রবীন্দ্রনাথের

বলাকা

গতিরাগের কাব্য

সুজয় বসাক

সাহিত্য সঙ্গী

৬ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট (দ্বিতল)

কলকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ পত্র

আমার সকল চিন্তা ও কর্ম যাঁর আদর্শ ও ভাবনার
আলো মেখে সতত প্রকাশিত, সকল সুখ-দুঃখের
নিত্য সঙ্গী আমার মা **শ্রীমতি গীতা বসাকের** করকমলে
এই ক্ষুদ্র প্রয়াসখানি অর্পিত হ্‌ল।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

১. শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ঃ সময়ের দর্পণে*
২. রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ঃ শতবর্ষোত্তর সমীক্ষা*
৩. দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ঃ পর্যালোচনার আলোকে*
৪. রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' ঃ কাব্য-পাঠের ভূমিকা*
৫. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' ঃ পুনর্বীক্ষণের আলোকে*
৬. রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' ঃ একটি সমীক্ষা*
৭. রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' ঃ শিল্প-ভাবনার আলোকে
৮. রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ঃ শিল্পিত অনুভবে
৯. চিতোর-বিজয় (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
১০. নাদিরা বেগম (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
১১. বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' ঃ তত্ত্বে ও সৃজনে
১২. রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' ঃ ভারত-ভাবনার আলোকে
১৩. সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ঃ অশান্ত সময়ের প্রতিধ্বনি
১৪. বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ঃ স্বদেশ-মন্ত্রের জাগরণী
১৫. বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' ঃ শিল্পিত অনুভবে*
১৬. শতবর্ষের আলোকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান'
১৭. রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ঃ বহুমাত্রিক পাঠ
১৮. রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ঃ মননে ও অন্বেষণে
১৯. বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' ঃ নদী ও জীবনের জলছবি
২০. তারাশঙ্করের 'কবি' ঃ বহুমাত্রিকতার দর্পণে
২১. শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' ঃ জীবন-বীক্ষার আলোকে
২২. শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' ঃ গার্হস্থ্য-জীবনের আলেখ্য
২৩. বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ঃ অন্বেষণের আলোকে
২৪. রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে' ঃ নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা
২৫. রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ঃ শতবর্ষের ক্রান্তিলগ্নে
২৬. রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' ঃ বেলা-শেষের কাব্য
২৭. রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' ঃ নিবিড় পাঠ
২৮. রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'
২৯. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ঃ নিবিড় পাঠের আলোকে
৩০. বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' ঃ শিল্প জিজ্ঞাসার আলোকে*
৩১. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'
৩২. তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'
৩৩. রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'
৩৪. শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ঃ বিশ্লেষণের আলোকে
৩৫. রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' ঃ শতবর্ষোত্তর পরিক্রমা

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্র-কাব্যধারায় অধ্যাত্মবাদের নিস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহের স্নিগ্ধ, কোমল, প্রশান্ত আত্মনিবেদনের যে সুরটি অপসৃত হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কাল-প্রবাহের অশান্ত, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে, সেই পর্বের প্রতিনিধি স্থানীয় কাব্য হল 'বলাকা'। এই 'বলাকা' পর্বে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কাব্য হল—'বলাকা' (১৯১৬), 'পলাতকা' (১৯১৮), 'পূরবী' (১৯২৫), এবং 'মহুয়া' (১৯২৯)। এইসব কাব্যের মধ্যে 'বলাকা' যে অন্যতম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কাব্যের মাধ্যমে কবি আমাদের মুক্ত প্রাণের গান শুনিয়েছেন। এই মৃতপ্রায়, অবসন্ন, জীর্ণ, পাংশু, রিক্ত, দরিদ্র জাতির চিত্তদেশে উচ্ছল যৌবনশক্তির দুর্মর প্রাণাবেগ তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। জড়ত্ব-জীর্ণতা আর মোহের জটিল জটাজালে আমরা আবদ্ধ। 'বলাকা'র কবিতা এই বন্ধন জাল ছিন্ন করে, আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার চরম সার্থকতার পথে এগিয়ে চলার পথে প্রেরণা জুগিয়েছে। 'বলাকা'র কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের ললাটে যৌবনের রাজটীকা পরিয়ে দিয়েছেন।

অনেকেই বলেন, 'বলাকা' গতিরাগের কাব্য। এ কথা বলার কারণ কী? 'গীতাঞ্জলি' পর্বে কবি-জীবনের সাধারণ রীতি ও প্রবণতা অনুসারে ছেদ পড়তো। কিন্তু হঠাৎ ঝড়ের বেগে কবির লেখনী থেকে বেরিয়ে এলো 'বলাকা' কাব্য। ইউরোপ তখন সর্বনাশা প্রথম মহাযুদ্ধ ও মৃত্যুর প্রভাবে মানবচিত্ত ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। ফরাসী দার্শনিক আঁরি লুই বার্গর্স-এর Elan Vital বা ক্রমবিকাশশীল গতিতত্ত্ব ইউরোপের দার্শনিক ও শিল্পীমহলে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। এই মতবাদে জড়ত্বকে নস্যাৎ করে গতিবাদের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। থেমে থাকা মিথ্যা, বিকৃতির নাম মৃত্যু। সত্যের সংজ্ঞা হলো—নিরবচ্ছিন্ন ও অপরিণামী গতি। গতিবাদের এই বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব 'বলাকা' কাব্যে হৃদয়গ্রাহ্য রসানুভূতিতে পরিণত হল, দর্শনের গতিবাদ হল কাব্যের গতিরাগ। এই গতিই জীবনকে সচল রাখে, গতিহীনতা স্থবিরত্ব মৃত্যুর নামান্তর।—কি বিশ্বজাগতিক নিয়মের ক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রীয় নিয়ম বা মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে—এই গতিই বারবার নবজীবন-এর স্পন্দন সৃষ্টি করে। যাদের জীবনের গতিপথ বাঁধা সড়কের ওপর সঞ্চারমান নয়, যারা নতুনকে পরীক্ষা ও গ্রহণ করতে অকুতোভয়। যৌবনের জয়গানে কবি তাই মুখর হয়েছেন।

'বলাকা'য় কেবল তত্ত্বগত গতির কথাই বলা হয় নি। গতির প্রসঙ্গে সমাজ প্রসঙ্গও এসে গেছে। যারা সমাজে অন্ধ ও প্রাচীন সংস্কারগ্রস্ত তারাই সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিশেষ অন্তরায়। এরা হলেন প্রবীণ. পাকা, অর্ধমৃত সম্প্রদায়। যৌবনের প্রাণ-চাঞ্চল্য ও গতিকে তারা অস্বীকার করে। তাই জড়ত্ব ও জীর্ণতায় সমাজের প্রবণশক্তি লয় হয়। এই পরিবর্তন বিমুখ অকর্মণ্য পাকাদের আঘাত করে অচলায়তনিক জীবনে গতির তরঙ্গ সৃষ্টি করাই কবির মূল লক্ষ্য। তাই কবি তরুণদের আহ্বান করে বলেছেন—

'ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

ভাবের গভীরতায়, আবেগের তীব্রতায়, ভাষার দীপ্তিতে, মুক্তবন্ধ ছন্দের অভিনবত্বে 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

প্রায় একশো বছর ধরে 'বলাকা' কাব্যের কবিতাগুলি নানাজনের বোধ আর বোধির জগতে আন্দোলন তুলেছে। তার মূল্যায়নও করা হয়েছে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। তবু কালোত্তীর্ণ কবিতা যেমন বহুপাঠেও তার নবীনতা হারায় না, তেমনি পাঠক-সমালোচকদের কাছেও সে নতুনতর অভিনিবেশ দাবী করতে পারে। আর অবশ্যই আছে প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডিবদ্ধতার আয়ত্তে থাকা শিক্ষার্থীদের ভাবনার জগত। সেখানে কবিতা পাঠ অনেকটাই নিবিড় এবং বিশ্লেষণমুখী। আমি মনে রেখেছি সেই কথাও। সুতরাং গবেষকের নতুন তথ্যসন্ধানী প্রবৃত্তি অন্বেষণের মাঝে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিবৃত্তির কথাও ভেবেছি বারে বারে। তবে বক্ষ্যমান সমালোচ্য গ্রন্থে ভাবনার ভিন্নখাত অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। আর চেষ্টাও করেছি অনুসন্ধান ও আলোচনাকে বহুমাত্রিক করতে।

বহু বিচিত্র কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আমার গবেষণালব্ধ এই স্বপ্নের ধন অবশেষে মুদ্রণের আলোকিত প্রকাশে নিজের পরিচয়কে চিহ্নিত করলো এবং এই ব্যাপারে যাঁর সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রেরণা প্রতিনিয়ত সজাগ থেকেছে তিনি হলেন 'সাহিত্য সঙ্গী'র কর্ণধার শ্রদ্ধেয় অসীমদা। এছাড়া আগ্রহ ছিল আমার আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব অনেকেরই।

এখন কবিতার মুক্তি পাঠকের হৃদয়ে, তত্ত্ব বা দর্শনের বেড়াজাল অতিক্রম করতে পারলেই মেলে কাব্যপাঠের আনন্দ।

নিবেদনান্তে
সুজয় বসাক

সূচীপত্র

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী (১-১৮ খণ্ড) [বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ]
২. বলাকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. কবি রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব বসু
৪. রবীন্দ্রনাথ—ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
৫. রবি-রশ্মি (১ম ও ২য় খণ্ড)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬. রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা (১ম ও ২য় খণ্ড)—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৭. বলাকা কাব্য-পরিক্রমা—ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী
৮. রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী
৯. রবীন্দ্র-কাব্যপরিক্রমা—ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
১০. রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়—ড. ক্ষুদিরাম দাস
১১. রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা—ড. নীহাররঞ্জন রায়
১২. রবীন্দ্র-জীবনী (১ম-৪র্থ খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপ্যায়
১৩. রবি-জীবনী (১ম-৮ম খণ্ড)—প্রশান্তকুমার পাল
১৪. পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—বার্ট্রাণ্ড রাসেল
১৫. দর্শন-দিগ্‌দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)—রাহুল সাংকৃত্যায়ন
১৬. রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু—ধীরেন্দ্র দেবনাথ
১৭. উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানস—ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত
১৮. রবীন্দ্র-কবিতা শতক (তিন দশক)—জগদীশ ভট্টাচার্য
১৯. কবি-মানসী (১ম ও ২য় খণ্ড)—জগদীশ ভট্টাচার্য
২০. রবীন্দ্র-কাব্যে পশ্চিমালোক—কালিসাধন মুখোপাধ্যায়
২১. বাঙ্‌লা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব—ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
২২. ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—প্রবোধচন্দ্র সেন
২৩. কবিগুরু—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে 'বলাকা'র স্থান

যে কোনো কবির কাব্য সৃষ্টিকেই একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। নদীর প্রবাহ সাধারণত বক্ররৈখিক, একটি সরলরেখায় তা চলে না—কোনো কবির কাব্য-সাধনাও এক অভিন্ন চিন্তার সরলমুখী গতিতে অগ্রসর হয় না, তার মধ্যে অনেক দিক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। নদীর গতির সঙ্গে কাব্যপ্রবাহের আরো একদিকে মিল আছে, সেটি তার পরিণতিতে। নদীর উৎস সাধারণতঃ গিরিশিখর, সেখান থেকে নদী যখন যাত্রা শুরু করে তার মধ্যে থাকে কৈশোর ও যৌবনের প্রত্যাশিত চাঞ্চল্য এবং তার চলায় তখন জাগে নৃত্য চপল ছন্দ। কিন্তু নদী যখন মোহনায় এসে সমুদ্রের সঙ্গে মেশে তখন সে প্রশান্ত, গভীর, অচঞ্চল। নদীর অন্তিম পরিণতি সমুদ্রের সঙ্গে মিলন, এটি তার প্রায় অনিবার্য এক পরিণতি। কোনো কবির কাব্য-সাধনা সম্পর্কেও এটি সাধারণ সত্য। কাব্য-সাধনার প্রাথমিক পর্বে অনেক উচ্ছ্বাস থাকে, রূপতৃষ্ণা থাকে, যৌবন-চাঞ্চল্য থাকে।—শব্দ প্রয়োগ, অলঙ্কার-সৃষ্টি এবং ছন্দ নির্মাণেও উচ্ছল পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখা যায়। কিন্তু অন্তিম পর্বে কাব্য মোহনায় আধ্যাত্মিক সাগর-সঙ্গম কবি চেতনার এক প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক ঘটনা। যে কবি রূপের জগতে বিভোর হয়ে থেকেছেন জীবনের মধ্যপর্বে, তিনিও শেষ জীবনে অরূপের সাধনা করেছেন, ইন্দ্রিয়-চেতনা যাঁর কবিতার প্রধান লক্ষণীয় সুর হয়েছিল একদিন, অন্ত্যপর্বে তিনিও আধ্যাত্মিক, এই দৃষ্টান্ত আমরা বার বার দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই স্বাভাবিক গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। 'সন্ধ্যা সংগীত' কাব্যগ্রন্থ থেকেই তাঁর কাব্য-সাধনার সফল পদচারণা—এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন। কল্পনার সতেজ ও সুস্থ সজীবতা আমরা দেখি তাঁর 'মানসী' পর্বে। সৌন্দর্যের উচ্ছল আবেগ সোনার তরী চিত্রা চৈতালি কাব্যগ্রন্থে আমরা পাই। 'মানসী' পর্বেই কবি হয়ে উঠেছেন শিল্পী।

সৌন্দর্য অনুভবের গাঢ়ত্ব যেমন তাঁর কবিদৃষ্টিতে পাই, সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রতি আগ্রহ পাই তেমনি তাঁর কবিতার প্রসাধনে। কবির কল্পনা ভিন্নমুখী হয়েছে, অর্থাৎ বাস্তব পৃথিবী ছেড়ে অতীত ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি অন্তর্মুখী হয়েছে 'কল্পনা' কাব্য থেকে এবং সেই প্রস্তুতিরই চূড়ান্ত পর্ব 'নৈবেদ্য'। কবি জীবনের স্বাভাবিক বিবর্তন এবং পরিণতির নিয়ম মেনেই যেন যৌবন স্বপ্নের কবি রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি কাব্যত্রয়ের আধ্যাত্মিকতায় সমাহিত হয়েছেন। এর পরেও কোনো কাব্যিক বিবর্তন যেমন অস্বাভাবিক তেমন অপ্রত্যাশিত। কিন্তু বার বার সর্বত্র যিনি নিয়ম ভাঙার খেলায় মেতেছেন এখানেও তিনি নিয়মভঙ্গ করে নিজেকে ব্যতিক্রম হিসাবে যেন প্রমাণিত করতে চাইলেন। 'গীতাঞ্জলি'র আধ্যাত্মিক প্রশান্তির পর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের যৌবন চাঞ্চল্য ও অস্থির গতির আবেগ কাব্যজগতে এক দুর্লভ ব্যতিক্রম।

কবিজীবনের এই ব্যতিক্রমের মানসিক কারণ নিশ্চয়ই আছে। কবি নিজে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ রচনার সময়কার মানসিকতা নিয়ে যেসব মন্তব্য করেছেন তাতে জানা যায় সেই

সময় তাঁর প্রাণের মধ্যে এক প্রচণ্ড অনির্দেশ্য ব্যথা জন্মেছিল। কবির তখনকার নিত্য সহচর দীনবন্ধু অ্যণ্ড্রুজ সেই বেদনার কথা জানতেন। কিন্তু বাহ্যিক কিছু ঘটনাও কবি জীবনের এই গতি পরিবর্তনের কারণ বলে আমরা মনে করি। অবশ্য এই কাব্যের কবিতাগুলি লিখবার আগে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে তিনি দেড় বছরের কিছু অল্প সময় কাটান। বিদেশে কবি পূর্বেও গিয়েছেন, কিন্তু এত দীর্ঘ সময় তিনি সেখানে আগে কাটান নি—এর এক ব্যাপক ও গভীর প্রভাব পড়েছে কবির ওপর। পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার এক নিবিড় পরিচয় তিনি এই সময় লাভ করেছিলেন। প্রতীচ্য জীবনের যে উচ্ছল স্রোত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখার জন্য সদাচঞ্চল, ভারতবর্ষে তা যেন অত্যন্ত ক্ষীণস্রোতা—প্রাণের বেগ বলতে যেন সেখানে বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জীবনধারার এই তুলনামূলক বিচার যখন অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁর নিজের মনেই গড়ে উঠেছে তখন স্বাভাবিক কারণেই তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। জ্ঞানে ও অগোচরে তাঁর সেই শঙ্কা 'বলাকা' কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে বলেই আমাদের মনে হয়।

দ্বিতীয় একটি ঘটনাও সমসূত্রে গ্রথিত বলে আমরা মনে করি। সেটি এই কাব্যারম্ভের পূর্ববর্তী বছরে কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ এতদিন অন্তরঙ্গভাবে যে কাব্য-সাধনা করেছেন তা যে মুহূর্তে বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেই মুহূর্তে তিনি বিশ্ব সম্বন্ধে এক সমগ্রতার বোধ বা ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অখণ্ডতার বোধ কবির পূর্বেও ছিল। কিন্তু অখণ্ড বিশ্বের দাবী যে কত বড়ো, এতদিনে তিনি তা বুঝতে পেরেছেন। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'ইতিপূর্বে গীতাঞ্জলির সময় পর্যন্ত প্রধানত আমাদের দেশের জীবনযাত্রা কবির কাব্যবস্তু ছিল। ইহার সুখ-দঃখ, আশা-আশঙ্কা, অতীত-ভবিষ্যৎ পরিমাপ করিয়া তিনি একটা ঐক্যবোধের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনপ্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণপ্রাণ ঐক্যবোধ শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাও বলাকার একটা লক্ষণীয় বিষয়।'

'বলাকা'-পর্বে উপনীত হয়ে যেন রামগড় পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নেমে এলেন কবি। গীতিমাল্যের শেষ গানটি কলকাতায় লিখে কবি এলেন শান্তিনিকেতনে। এখানে বিদ্যালয়ে নানা পরিবর্তন চলেছে। কবির মনেও বোধ হয় পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র আধ্যাত্মিক পর্বে উপনীত হওয়ার পরও যে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে অকস্মাৎ একটি অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার জন্য আরো একটি বাহ্যিক কারণ দায়ী বলে আমাদের মনে হয়। মধ্য যুগে সাহিত্য সাধনা ছিল রাজসভাভিত্তিক, আধুনিক যুগে তা ছিল সাহিত্যপত্র-কেন্দ্রিক। এক-একটি সময়ে একটি বিশেষ রুচির সাহিত্য পত্রের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এক বিশেষ ধরনের রচনার জন্ম হয়েছে—বরেণ্য সাহিত্যিকদের কলমেও। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে দিক্ পরিবর্তনও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। তাঁর কাব্য-সাধনার প্রথম পর্যায়ে ছিল 'ভারতী' পত্রিকা, তারপর 'সাধনা' এবং 'হিতবাদী'। এরপর আবার 'ভারতী' পত্রিকা কবি আশ্রয় করেছেন এবং তারপর 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'। এরপর কবির প্রধান আশ্রয় 'প্রবাসী' এবং বলাকা পর্বে তিনি অবলম্বন করেছেন 'সবুজপত্র' পত্রিকাটিকে। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত এই পত্রিকাটি বিভিন্ন কারণে ছিল অভিনব, যে কারণে একটি বিদ্রোহের সুরধ্বনিত হয় এই পত্রিকার মধ্যে। এই বিদ্রোহ প্রচলিত ধারণার প্রতি,

প্রথাগত জীবনযাত্রার প্রতি, রীতিসিদ্ধ সাহিত্য সাধনার প্রতি। এই বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথ ও আত্মস্থ করেছেন এবং তাঁর 'বলাকা' পর্বের কাব্য-সাধনাও সবুজপত্রের দৃষ্টিভঙ্গির সমধর্মী হয়ে উঠেছে।

সবুজপত্রের (প্রথম প্রকাশ ১৩২১ বঙ্গাব্দ/ইং ১৯১৪ খ্রিঃ) চাহিদা মেটাতে কবিকে গল্প রচনায় মন দিতে হলো। কবির মনে যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো তারই সঙ্গে সুর মিলেয়ই যেন প্রকাশিত হলো নতুন পত্রিকা—'সবুজপত্র'। পত্রিকার নামটিও লক্ষণীয়। মনে যে সবুজের রঙ ধরেছে এতে তারই প্রকাশ দেখা গেল। ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে যে ছোটগল্পটি প্রকাশিত হলো তার নাম 'স্ত্রীর পত্র'। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ভাঙিবার যে সুর বলাকার প্রথম তিনটি কবিতার মধ্যে ধ্বনিয়াছিল। তাহাই যেন রূপ পাইয়াছে সবুজপত্রের গল্প ধারায়। 'সবুজপত্রে' তিনটি নারী চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, নারীর শুভ্র শঙ্খ দেবতার বাণী ঘোষণা জন্য, ধূলায় পড়িয়া থাকিবার জন্য নহে।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এদিকে 'বলাকা' কাব্যের বিচিত্র উপাদান অন্তরে নানাভাবে সঞ্চিত হইতেছে; শুধু ভাবের উপকরণ নহে—রূপের ও ছন্দের উপকরণও জমিতেছে। 'আষাঢ়' প্রবন্ধে কবি বস্তু ও অবস্তু লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, 'বস্তু পিণ্ডকে ঘেরিয়া আছে তথাকথিত অবস্তু বা বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত ও শূন্যে, যেখানে তাহার নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। তেমনি মানুষের চিত্তের চারিদিকে তাহার নানারঙের খেলায় ভাসিতেছে। সেখানকার ভাষাই সঙ্গীত।" 'বলাকা'তেও বস্তু ও অবস্তুর কথা আছে। এই প্রবন্ধে ছন্দ সম্বন্ধেও কবি আলোচনা করেছেন; অ্যাণ্ড্রুজকে লিখিত একটি পত্রেও কবি ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছে। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন—'কিছুকাল হইতে নানা কারণে কবিকে ছন্দ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। ছন্দের সহিত ভাবের ও ভাষার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য;....এই নবছন্দে কবি রূপ দিলেন নূতন ভাবনাকে। বস্তুর গতিধর্ম ও স্থিতিধর্ম লইয়া বিজ্ঞানে ও দর্শনে যে সংগ্রাম চলিতেছে—তাহারই সংশ্লেষণী নূতন তত্ত্বকে কবি আপনার ভাষায় নূতন ছন্দে ব্যক্ত করিলেন।'

৪ঠা আগস্ট ১৯১৪ খ্রিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। শান্তিনিকেতনে শান্তির অগ্রদূত কবি পাপ দূর করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। তাঁর বিশেষ প্রার্থনা হলো, 'আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' ভয়ঙ্করের ভিতর দিয়েও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হয় এটাই কবির এ যুগের বিশিষ্ট বিশ্বাস।

৫ ভাদ্র (আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ, ১৯১৪ খ্রিঃ) রবীন্দ্রনাথ 'পাড়ি' কবিতা লেখেন। এই কবিতায় যে যুদ্ধের ভাবনা আছে তা কবি নিজেও স্বীকার করেছেন। যুদ্ধের মত্ততার মধ্যে তিনি মঙ্গলের পদসঞ্চার শুনেছেন। এই কবিতায় 'বলাকা' কাব্যের মূল সুরটির সন্ধান পাওয়া যায়। গতিই একমাত্র সত্য নয়। গতি ও স্থিতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

'গীতালি'র গানগুলো শেষ হতে না হতেই আরম্ভ হলো 'বলাকা'র পর্ব। একটা ঋতুর অন্তে এবং আরেকটির আগমনে যেমন মিলিত অবস্থা দেখা যায়, 'গীতাঞ্জলি'র শেষে এবং 'বলাকা'র প্রথম দিকেও সেই মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধগয়ায় থাকাকালীন কবি লিখেছেন ঃ—

'পান্থ তুমি, পান্থ জনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।'

অথবা,

'পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিক জনের লহো নমস্কার।'

'গীতালি'র এই গানে 'বলাকা'র গতিরাগের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

'গীতালি'র ৯৭ সংখ্যক গানটি—

'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।'

'বলাকা'র অন্তর্নিহিত সুর এখানেও প্রবহমান।

'বলাকা'তে কবি নিজেই বলেছেন—

'পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আজি বসন্তের মাতাল বাতাস।'

'চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর' বসন্তের মাতাল বাতাস টলে পড়লো 'পউষের পাতা ঝরা' তপোবনে পরবর্তী যা তা এসে মিলিত হলো অগ্রবর্তীর সঙ্গে। অগ্রবর্তীর সঙ্গে পরবর্তীর অথবা পরবর্তীর সঙ্গে অগ্রবর্তীর মিলনের ফলশ্রুতি একই। 'গীতালি'র সমাপ্তিকালের সুর গিয়ে মিশলো 'বলাকা'র সুরে। অথবা 'বলাকা'র সুরটি 'গীতালি'র কালেই মনে জেগেছে—ফলে পার্থক্য তাতে কিছু নেই।

'গীতালি'র শেষ কবিতা 'এই তীর্থ দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে' সনেটটি কবি এলাহাবাদে লেখেন ৩রা কার্তিক ১৩২১ বঙ্গাব্দে—সেইদিন রাত্রেই তিনি লেখেন 'বলাকা'র 'ছবি' ('তুমি কি কেবলই ছবি') কবিতাটি। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বহুকাল কবি সুখের রাজ্যে বাস করিয়াছেন। যথার্থ ছন্দোময় কাব্যের মধ্যে আপনার চিত্তকে ও কল্পনাকে অবাধ বিচরণের অবসর দিতে পারেন নাই। সুরের মধ্যে ছন্দের মধ্যে, রূপের মধ্যে রূপকের মধ্যে আপনার ভাবনারাশিকে মুক্তি না দিতে পারিলে কবির সাহিত্যিক চিত্ত যেন তৃপ্ত হয় না। তাই এতদিন পরে ছন্দের মধ্যে আপনার আনন্দ মূর্তি লইল।' এলাহাবাদে তিনি আর একটিমাত্র কবিতা লেখেন ১৪ই কার্তিক—শাজাহান (একথা জানিতে তুমি)।

ড. সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের বারে বারে দিক পরিবর্তনের কথা খুবই সুন্দর করে দেখিয়েছেন, " 'বলাকা' (১৯১৬), রবীন্দ্রনাথের কবি দৃষ্টিতে আবার দিক পরিবর্তন সূচনা করিল। ভাবে-ভাষায় সহজ হইতে কঠিন, ভাব হইতে অনুভাব, জীব দত্তা হইতে কবিসত্তা—এমন দিক পরিবর্তন বারে বারে দেখিয়াছি। চৈতালি হইতে কল্পনা, কল্পনা হইতে ক্ষণিকা, ক্ষণিকা হইতে নৈবেদ্য। এখন গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি হইতে বলাকা, এবং বলাকা হইতে পলাতকা। পূর্বে ক্ষণিকার যে দিক পরিবর্তন দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে বলাকার বাহিরের মিল নাই, কিন্তু ভিতরে বিশেষ যোগ আছে।—...শৈবালে ও তীরতরুচ্ছায়ে দীঘির গভীরত্ব যেমন পরিস্ফুট করে বলাকার কবিতায়, তেমনি ভাষার ঐশ্বর্য ও কাব্যশ্রীর চারুতা ভাবগাম্ভীর্যকে গম্ভীরতর করিয়াছে। ...বলাকার কবি উন্মনা পথের শেষে যে ধ্রুবলোক বিরাজ করিতেছে

তাহারি জন্য। যদিও সে ধ্রুবলোক ধ্যান-ধারণার লক্ষ্য পথে আসে নাই।"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প দুটো একালে রচিত 'রাজপথের কথা'য় চলাটাই সত্য। এবং 'ঘাটের কথা'য় লক্ষ্যটাই সত্য—'বলাকা'র সঙ্গে এ দুটোরই সুরের মিল আছে। 'বলাকা' রচনাকালে কবি ৪৫-৫৫ বছরে এসে পৌঁছেছেন তাই কেবল চলাটাকেই ধ্রুব সত্য করার বয়স পার হয়ে গেছে—শেষ গন্তব্যস্থানটির কথা না ভেবে পারেন না। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'অচলায়তন' নাটকে 'শোণপাংশু' কেবল চলাটাকেই সত্য বলে মনে করতো, তাদেরও তিনি স্থবিরদের সঙ্গে মিলিয়ে এক উদ্দেশ্যের মধ্যে বাঁধবার ব্যবস্থা করেছেন।

ড. ক্ষুদিরাম দাস বলেন সমগ্র গীতালি এই জীবনোৎসবের মুখর।...গীতালিতে জীবনের গতির কথা এবং কবির নিজের যাত্রার আনন্দ বারংবার অনুরণিত হয়েছে।...গীতালিতেই কবি দৃষ্টিকে নিরাশ্রয় অরূপ ভাবলোক থেকে নামিয়ে এনে মানবজীবনে নিক্ষেপ করেছেন। এই নব জীবনবাদের প্রকাশ দুইভাবে হয়েছে। এক, সর্বনাশ ও মৃত্যুকে বরণ করার উৎসাহে, দুই, জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রার প্রেরণায়। এই ভাব মুহূর্তগুলিই রবীন্দ্র কাব্যের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত, তাঁর কাব্য-সাধনার পরিপক্কাবস্থা।...কবির গতি অভিমুখী যে মন যাত্রা, যাত্রী, তরী, কাণ্ডারী, নেয়ে, পথ, পান্থ, সাথী প্রভৃতির কল্পনায় 'গীতালি' পূর্ণ করে তুলেছে, সেই জন্যই বলাকার আত্মগত যাত্রার কবিতাগুলিতে সদৃশ কল্পনা আশ্রয় করেছেন। তরীতে যাত্রাই হোক বা পদক্ষেপই হোক, মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই।

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মনে করেন যে, বলাকাশ্রেণী সন্ধ্যাবেলা আকাশ পথে উড়ে যায়। পুরাণ-কল্পিত মানস সরোবরের দিকে। সুতরাং তাদের চলার লক্ষ্য বিস্ময়ময় সৌন্দর্যলোক। মানব জীবনও মঙ্গল এবং সুন্দরের সন্ধানে যাত্রা করেছে। এ চলা উদ্দেশ্যহীন চলা নয়—লক্ষ্য স্থির রেখে চলা।

রবীন্দ্র-জীবনী লেখক শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "উপহার কবিতাটি (১০ সংখ্যক) লিখিবার দুই দিন পরে লেখেন 'বিচার' (১২ পৌষ, ১১ সংখ্যক)। মহাযুদ্ধের নৃশংসতার কথা কিছুতেই মন হইতে মুছিতে পারিতেছেন না, উন্মত্ত মানব আজ নানা মনোমুগ্ধকর নাম লইয়া দেবতাকে অপমান করিতেছে—তাহার গায়ে ধূলা নিক্ষেপ করিতেছে।" 'বিচার' কবিতাটি এই বেদনা থেকেই জন্মলাভ করেছে।

প্রভাতকুমার আরও বলেছেন, "মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কবি শান্তিনিকেতন মন্দিরে 'পাপের মার্জনা' নামে যে উপদেশ দেন (৯ ভাদ্র, ১৩২১) তাহার মধ্যে এই কবিতার ভাবটি নিহিত ছিল।" তিনি বলেছেন, "আজ এই যুদ্ধের আগুন জ্বলছে, এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাটি কেঁদে উঠছে....বিশ্বপাপ মার্জনা করো । আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পাপ স্তূপাকার হয়ে ওঠে, তখনই তো তার মার্জনার দিন আসে।" এ যেন কতকটা 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র মতোই। তবে কি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেও মঙ্গলকে দেখতে পেয়েছিলেন?

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, বলাকা ১৩২৩ সালে প্রকাশিত। এর কবিতাগুলি দু'বছর ধরে লেখা হচ্ছিল। প্রথম চৌত্রিশটি ১৩২১-এ এবং শেষ ১১টি ১৩২২-এর কার্তিক থেকে পরবর্তী বৈশাখের মধ্যে রচিত। এই পঁয়তাল্লিশটি কবিতার দশটি সমশ্লোকে ও একটি সনেট আকারে লেখা। বাকি চৌত্রিশটি বিষমশ্লোকে রচিত। এই শ্লোকের পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে বলাকার ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ।

বলাকা আলোচনার পূর্বে কবি-জীবনের একটি ঘটনা মনে রাখা দরকার। এই কাব্য লেখবার পূর্বে কবি দীর্ঘকাল, প্রায় সতের মাস, বিদেশে, ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করেছিলেন।

এর আগেও কবি বিলাতে গিয়েছেন। তার মূল্য নগণ্য, সে-সব ভ্রমণ বাইরের দিক থেকেও যেমন অ-চিরকালস্থায়ী, কবির কাব্যেও তার প্রভাব তেমনি অল্প। কিন্তু এবারে তিনি বিদেশে গিয়ে তথাকার বিপুল জীবন-যাত্রার কিছু আভাস পেয়েছেন। মানুষের তিনি কবি; মানবতার যে ধারণা আমাদের দেশে প্রবাহিত, যাঁর কূলে তিনি মানুষ, তাঁর ক্ষীণস্রোত, প্রাণের বেগ তাতে অতি মন্থর; একদিন যা মহানদ ছিল, এটা তার শুষ্কাবশেষ মাত্র। এই মানবতার প্রবলতম ধারণা আজ ইউরোপময় বইছে; সেই বিরাট বেগ্‌বান স্রোত কবি প্রত্যক্ষ করে আসলেন। তার প্রচণ্ড প্রবাহ তাঁর শিক্ষা-উপশিক্ষাকে অভিষিক্ত করে দিল। বলাকা যথার্থভাবে হলে মানুষেরই এই বিরাট জীবন প্রবাহটাকে পাঠকের চিত্তের পটভূমিতে রাখা আবশ্যক। কারণ এই ভাবটা স্বয়ং কবির কল্পনায় সর্বদা অলক্ষ্যে কাজ করছে।

'বলাকা'র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল ফাল্গুনী কাব্যগ্রন্থ এবং ফাল্গুনী নাটক; আশ্চর্য, এখানেও সেই যৌবনের জয়গান—জীবনের বেগবান গতিস্রোত-এর পরিচয়।

অধ্যাপক বিশী আরও বলেছেন, "ইতিপূর্বে গীতাঞ্জলির সময় পর্যন্ত প্রধানত আমাদের দেশের জীবনযাত্রা কবির কাব্যবস্তু ছিল। ইহার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা অতীত-ভবিষ্যৎ পরিমাপ করিয়া তিনি একটা ঐক্যবোধের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জীবন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণপ্রাণ ঐক্যবোধ শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাও বলাকার একটা লক্ষণীয় বিষয়।"

সে ঐক্যবোধ শিথিল হয়েছে, ভালোই হয়েছে। কারণ এর প্রয়োজন ছিল। যে মানব-জীবনকে ভিত্তি করে কবি সমাজের স্বর্গ গড়েছিলেন, সে মানবজীবন অসম্পূর্ণ ছিল। এবারে সম্পূর্ণ মানবজীবনের তিনি সাক্ষাৎ পেলেন, কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্যের তোরণ নির্মাণ তেমন সহজ নয়—সেই জন্য, পূর্বের কাব্যের ন্যায়, ঐক্যবোধ ও সামঞ্জস্য বলাকার প্রধান রস নয়। এই দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশার পরপারেও যে 'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার' আছে তা কবির বিশ্বাস। সে স্বর্ণদ্বার আজ না খুলুক, একদিন যে তা খুলবেই, তাতেই তাঁর পরম আনন্দ। এই আশা-আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত আশ্বাস বলাকার একটা প্রধান রস। খেয়া-নৈবেদ্য গীতাঞ্জলির মতো তত্ত্ব হিসাবে এটা অত্যন্ত অভ্রান্ত ঐক্যমূলক নয় বলেই পাঠককে এটা আনন্দ দেয়। খেয়া-নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির পরে যে এই কাব্য বাঙালি পাঠককে বিস্মিত করে দিয়েছিল—এটা তার কারণ।

১৩২১ (১৯১৪-১৫) সালে লেখা 'বলাকা'র প্রথম দিক্‌কার কয়েকটি কবিতা,—যেমন সবুজের অভিযান, পাড়ি, শঙ্খ, ছবি, শাজাহান, চঞ্চলা, দান ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতাগুলি। আবার এই সময়েই ১৩২১ সালের ভাদ্র মাসের থেকে কার্তিকের মধ্যে 'গীতালি'র গানগুলি তিনি লিখেছেন। ১৩২২ সালে লেখা 'বলাকা'র নাম কবিতা, ঝড়ের খেয়া, নববর্ষের আশীর্বাদ। কিন্তু বলাকার অধিকাংশ কবিতা ১৩২১ সালে লেখা। তখন রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ় কবি,—নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯১৩) আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান কবি। 'বলাকা'র অব্যবহিত অতীতের রচনা তাঁর গীতাখ্য কাব্যত্রয়—গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৪)। বন্ধনীতে কবিতাগুলির রচনাকাল দেওয়া হয়নি। প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে। 'বলাকা'র প্রকাশকাল ১৯১৬। ১৯১৬ পর্যন্ত সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের অথবা

শুধুমাত্র কাব্যধারা অনুসরণও কয়েক পৃষ্ঠায় সম্ভব নয়। তাই এই অসাধ্য চেষ্টা না করে। 'বলাকা'য় পৌঁছানোর পথের রেখাই শুধু টানতে চাই।

বলাকা-পূর্ব যুগকে এই কয়টি পর্বে ভাগ করে নিতে পারি। পদ্মাতট-পূর্ব-পর্ব, পদ্মাতট-পর্ব, অতীত ভারতে মানসভ্রমণ-পর্ব, গীতাখ্য কাব্য-পর্ব। প্রথম পর্বে আত্মপ্রকাশের এক আকুলতা তাঁকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় পর্বে ঝোঁক পড়েছে বৃহৎ উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যেও পল্লীর সাধারণ মানুষের জীবনে। তখন পদ্মা তাঁর কল্পনার ধাত্রী। তৃতীয় পর্বে তিনি প্রাচীন ভারতে মানসভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন, প্রাচীন ভারতের তপোবন জীবনাদর্শের জয়গান গাইলেন, প্রাচীন ভারতের অর্থাৎ হিন্দু ভারতের মহিমা কীর্তনে মুখর হলেন। চতুর্থ পর্বে ঈশ্বর ভাবনা ফিরে ফিরে রূপ পেয়েছে।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'কবিকাহিনী'তে একটি অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি আছে—'মানুষের মন চায় মানুষের মন।' কবি তাঁর অন্তর্মুখী মনের বন্ধন কাটিয়ে মানুষের সঙ্গলাভের ব্যাকুলতা এখানে প্রকাশ করলেন। জীবনের প্রথম পর্বে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রভৃতি গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য রচনা শেষ করে তিনি 'শৈশব সংগীত' নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এসব রচনায় তাঁর অস্পষ্ট আবেগের উচ্ছ্বাস। তবুও এরই মধ্যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের মূল সুরটি সাধা হলো। স্নেহপ্রেমময় মানব প্রকৃতিকে অস্বীকার করলে শেষপর্যন্ত প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়, জীবন বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাস পরাভূত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলির ঢঙে তিনি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' লিখবেন। এই উজ্জ্বল অনুকৃতিতে তিনি তাঁর ভাবী কাব্যের ছন্দ, ভাষা ইত্যাদি আয়ত্ত করে নিলেন। 'সন্ধ্যা-সংগীত' থেকে কাব্যগ্রন্থগুলিকে তিনি তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করেছেন। 'সন্ধ্যা-সংগীতে' ছিল তাঁর অন্তর্মুখী মনের বেদনা, মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থাবলী'তে 'সন্ধ্যা-সংগীতে'র কবিতাগুলিকে 'হৃদয়-অরণ্য' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'সন্ধ্যা-সংগীতে'র পরে 'প্রভাতসংগীত'। এখানকার কবিতাগুলির শিরোনাম দিয়েছিলেন মোহিতচন্দ্র সেন 'নিষ্ক্রমণ', 'প্রভাতসংগীতে'রই বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। হৃদয়-বেদনা গুহায় যে-চেতনানির্ঝর বন্দী ছিল, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটল। দূর মানবসাগরের আহ্বান কানে নিয়ে সেই নির্ঝর গুহার পাষাণ কারা থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর একে একে তিনি লিখলেন 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল'। তারপর তিনি উত্তর ভারতের গাজিপুরে বেড়াতে গেলেন। সেখানকার গঙ্গাতীরে শুরু হল 'মানসী-পর্ব'। এই 'মানসী'তে কবির সঙ্গে শিল্পীর মিলন হল। ভাবকে তার উপযোগী রূপদানের জন্য ভাষা, ছন্দ, চিত্রকল্প এবারে তাঁর আয়ত্ত হল।

এই সময় তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে জমিদারির ভার নিয়ে পদ্মাতীরে গেলেন। বাংলার বৃহৎ উদার উন্মুক্ত রূপের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে তাঁর কল্পনা পেল অবাধ মুক্তি। আবার এই পর্বেই বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গ তিনি পেলেন। এই পর্বেই তিনি লিখলেন, 'সোনার তরী'র বিখ্যাত কবিতাগুলি। রোমান্টিক কবিকে তাঁর পরিপূর্ণ রূপে এখানে দেখা গেল। এই রোমান্টিকতার মধ্যে ক্লান্ত হয়ে 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় সংসারের তীরে তাঁর তরী বাঁধতে চাইলেন। 'সোনার তরী'র শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় তিনি অপ্রাপ্য সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল চিত্তে সেই সৌন্দর্যের দূতী এক বিদেশিনীর সঙ্গে রহস্য সিন্ধুর পরপারে যাত্রার উৎসাহ প্রকাশ করলেন। 'চিত্রা'য় এসে এই নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের

আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হল সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ জীবনের প্রতি আকর্ষণ। তিনি 'চৈতালি'র সংক্ষিপ্ত পর্বে গ্রামবাংলার বস্তুচিত্র আঁকলেন, কয়েকটি সনেটে প্রাচীন ভারতের কাব্যসৌন্দর্যে সাড়া দিলেন। এভাবে আমাদের পূর্বোল্লিখিত পদ্মাতট পূর্বপর্ব ও পদ্মাতট-পর্ব শেষ হল।

এবারে উন্মুক্ত হল তৃতীয় পর্ব—প্রাচীন ভারতে তাঁর মানসভ্রমণপর্ব, একের পর এক তিনি লিখে চললেন 'কথা', 'কাহিনী', 'নৈবেদ্য', স্ত্রীর মৃত্যুতে 'স্মরণ', 'শিশু', উৎসর্গ। বৈদিক ঔপনিষদিক যুগ, বৌদ্ধযুগ, মহাভারতের কাল বা নিকট অতীতের রাজপুত-মারাঠা-শিখদের শৌর্যবীর্যময় যুগ তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে এই পর্বে। মনুষ্যত্বের আদর্শ বার বার চিত্রিত হয়েছে। 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন' কবিতায় দূরে বহু দূরে উজ্জয়িনীপুরে তিনি পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়ার সন্ধানে বেরিয়েছেন। এই পর্বের নানা কবিতায় বারবার প্রাচীন তপোবন জীবনাদর্শের প্রতি আকর্ষণ ব্যক্ত করেছেন। 'নৈবেদ্য'র কবিতায় প্রাচীন ভারতের মহিমা রূপ পেয়েছে। উপকরণবিরল সহজ সরল তপোবনের পরিচয় তিনি পেয়েছেন কালিদাসের মতো কবির কাব্যে। এই সময় বছর কয়েকের জন্য তিনি বেশ একটু সংকীর্ণ অর্থেই 'হিন্দু' হয়ে উঠছিলেন। 'হিন্দুর ঐক্য' ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে হিন্দুত্বের বা আর্যত্বের উগ্র প্রকাশ ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগ, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ববোধ এসব প্রবন্ধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই পর্বকেই আমরা বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পর্ব—তৃতীয় পর্ব বলতে পারি। কিন্তু এ এক সাময়িক পর্ব। ১৯০৭ থেকে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা' লেখা আরম্ভ করেন। শেষ হয় ১৯১০ এ। গোরার হিন্দুত্বের ঘোর কেটে যায়, ভারতীয়ত্ববোধে তার উত্তরণ ঘটে। হিন্দু ভারত থেকে মহাভারতে গোরার এই নিষ্ক্রমণ আসলে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই উত্তরণ। বলাকা পূর্ব পর্বে 'বলাকা'র আভাসের দিক থেকে উপন্যাসে যেমন 'গোরা'র গুরুত্ব, প্রবন্ধে তেমনই 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'র মূল্য। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন উপাদানের মধ্য থেকে ভারতে কিভাবে এক মহাভারত বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা তিনি করেছেন। এখানে হিন্দুত্বের গোঁড়ামি নেই, দৃষ্টি মুক্ত ও উদার। এসব তিনি লিখছেন পঞ্চম পর্বে। এই পর্বেই 'অচলায়তন' নাটক লিখছেন। এতে আচার-বিচার-মানা হিন্দু সমাজের ওপর ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। এই মনোভাবের পরিচয় পরবর্তী 'বলাকা' পর্বে আরও বেশি পেয়েছি। তখন কবিতায় চলছে গীতাখ্য কাব্যের পালা।

এই গীতাখ্য কাব্যত্রয়ের পর্ব আসলে 'খেয়া' (১৯০৫-০৬) থেকেই শুরু হয়ে গেছে। বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ থেকে একের পর এক শোকের আঘাত রবীন্দ্রনাথের জীবনে এসে পড়ে। ১৯০২ সালে কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু, ১৯০৩-এ মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু, ১৯০৫-এ পিতা দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯০৭-এ কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। এইসব শোক জয় করে তিনি এক অভিনব অধ্যাত্মলোকে উত্তীর্ণ হলেন। এই অধ্যাত্মলোকের অনুভূতি তাঁরই স্বকীয়। এর সঙ্গে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক চেতনার যোগ নেই। একথা সত্য, তখনকার গদ্য প্রবন্ধে তিনি উপনিষদ্, গীতা জাতীয় বিখ্যাত গ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে মেলে এমন উদ্ধৃতিই তিনি চয়ন করেছেন। এসব উদ্ধৃতির ব্যাখ্যাও তাঁর নিজের মতো, কোনও পূর্বাচার্যের ব্যাখ্যানুসারী নয় তাঁর ব্যাখ্যা। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু'মাস পরে, তিনি মাঘোৎসবে 'দুঃখ' নামে ভাষণ দেন। এই ভাষণ এখন 'ধর্ম' বইটির অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষণে তিনি বলেছেন :

'হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের

বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃদপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি; হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন ভয়ে না বলি—সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, 'তুমিই আমার প্রিয়।'

এই ভাষণের তলায় লেখা ফাল্গুন ১৩১৪। ১৩১২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে লেখা 'খেয়া'র 'আগমন' কবিতার সঙ্গে এর ভাব ও ভাষাগত মিল আছে। এ কবিতায় রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি তুলে যিনি আসেন, তিনি কবিতার ভাষায় 'আঁধার ঘরের রাজা, দুঃখরাতের রাজা'। তার আগমনে আমাদের অসাড় নিদ্রাচ্ছন্ন চেতনা জেগে ওঠে। দুঃখের দেশে, রুদ্রের রূপে বারবার কবি ঈশ্বরের আবির্ভাব কল্পনা করেছেন। প্রাত্যহিকতায় অভ্যস্ত, সুখে লীন। আমাদের চিত্ত স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাই মাঝে মাঝে দুঃখের আঘাত এসে পড়ায় আমাদের অন্তরাত্মার জাগরণ ঘটে। কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনের শোকগুলিকে সেই অন্তর-জাগানিয়া আঘাত হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। আর এসব অনুভূতি খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির কবিতায় তিনি বারবার ব্যক্ত করেছেন। অন্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া উপমার আশ্রয় নিয়ে বলতে পারি, রবীন্দ্র-সাহিত্য নদীর মতো চলতে চলতে বলাকাপর্বে এসে আরেকবার নতুন করে বাঁক নিল। নিঃসন্দেহে এ এক গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তন। কিন্তু সবই কি অভাবিত পূর্ব? তার আভাস কি পূর্ববর্তী পর্বগুলিতে কোথাও ছিল না?

'বলাকা'য় যে-যৌবন-বন্দনা, যে-অভিব্যক্তি-ভিত্তিক বিশ্ববীক্ষা, সংগ্রামশীল গতিময় বিদ্রোহী জীবনের প্রতি যে আগ্রহ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ও প্রাণের বিবর্তনের প্রতি যে-উৎসাহ, বিশ্ব অভিব্যক্তির পূর্ণতম রূপে মানুষকে দেখার যে দৃষ্টি, সংকীর্ণ জাতিপ্রেমের যে-নিন্দা, যে-স্বকালমনস্কতা, ভবিষ্যত্বের প্রতি যে উন্মুখতা, অতীতের সম্মোহন পাশ ছিন্ন করে অগ্রসর হওয়ার যে-ব্যাকুলতা, আধুনিকতার প্রতি যে উৎসাহ, জীবনের অমঙ্গল সম্পর্কে যে বোধ—এই সবের সঙ্গে পূর্ববর্তী পর্বগুলির যোগ দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, যা আগে আভাসিত হচ্ছিল, তারই প্রত্যক্ষ স্পষ্ট রূপ 'বলাকা'য় একের পর এক কবিতায় ফুটে উঠলো।

আগে বলেছি 'বলাকা'র পূর্ববর্তী পর্বগুলির প্রথমটি—পদ্মাতটপূর্বপর্ব, দ্বিতীয়টি—পদ্মাতট পর্ব, তৃতীয়টি—প্রাচীন ভারতে গীতাখ্য কাব্যপর্ব। বলাকাপর্বের সঙ্গে ভাবের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্বের নিবিড় যোগ আছে। বলাকার যৌবন বন্দনা গল্পরূপ পেয়েছিল 'একটা আষাঢ়ে গল্প' রচনায়। এই গল্প কবির একত্রিশ বছর বয়সে লেখা, তিপান্ন বছর বয়সে তিনি লিখেছেন বলাকার প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান'। এ গল্পের সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যৌবন নির্বাসিত, স্থবিরদের রাজত্ব, এ এক খাঁচা, খাঁচার মধ্যে পাখি ঝট্‌পট করে, কিন্তু এখানকার মানুষগুলি জীবন্মৃত পাখির মতো খাঁচার মধ্যে চুপ করে বসে আছে। তাই এ খাঁচা নড়ে না, দোলে না। এই জীবন্মৃত পাখির চিত্রকল্প আমাদের সনাতন ব্যবস্থায় নির্জীব সামাজিকদের বর্ণনায় 'সবুজের অভিযান' কবিতায়ও একইভাবে আছে : 'ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা, চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায়, ঢাকা/ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা/অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।' প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করি, সাতাত্তর বছর বয়সে 'একটা আষাঢ়ে গল্প' যখন কবির হাতে 'তাসের দেশ' নাট্যরূপ পায়, তখনও যৌবন-চঞ্চলতাকে রূপ দেওয়ার প্রেরণায় ডানা মেলে দেওয়া পাখির চিত্রকল্প আরম্ভেই এসে যায়। বদ্ধ আর মুক্ত জীবনের রূপসৃষ্টিতে

খাঁচায় বন্দী আর উড়ন্ত-পাখির চিত্রকল্প রবীন্দ্রসাহিত্যে ফিরে ফিরে আসে। 'একটা আষাঢ়ে গল্প' আমাদের উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্বের রচনা। চতুর্থ পবের 'অচলায়তন' (১৯১১) নাটকে উপাধ্যায় বলেছেন, 'তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।' আজ আছে কাল নেই যে তুচ্ছ প্রাণ, অচলায়তন তারই জয়গান মুখর; এ নাটকে চিরকালের সনাতন অনড় অচল ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই তুচ্ছ প্রাণই অকারণ আনন্দে ওড়ে, পাখা ঝাপ্‌টায়; স্থির হয়ে থাকে না।

'বলাকা' পর্বের 'কালান্তর' গ্রন্থভুক্ত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন ঃ

'সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে আমাদের অতীত তাহার সম্মোহন বাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার ধূলি পুঞ্জে শুষ্কপত্রে যে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নব নব অধ্যবসায়-শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল—আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে।

অতীতের এই সম্মোহন পাশ থেকে বেরিয়ে আসার কথা, পিঠের দিকটাকে মুক্তি দেওয়ার কথা 'বলাকা' পর্বে সম্পূর্ণ নতুন কথা নয়। 'অচলায়তন' নাটকে আচার্য পঞ্চতককে বলেছেন যে গুরু আসছেন। গুরু এসে যদি তাঁর জড়ার বন্ধন খুলে দেন, যদি 'ভুল করে সত্য জানবার অধিকার দেন', তাঁর 'মনের উপর থেকে হাজার দু'হাজার বছরের পুরাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন', তাহলে তিনি বেঁচে যান! আচার্যের এসব কথা কি 'বলাকা' পর্বের কথা নয়? তবুও 'বলাকা' পর্বের মায়াবী অতীতের বন্ধনমুক্ত যৌবন ধর্মকে নতুন মনে হওয়ার কারণ আছে। তৃতীয় পর্বে অতীত ভারতে মানসভ্রমণের সময় কবি মাঝে মাঝে এমন আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে এই একই যৌবনধর্মের দোহাই দিয়ে তিনি লিখে ফেলেছেন ঃ

'নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবন সমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবনে স্নান করিতে পায়।'

'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ'—বইটির 'নববর্ষ' প্রবন্ধে যদিও এই 'নূতনত্বের' কথা আছে, তবু জোরটা চির-পুরাতনের ওপর পড়েছে—তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমগ্র প্রবন্ধটি পড়ার পর। 'পুরাতনই চির নবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার', এই পুরাতন 'ভস্মাচ্ছন্ন মৌনি ভারত' মৃগচর্মে উপবিষ্ট। এই চিরপুরাতন ভারত থেকেই নবীনতা গ্রহণের আহ্বান এই প্রবন্ধে জানানো হয়েছে। এই 'নববর্ষ' বা এ জাতীয় আরও অনেক লেখার কথা মনে পড়লে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে ব্যক্ত সম্মুখে চলার উৎসাহকে অভিনব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্বাপর রবীন্দ্র সাহিত্য মনে রাখলে তা অভিনব অভাবিতপূর্ব মনে করার কারণ থাকে না।

'অচলায়তন' নাটকের আচার্য ভুল করে সত্য জানার যে-উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, তা যৌবনের উৎসাহ। 'সবুজের অভিযান' কবিতায় এই যৌবনের উদ্দেশ্যেই তিনি বলেছেন, 'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে/ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা।' এই তরুণের দল অজানার মাঝখানে পথ কাটতে কাটতে চলে। সব সময় 'নতুনত্বের মধ্যে' 'চিরপুরাতনকে' অনুভব করার দায় মাথায় পেতে নিলে বাঁধা পথের বাইরে অজানার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস ঝিমিয়ে পড়ে। এসব কথা তৃতীয় পর্বে প্রাচীন ভারতের প্রতি ভক্তিতে, হিন্দুত্বের গর্বে, আর্যামির আস্ফালনে, ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শে নিষ্ঠায় কখনো কখনো তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এ এক সাময়িক অবস্থামাত্র। তিনিই কি দ্বিতীয় পর্বের অব্যবহিত আগেকার 'মানসী'তে

ব্যঙ্গ ভরে বলেন নি যে 'মোক্ষমুলর' বলেছে—'আর্য,/সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য/মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য/আমরা পড়েছি শুয়ে'—বঙ্গবীর। সর্ববন্ধনমুক্ত জীবনোল্লাস ও কি 'মানসী'র কবিতায় ধ্বনিত হয় নি—'ইহার চেয়ে হতেন যদি/আরব বেদুয়িন!/চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন'—দুরন্ত আশা। 'বিপদ-মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে/শোণিত উঠে ফুটে' যে জীবনে, সে জীবনের কথাই তো 'বলাকা'য় শুনি। 'দুরন্ত আশা' কবিতার মতোই 'আপদ আছে জানি আঘাত আছে, তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে'। অতীতকে আঁকড়েই সম্মুখে চলতে হবে এই জাতীয় আদর্শের কথাই তৃতীয় পর্বে মাঝে মাঝে তিনি বলেছেন। এসব কথা উনিশ শতকের শেষ দিকে নব হিন্দুত্বের ধ্বজাবাহীরা যখন বলেছেন, তখন কবি মানসীর 'পরিত্যক্ত' কবিতায় অনেক কাল আগে সেই ১৮৮৮-তে লিখে এসেছেন চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকারদের উদ্দেশ্যে 'কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,/কোথা গেল সেই আশা!/আজিকে বন্ধু, তোমাদের মুখে/এ কেমনতর ভাষা!/আজি বলিতেছ, বসে থাকো, বাপু,/ছিল যাহা তাই ভালো।' 'ছিল যা তাই ভালো' বলে বসে থাকার কথা তৃতীয়পর্বে মাঝে মাঝে তিনি নিজেও বলেছেন। তাই 'বলাকা' পর্বে জীবন যখন মরণবিহারে মেতে ওঠে, সম্মুখের আহ্বান কানে নিয়ে অতীতের পিছুটান ছিঁড়তে ছিঁড়তে জীবন যখন অগ্রসর হয়, তখন খুব নতুন মন হয়। আসলে এ এতোটা নতুন নয়। বাধাবিঘ্ন জয়ী, সুখের বন্ধনছেদী, দুঃখকে-আত্মসাৎ-করা আনন্দ সন্ধানী যে-যৌবন বারবার 'বলাকার' কবিতায় অভিনন্দিত হয়, সে-যৌবনের রূপই ফুটেছে 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা'য় ব্যক্ত ইচ্ছায়। 'পরিতাপজর্জর পরাণে' বৃথাক্ষোভে অতীতের দিকে না তাকিয়ে, ভবিষ্যতের মিথ্যা দুরাশায় না ঘুরে, কবি এ 'বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়' ভেসে যেতে চেয়েছেন, পেতে চেয়েছেন 'অরুণগণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা', দেশ-দেশান্তরের জীবন অঙ্গীকারের ইচ্ছা জানিয়েছেন। তার সঙ্গে 'বলাকা'র জীবন ভাবনার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও গোত্রগত বা প্রকৃতিগত একটা যোগ আছে। তবে 'বলাকা'য় আবেগের প্রকাশ অনেক সংহত, উচ্ছ্বাস অনেক সংযত।

'বলাকা' পর্বে পশ্চিমমুখী রবীন্দ্রনাথের মনের যে-পরিচয় পাই আর সেই সূত্রে ভারতের অনড় অচল সমাজের যে সমালোচনা শুনি, তাও সম্পূর্ণ খাপছাড়া নয়, পূর্বাপর যোগহীন নয়। তাঁর প্রথম পাশ্চাত্যভ্রমণ ১৮৭৮, দ্বিতীয় ভ্রমণ ১৮৯০, তৃতীয় ভ্রমণ ১৯১২-১৩ আর চতুর্থ ভ্রমণ ১৯১৬-১৭। পরবর্তী পাশ্চাত্য ও বিদেশ ভ্রমণগুলির উল্লেখ বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক বলে বাদ দিচ্ছি। দ্বিতীয় ভ্রমণ বাদ দিলে আর বাকি তিনটি ভ্রমণের সঙ্গেই তাঁর সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তনের যোগ আছে। প্রথম দুটি ভ্রমণ নিয়ে তিনি লিখেছেন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' আর 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'। য়ুরোপের যা-কিছু ভালো, তাঁর সপ্রশংস আলোচনা আছে বই দুটিতে। জাতি-প্রেমে অন্ধ হয়ে য়ুরোপের ভালোটুকু দেখা থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করেন নি। আর তৃতীয় ভ্রমণ নিয়ে লেখা তাঁর 'পথের সঞ্চয়'। তখনও চলেছে গীতাখ্য কাব্যের পর্ব, সঙ্গে নিয়ে তিনি যাচ্ছেন 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি, তখনও যাত্রার পথে বেরিয়ে পড়েন নি। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে বলার জন্য তিনি লিখছেন 'পথের সঞ্চয়' বইটির প্রথম প্রবন্ধ 'যাত্রার পূর্বপত্র'। এখানে বলছেন ঃ 'য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?'

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত আর ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিক—এ জাতীয় আত্মসান্ত্বনা

লাভের বিড়ম্বনায় তিনি ভুগছেন না। মানুষের ভালো মানে যে-য়ুরোপ, তাকে আধ্যাত্মিক বলতে তাঁর কুণ্ঠা নেই। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি যে-আজ্ঞা ভারতবর্ষে সীমাহীন, মানুষের প্রতি যে ঔদাসীন্য এদেশে সর্বব্যাপী; আধ্যাত্মিকতার রাঙতায় যেভাবে এদেশে এই অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যকে মোড়া হয়, তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। য়ুরোপীয়দের মধ্যে যথার্থ আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষ দেখে আসার পর 'বলাকা'র ৪ সংখ্যক 'শঙ্খ' কবিতার আলোনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে তিনি বলেছেন ঃ

পাশ্চাত্যদেশে দেখে এসেছি সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে; তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে কাল সর্বজাতির লোকেরা...শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে' পৌঁছেছে। রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক এদেরই তিনি আধ্যাত্মিক বলে মনে করেন। কেননা এঁরা সার্বজাতিক, কল্যাণকামী জাতিপ্রেম এদের অন্ধ করতে পারে নি। এই অন্ধ জাতিপ্রেমের নিন্দা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে রচিত 'বলাকা'র কবিতাতেই তিনি প্রথম করেন নি। এই শতাব্দীর আরম্ভে বুয়র যুদ্ধে জাতিপ্রেমের সর্বনাশা রূপ তিনি দেখেছিলেন এবং 'নৈবেদ্য'র কবিতায় লিখেছিলেন ঃ

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী।"

—৬৪ সংখ্যক কবিতা

অথবা,

"ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।"

—৬৫ সংখ্যক কবিতা

এসব কবিতা 'বলাকা'র ৩৭ সংখ্যক কবিতা 'ঝড়ের খেয়া'র এই উদ্ধৃতির স্বগোত্র—

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়।
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ
জাতি-অভিমান
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।"

একথা সত্য, 'নৈবেদ্য'র চেয়ে 'বলাকা' পর্বে কবিমন দেখার ও জানার অভিজ্ঞতায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এই পর্বে ১৯১৬'তে জাপানের পথে তাঁর আমেরিকা যাত্রা, জাপানে 'The cult of Nationalism' ভাষণ দেন, 'Nationalism' বইটির প্রকাশ ১৯১৭'তে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ বনাম নিখিলেশের দ্বন্দ্বে যথাক্রমে জাতিপ্রেমের সংকীর্ণতা ও উন্মাদনা বনাম উদার মানবিকতাবোধজাত গঠনমূলক দেশাত্মবোধের দ্বন্দ্বকে এই পর্বেই তিনি রূপ দিয়েছেন। পরাধীন দেশ ভারতে সন্দীপের জাতিপ্রেমের সংকীর্ণতায়, ভাবুকতা

ও গঠনমূলক কর্মের বদলে উচ্ছ্বাস প্রবণতায়, শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধে। আর য়ুরোপের স্বাধীন দেশগুলির এই অন্ধজাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে উগ্র রূপ নেয়। তখন একটি স্বাধীন জাতি ভাবতে শুরু করে, তার পৃথিবী জুড়ে প্রভুত্বের অধিকার আছে, আর সকল জাতি তার দাস। 'কালান্তর' গ্রন্থভুক্ত 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধের ভাষায় তখন সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের গান্ধর্ববিবাহ ঘটে। অর্থাৎ উপনিবেশগুলি হয় কাঁচামাল সরবরাহকারী, য়ুরোপের স্বাধীন উন্নতদেশগুলি শিল্পজাতপণ্যের উৎপাদক আর উপনিবেশের অসহায় মানুষগুলিকে তাদেরই কাঁচামাল উৎপাদিত পণ্যের চড়া দামে ক্রেতা হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে, অন্ধজাতীয়তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের যোগ সম্পর্কে 'বলাকা' পর্বের মতো এমন ভূয়োদর্শী বোধের পরিচয় প্রবন্ধে যেমন আছে, 'বলাকা'র ৩৭ সংখ্যক কবিতায় তেমন নেই। এই বিশেষ কবিতার আলোচনা এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে বোধে ভাস্বর রচনা সেই কবে যৌবনে তিনি লিখেছিলেন 'দয়ালু মাংসাশী' (১৮৮১), আরও অনেক পরে 'রাজা-প্রজা'র 'ইম্পিরিয়লিজ্‌ম্' প্রবন্ধ (১৯০৫)। এরকম অনেক লেখার নাম করা যায়, এগুলির আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক। তাঁর পাশ্চাত্যবরণের উৎসাহ পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ দেখার দৃষ্ট আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এ দেখায় তিনি ভুলে করেন নি তা নয়। তবে তিনি ভুল করতে করতে সত্যদৃষ্টির অধিকার লাভ করেছেন। এখানে এ আলোচনার প্রয়োজন নেই।

শুধুই য়ুরোপের বাধাবন্ধ হারা জীবনের গতি, মানবকল্যাণবোধ, বিজ্ঞান বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য মুখী করে নি। য়ুরোপের বিশ্ববীক্ষা, অভিব্যক্তি তত্ত্ব, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাবনায় তাঁর মনন জেগেছে, কল্পনা সমৃদ্ধ হয়েছে। 'বলাকা'র গতির ধারণা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' মন্ত্র থেকে আসে নি। এই 'চরৈবেতি' একটি উপদেশমাত্র। 'বলাকা'র সঙ্গে বেদের সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে প্রকাশিত বিশ্ববীক্ষা ও জীবনভাবনার যোগ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। রবীন্দ্রনাথের গতিভাবনার অব্যবহিত কারণ হতে পারে ১৯১১-তে প্রকাশিত ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর 'Creative Evolution'-এর ইংরেজি অনুবাদ পাঠ। বার্গস সৃষ্টি ক্রিয়ার মূলে দেখেছেন elan vital। নানারূপে নানা আকারে এই e'lan vital কাজ করে চলেছে। বের্গসঁর তত্ত্বের সঙ্গে 'বলাকা'র যোগ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। রবীন্দ্রমন তাঁর যৌবন থেকে যে-পথে অগ্রসর হচ্ছিল তাঁর পড়ায়, তাঁর লেখায়, সেই পথই তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে 'বলাকা'য়। ১৮৯০-এ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে তিনি লিখছেন : Wallace-এর Darwinism পড়ছি, বেশ লাগছে' ইত্যাদি। শুধু জীবের ক্রমবিকাশ নয়, মহাজাগতিক ক্রমবিবর্তনের ধারণার প্রতি যৌবনেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জীবের ক্রমবিকাশের ধারণা তাঁর যৌবনাবধি অনেক কবিতা ও গদ্যরচনার গভীরে আছে। 'চিত্রা'র 'সন্ধ্যা' পৃথিবীর যে কতো পরিবর্তন পেরিয়ে আজকের রূপ পেয়েছে—এ বিষয়ে কবির অনুভূতিসমৃদ্ধ একটি কবিতা :

"ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ননিমেষে
কত যুগ যুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীবজীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্যনীহারিকা;
তারপরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা;

জীবধাত্রী জননীর কাজ বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।"

এ কবিতার শেষে উচ্চারিত ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুরের ব্যথিত প্রশ্ন—'আরো কোথা? আরো কত দূর?' এই কবিতার শেষ চরণ স্বভাবতই আবু সয়ীদ আইয়ুবকে মনে করিয়ে দিয়েছে 'বলকা'র নাম কবিতার (৩৬ সংখ্যক) অন্তিম উচ্চারণ 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।' 'সন্ধ্যা' কবিতায় নেবুলা (নীহারিকা), জ্বলন্ত আগুন—এরকম নানা স্তর পেরিয়ে পৃথিবীর বর্তমান রূপলাভের দীর্ঘ ইতিহাস কবির যেমন মনে পড়েছে, তেমনই তাঁর স্মৃতিতে জেগেছে প্রাণ তার যাত্রাপথে কতো রূপ পেরিয়ে এসেছে, কত রূপ হারিয়ে ফেলেছে। ভূপৃষ্ঠের রূপ থেকে রূপান্তর, শৈবালে শাদ্বলে উদ্ভিদে প্রাণের প্রকাশ, তার শেষে মানবীর আবির্ভাব—এইসব কল্পনা থেকে 'চিত্রা'র বেশ কিছু কাল আগে 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি' কবিতা লেখা হয়েছিল অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক ভাবনা স্বল্প কথায় ঝিলিক দিয়েছে। 'বলাকা'র কবিতায়। একদিন আমি পৃথিবীর জল ও অরণ্যময় দুটি রূপই একসঙ্গে এসেছে 'বলাকা'র চঞ্চলার—'রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ। কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা।' এভাবে ভূপৃষ্ঠের রূপান্তর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ও জীবজগতের অভিব্যক্তিকে ঘিরে 'বলাকা'র সমৃদ্ধ কল্পনার জগৎ আমরা পেছনে তাকিয়ে রবীন্দ্র কবিতায় দেখে নিতে পারি। তা দেখলে 'বলাকা'য় তাঁর উত্তরণের পথটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অভিব্যক্তির পরিণাম রূপে কবি 'বলাকা'র কবিতায় মানুষকে দেখেছেন। কিন্তু এসব কথাও এখানে নতুন নয়। 'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনা যখন রাজাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি আমাকে কেমন দেখতে পাও? কি দেখ? তখন রাজা বলছেন—

'দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।'

রাজাকে যদি বলি ঈশ্বর, তাহলে রাণী মানুষের প্রতিনিধি, ঈশ্বর এখানে নিজে বলছেন তাঁর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার মানুষের সঙ্গে তাঁর আনন্দের সম্পর্কের টানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে মানুষের এই ছোট্ট রূপের মধ্যে। রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার অবিস্মরণীয় পথিকৃৎ অজিতকুমার চক্রবর্তী রাজার এই উত্তর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ

'মানুষের সীমাবদ্ধ এতটুকখানি রূপের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের রূপ সমস্ত চন্দ্র-সূর্য-তারার রূপ যে ভরিয়া আছে এবং অরূপ ভগবান যে সেইরূপে মুগ্ধ, এমন কথা এমন আশ্চর্য ভাষায় পৃথিবীর আর কোঁন্ মহাকবি বলিয়াছেন আমি জানি না।'

রাজা এই উত্তর দিয়েচেন গদ্যে। কিন্তু এ এমন গদ্য যা কবিতার অধিক। এমন অনুভবই ভাষা পেয়েছে মানুষের কণ্ঠে 'বলাকা'র ২৯ সংখ্যক কবিতায় ঃ

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি অেমার দেখা
* * * * * * * * * *
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।"

মানুষ এলো বলে স্রষ্টার সৃষ্টি পরম অর্থ পেয়েছে, অন্ধকারে জ্বলে ওঠা লক্ষ নক্ষত্রের আলো এসে মানুষে সংহত হয়েছে। তাই শূন্যে শূন্যে আলোর আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। এ কবিতায় লেখা হলেও, দলবৃত্তে মুক্তকে সাধা হলেও রাজার সংলাপের তুলনায় নিতান্ত গদ্য। 'চঞ্চলা (৮ সংখ্যক) কবিতায় প্রাণ-প্রবাহের মধ্যে মানুষের আগমন কথা বিজ্ঞান সম্মতি ভাষায় বলা হয়েছে, তাতেও এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে :

"মনে আজি পড়ে সেই কথা
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্থলিয়া স্থলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।"

এখানেও সেই প্রৈতির রহস্যময় অভিব্যক্তির কথা! অভিব্যক্তি পূর্ণতা পেয়েছে মানুষে। এই অভিব্যক্তির ভাবনাই অন্য ভাষায় রাজার কণ্ঠে শুনেছি।

গীতাখ্য কাব্যপর্বের শেষে 'গীতালি'তে কবি যখন বলেন 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা' তখন নিজেকে 'পান্থজন' বলায় অর্থাৎ পথিক বলায় অভিনবত্ব নেই। কিন্তু ঈশ্বরকে পান্থ বলায় অভিনবত্ব আছে বৈকি! এখানে বিশ্বজগতের গতিশীলতা ও বিবর্তনধর্মে উজ্জ্বল একটি ছবি কবির মনে কাজ করেছে। এই ছবি বার বার আঁকা হয়েছে 'বলাকা'র কবিতায়। স্বয়ং ঈশ্বরও পথিক, তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অনড় অচল নন। সেই সৃষ্টি নিয়ে তাঁর নিত্য অতৃপ্তি। তিনি যেন নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে গড়ছেন। এই ভাঙাগড়া অমোঘ নিয়মে ঘটেছে। স্বয়ং স্রষ্টাকেও সেই নিয়ম মেনে চলতে হয়। সেখানে যথেচ্ছারের সুযোগ নেই। স্রষ্টা সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র নন। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা অনুপ্রবিষ্ট। সৃষ্টির নিত্যপরিবর্তমান বিবর্তনশীল রূপের মধ্যে স্রষ্টা নিজেকে ভাঙছেন, আবার গড়ছেন। এই অন্তহীন ভাঙাগড়ায় তাঁর পথিক পরিচয়। পথিক যেমন পথ চলতে চলতে নিজেকে পালটায়, নিত্য নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়, ঈশ্বরও তেমনই তাঁর সৃষ্টির ভাঙাগড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। বিবর্তনশীল বিশ্বের ধারণা প্রথম থেকেই রবীন্দ্র মনে জাগরূক ছিল। 'বলাকা'য় এই ধারণারই স্বমহিমরূপ দেখি। 'চঞ্চলা'য় 'বলাকা'র নাম কবিতায় এই ধারণার কাব্যরূপ। তারই পূর্বাভাস পূর্ববর্তী-পর্বে ঈশ্বরের পথিকরূপ কল্পনায়। গীতাঞ্জলির ৩৬ সংখ্যক কবিতায় ঈশ্বরের এই পথিক রূপ—'আমার মিলন লাগি তুমি/আসছ কবে থেকে/তোমার চন্দ্রসূর্য তোমায়/রাখবে কোথায় ঢেকে।' না, চন্দ্র সূর্যে ঈশ্বর ডাকা পড়েন নি, বরং চন্দ্রে সূর্যে গ্রহে তারায় পথিক ঈশ্বরের পথের চিহ্ন আঁকা হচ্ছে : 'অনেককালের যাত্রা আমার/অনেক দূরের পথে/প্রথম বাহির হয়েছিলেম/প্রথম আলোর রথে/গ্রহে তারায় বেঁকে/পথের চিহ্ন দিলে এঁকে/কত যে লোক লোকান্তরের অরণ্যে পর্বতে'—গীতিমাল্য ১৪। এসব কবিতায় ঈশ্বর পথে বেরিয়েছেন মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য। গ্রহে তারায় আঁকাবাঁকা পথের কল্পনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত আছে। এরকম অজস্র কবিতায় গানে যাত্রা, অভিসার যাত্রী, পান্থ, সাথি, কাণ্ডারী, নেয়ে, তরী প্রভৃতি কল্পনার বিপুল সমারোহ :

"কূজনহীন কাননভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের ধারে
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার"
—গীতিমাল্য ৬২

"আমি পথিক, পথ আমারি সাথি
পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।"

কবির এই গতিমুখী মনেরই সৃষ্টি 'বলাকা'র যাত্রার কবিতাগুলি—সে যাত্রা কখনো জলপথে কাণ্ডারীর নেতৃত্বে, যেমন 'ঝড়ের খেয়া'য়. কখনো স্থলপথে বহুদূর বিস্তৃত প্রকৃতিক ও মানবিক ইতিহাসের অন্তবিহীন সময় সরণীতে যেমন 'চঞ্চলা'য় অথবা 'বলাকা'র নাম কবিতায়, কখনো স্মৃতিকে আত্মসাৎ-করা বিস্মৃতির মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষেব পথ, চলায় যেমন, 'ছবি'তে আবার কখনো বৃহৎ অনুরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্যে অনুপ্রাণিত 'শাজাহান' নামক মানব প্রতিনিধির নিরন্তর অগ্রগমনে। পূর্ববর্তীপর্বে ঈশ্বরকে পথিক রূপে এবং নিজেকে সে-পরমপথিকের সখা পথিকরূপে কল্পনা করে এসেছিলেন বলেই 'বলাকা'র এ-সব যাত্রাব কবিতাগুলি সম্ভব হয়েছে। একথা ঠিক, 'বলাকা'য় গীতাখ্যপর্বের মতো ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরের ধারণা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সখা, প্রিয়, বন্ধু বা বঁধু, স্বামী, প্রভু, পিতা, মাতা, রাজা জাতীয় সম্বোধন বিশেষ শুনি নি 'বলাকা'য়। 'প্রভু' সম্বোধন 'বলাকা'র ২৯, ৩১, আর ৩২ সংখ্যক কবিতায় পুরানো অভ্যাসের জের হিসাবে মাত্র তিনবার উচ্চারিত হয়েছে ঃ 'ওগো আমার প্রভু,/জানি আমি তবু/আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম/কৌতূহল/নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল'—২৯ সংখ্যক কবিতা। 'এ ঐশ্বর্য তব/তোমার আপন কাছে। প্রভু, নিত্য নব নব'—৩১ সংখ্যক কবিতা; 'এমনি করেই প্রভু/এক নিমেষে পত্রপুটে ভরি'/চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি'—৩২ সংখ্যক কবিতা। এই তিনটি কবিতা ছাড়া আরও কয়েকটি গীতাখ্যপর্বের উপাস্য ভগবান ও উপাসক ভক্তের ভাবের অনুররণ শুনি, যেমন ২৭ সংখ্যক কবিতায় ভগবানকে 'রাজা' বলছেন ঃ আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা'। 'বলাকা'র ৩৩ সংখ্যক কবিতায় ভগবানের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন ঃ

"জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও
খুশি হয়ে পথেরপানে চাও।"

মানুষের পায়ের শব্দ শোনার জন্য ঈশ্বরেব় প্রতীক্ষা, সে শব্দ শুনে তাঁর আনন্দ, সেই আনন্দেরই প্রকাশ প্রকৃতির রূপে রূপান্তর। আর অন্যদিকে গীতাঞ্জলির ৬২ সংখ্যক কবিতায় একই কথা তিনি উলটো করে বলেছিলেন যে ঈশ্বর নিত্য-নিয়ত মানুষের দিকে আসছেন ঃ

"তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।"

মানুষকে কবি বলছেন, ভগবান্ যে আসছেন 'ফাগুনদিনে বনের পথে', শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে, তাকি তোরা শুনতে পারছিস নে? ভগবান ও মানুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এমনই অনিবার যে ভগবানও যেমন মানুষকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল, মানুষও তেমনই ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁরই দিকে নিত্য পথ চলছে। 'গীতাঞ্জলি'র এ-কবিতায় ভগবানের পথ চলার কথা বলছেন, আর 'বলাকা'র এ-কবিতায় মানুষের পথ চলার কল্পনা এবং তাঁর পায়ের শব্দ শোনার জন্য প্রতীক্ষা আর সে-প্রতীক্ষা সফল হলে তাঁর খুশি ফুটে ওঠে 'শরৎ আকাশে/অরুণ আভাসে', ফুলের ঝড় ওঠে, সে-ঝড়ে বসন্তের বন আকুল হয়ে পড়ে। তাই বলা যেতে পারে, এ দুটি কবিতায় 'গীতাঞ্জলি' ও 'বলাকা' পর্বের ভাব একই, শুধু তার প্রকাশের ধরণ স্বতন্ত্র। এ জন্যই 'বলাকা'য় গীতাখ্যপর্বের রেশের কথা আমরা বলছিলাম। 'বলাকা'র পরে প্রভুনাথ বন্ধু ইত্যাদি সম্বোধন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তিনি বিশেষ করেন নি।

'বলাকা'র পরে 'প্রভু' সম্বোধন শুনি ক্কচিৎ কখনো, প্রায় না-শোনার মতো!

"প্রভু,
সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
মমত্ব নাই তব,
ভাঙা গড়ায় সমান তোমার লীলা।"

—নমস্কার, বীথিকা।

বিশ্বস্রষ্টাকে কর্ণধার অর্থাৎ হাল-ধরা নেয়ের রূপে কল্পনা 'বলাকা'র পরে একবার দেখি কবিতায়—

"তুমি আমার লীলার কর্ণধার
তারার ফেনা ফেনিয়ে তোল
আকাশগঙ্গার।"

—কর্ণধার, সানাই

আরেকবার গানে

"সম্মুখে শান্তিপারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার!"

কিন্তু এ সবই যেন ব্যতিক্রম। 'বলাকা' পর্ব থেকে ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণার স্থলে নৈর্ব্যক্তিক আর তাই সকলজ্ঞানের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট মানবসর্বস্ব এক পরম সত্যের ধারণার দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সত্যকে প্রিয় বা অপ্রিয় বলা অর্থহীন। কর্ণধার, প্রভু, পিতা নোহসি ইত্যাদি বলার অবকাশই এখানে নেই। এখন থেকে পরম সত্যকে তিনি আর মানবতাতিরিক্ত ভাবতে চাইছেন না। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার শেষে তিনি বলেন, একদিন জীব হিসাবে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, কবিতার ভাষায় 'মধ্যসীমা' চূর্ণ করে মানুষের মধ্যেই দেবতার অমর মহিমা দেখা দেবে। 'দেবতা' শব্দটি—থাকলেও এর ভাব হচ্ছে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কবিতার এই অন্তিম উচ্চারণ মনে রেখে আবু সয়ীদ আইয়ুব লিখেছিলেন ঃ

'এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় সেই স্থান যেখানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন ঃ ভগবান বলতে মনুষত্বের চরম বিকাশ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না।'

এভাবে সমালোচক এখানে 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩২) রচয়িতার মানবিক ধর্মমতের পূর্বাভাস দেখেছিলেন। এতে নিঃসন্দেহে 'বলাকা'য় দিক পরিবর্তন বোঝা যাচ্ছে। গীতাখ্যপর্বে এমন ভাবনার সন্ধান আমরা পাইনি। সেখানকার ঈশ্বর মানুষ ছাড়া আর কোনও একজন। তাঁর সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ক পাতা যায়; তাঁকে রাজা প্রভু, স্বামী, বন্ধু, সখা, সাথি-এমনিতর সম্বোধনে ডাকা যায়। তার ঈশ্বর যদি মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হন, নিজের ভেতরকার পরম 'আমি' হন, alter ego হন, তাহলে তাঁকে ডাকার কথাই ওঠে না— যে ডাকার কথা কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, 'বিনা প্রয়োজনের ডাকে/ডাকব তোমার নাম,/সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম।/শিশু যেমন মাকে/নামের নেশায় তাকে,/বলতে পারে সেই সুখেতেই/মায়ের নাম সে বলে।'—৩২, গীতিমাল্য। এভাবে নামের নেশায় ঈশ্বরকে না ডেকেও তাঁর লেলিহান অগ্নির মতো রূপকে শেষ পর্যন্ত যে মেনে নেওয়া যায়। অনেক বিরোধ অনুতাপ অনুশোচনা পেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে মিলন যে সম্ভব হতে পারে তার আভাস রবীন্দ্রনাথ দিতে পেরেছিলেন গীতাখ্য পর্বেই 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা চরিত্রে।

এ নাটকে রাণী সুদর্শনা রাজার সঙ্গে এক অন্ধকার ঘরে নিভৃতে মিলিত হলেও কখনো তাঁকে স্বচক্ষে দেখেন নি। আলোয় রাজাকে দেখার সাধ ছিল রাণী অনেক দিনের। তাঁর ধারণা ছিল, রাজা 'ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর'। রাজা রাণীকে বলেছিলেন, বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে লোকসমাবেশের মধ্যে রাজাকে দেখার চেষ্টা তিনি করতে পারেন। রাজাকে প্রজারা কখনো দেখতে পায় না। তাদের সন্দেহ সে-দেশে রাজা নেই। উৎসবে অন্য রাজারা এসেছিলেন। তাঁদের মনেও এই সন্দেহ জাগে। সেই রাজাদের মধ্যে একজন ছিলেন কাঞ্চী রাজা। তাঁর মনে শুধু সন্দেহ জাগেনি। এদেশে রাজা যে নেই, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হন। বসন্ত উৎসবে আগত রাজাদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন সুবর্ণ নামে এক ছদ্মবেশী সুপুরুষ। তিনি নিজেকেও দেশের রাজা বলে পরিচয় দিলেন। কাঞ্চীরাজা সুবর্ণের মিথ্যা পরিচয়ের ফাঁকিটা বুঝতে পারলেন। কাঞ্চীরাজ রাণী সুদর্শনাকে পেতে চান, কিন্তু তার জন্যে হাতে রেখেছেন এই ছদ্মবেশী সুবর্ণকে।. রাণী সুদর্শনা ভুল করেছিলেন, ভেবেছিলেন যে এই সুবর্ণই বুঝি তাঁর রাজা! তাঁর রাজার এমন অবিমিশ্র সুন্দর রূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন যে তাঁর মনে হলো, এই সুবর্ণই ও-দেশের রাজা।

বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে রাণী পদ্মপাতায় ফুল সাজিয়ে সুবর্ণের কাছে ফুলের অর্ঘ্য পাঠালেন, সুবর্ণের রাণীকে পাওয়ার কোনও লোভ ছিল না। তাই এই অর্ঘ্য প্রেরণের কোনোও অর্থই তিনি বুঝতে পারেন নি, বুঝতে পারলেন কাঞ্চীরাজ। কেননা কাঞ্চীরাজের তো রাণীর প্রতি লোভ ছিল। তাই কাঞ্চীরাজ সুবর্ণের গলা থেকে মুক্তোর মালা নিজে খুলে নেন এবং দাসীর হাত দিয়ে ও-দেশের রাজা মালা বলে রাণীকে পাঠিয়ে দিলেন। দাসীর হাতে রাজা মালা পাঠিয়েছেন ভেবে সুদর্শনা অপমানিত বোধ করলেন।

তারপর ঘটনার গতি নাটকে দ্রুত বয়ে চলে। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে পাওয়ার লোভে রাজপ্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিলেন। সেই আগুনের আলোয় রাজপ্রাসাদে সুদর্শনা সত্যিকারের

রাজাকে দেখলেন যে তিনি কালোয় কালো, ধূমকেতু যে-আকাশে উঠেছে, সেই আকাশের মতো রাজা কালো। ভয়ে রাণী শিউরে উঠলেন। তিনি রাজার কাছ থেকে পালাতে চাইলেন, আবার অভিমানও হলো এই ভেবে যে রাজা তাঁকে চলে যেতে নিষেধ করছেন না।

সুদর্শনা তাঁর পিতৃগৃহে চলে এলেন। কিন্তু পতি গৃহত্যাগিনী কন্যা সুদর্শনার অবস্থা হলো ওখানে দাসীর মতো। তখনও সুবর্ণের রূপের মোহে তাঁর মন আচ্ছন্ন। রাণী ভাবছেন, কেন সুবর্ণ তাঁকে কেড়ে নেওয়ার জন্য আসছেন না। এদিকে সুবর্ণকে বাহন করে সুদর্শনাকে নেওয়ার জন্য রাণীর পিতৃরাজ্যে কাঞ্চীরাজ এসে উপস্থিত। আরও কয়জন রাজা একই উদ্দেশ্যে তখন ওখানে এসে সুদর্শনার পিতার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন এবং পিতা বন্দী হলেন। সুদর্শনার জন্য রাজাদের নিয়ে এক স্বয়ম্বর স্বয়ম্ভর সভা বসল। কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে তাঁর ছত্রধর করলেন। ছত্রধব সুবর্ণকে দেখে তাঁর প্রতি সুদর্শনার ঘৃণা জেগেছে। তখন তাঁর মনে হয়, সুবর্ণ মোটেই সুন্দর নন। এই সাত রিপুর সাতরাজার টানাটানির মধ্যে তাঁর মরার ইচ্ছা জেগেছে, ভাবলেন তিনি বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করবেন।

এভাবে রূপমোহের পাপ থেকে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের সূত্রপাত। সুন্দবকে পাওয়ার ইচ্ছা বা সেই ইচ্ছার তৃপ্তি সাধন মোটেই পাপ নয়! সুদর্শনার মনে যে সৌন্দর্যের স্থান জুড়ে আছে লালসা। সুবর্ণের তথাকথিত সৌন্দর্য তাঁর মনে জাগিয়েছে এই লালসা। এই লালসা পাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

সুদর্শনাকে নিয়ে যখন সাতরাজার যুদ্ধ বেঁধেছে সুদর্শনার পিতা যখন বন্দী, তখন হঠাৎ যোদ্ধবেশে সেখানে ঠাকুরদাদা উপস্থিত হলেন। আগে কাঞ্চীরাজ ঠাকুরদাদাকে সমস্ত উৎসবে দলবল নিয়ে নাচতে গাইতে দেখেছেন। এহেন লোক কি না সেনাপতি! বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা বইল না। সব রাজাই রাজা ও তাঁর সেনাপতির ভয়ে হার মানলেন, কিন্তু কাঞ্চীবাজ তখনও নির্ভয়, তিনি যুদ্ধ করতে চান।

অন্যদিকে সুদর্শনার অভিমান হলো যখন রাজা যুদ্ধদেশেষ ফিরে গেছেন, কিন্তু তাঁকে ডেকে নিয়ে যান নি, যদিও তিনিই রাণীকে সাতরাজার এই কুৎসিত প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ধার করেছেন। তারপর শেষ দৃশ্যে পরাজিত কাঞ্চীরাজ, ঠাকুরদাদা, বাণীর দাসী সুবঙ্গমা সকলে পথে বেরিয়ে এলেন। এ পথ যাত্রীর পথ, মুক্তির পথ। সে-পথে বাজকীয় সমারোহহীন রাজার সঙ্গে রাণীর মিলন হয়। রাণী রাজাকে বললেন—আমি তোমার দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে সহ্য করতে পারবে? রাণী বললেন, পারবো—

'প্রমোদ বনে আমার রাণীর ঘরে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম যেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে! তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু। সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা বললেন—

'তোমাবি মধ্যে আমার উপমা আছে।'

সুদর্শনা উত্তরে বলেন—

'যদি থাকে তো সেও অনুপম, আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার

ছায়া পড়ে সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।'

তখন রাজা রাণীকে বলেন—

'আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম। এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো—আলোয়।'

নাটকের শেষ সংলাপ সুদর্শনার মুখে শুনি—'যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।'

অনেক বাদ-ছাদ দিয়ে এই হচ্ছে 'রাজা' নাটকের গল্প। গল্প বেশ জমজমাট। এ গল্পের নাট্যরূপে গূঢ় তাৎপর্য আছে। রাজা কোমলকান্ত পেলব হলেন ভেবে নিয়ে সুদর্শনা দিব্যি সুখে ছিলেন। আমরাও জীবনকে, জীবনের নিয়ন্তা ঈশ্বরকে এ রকম ভেবে সুখে থাকতে চাই। একই কারণে সুদর্শনা মেকি রাজা সুবর্ণকেই তাঁর রাজা ভেবেছিলেন, রাজপ্রাসাদে আগুন লাগার সময় রাজাকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন। আমরাও দুঃখের দিন ঈশ্বরের ভয়াল ভীষণ রূপের আভাস মাত্র পেয়ে ভয়ে শিউরে উঠি। গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের সময় অর্জুন দেখেছিলেন ঃ

"লেলিহাস্যে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ তেজোভিরাপূর্ণ জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রা: প্রতপন্তি বিষ্ণো।"

[গীতা, ১১/৩০]

[সমগ্র লোককে তোমার জ্বলং-বদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ, সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া হে বিষ্ণু, তোমার উগ্র জ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে—রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ, 'ধর্ম' বইটির 'দুঃখ'।] শ্রীকৃষ্ণ জ্বলন্ত মুখে সব কিছু লেহন করছেন। সুদর্শনা ঈশ্বরের এই ভয়াল ভীষণ রূপটি দেখে সহ্য করতে পারেন নি, ভয় পেয়েছেন, ছুটে পালিযেছেন। অর্জুনও লেলিহান অগ্নিভ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বলেছিলেন 'ভয়েন চ প্রব্যক্ষিতং মনো মে' (১১/৪) ভয়ে আমার আমার মন প্রত্যথিত। কিন্তু এ শ্লোকেই তিনি কৃষ্ণকে বলেন 'হৃয়িতোহস্মি'—আমি হৃষ্ট হয়েছি। এই ভয় ও হর্ষ তাঁর একই সঙ্গে জাগছে, এই উপলব্ধি যুগপৎ হচ্ছে—যদিও সমগ্র গীতার কথা মনে রাখলে বলতে পারি, ভয় ও হর্ষের কথা একই উচ্চারণে বলা হলেও এখানেও এক উত্তরণের নাটক এবং সে-নাটক প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে গীতায়। এই নাটক 'রাজা'র সুদর্শনার মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে।

সুদর্শনা যেমন ভয়ে পালিয়ে যান পিতৃগৃহে, আমরাও তেমনই পালাই ঈশ্বরের চরণাশ্রয়ে। সুদর্শনার মতো সেই আশ্রয় জুটলেও তাতে উপেক্ষার বেদনা জাগে। ঈশ্বরের কী দায় আমাদের আশ্রয় দেওয়ার! কেন না তাঁকেও অমোঘ নিয়ম মানতে হয়। মানুষ জন্মালে মরবেই এই নিয়মের ব্যত্যয় কি তাঁর পক্ষে ঘটানো সম্ভব? তাই প্রিয়জনকে হারিয়ে দুঃখের দিনে আমাদের যখন চোখের জল ঝরে, তখন তাতে ঈশ্বরের মন ভেজে নি। তাঁর কাছে আমাদের সব আবদার ব্যর্থ হয়ে হয়ে ফিরে ফিরে আসে। আমরা এমনই অবোধ যে তাঁকে তখন দোষারোপ করি। আবার উল্টোটাও করি। ঘটনাচক্রে আমরা মামলায় জিতে বা পরীক্ষায় পাশ করে তাঁর প্রতি ভঙ্গিতে গদ্ গদ্ হই।

সুদর্শনা রাজার 'প্রকাণ্ড সুষমা' বুঝতে পারেন নি। পিতৃগৃহে অভিমান ভরে পালিয়ে রাণী যে ভুল করলেন, তার মূল্য পরে তাঁকে শোধ করতে হলো। তাঁর লোভে রাজা-রাজড়ারা পিতৃরাজ্য আক্রমণ করলেন। সমূহ বিপদের দিনে বাইরে থেকে দেখলে রাজাই তাঁকে উদ্ধার করলেন—যদিও সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন না। সত্যিই কি রাজা তাঁকে উদ্ধারের করেছেন? আমরা ক্বচিৎ কখনো অমঙ্গল থেকে, অশান্তি থেকে উদ্ধার পাই। মনে করি, ঈশ্বরই বুঝি উদ্ধার করলেন। আসলে উদ্ধার নিজেকেই নিজে করতে হয়।

'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ—রাণীর রূপ লালসা, কাঞ্চীরাজের দুষ্টবুদ্ধি—এ সবের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বলতে পারি নাট্যকার পাপ-অমঙ্গলবোধ সম্পর্কে তীব্রভাবে এই পর্বেই সচেতন হয়েছিলেন, যদিও তার এমন প্রকট প্রকাশ গীতাখ্য কাব্যত্রয়ের কবিতায় দেখতে পাই না। ঈশ্বরকে ভালোবাসার পরিবর্তে এসব কবিতায় ঈশ্বরের ভালোবাসা পেতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব য়ুরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজা (১৬৩২-৭৭)-র উক্তি স্মরণ করেছেন ঃ 'যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, তিনি তার বদলে এমন চেষ্টা করতে পারেন না যে ঈশ্বরেরও তাঁকে ভালোবাসা উচিত' (He who loves God cannot endeavour to bring it about that God should love him in return.)। গীতাখ্য কাব্যত্রয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা স্পিনোজার স্তরে উঠতে পারে নি, কিন্তু তা উঠেছে 'রাজা'য়। কেননা এখানকার সুদর্শনা রাজাকে ভালোবেসেও ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা পান নি। এজন্য রাজা তাঁকে পিতৃগৃহে চলে যেতে নিষেধ করেন না, তাঁর পিতৃরাজ্য আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীদের যুদ্ধে হারান, কিন্তু রাণীকে সঙ্গে না নিয়েই ফিরে আসেন। রাণী শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজেকে উদ্ধার করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা গীতার শ্লোক স্মরণ করেছি। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির কবিতার রবীন্দ্রমন 'রাজা' নাটকের তুলনায় অনেক অপরিণত। কবিতায় তাঁর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন 'তোমার প্রেমে আগাত আছে, নয় কো অবহেলা'। কিন্তু সুদর্শনা অবহেলা পেয়েছেন বিস্তর, আঘাত তো পেয়েছেনই। আঘাতের কথায় গীতাখ্যকাব্যত্রয়ে ঈশ্বরের বজ্রকঠিন রূপের আভাস বারবার ফুটেছে, 'বজ্রে তোলো আগুন করে/আমার যত কালো' অথবা 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি/সে কি সহজ গান'। গীতাঞ্জলি ২৪। দঃখের কথা থাকলেও পাপ-অশান্তি অমঙ্গলের অভ্রভেদী স্বরূপের সঙ্গে যে-ভাবে 'বলাকা'র কবি পরিচিত হলেন, তা তিনি হতে পারেন নি 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানে কবিতায়, কিন্তু হতে পেরেছিলেন এই পর্বেরই সৃষ্টি 'রাজা' নাটকের ঠাকুরদা চরিত্রে। তাই ঠাকুরদা গাইতে পেরেছেন প্রশান্তচিত্তে এই গান ঃ

> "হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
> কাঁপে ছন্দ ভালোমন্দ তালে তালে,
> নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
> তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ"

'বলাকা'র শঙ্খ'তে (৪ সংখ্যক কবিতা) কবিতার ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী গীতাখ্যকাব্যত্রয়ের কথা মনে রেখেই যেন লিখেছেন ঃ

> "চলেছিলেম পূজার ঘরে
> সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য!

খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তিস্বর্গ।"

পূজার ঘর ছিল ঐ গীতাখ্য কাব্যত্রয়, সেখানে তিনি শান্তিস্বর্গ খুঁজছিলেন। কিন্তু তা কি তিনি পেলেন? 'বলাকা'র কবি বলছেন যে তা তিনি পান নি। তাঁর ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের হৃদয়ক্ষত সব গত হবে তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু আজ তিন দেখছেন ঃ

"পথে দেখি ধূলায় মত
তোমার মহাশঙ্খ।"

মানবতায় মহাশঙ্খ ধ্বনি তুলেই ইতিহাসবিধাতা বারবার মানুষকে ডাক দেন। আর সেই শঙ্খই কিনা ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। তা হাতে তুলে নিয়ে ডাকতে শুনেছেন 'বলাকা'র 'ঝড়ের খেয়া'য় (৩৭ সংখ্যক কবিতায়) ইতিহাসবিধাতাকে। এই ইতিহাসবিধাতা বা ইতিহাসস্রষ্টা যুগপুরুষকে তিনি এ কবিতায় এক নাবিক (নেয়ে) রূপে কল্পনা করেছেন। সে-নাবিকের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানাছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;"

গীতাখ্যপর্বের পূর্বে দুঃখের কথা অজস্রবার বললেও পাপ অমঙ্গল অশান্তি সম্পর্কে এমন নিষ্কুণ্ঠ স্বীকৃতি তাঁর কাছ থেকে আগে শুনি নি। তার চেয়েও এক বলিষ্ঠ মনের পরিচয় আছে 'বলাকা'র আরেকটি স্বল্পালোচিত কবিতায়। তা হচ্ছে ১১-সংখ্যক কবিতা 'বিচার'। সেখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গর্জমান কামান আর রক্তক্ষয়কেও মনে হলো রুদ্রের মার্জনা। তাঁর কাছে মনে হলো, ইতিহাস বিধাতাই রুদ্ররূপে সেদিনকার বিশ্বযুদ্ধে দেখা দিয়েছেন।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত নিয়ে দেখা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা পরে আমরা করবো। আপাতত 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথের উত্তরণের পথ নির্দেশ করার কাজ এখানেই শেষ হলো।

॥ দুই ॥

'বলাকা' কাব্যের রচনাকাল ও কবিতার শ্রেণীবিভাগ

কাব্যগ্রন্থ হিসাবে বলাকা প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে তারিখে, কিন্তু এর কবিতাগুলির রচিত হয় বিভিন্ন স্থানে প্রায় দু'বছর ধরে, প্রথম কবিতাটি রচিত হয় শান্তিনিকেতনে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই বৈশাখ এবং শেষ কবিতাটি লেখা হয় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই বৈশাখ, কলিকাতায়। বাকি কবিতাগুলি এই দু'বছরের মধ্যে শান্তিনিকেতন, সুরুল, রামগড়, কলিকাতা, এলাহাবাদ, শিলাইদহের পদ্মাতীর, রেলপথ, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে লেখা। হিসাব করলে দেখা যায়, 'বলাকা'-র মোট পঁয়তাল্লিশটি কবিতার মধ্যে প্রথম চৌত্রিশটি রচিত ১৩২১ বঙ্গাব্দে এবং বাকি কবিতাগুলি ১৩২২ বঙ্গাব্দে (পরের বছর বৈশাখেও আছে) রচিত। কবিতাগুলি যখন সাময়িক পত্রের প্রকাশিত হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই এদের নামকরণ করা হয়েছিল, কিন্তু কাব্য গ্রন্থাকারে 'বলাকা'-য় যখন তারা স্থান পায় তখন কোন নামের পরিবর্তে সংখ্যা দ্বারাই তাদের চিহ্নিত করা হয়। এর কারণ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বলাকা'র ভিন্ন ভিন্ন কবিতাগুলির আমি কোন নাম দিতে চাই না। বলাকার অখণ্ড পংক্তিই মনোহর। তার মধ্যে বিশেষ একটি পংক্তিকে বিযুক্ত করে দেখানো চলে না। দালানের খিলানের মধ্যে সবগুলি পাথরেরই যেমন তুল্য-মূল্য, তেমনি বলাকার প্রত্যেকটি কবিতারই তুল্য-মূল্য। তার মধ্যে তারতম্য করতে গেলেই বিপদ। সারা চরাচরে, যেমন সমস্ত কিছুই ভেসে চলেছে, এই কবিতাগুলিও তাই। বলাকার মতো এরাও যে কোথা থেকে এল কোথায় যাবে তা কে জানে? কিন্তু এদের এই সবাই মিলে একসঙ্গে যাত্রার ছন্দেই আমাদের মনও যেন কোন্ অজানার দেশে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করতে চায়। মনে হয় যেন আমিও এই দলেরই পাখি। এখানে কিসের বাঁধনে যেন আপন মর্মকথা ভুলে গিয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। এদের চলার ইঙ্গিতেই আমার প্রাণেও উড়ে যাবার ব্যাকুলতা আসছে। আমার এই ব্যাকুলতাটি 'বলাকা'-তে বিশেষভাবে ব্যক্ত হলেও আমার সব কবিতাতেই তার পরিচয় আছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই যখন বলেছেন, বলাকার মত প্রত্যেকটি কবিতাই এক বিশেষ লক্ষণে স্বাতন্ত্র্যে হারিয়ে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছে, তখন কবিতাগুলির বিভাগ বন্টন কতটা সংগত হবে সে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু পৃথকভাবে কবিতার বিষয়বস্তু বিচার করলে কতকগুলি বিভাগ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এই বিভাগগুলি আমাদের মতে এইরকম—(ক) পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের সংঘাতজনিত মানসিকতায় রচিত কবিতা, (খ) যৌবনের কবিতা, (গ) গতি বিষয়ক কবিতা, (ঘ) শিল্পতত্ত্ববিষয়ক কবিতা এবং (ঙ) ঈশ্বর চেতনাবিষয়ক কবিতা।

প্রথম শ্রেণীর কবিতার মধ্যে প্রাধান্য পেতে পারে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৩৭, ৪৪, এবং ৪৫ সংখ্যক কবিতা। এই কবিতা গুলির বিশদ আলোচনা কবি স্বয়ং করেছেন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নকালে, সুতরাং কবিতাগুলি রচনার সময় কোন্ মানসিক অবস্থায় তিনি ছিলেন সে বিষয় আমরা সহজেই অবহিত হতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তখন আমার প্রাণের

মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময় পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল।" এইসব কবিতায় যেমন আমাদের দেশের নির্জীব জীবনধারার প্রতি ব্যঙ্গ আছে, পাশ্চাত্য জীবনধারার প্রমত্ত যৌবনকে বন্দনা আছে, তেমনি আছে বিশ্বব্যাপী এক বিরাট বিপর্যয় এবং আলোড়নের পূর্বাভাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় নি তখনই এই বিধ্বংসী কাণ্ডের আভাস রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় দিয়েছেন। তাঁর চেতনাকে যা আলোড়িত করেছিল তা আসলে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষির সেই মহানুভব প্রাজ্ঞ দৃষ্টি যা মানব-অকল্যাণের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে পড়ে, কোন যুদ্ধের পূর্বাভাস নয়, মানবিক মূল্যের চরম বিপর্যয়ের এক ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন এবং তাই তুলে ধরেছেন তাঁর এই ধরনের কবিতায়। এই বিভাগের শ্রেষ্ঠ কবিতা নিঃসন্দেহে ৩৭ সংখ্যক কবিতাটি। বলাকার প্রথম কবিতায় যদি থাকে রক্ষণশীল সমাজের প্রতি ব্যঙ্গের ভূমিকা, এখানে তাহলে সেই ব্যঙ্গ বিস্ফোরণের আকার নিয়েছে। এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কবিতা রবীন্দ্রনাথ খুব অল্পই লিখেছেন। এই কবিতায় ঋষি-কবির বিশ্বজাগতিক এক বেদনার্ত অনুভূতির কথা আছে, কিন্তু সেই অনুভূতি কোন তত্ত্বে পরিণত হয় নি, এখানেই কবিতাটির সার্থকতা। পৃথিবীর এক মহা সর্বনাশের চিত্র এই কবিতায় তিনি তুলে ধরেছেন—

"বহ্নি বন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন।"

কিন্তু এই সর্বনাশই সর্বনাশের শেষ কথা হতে পারে না। কবি জানেন নতুন কোন সমুদ্রতীর আমাদের গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাই ধ্বংসের মধ্যেও কবি যেন শুনতে পান অন্তরের আদেশ—

"যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল,
উঠেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ।"

এই বিপর্যয় যে কোনও একজনের একদিনের অপরাধে সৃষ্টি হয় নি সে কথা কবি স্পষ্ট করে বলেছেন—

"ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।"

কিন্তু আমাদের সকলের পাপে এ মহা সর্বনাশ একতা যেমন সত্য, আমাদের সকলের তিল তিল স্বার্থত্যাগ, দুঃখভোগ এবং আন্তরিক প্রয়াসে আছে তা থেকে মুক্তি, এ সত্যও কবি উপলব্ধি করেন—

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর মত মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা।"

কবি বিশ্বাস করেন, রাত্রির তপস্যা আসলে অনাগত দিবসের জন্যই তপস্যা এবং মহাদুর্যোগময় অন্ধকারের শেষে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' দেখা দেবেই। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের কবিতায় শেষ পর্যন্ত তাই বিপর্যয় সত্ত্বেও আশার সুরই শোনা যায়।

যৌবন বা বসন্তের কবিতা বলাকা-ও কবিতাগুচ্ছের একটি উপবিভাগ। যৌবনের প্রসঙ্গ

আগের কবিতাগুলিতেও লক্ষণীয় ভাবেই আছে, প্রথম কবিতাতেই কবি সমুজের জয়গান করেছেন। তবু এই উপরিভাগের অর্থ, এখানে মানব-জীবন বা মানব-সমাজের যৌবনের কথা নেই, আছে ব্যক্তিগত জীবনের যৌবনের কথা। সাধারণভাবে মানব-জীবনের যৌবনের কথা যখন কবি বলেছেন তখন কেবলই আশা ও উদ্দীপনা প্রকাশ করেছেন তিনি। কিন্তু ব্যক্তিগত যৌবনের সীমা আছে, তাই হতাশা ও কারুণ্যও সেখানে প্রকাশিত হয়। কবি জানেন, বসন্ত কেবলই ফোটা ফুলের মেলা নয়—'পউষের পাতা-ঝরা তপোবনেও' অকস্মাৎ বসন্তের মাতাল বাতাস এসে টলে পড়ে। গত যৌবনের বেদনা এবং সেখানে বসন্তের নিরুত্তাপ আগমনের চিত্রও ফুটে উঠেছে এই শ্রেণীর কবিতায়। কবি লিখেছেন—

"সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে,
অনিমেষে—
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্ত দেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।"

২৬-সংখ্যক কবিতাটি এই জাতীয় কবিতার মর্মকথাটি প্রকাশ করেছে।

বলাকা কাব্যের সঙ্গে যে গতিবাদ প্রায় অচ্ছেদ্য হয়ে আছে সেই গতিবিষয়ক যে কবিতাগুলি এই কাব্যে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ৩৬-সংখ্যক কবিতা। পত্রিকায় প্রকাশকালে এটি 'বলাকা' শীর্ষ নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতা রচনার নেপথ্যে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল, সে অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশও করেছেন। এইসব আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এই কবিতার মর্মকথা এই রকম যে, প্রকৃতিতে কিছুই স্থির হয়ে নেই—সব কিছুই গতিশীল। তেমনি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাও এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে, এক লোক থেকে অন্য লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবি যেন তাঁর অন্তরের মধ্যে দৃক্‌পাত করেও এই একই সত্যের সন্ধান পান—তিনি বলেছেন, "আমার মনের বাসা ছাড়া পাখি আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অবিশ্রাম চলেছে—যা কিছু গতিশীল, যা কিছু উড়ে চলেছে তাদের সহযাত্রী হয়ে, অসংখ্য পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে।" অর্থাৎ আকাশ, প্রকৃতি, মানব এবং মানবাত্মা—প্রত্যেকেরই আর্তি এককথায় বলা যেতে এই রকম—

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!"

৮-সংখ্যক কবিতা, পত্রিকায় প্রকাশের সময় যার নাম ছিল 'চঞ্চলা' সেখানে এর একটি বিপরীত পদ্ধতি আশ্রয় করা হলেও কবির বক্তব্য মূলত একই। এখানে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল, বিশ্বকে এক বিশেষ তত্ত্ব হিসেবে, একটা চিন্তাপ্রণালী হিসেবে দেখবার চেষ্টা এবং নিজেকে সেই প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে চিন্তা করা। এখানে গতির যে তত্ত্ব আছে, তা পুরোপুরি তত্ত্বের আকার লাভ করেছে, নতুবা নদীর জল সম্বন্ধে একথা বলা চলতো না—

'অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল,
চলে নিরবধি।'

গতিতত্ত্ব আংশিকতা অতিক্রম করে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে ১৬-সংখ্যক কবিতায়।

শিল্পবিষয়ক ধারণা প্রকাশিত হয়েছে, এমন কিছু কবিতাও বলাকা কাব্যগ্রন্থে আছে, ৬, ৭ এবং ৯-সংখ্যক কবিতা তিনটিকে শিল্পচিন্তা সম্পর্কিত বলা চলে। একটি ছবি এবং

তাজমহলকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। ছবিকে আশ্রয় করেছেন তিনি ৬ সংখ্যক কবিতায় এবং তাজমহলকে আশ্রয় করেছেন ৭ ও ৯-সংখ্যক কবিতায়।

কয়েকটি কবিতায় মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে ১০, ১১, ১২ প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলির সঙ্গে বলাকার বিশিষ্ট মানসিকতার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। সমালোচক বলেছেন—"কবিতাগুলি কাব্যরূপের হিসাবে বলাকার অন্তর্গত অভিজ্ঞতায় ইহারা গীতাঞ্জলি পর্বের।...গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতা যে কবির হৃদয় হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা যে কবি-হৃদয়ের একটা স্তরে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, এ কবিতাগুলিকে আমরা সেই প্রমাণ পাই।"

॥ তিন ॥

'বলাকা' কাব্যের সমকালীন অন্যান্য রচনা

● 'বলাকা'র সমকালীন প্রবন্ধ

'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত বেশ কয়টি প্রবন্ধ 'বলাকা'র সমকালীন অথবা সমকালীন না হলেও এক ভাবসূত্রে গ্রথিত। এগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ। সমাজের রক্ষণশীল প্রবীণরা বিবেচনার দ্বারা চালিত হয়। আর পরিবর্তনকামী তরুণদের চঞ্চল করে তোলে তাদের অবিবেচনা। বিশেষভাবে 'বলাকা'র প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযানে'র সঙ্গে এই প্রন্ধের ভাবগত যোগ আছে। এই প্রবন্ধে খাঁচা ও তাতে বন্দী পাখি এবং আকাশ ও ডানা-মেলে-দেওয়া পাখির উপমার ছড়াছড়ি। আমাদের সমাজ খাঁচার মতো বাধানিষেধের শলাকায় বেষ্টিত। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'র ভাষায় এখনে শুধু নিষেধ, শুধু বিবেচনা, কলের পুতুল, পুতুলবাজির কারখানা, মৃত্যু, প্রাচীর, স্থলের স্থাবরতা, পক্ককেশের শুভ্র মরুভূমি, জটাজুট বিলম্বিত তপোমগ্ন উলঙ্গ ধূর্জটি। পক্ষান্তরে মুক্ত সমাজে থাকে খাঁচার বিপরীত আকাশ, নিষেধের বিপরীত তাগিদ, বিবেচনার বিপরীত অবিবেচনা, প্রবীণ ভয়ের বিপরীত নবীন প্রাণ, মৃত্যুর স্তব্ধতার বিপরীত জীবনের চঞ্চলতা—সমুদ্র থেকে আকাশে জলের মেঘরূপে উর্ধ্বগতি—আবার আকাশ থেকে মাটিতে বর্ষণের অধোগতি—ঐভাবে এক অন্তহীন গতির আবর্ত, সেখানে ধূর্জটির উদ্দেশ্যে কবির উক্তি, বসন্তের বন্যা স্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান/জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু কলতান—শুনিলে তন্ময়'—তপোভঙ্গ, পূরবী। আসলে ১৩২১ এ লেখা এই প্রবন্ধে ১৩৪০-এর 'তপোভঙ্গ' কবিতার ভাব বীজাকারে দেখি তপোমগ্ন ধূর্জটির তপোভঙ্গ করে উমা মহাদেবের মিলন কল্পনায়। আমাদের সনাতন বিধির প্রাচীরে বাঁধা সমাজের কথায় 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বহুবার ঘটা বাড়িয়া গিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি, সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে বলিতে হয় 'খাঁচাটাকে ভাঙ্গো, কারণ এটা আমাদের ঈশ্বর দত্ত পাখা দুটোকে অসাড় করিয়া দিল' নয় বলিতে হয় ঈশ্বর দত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাকাগুলো পবিত্র, কারণ পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাকাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, কিন্তু কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন, অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা ঝাপ্টে সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যেই যদি থাকিতে হয় কবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।"

কর্তা, গুরু, পুরোহিত, পাঁজি, পুঁথি, মোল্লা মৌলবী, স্মৃতিশাস্ত্র, শরিয়ত, আমরা দীর্ঘকাল মেনে এসেছি। ভুল করবার স্বাধীনতা, ভুল করতে করতে সত্য সন্ধানের অধিকার এখানে অস্বীকৃত শুধু নয়, ধিক্কৃত। তাই সত্য থেকে আমরা ভ্রষ্ট, পাখার চেয়ে শলার পবিত্রতা

ও সনাতনত্ব ঘোষণায় আমরা মুখর। ক্ষণিক প্রাণের চেয়ে সনাতন বিধির মহিমা কীর্তনে 'অচলায়তন' নাটকের উপধ্যায়ের মতোই আমরা উচ্চকণ্ঠ। আকাশকে আমরা ওড়বার আনন্দে জানিনি, জেনেছি নিষেধভরা প্রবীণ ভয়ে। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধেও কবির প্রিয় খাঁচার আর মুক্তিপ্রিয় কূজনে মুখর পাখির চিত্রকল্প 'সবুজের অভিযান' বা আগে ও পরে লেখা অনেক রচনার মতোই এসে যায়। 'বলাকা'র কবিতার ভরা জোয়ারের মুখে এই প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। মনে রাখতে হবে, এই একই বৈশাখে তিনি 'সবুজের অভিযান' কবিতাটিও লিখেছেন। ১৩২১ সালে 'কালান্তর' বইটির বেশ কিছু প্রবন্ধ তিনি পর পর লিখছিলেন, যেমন 'লোকহিত', 'লড়াইয়ের মূল' (পৌষ, ১৩২১) কিছু প্রবন্ধ পরে লেখা হলেও বলা যায় 'বলাকা'র ভাবে এগুলি দীপ্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধের আলোচ্য। এই প্রবন্ধে এই যুদ্ধের কারণ রূপে তিনি নির্দেশ করেছেন সাম্রাজ্যবাদকে। 'বলাকা'র কবিতার এই বিশ্বযুদ্ধকে ঘিরে তাঁর ভাবনা-কল্পনার রূপ ফুটেছে, যেমন এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'ঝড়ের খেয়া'র (সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতা) কথা, রচনাকাল—কার্তিক ১৩৩২। 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে বস্তুনিষ্ঠ সত্যসন্ধানী যে রবীন্দ্রনাথকে দেখি, কবি রবীন্দ্রনাথ সে তুলনায় অনেকটা ভাবালুতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে যে ১৩২১ বঙ্গাব্দের পৌষে লিখেছেন, সেই বছরের শ্রাবণের শান্তিনিকেতন গ্রন্থের 'মা মা হিংসীর', ভাদ্রের 'পাপের মার্জনা' ভাষণ দুটিতেও এই কুয়াশা আমরা দেখতে পাই। এগুলিতে যদি কুয়াশা দেখে থাকি তাহলে 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে কুযাশাভেদী সূর্যের আলো জ্বলেছে। এজন্যই 'বলাকা'র কবিতার সঙ্গে প্রবন্ধ মিলিয়ে পড়লে আমরা তাঁর তখনকার কুয়াশায় আলোতে মেশা মনের একটি পুরো ছবি দেখতে পাই।

কিন্তু তার আগে কাকে কুয়াশা বলছি, আর কাকে বলছি সূর্যালাক—তা বোঝার জন্য কবিতার ও প্রবন্ধে মূল ভাবনাগুলির দিকে তাকানো যাক্। কবিতাটিতে একটি শব্দ আছে 'জাতি-অভিমান'। এই জাতি-অভিমানই সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয়। যখন একটি জাতি ভাবতে শুরু করে, তার পৃথ্বীব্যপী প্রভুত্বের অধিকার আছে আর সকল জাতি তার দাস, তখন সেই 'জাতি-অভিমান' 'মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান' ঘটায় তখন লোভী জাতিবিশেষের লোভ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, যারা বঞ্চিত তাদের নিত্য চিত্তক্ষোভ জাগে। একদিকে 'প্রবলের উদ্ধত অন্যায়' খরনখ ও তীক্ষ্নদন্ত বিস্তার করে অন্যদিকে ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। এই পর্যন্ত কবিতার কথা। 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে তিনি বলেন, একদিন য়ুরোপীয় জাতিগুলি নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের অভিযানে এশিয়ায় আফ্রিকায় প্রভুত্বের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করেছিল। প্রভুত্ব বিস্তারে জার্মানি যথাসময়ে মন দেয় নি। যখন মন দিল তখন আজ ক্ষুধিত জার্মানির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস, দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস, সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, আর যার জোর নাই 'সে পথ করিয়া দিবে'। এই ভাষায় তিনি এই প্রবন্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই যুগ তাঁর ধারণায় 'বৈশ্যরাজকে'। তিনি বুঝেছিলেন, সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের গান্ধর্ব বিবাহ একালে ঘটেছে, জর্মন পণ্ডিত জর্মন প্রভুত্বের যে-তত্ত্ব প্রচার করেন, তার উৎপত্তি 'জর্মন পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান

য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে'। এইসব সত্যবোধকেই আমরা বলছি সূর্যালোক।

'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় পাপের দায় তিনি অত্যাচারী-অত্যাচারিত, প্রভু-দাস, বিজেতা-বিজিত, নির্বিশেষে সকলের ঘাড়ের চাপিয়ে দিয়েছেন ঃ

"ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।

একেই আমরা বলছি ভাবালুতার কুয়াশা। এই কুয়াশার স্পর্শমাত্র নেই, 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে। একথা সত্য যে যারা যুদ্ধ বাধায়, তাদের সঙ্গে অথবা তাদের বাদ দিয়ে নিরীহ মানুষরাও মরে, শুধু পাপীই শাস্তি পায় না। পাপী পাপের জন্য শাস্তি পাবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশিত। তবে ব্যতিক্রম দেখে এই অসংগতিতে মানুষ দুঃখ পায়। এই অসংগতির একটা ব্যাখ্যা শান্তিনিকেতন ভাষণমালার 'মা মা হিংসীঃ' এবং 'পাপের মার্জনা' ভাষণ দুটিতে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার মতোই তিনি দিতে চেয়েছেন। 'মা মা হিংসীর' ভাষণে গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির মধ্যে সমকালীন বিশ্বযুদ্ধের রাজনীতি প্রসঙ্গও উঠেছিল এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন ঃ

বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রের সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। পীস্ কন্‌ফারেনস্ শান্তি স্থাপনের উদ্‌যোগ চলেছে, যেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে?

এই পর্যন্ত রাজনীতির আলোচনা রাজনীতির ভাষাতেই চলছিল, তারপর অধ্যাত্ম ভাবনা এসে রাজনীতি চিন্তাকে ঘোলাটে করে তোলে এভাবে ঃ এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে সেই পাপই যে মরবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে ঃ মা মা হিংসীর পিতা, তোমার বোধ না দিলে এ মার থেকে কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

বলা বাহুল্য, পিতা ঈশ্বর, যিনি জগতের পিতা। তিনি যদি তাঁর বোধ দেন, (পিতা নো বোধি) তাহলে আমাদের শুভবোধ জাগে, আমাদের মধ্যেকার পাপ ও অমঙ্গল দূর হয়, এ সমস্ত অধ্যাত্ম উপলব্ধি মেনে নিলেও 'সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে' এ কথায় একটা ফাঁকি থেকেই যায়। সংকীর্ণ জাতীয়তা ও তজ্জাত সাম্রাজ্যবাদের জন্য সমস্ত মানুষ দায়ী এমনকি শোষিতরাও দায়ী—এ কথা কি বলা যায়? রবীন্দ্রনাথ এখানে তা-ই বলতে চেয়েছেন।

এই একই ধারণা 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালার 'পাপের মার্জনা'য় আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে ঃ

সেইজন্য এক-এক সময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে, যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু এই কথা জেনো যে মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড় দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলেরই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে, মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

সমগ্র মানব সমাজ একটি দেহের মতোই অবিভাজ্য। দেহের এক জায়গায় আঘাত

লাগলে সেই বেদনা যেমন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই একের পাপের ফলভোগ অপরকে করতেই হয়। এজন্যই 'জাতি-অভিমান' যারা মত্ত হয়, তাদের মত্ততার জন্য দুঃখ পেতে হয় নিরীহ পরাধীন দেশগুলিকে। এসব কথায় উপমা আছে, কিন্তু যুক্তি নেই। এই যুক্তি ছিল 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে। বাতাস যদি গরম হয়ে হালকা হতে থাকে, তার কোনও প্রতিক্রিয়া অনেকক্ষণ দেখা যায় না। তারপর হঠাৎ ঝড় ওঠে, হালকা বাতাস ওপরে উঠে যাওয়ায় সেই ফাঁকে ভরার জন্য দুর্দম গতিতে বাতাস ছুটে আসে, আর তখনই ভাঙাচোরা শুরু হয়। এভাবেই প্রভুত্বকামী জাতির মনে পাপ জমতে জমতে তার বিষক্রিয়া সমগ্র মানবসমাজকে ভোগ করতে হয়। 'ঝড়ের খেয়া'য় এ সব কথা এভাবে তিনি লিখলেন ঃ

"বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়।"

মানুষের পাপে বিধাতার বক্ষের বেদনার তাপ থেকে আজ বায়ুকোণে ঝড় উঠছে। এই পাপও সকলের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সকলে। কোনও মানুষই স্বতন্ত্র নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। তাই এই যন্ত্রণাভোগ সম্মিলিত। পাপ ও তার ফলে দুঃখ ভোগের এই কাব্যিক ব্যাখ্যার মধ্যে বুদ্ধির সূর্যালোক জ্বলতে পারে নি, সূর্যালোক এখানে ভাবালুতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

রবীন্দ্রনাথের সব রচনায় বুদ্ধির আলো জ্বলেনি। কুয়াশায় ঢাকা—তা মোটেই সত্য নয়। গান্ধিজীর সঙ্গে অসহযোগ ও বিলিতি কাপড় পোড়ানো নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধ (কালান্তর গ্রন্থভুক্ত কার্তিক ১৩২৮ অর্থাৎ ১৯২১) আর গান্ধিজী তাঁর উত্তর দেন The Poet's Anxiety-তে। 'সত্যের আহ্বানে' রাজনীতি অর্থনীতি আলোচনায় পাপ, অপবিত্র, প্রায়শ্চিত্ত এই জাতীয় ধর্মশাস্ত্রীয় শব্দ ব্যবহার গান্ধিজী করছেন দেখে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'আজ ঘোষণা করা হয়েছে, বিদেশী কাপড় অপবিত্র; অতএব তাকে দগ্ধ করো।' অর্থশাস্ত্রকে বহিস্কৃত করে 'তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল।

বিদেশী কাপড়ের বদলে স্বদেশী কাপড় উৎপাদন ব্যাপারটা অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। তার মধ্যে হঠাৎ অপবিত্র বিদেশী কাপড়ের বিরুদ্ধে জেহাদ তুলে স্বদেশী বস্ত্র শিল্পীকে উৎসাহদানের কথা বলায় অর্থশাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে জনসাধারণের ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়া হল। তাতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানালেন।

কিন্তু এই কাজটিই কি তিনি নিজে 'ঝড়ের খেয়া'য় 'মা মা হিংসীর' অথবা 'পাপের মার্জনা'য় করেন নি?

এ কবিতা লেখার বছর পনেরো পরে ১৯৫৪-এ গান্ধিজী বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পকে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা নামক পাপের জন্য ভগবানের শাস্তি বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ জানায়। এ যদি শাস্তিই হয়, তাহলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মাটির ঘরগুলি ভগবান কেন ভাঙলেন? উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দালানকোঠাগুলিই বা কেন অটুট রইল? অস্পৃশ্যতা মেনে তারাই তো পাপ করছে! শাস্তি তাদেরই প্রাপ্য! শাস্তি উল্টে যায় কেন? এখানেই ছিল রবীন্দ্রনাথের আপত্তি।

এ আপত্তি আমরাও করতে পারি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে এ কবিতায় কবি

বলেন ঃ 'এ আমার এ তোমার পাপ/বিধাতার বক্ষে এই তাপ/বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়।' 'পাপের মার্জনা' ভাষণে এসব কাব্যি কাব্যি ধারণা থেকে আবার তিনি অবিভাজ্য মানবের একটা দুর্বল তত্ত্ব খাড়া করলেন।

গান্ধিজীর ধরনের কথা সেই বিহার ভূমিকম্পের বছর চব্বিশ আগে গীতাঞ্জলির ১০৮ সংখ্যক (দুর্ভাগা দেশ বা 'অপমানিত') কবিতায় তিনি নিজেও বলেছিলেন ঃ

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে
বিধাতার রুদ্র রোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

বিহারে 'দুর্ভিক্ষের দ্বারে' না হলেও ভূমিকম্পের দ্বারে বসে বিধাতার রুদ্র রোষে উচ্চ ও নিম্নবর্গের সকল মানুষকে এক সঙ্গে অন্ন খেতে হয়েছে, জলপান করতে হয়েছে, জাতিবিচার ছোঁওয়াছুঁয়ি টেঁকে নি। এ কবিতার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধিজীর পার্থক্য কোথায়?

এই পার্থক্য 'ঝড়ের খেয়া'র উদ্ধৃত অংশ বা 'মা মা হিংসীর' বা 'পাপের মার্জনা'র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও বিশেষ নেই। কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথেরই যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হই কালান্তরের অনেক প্রবন্ধে। সন তারিখ মিলিয়ে বলে দেওয়া যায় না. এই সময়টা তাঁর কুয়াশার পর্ব আর তারপর থেকে 'কুজঝটি জাল ছিঁড়ে' আলো জ্বলেছে। কেন না আগে দেখে এসেছি, ১৩২১-এর পৌষে 'লড়াইয়ের মূল' লিখেছেন, একই বছর শ্রাবণে 'মা মা হিংসীর', ভাদ্রে 'পাপের মার্জনা', আবার ১৩২২ এর কার্তিকে 'ঝড়ের খেয়া'। আসলে সন তারিখ কবির মন বোঝার বেলার খুব সাহায্য করে না। মানুষের মনই জটিল, আর কবির মন তো আরো জটিল। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির রচনায় যে-আত্মপ্রকাশ, তা শেক্‌সপীয়র সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন সেই ভাষারই বলা যায় 'খুব সম্মিশ্রিত বৃহৎ এবং বিচিত্র।' এই সম্মিশ্রিত বৃহৎকে ধরায় সন তারিখ বিশেষ সাহায্য করে না।

তাই 'বলাকা'র সমকালীন না হলেও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' (১৩১৮ অর্থাৎ ১৯১১) নামক 'বলাকা'র পূর্ববর্তী একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ এবং পরবর্তী 'কালান্তরে'র 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (ভাদ্র, ১৩২৪ অর্থাৎ ১৯১৭) এবং সমস্যা' (অগ্রহায়ণ ১৩৩০ অর্থাৎ ১৯২৩) এই তিনটি প্রবন্ধেব সঙ্গে 'বলাকা'য় বন্দিত নবযুগ ও যৌবনের যোগ বিশেষ ভাবে অনুভব করার মতো। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'য় নবযুগ ও যৌবনের প্রসঙ্গ নেই। কেন না এখানে লেখকের লক্ষ্য অতীত ভারত সেই অতীত ভারত যে কি না নিরন্তর আত্মরক্ষাণী ও আত্মপ্রসারণীর মতো প্রাণের আদিম দুটি মৌল লক্ষণ নিয়ে সম্পূর্ণ জীবিত ছিল, তাই সেদিন ভারতীয় জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ছিল যৌবনাবেগস্পন্দিত। সেখানেই প্রাণের এই আদিম দুটি লক্ষণের সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেছে, তখন কিভাবে এ দেশে প্রাণের বিকৃতি দেখা দিয়েছে, অতীত সম্পর্কে মোহজ্ঞানমুক্ত হয়ে তার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা তিনি করেছেন এই প্রবন্ধে। এই আলোচনা থেকে তাঁর মনটি কিছুটা বুঝতে পারি যে তাঁর স্বপ্নের আধুনিক ভারত হোক সেই মহাভারত যে-ভারত আত্মরক্ষা করতে করতে আত্মপ্রসারের আনন্দে মেতে

উঠবে। সেই আনন্দ পরিপূর্ণ জীবনের আনন্দ, অন্য ভাষায় জীবনের আনন্দ।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এবং 'সমস্যা' প্রবন্ধের কোনো কোনো উক্তি আমরা অন্য প্রসঙ্গে স্মরণ করেছি। 'কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটির মূল কথা, আমরা যা কিছু করি সব কর্তার ইচ্ছায় করি। সে কর্তার হুকের রকম—'ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, যা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা মনসা ওলবিবি, দক্ষিণ রায়, শনি মঙ্গল রাহু কেতু।' এরকম হাজার নামের কর্তার জুজুর ভয়ে আমরা থরথর করে কাঁপি, তাই আমরা আত্মকর্তৃত্ব লাভ করতে পারি না, নিজের ওপর আস্থায় নিজের বিবেক বুদ্ধিমত আমাদের কোনও কিছু করা সম্ভব হয় না। 'ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে।' আমাদের ভুল করবার স্বাধীনতা নেই বলেই সত্য লাভের অধিকার করতে পারি নি। 'মানুষকে পুঁথিকে, ইশারাকে গণ্ডিকে বিনা বাক্যে পুরুষে পুরুষে' নতমস্তকে মেনে চলাতেই আমরা অভ্যস্ত। 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী' নাটকে এবং 'বলাকা'র কবিতায় আমাদের শতশত নিষেধ বেষ্টিত ছোট্ট জীবনপরিধিতে অন্ধভাবে ঘুরপাক খাওয়ার হাস্যকরতার কথা বলে হয়েছে। 'সমস্যা' প্রবন্ধে আমাদের সংস্কার-মানা অস্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

যে দেশে যা আছে তাকেই স্বীকার করা—যা ছিল তাকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা—সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে খুঁটিটা শত শত বৎসর ধরে রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল, অবশেষে একদিন খামকা কোথা থেকে একজন ভ[illegible]গদ মানুষ এসে তার গায়ে একটা সিঁদুর লেপে তার উপর একটা মন্দির তুলে বস[illegible]পর থেকে বছর বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা গেল, শুক্লপক্ষের কার্তিক সপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুঁটিশ্বরীকে এক সের ছাগদুগ্ধ ও তিন তোলা রজত দেয় তার সেই ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ। খুঁটিশ্বরীর পূজায় এমনই পূর্ণ হবে তাতে তিন কোটি বংশ উদ্ধার হওয়া উচিত। ব্যঙ্গের ভাষায় যাকে খুঁটিশ্বরী বলেছেন, যে খুঁটিশ্বরীর পূজার ধুমধাম সম্প্রতি কলকাতার মতো বড়ো শহর থেকে গাঁয়ে গঞ্জে সর্বত্র দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, সে খুঁটিশ্বরীকেই 'সবুজের অভিযান' কবিতায় 'শিকলদেবী' বলেছেন। এই শিকলদেবী আমাদের বুদ্ধিকে মুক্তি দেয় না; সংস্কারের সহস্র গ্রন্থিতে আমাদের বাঁধে। সে শিকল আমাদের চিত্তকে বুদ্ধিকে বিকল করে।

এভাবে এসব প্রবন্ধে 'বলাকা' পর্বের মুক্ত জীবনে দৃষ্টি কখনো সমকালে, কখনো পূর্বে যা পরে যুক্তির ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তির ভাষা আসে নি 'মা মা হিংসীর' ও 'পাপের মার্জনা'য়। এসব কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

● 'বলাকা'র সমকালীন গল্প

এ যেমন 'বলাকা'র সমকালীন প্রবন্ধের কথা, তেমনই তখনকার ছোটগল্পের সঙ্গেও বলাকার যোগনির্দেশকরা যায়। বলা যেতে পারে হালদার গোষ্ঠীর বনোয়ারিলালের কথা। যে সমাজ শেখায় 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ; পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ, যে সমাজে 'ঘরের বাপদাদা' কর্তার জুজু দেখায়, যেখানে সমাজ ব্যক্তিকে ব্যক্ত হতে দেয় না; যেখানে ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠীর মূল্য বেশি; সেখানে এ গল্পের বনোয়ারিলালের জীবন রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ে। স্ত্রী কিরণ, ভাই বংশী—সকলেই হালদারগোষ্ঠীর; কিন্তু নিজেকে সে হালদারগোষ্ঠীর জমিদারি হাবভাবের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে নি; তাদের

অত্যাচার থেকে মধুকৈবর্তকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়। এই সমস্ত ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে গোষ্ঠীতন্ত্রে এই নিঃসঙ্গ বেমানান মানুষটি পিতৃ শ্রাদ্ধের দায়িত্ব পালন না করে তার আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে বেরিয়ে পড়ে। কোন্ সমাজ থেকে তার এই মুক্তি? যে-সমাজ কি না বলেছে 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ'। এখানে গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির যে-বিদ্রোহ রূপ পেয়েছে, এও নিঃসন্দেহে 'বলাকা'র যৌবনের বিদ্রোহ। বনোয়ারির মুক্ত যৌবন প্রসঙ্গে 'বলাকা'র কেন্দ্রীয় পাখির চিত্রকল্পটিও এ-গল্পে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এক জায়গায় এ-গল্পে লেখক লিখেছেন যে একধরনের মানুষ থাকে তারা ডিমের নিরাপদ খোলস ভেঙে পাখির ছানার মতো বেরিয়ে পড়ে। ডিমের খাদ্যরসে তারা বাঁচাতে পারে না 'খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র' সন্ধানে তাদের মুক্তি। অর্থাৎ পাখিরূপে নবজন্মেই তাদের মুক্তি। অর্থাৎ পাখি রূপে নবজন্মেই তাদের সার্থকতা। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা নিয়ে জন্মেছে। তাই হালদারগোষ্ঠীর ডিমের নিরাপদ খোলস ভেঙে তার এই বাইরে যাত্রা, সত্যিকারের প্রতিটি ব্যক্তি পাখির মতো দ্বিজ। তার প্রথম জন্ম এক গোষ্ঠীতে, দ্বিতীয় জন্ম তার স্বকীয়তায়, ব্যক্তির ব্যক্ত হয়ে ওঠার আনন্দে।

এই সময়কার 'হৈমন্তী' গল্পের নায়ক বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভেল্যুশনের পাঁচ-সাত পাতা নোট মুখস্থ করেছেন, মার্টিনের চরিত্র-তত্ত্বে, পরীক্ষার তারায় নীল পেন্সিল চালনায় ব্যস্ত অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনে মুক্তির ভাবনায় দীক্ষিত এক নব্য যুবক। এ হেন যুবকের পরিবারে পিতৃতন্ত্র প্রাধান্য, কুষ্ঠি, ঠিকুজি, পঞ্জিকার সনাতনবিধি, নারীর অবমাননা, শেষ পর্যন্ত নায়কের স্ত্রী হৈমন্তীর অকাল মৃত্যু ঘটে অবহেলায়, অযত্নে, চিকিৎসার অভাবে। নায়ক এসবে সায় দিতে না পারলেও অসহায়। অসুস্থ স্ত্রীর বায়ু পরিবর্তনের জন্য সে যখন বলে "হৈমকে আমি লইয়া যাইব।" তখন পুত্রের একথায় পিতার গর্জন ঃ "বটে রে-।" এ গল্পের শেষে নায়কের বন্ধুরা স্ত্রীকে জোর করে সে নিয়ে গেল না কেন, জিজ্ঞেস করলে সে যে উত্তর দিয়েছে, তা তার নিজের ভাষায় শোনা যাক্ ঃ

"যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কি করিতে আছে, জানো তোমরা? সেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবী করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিও তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রী-পরিত্যাগের গুণ বর্ণনা করিয়া মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে সে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।"

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে এ-গল্পে নায়কের আবার বিবাহের জন্যে পাত্রীর সন্ধান চলে। ঠিক এইভাবেই তেইশ-চব্বিশ বছর আগে লেখা 'দেনাপাওনা' গল্পের নায়কেরও স্ত্রী নিরূপমার মৃত্যুর পরে পূণর্বিবাহের আয়োজন দেখি। তাই এই দুই গল্পের মিল অস্বীকার করা যায় না। তাহলে 'বলাকা' যুগের যৌবনের অভিনবত্ব 'হৈমন্তী' গল্পে কোথায়? অভিনবত্ব রামের সীতা বিসর্জন নামক নির্মম অন্যায় কর্মটিকে নায়কের এই উক্তিতে খোঁচা দেওয়ায়। এখানে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সীতা পরিত্যাগকারী রামচন্দ্র স্থবির সনাতন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি। স্ত্রীকে ত্যাগ করে আত্মনিগ্রহে কষ্ঠ পেলেও রামচন্দ্রের জীবনে বহুযুগের শিক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার রাম, 'প্রাচীন সাহিত্য' বইটির 'রামায়ণ' প্রবন্ধের নরচন্দ্রমা

রামের উদ্দেশ্যে 'বলাকা' যুগের রবীন্দ্রনাথের এই ব্যঙ্গের বান নিক্ষেপের মধ্যেই এ গল্পের অভিনবত্ব। এইটি আমরা 'দেনাপাওনা' গল্পে আশাই করতে পারি না।

'হালদার গোষ্ঠী' তে যেমন পুরুষ ব্যক্তিত্বের মুক্তির অভীপ্সা, 'স্ত্রীর পত্র' তেমনই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির মেজোবউ মৃণালের নারী ব্যক্তিত্বের মুক্তির সন্ধানে দুঃসাহসিক যাত্রা। বিন্দুর প্রতি যে-অবিচার হয়েছে, তার প্রতিকার তার পক্ষে করা সম্ভব হয় নি, যেমন সম্ভব হয় নি মধু কৈবর্তের ওপর হালদার গোষ্ঠীর অত্যাচারের প্রতিকার বনোয়ারিলালের পক্ষে। কুষ্ঠরোগী স্বামীকে কোলে করে স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে—এমন গল্পের যে-সমাজ সতীত্বের মহিমা কীর্তন করেছে, যে-সমাজে নারীকে বারবার আত্মহননের নিষ্ঠুর পথ বেছে নিতে হয়; সেই সমাজের কপটতা, ছলনা আর ভণ্ডামির ওপর পুরীর দূর সমুদ্রতীর থেকে মৃণাল যে-পত্র বোমা নিক্ষেপ করেছে, তার শব্দে সেদিনকার সমাজ হকচকিয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ সেকালের রাজনীতির নেতা বিপিনচন্দ্র পাল প্রতিবাদের ভাষায় লিখেছিলেন 'মৃণালের পত্র' গল্প। মৃণাল লিখেছে 'এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।' লিখেছে 'মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।' আবার বনোয়ারির ডিমের খোলস ভেঙে পাখির ছানা বেরিয়ে আসর চিত্রকল্প। পক্ষান্তরে মৃণালের স্বামী খোলস-আঁটা শামুক, পাখির মতো তার মুক্তি নেই, জীবনের ভার বহনে মন্দগতি, যেমন আমাদের আবহমানকালের এই সমাজ। এই সমাজেই বনোয়ারিলাল বা মৃণালের মতো দু-একজন পুরুষ ও নারী খোলস ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। তাদের গল্প বলায় 'বলাকা' যুগে রবীন্দ্রনাথের অদম্য উৎসাহ। কেননা এ যুগ তাঁর নিজেরও খোলস ভাঙার যুগ, অতীতের সম্মোহন পাশ ছিন্ন করে ভবিষ্যতের ভাবনায় ঝাঁপিয়ে পড়ার যুগ।

'স্ত্রীর পত্র'র চেয়েও আরেকধাপ রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন এই সময়ে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পে। এ-গল্পের কল্যাণীর বিবাহের লগ্ন ভ্রষ্ট হয় পণের গুরুভার পাত্রীপক্ষের বইতে না পারায়। পণের দায় মাথায় নিয়ে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী কল্যাণী বাসরঘরে প্রবেশ করে নি, আপন ভাগ্য নিজের হাতে সে রচনা করেছে, নারীশিক্ষার ব্রত সে নিয়েছে, বিবাহকে নারী-জীবনের সার্থকতার একমাত্র পথ বলে সে জানে নি, তবুও সে তার জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ পেয়েছে, শুধু একরাত্রির তার মধুর কণ্ঠস্বরই দূরলোকের চকিত বার্তা বহন করে এনেছিল নায়কের জীবনে। মৃণাল নিজে চাকরি করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, কল্যাণী নারীশিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেয়েছে। এজন্যই বলছিলাম, এখানে লেখক আরও একধাপ এগিয়েছেন। ছোটগল্পের স্বল্পাক্ষর ব্যঞ্জনায় ও আশ্চর্য লাবণ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম এই 'অপরিচিতা'।

হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা এই গল্পসপ্তক ১৩২১-এর বৈশাখ থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে সবুজপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের এই পর্বকে 'বলাকা' পর্ব বলা হয়। কেননা তখন 'বলাকা'র কবিতার ভরা জোয়ার চলছে। তারপরেও ১৩২৮ বঙ্গাব্দে, সবুজপত্রে 'তপস্বিনী', 'পয়লানম্বর', 'পাত্র ও পাত্রী', গল্প যথাক্রমে বৈশাখ, আষাঢ় ও পৌষ এই তিন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা এই পর্বের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র, অপরিচিতা এই চারটি গল্পের তবু কিছুটা আলোচনা করেছি। বাকি গল্পগুলি সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে প্রতিটি গল্পেই

কিছু-না-কিছু আমাদের ধর্মধ্বজাবাহীদের কালিমালিপ্ত স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা আছে। প্রায়ই তিনি ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। তিনি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এ জন্যই জীবন-সায়াহ্নের একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে একগুচ্ছ সমস্যাপ্রধান গল্প লেখার সময় তাঁর অজান্তে এসে উপস্থিত হয়। সমস্যাপ্রধান ছোটগল্প তিনি 'বলাকা' বা 'সবুজপত্র' পর্ব থেকেই লিখতে শুরু করেন। ভাষা কোথাও পরিহাসবিজল্পিত, কোথাও ব্যঙ্গে ক্ষুরধার, কোথাও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যময়; আগেকার ছোটগল্পের মতো ব্যঞ্জনাধর্মী লাবণ্যমণ্ডিত নয়। বহু আগেকার 'নষ্টনীড়ে'র ভূপতির সঙ্গে 'পয়লানম্বরে'র গল্পকথকের লেখাপড়া ও নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ততার মিল। সেই ব্যস্ততায় উপেক্ষিতা স্ত্রী চারুলতা ও অনিলার মিলও অস্বীকার করা যায় না। তবুও অমলে ও সিতাংশু মৌলিতে দুস্তর দূরত্ব। চারুলতার সঙ্গে অনিলার মিল সত্ত্বেও চাপা স্বভাবে, গাম্ভীর্যে নিজেকে নিত্য আড়ালে রাখায় অনিলা অনেক বেশি আধুনিক, অনেকটা দুর্জ্ঞেয়। অমলের স্মৃতিবেদনার মালা গাঁথার জন্য চারুর সে-বাড়ি আঁকড়ে থাকার কারুণ্য আর 'পয়লানম্বরে'র অনিলার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্র ছোটগল্প এক দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছে। দীর্ঘ পথের বাঁক আর সেই বাঁক যদি হয় উঁচু জায়গায়, তাহলে তো দূর থেকে চোখে পড়েই। এরই জন্য এ-পর্বের গল্পগুলির এমন গুরুত্ব। 'বোষ্টমী' গল্পে গুরুর লালসালোলুপ যে-রূপ দেখি, তার মধ্যে ধর্মধ্বজীদের প্রতি খড়্গহস্ত লেখককেই দেখতে পাই। বোষ্টমী আনন্দীর মধ্যে যে অধ্যাত্মমুক্তির ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গেও এই পর্বের রবীন্দ্রনাথের যোগ আছে।

সমাজসমস্যা প্রথমাবধিই তাঁর গল্পে ছিল। কিন্তু সমস্যার রূপদানে সেই রূপের চেয়েও সমস্যা আগে এ-পর্বের মতো বড়ো হয়ে ওঠে নি, সমস্যাব ওপর অত্যধিক গুরুত্ব পড়ায় প্রায়ই আমাদের চিরাচরিত সমাজ ধর্ম, হিন্দুয়ানি, গোঁড়ামি বরাবর লেখকের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে 'বলাকা'র পূর্ববর্তী ও সমকালীন নাটক যথাক্রমে 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'র আলোচনা করা হয়েছে বলে স্বতন্ত্রভাবে প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের মতো নাটক বিষয়ে আলোচনা এখানে করা হয় নি।

॥ চার ॥

'বলাকা'-পর্বের যৌবনবন্দনা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটির 'কেকাধ্বনি' রচনায় কালিদাসকে বলেছিলেন— যৌবনাবেশবিধুর', 'নববর্ষা', রচনায় মেঘদূতের অলকাপুরীকে বলেছিলেন, 'চিরযৌবনের রাজ্য'। অলকাপুরীকে 'চিরযৌবনের রাজ্য' বলার সময় নিশ্চয়ই তাঁর মনে ছিল মেঘদূতের এই শ্লোকাংশ 'ন চ খলু বয়ো 'যৌবনাদন্যদস্তি' (উত্তরমেঘ-৪, অলকাপুরীতে যৌবন ছাড়া অন্য কোনও বয়স নেই)। 'বলাকা'র যৌবনবন্দনা প্রসঙ্গেও আমরা বলতে পারি, এখানে এমন এক ভুবনের সন্ধান পাই যেখানে 'ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি'। কালিদাসকে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন যৌবনাবেশবিধুর, আমরাও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে বলতে পারি যৌবনাবেগদীপ্ত কবি। যৌবনাবেগদীপ্ত বলার সময় 'বলাকা'য় 'শঙ্খ', কবিতা আমাদের মনে পড়ছে : 'যৌবনেরি পরশমনি/করাও তবে স্পর্শ/দীপক তানে উঠুক ধ্বনি/দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।' আবেশে ও বিধুরে কেমন যেন হতবুদ্ধি স্থবিরতা ও গতিহীনতার প্রতি ইঙ্গিত আছে। কালিদাসকে রবীন্দ্রনাথ যৌবনাবেশবিধুর বলার সময় তাঁর মনে ছিল 'ঋতু-সংহারে'র মতো তাঁর প্রথম জীবনের অপরিণত কাব্য। এ-কাব্যে ছয় ঋতুর তারে নরনারীর প্রেমের সুরের অনুরণন শুধু শুনি। কালিদাসের সমগ্র সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে হলে তাঁকেও যৌবনাবেগদীপ্ত কবিই বলতে হয়।

সে যা হোক, রবীন্দ্রনাথ যে-যৌবনের উদ্দেশ্যে বন্দনা জানান, সে-যৌবন চলিষ্ণু, মোটেই ভাবালুতায় কুয়াশাচ্ছন্ন নয়; ভাবুকতায় দীপ্ত, দীপক-তানে সে দীপ্ত-প্রাণের হর্ষ জাগিয়ে তোলে। দীপক হচ্ছে সেই তান যা আগুন জ্বালায়। আগুনের একটি প্রতিশব্দ পাবক, পাবক শব্দের ধাতুগত অর্থ যা পবিত্র করে, যার লেলিহানশিখার কলুষ ভস্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের বন্দিত যৌবন যে-ভাবুকতায় জ্বলে ওঠে, তা আমাদের কর্মে উদ্দীপ্ত করে, বন্ধন ছিন্ন করতে উৎসাহ জাগায়, অনমনীয়তায় ঋজুতায় দৃঢ়তায় চরিত্রকে বলিষ্ঠ করে, কর্মিষ্ঠ করে, জীবনঘনিষ্ঠ করে।

যৌবনের রঙ সবুজ। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' বাঙালির যৌবনকে আহ্বান জানিয়েছিল। সেই সবুজপত্রেই 'বলাকা'র প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান' প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সবুজপত্রে কোনও ছবি থাকতো না। শুধু প্রচ্ছদে সবুজ তালপাতার ছবি থাকতো। এতো সবুজ পাতা থাকতে তাল পাতা কেন? তালপাতা ঋজু দৃঢ়, অনমনীয়। সবুজপত্রের আহ্বান ছিল এই ঋজু যৌবনের উদ্দেশ্যে। তাই প্রচ্ছদে তালপাতার ছবি।

রবীন্দ্রনাথের বন্দিত যৌবন 'বিদ্রোহী নবীন বীর' বেশে দেখা দেয়, বারবার 'স্থবিরের বন্ধন-নাশন ঘটায়। বলাবাহুল্য এসব উদ্ধৃতিচূর্ণ 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতার। 'বলাকা'র পরে লেখা 'পূরবী'। আগেই একবার 'তপোভঙ্গ' কবিতার কথা উঠেছে। 'বলাকা'র যৌবন অচলায়তন নাটকের স্থবিরক বা দর্ভক হতে আমাদের শেখায় না, শোনপাংশুদের মতো হয়ে ওঠার প্রেরণা দেয়, শত সহস্র বন্ধনে বাঁধা এই সমাজ অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙার উৎসাহ জাগায়, আমাদের বলতে শেখায় : 'ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত

কর'। যে-কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতি, সেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবির যৌবনে বাইশ বছর বয়সে লেখা। এ কবিতার প্রথম পাঠে (বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড) নির্ঝর বলছে : 'যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব/কে জানে কাহার কাছে।' এই যৌবনের বেগ যৌবন পেরিয়ে এসে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে কবি আরও নিরাসক্ত ভাবে অনুভব করছেন 'বলাকা'য়। 'বলাকা'র সমকালীন নাটক 'ফাল্গুনী'র কবি বলেছিলেন, যে প্রৌঢ়দের যৌবনই 'নিরাসক্ত যৌবন'। এই নিরাসক্ত যৌবনের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন অনেককাল পরে 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের ৪৫ সংখ্যক কবিতায় সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর উদ্দেশ্যে : 'যৌবনকে না ছাড়ালে যৌবনকে যায় না পাওয়া।' বয়সের দিক থেকে যৌবন যখন তাঁর ছিল না, তখনই যৌবনের জয়গান তিনি মুক্ত কণ্ঠে গাইতে লাগলেন। অচলায়তন নাটকের স্থবিরকরা যা আছে তাকেই অন্ধ আবেগে আঁকড়ে থাকতে চায়। দর্ভকরা দর্ভাকুরের মতোই তৃণাদপি সুনীচেন ভক্তিতে বিনম্র হয়ে অপরের পদদলিত হয়ে বেঁচে থাকাকেই জীবনের চরিতার্থতা বলে জানে। শুধু পঞ্চকের নয়, শোণপাংশুদের সকলের কানে আর মর্মে বেজেছে এই গান : 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে/কেউ তা জানে না।' এই গানে সাড়া দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছে বাঁধা পথের শেষে তরুণের স্বপ্নে বিবাগী হয়ে অজানা আর অচেনার মধ্য দিয়ে পথ কাটতে কাটতে নতুনের সন্ধানে। এই নতুনের সন্ধানে যাত্রার আবেগে উদ্দীপ্ত যৌবনের বন্দনা শুনি 'বলাকা'র কবিতায়। জলপথেও 'পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা'র মোহ ছিন্ন করে, 'বন্দরের কাল হল শেষ' বলতে বলতে এই যৌবন নতুন সমুদ্রতীরে উদ্দেশ্যে যাত্রার উৎসাহে ফেটে পড়ে।

নিরাসক্ত যৌবনের কথা আমরা বলছিলাম। প্রেমের প্রেরণায় জীবনে নিরন্তর, যে-পথ চলার ভাবনা 'শাজাহান' আর 'ছবি' কবিতা দুটির মর্মস্থলে আছে, তাতেও নিরাসক্ত যৌবনের রূপ আভাসিত হয়েছে। যে-প্রেম মৃতা প্রিয়তমার মরণকে 'স্মরণের আবরণে' স্মৃতিস্তম্ভে যত্নে ঢেকে রেখে স্থবির হয়ে থাকতে চায়, সেই প্রেমকে ধিক্কার জানিয়ে, যে-প্রেম নিজে চলতে আর অপরকে চালাতে জানে, পথের আনন্দ বেগে পাক্ষেয় অবাধে ক্ষয় করতে জানে, সেই প্রেমের ধারণাই 'শাজাহান' কবিতায় মূর্ত হয়েছে। এই প্রেম একমাত্র নিরাসক্ত যৌবনেই লাভ করা সম্ভব। স্মৃতির সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে বিস্মৃতির উদার ক্ষেত্রে যে-প্রেম সত্তার শিকড়ে শিকড়ে জল সেচন করে, সেই প্রেমের ধারণা 'শাজাহান' কবিতার মতো 'ছবি'তেও রূপ পেয়েছে। প্রিয়াকে হারিয়ে বৃদ্ধের স্মৃতিতে স্থবির প্রেমের কান্নাভরা বর্ষা ছাপিয়ে উঠেছে বিস্মৃতিস্নিগ্ধ রৌদ্রে উজ্জ্বল শরতের এক স্নিগ্ধ নীলাভ আকাশ। 'ছবি' কবিতা প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে, 'লিপিকা'র 'প্রথম শোক' গদ্যকবিতার অন্তিম উচ্চারণ : 'যা ছিল শোক, তাই হয়েছে শান্তি'। এই শোক পেরিয়ে শান্তিলাভের যৌবন নিরাসক্ত যৌবন, নির্লিপ্ত যৌবন, বৃহৎ অনুরাগের বৈরাগ্যধর্মে উদ্দীপ্ত যৌবন। 'ছবি' বা 'শাজাহান' কবিতার সঙ্গে কবির উপলব্ধ নিরাসক্ত যৌবনের যোগ প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। তবুও 'বলাকা'র বন্দিত যৌবনের আলোচনায় এই পরোক্ষ যোগও উপেক্ষা করা যায় না। এই পরোক্ষ যোগের দিক্ থেকে ৪ সংখ্যক ('শঙ্খ') কবিতায়ও যৌবনের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। আর এজন্যই আমরা আগে 'যৌবনেরই পরশমণি করাও তবে স্পর্শ ইত্যাদি উদ্ধৃতি দিয়েছি।

যৌবনবন্দনার আলোচনা সূত্রে 'বলাকা'র কবিতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। প্রথমতঃ এই পরোক্ষ যোগের তিনটি কবিতা ৪ (শঙ্খ), ৬ (ছবি) এবং ৭ (শাজাহান) সংখ্যক কবিতা। দ্বিতীয়ত, বসন্ত যৌবনের ঋতু বলে যৌবনের জয়গানে-গানে ভরা 'বলাকা'য় বসন্ত-বর্ণনা বা বসন্ত-বন্দনার কবিতা। এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ১৩, ১৮, ২১, ২৫ ও ২৬ সংখ্যক কবিতা। আর তৃতীয়ত, সোজাসুজি যৌবনবন্দনার কবিতা মাত্র চারটি— ১, ৩, ৪৪, ও ৪৫ সংখ্যক কবিতা। এখানে লক্ষণীয় 'বলাকা'র আরম্ভে ও শেষে আলোচনায় যৌবনের সুর সাধা হয়েছে। এই কবিতা চারটির বিস্তৃত আলোচনায় আমরা সবশেষে আসছি। তার আগে বসন্তের কবিতাগুলির কথা বলে নিচ্ছি।

আগেই বলেছি, যৌবনের ঋতু বসন্ত। শীতের জরাজীর্ণতা ঘুচিয়ে বসন্তের পুষ্পিত আবির্ভাব, সঙ্গে থাকে তার সবুজ পল্লবসমারোহ। তাই যৌবন ভাবনার সঙ্গে 'বলাকা'য় জড়িয়ে যায় বসন্তের বনফুল, ফিরে ফিরে উচ্ছ্বসিত হয় বসন্তের দৃশ্যগন্ধগান! তাই সংশয়ে পক্ককেশ শীত পথ ছেড়ে দেয়। বসন্ত তখন এসে বলে ঃ 'আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা।' কবির কাছে মনে হয়, এ শুধু ঋতুপর্যায়ের সত্য নয়, সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্গূঢ় সত্য। আঠারো সংখ্যক কবিতায় এই সত্যের উদ্ভাস। একুশ সংখ্যক কবিতায় শুনতে পাই বসন্তের গাছে গাছে শাখায় শাখায় কোলাহলের শব্দ, দেখতে পাই 'গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।' ছুটে আসে বসন্তের 'পাগল চাঁপা' আর 'উন্মত্ত বকুল।' পঁচিশ সংখ্যক কবিতায় বসন্ত এসে কোলাহল করে; প্রাঙ্গণতলে দাঁড়িয়ে 'পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে' কলহাস্য তোলে। ছাব্বিশ সংখ্যক কবিতায় কবির 'জীবন-লতিকায়' 'ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত।' তেরো সংখ্যক কবিতায় 'বহুদিনকার/ভুলে যাওয়া যৌবন', 'উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে' কবির কাছে পত্র পাঠিয়েছে আর তাতে লিখেছে প্রকৃতির অনন্ত যৌবনের কথা। মানুষের জীবনে যৌবন আসে, আবার চিরদিনের মতো চলেও যায়। কিন্তু প্রকৃতির যৌবন ফিরে ফিরে আসে। তাই প্রতি শীত শেষে দেখি বসন্তের সুস্মিত মুখচ্ছবি। কয়েকদিনের মধ্যেই তার স্মিতহাস্য কলহাস্যে সশব্দ হয়ে ওঠে।

'বলাকা'র শীতজয়ী বসন্তের এই কবিতাগুলি সঙ্গে যুক্ত সমকালীন 'ফাল্গুনী' নাটক। কেন না ফাল্গুনীও তো অনন্ত যৌবনাপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনকে মেলানোর নাটক। প্রকৃতিতে 'পুরাতন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চির নবীনতা প্রকাশ করে' (আত্মপরিচয় তৃতীয় প্রবন্ধ), শীত 'পুরাতন', শীতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চির নবীন বসন্ত দেখা দেয়। তাহলে মৃত্যু মৃত্যু নয়। নবজীবনের আরম্ভ। তাই এ-নাটকে চন্দ্রহাস যে-মৃত্যুকে বুড়ো বলে ভেবেছিল, পরে তাকে বালকরূপে দেখতে পেল। মৃত্যুকে চন্দ্রহাস বিস্মিত কণ্ঠে বলেছে ঃ 'যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ তো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।' শীতের শেষে চির নবীন প্রাণের রূপ মৃত্যুর মধ্য থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে। এই প্রাণ কখনো পুরোনো হয় না, সে বারেবারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম। চন্দ্রহাসের উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছে ফাল্গুনীতে। প্রকৃতির ঐশ্বর্যের প্রকাশক্ষেত্র বসন্তে, মানবজীবনে প্রাণশক্তির প্রকাশ যৌবনে। তাই যৌবন আর বসন্ত কবির অনুভবে একাকার। 'বলাকা'র কবিতায়ও যৌবনপ্রসঙ্গ বসন্তের অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বারবার। 'ফাল্গুনী'তে বাউল বলেছে ঃ 'যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায়

তারই ঢেউ। যারা মরে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে।' 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'জরা সমাজ ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায় তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলেছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে।' প্রকৃতির মধ্যেও যেমন শীতের জরা বিদীর্ণ করে বসন্ত দেখা যায়, সমাজে রাষ্ট্রেও তেমনই অচলায়তন ভেঙে নবীনের আবির্ভাব ঘটে আচার-বিচারের ও বিধি-বিধানের বন্ধন তখন ছিঁড়ে যায়, দুয়ার ভেঙে জ্যোতির্ময় এসে দেখা যায় সেই তিমিরবিদারী উষার অভ্যুদয় মুহূর্তে। আর এই সবই যৌবনের কাজ। এইভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল 'বলাকা' পর্বের আগে লেখা 'অচলায়তন' এবং 'বলাকা' পর্বের 'ফাল্গুনী' এই দুটি নাটকে।

'বলাকা'র যে-সব কবিতায় তিনি যৌবনের স্তব রচনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখি, যৌবনের বসন্তরূপ কল্পিত হলেও বর্ষার ঝড়ঝঞ্ঝা, জলধারা মুহুর্মুহু বজ্রবিদ্যুৎ, দিক থেকে দিগন্তে ধাওয়া ঝড়ো বাতাসে প্রতিকূলতা জয় করতে করতে তরুণদলকে অগ্রসর হতে হবে এই ভাবনা ফিরে ফিরে আসছে। আর এই সূত্রেই বর্ষার চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে কবিতাগুলিতে।

যৌবনের ঋতু বসন্ত বলেই তরুণরা বসন্তের গলায় তখনকার ফোটা বকুলফুলের মালা গেঁথে পরিয়ে দেবে। কিন্তু এই মালা পরানোই যৌবনের একমাত্র কাজ হবে না। বিপদ-আপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যৌবন বিপদ্ জয়ের উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠবে। বিপদ্ আপদ্ মেঘ, উৎসাহ বিদ্যুৎ। জলভারনত মেঘে যেমন বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, তরুণ দলের উৎসাহও তেমনই বিপদ-আপদের সম্মুখে জ্বলে উঠবে। তাদের জন্য কালবৈশাখীর আশীর্বাদ আর শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ অপেক্ষা করবে, গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা তুলে থাকবে, পথের কণ্টক তাদের অভ্যর্থনা জানাবে। এইসব কিছু উপেক্ষা করে তারা পথ চলবে।

বজ্রনাদ, উদ্যতফণা, গুপ্তসর্প, কণ্টকিত পথ অনিবার্যভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয় রাধার বর্ষাভিসারের ছবি—অভিসারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রাধার ছবি। 'বলাকা'র কবি রাধার প্রেমের অভিসারের ছবি আঁকছেন না, বীতবিঘ্ন নির্ভীক যৌবনের পথ চলার কথা বলছেন, সে-পথে বাধা বিঘ্নের কাঁটা পায়ের ছোঁওয়ায় ফুল হয়ে ফুঠে ওঠে। নবযুগের এই ভাবোদ্দীপ্ত ছবিতে কবির অজান্তে বহু যুগের ওপার থেকে রাধার অভিসারের রঙ এসে লাগে। একে বলতে পারি জীবনের সৌন্দর্য সন্ধানে যৌবনের অভিসার। জীবনের সৌন্দর্য মৃত্যুর ঘোমটার আড়ালে মানিনী প্রিয়ার মতো লুকিয়ে আছে। যৌবন মৃত্যুর ঘোমটা তুলে তার প্রিয়াকে দেখবে বলে পণ করেছে, তাই তার এই অভিসার। এ ভাবে প্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেমিকের অভিসারের একটি চিত্রকল্প এসে যায় 'বলাকা'র চুয়াল্লিশ্ সংখ্যক কবিতায়। বৈষ্ণব পদাবলীতে ছিল প্রিয়া রাধার অভিসার আর এখানে প্রেমিক যুবকের অভিসার। এ অভিসারে যেতে হয় 'মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে' শিকারির মতো, বৈষ্ণব কবিও তো অভিসারিকা রাধাকে দেখেছিলেন ছুটন্ত বাণের মতো উদ্দিষ্ট প্রেমিকের দিকে দ্রুতগতিতে পথ চলতে 'ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার'।

যৌবন ঝড়ের থেকে বজ্র কেড়ে নেয়। কেননা কবি বন্দিত যৌবন বজ্রে ভীত নয়, নিজেই বজ্রের চেয়ে কঠোর অন্যায়ের ওপর অবিচারের ওপর বজ্রের অস্ত্র নিক্ষেপ তার কাজ। ঈশান কোণে ঝড়ের বিষাণ বেজে উঠলেই তরুণের দল আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কেননা বিপদ তাঁদের ডাকে। সে ডাক তাদের রক্তে ঢেউ তোলে। আরাম চাওয়ায় তাদের লজ্জা, সকল অঙ্গ ছেয়ে রণসজ্জা পরায় তাদের উৎসাহ। মেঘে অস্তসূর্যের রক্তঝিলিক দেখে উৎসাহে তাদের রক্ত ছলকে ওঠে। এমনকি প্রলয় কালের মতো মেঘে মেঘে ভয়াল ভীষণ রূপ দেখেও তাদের মৃত্যুভয় জাগে না, বরং তারা উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়।

তখন তারা গৃহকোণের নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম দৈনন্দিনতার নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে পড়ে। আর এই সূত্রেই 'বলাকা'র বেশ কিছু কবিতায় ঘরের মঙ্গল শঙ্খ, সন্ধ্যার দীপালোক, পূজার ঘর, সে ঘরে সন্ধ্যার আরতি, আরাধ্য ঈশ্বরের ক্রোড়, নিদ্রার পালঙ্ক, শান্তিশুভ্র রজনীগন্ধা, নিরাপদ নোঙরের আশ্রয়, আরামের শয্যাতল, মায়ের কান্না, প্রেয়সীর অশ্রুচোখ বা বেদনায় বোজা চোখ এ সবের প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে আপদে-বিপদে বেদনায় দুঃখে অমঙ্গলে পরিপূর্ণ জীবনের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে। এজন্যই বারবার ঘরের নিন্দা শুনি আর পথের স্তুতি শুনি। ঘরে বন্ধন, পথে মুক্তি, 'বলাকা'র সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতা 'ঝড়ের খেয়া'য় শুধু এই পথ জলপথ, আর সব কবিতায় স্থলপথ। 'ঝড়ের খেয়া' সোজাসুজি যৌবন বন্দনার কবিতা নয়। তবু নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে ঝড় মাথায় কাণ্ডারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দাঁড়ীরা যে-ভাবে ঘর ছেড়ে বন্দরের বন্ধন ছিন্ন করে তরী নিয়ে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য বেরিয়ে এসেছে, তাতে যৌবনের একটি রূপ নিশ্চয়ই ফুটেছে।

স্থলপথে তরুণদের যাত্রার বর্ণনায় সেই পথ হয়ে উঠেছে অনেক সময় গ্রীষ্মের খররৌদ্রদীপ্ত, ধূলিধূসর, মাঝে মাঝেই পথে ধূলির ঘূর্ণি ওঠে। তবুও কবি বলেন সেই রুদ্ররৌদ্রেই রুদ্রের প্রসাদ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের ই পথ চলার জন্য যে-নিন্দা হবে, যে-কুৎসিত কানাকানি চলবে। যে-সন্দেহ দেখা দেবে, যে-ভৎর্সনা উচ্চারিত হবে— এই সবই রুদ্রদেবের প্রসাদ। রুদ্র ভাঙনের দেবতা, ধ্বংসের দেবতা। কার ভাঙন? কার ধ্বংস? যা পুরোনো জীর্ণ, তাকে না ভাঙলে নতুন আসতে পারে না। তরুণরা নতুনের সন্ধানে চলেছে, পরে তাদের যে-ক্ষয়ক্ষতি হবে, তাতেই পাবে অমূল্য উপহার, কিন্তু সে-উপহার অদৃশ্য, শুধুই অনুভব-গম্য। ক্ষতির ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত হয়ে তারা মনের দিক থেকে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠবে। এই মানসবৈভবই তাদের কাছে অমূল্য অদৃশ্য উপহার। এদের সুখ নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, আরাম নেই। আছে শুধু মৃত্যুর হানা, দ্বারে দ্বারে মানা। মৃত্যু ভয় দেখাবে, ঘরে ঘরে সকলে তাদের কথ চলতে নিষেধ করবে। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের শুভারম্ভে যে-কবিতা তিনি লিখেছিলেন, যা কি না 'বলাকা'র শেষ কবিতা। সেখানে শুরুতেই আছে, যৌবনের পথে পথে ধ্বনিত হচ্ছে তপ্ত রৌদ্রের আহ্বান, সে-পথে বাজছে রুদ্রের ভৈরব গান। গ্রীষ্মের মধ্যে আছে এক রুদ্র মূর্তি, তার রৌদ্রের তপস্যার ক্লেশ। গ্রীষ্মের ধূলিধূসর পথ যেন বেজে চলছে। 'শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে', সে-পথ 'যেন পথ হারা/কোন্ বৈরাগীর একতারা।' এ এক আশ্চর্য চিত্রকল্প! পথ দেখি চোখে। কবি বলেছেন, সেই চোখে দেখার পথ যেন পথ হারানো এক বৈরাগীর একতারায় ঝঙ্কৃত তীব্র দীর্ঘ তান। এভাবে

দৃশ্য পথের সঙ্গে উৎপ্রেক্ষায় তিনি যুক্ত করে দিলেন শ্রব্য তানকে। দৃষ্টি শ্রুতি এভাবে মিশে গেল, যৌবনের মধ্যে তিনি বৈরাগ্য অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগের রূপ দেখেন। 'শাজাহান কবিতায়' সম্রাট বৃহৎ অনুরাগে সাড়া দিয়ে ক্ষুদ্র অনুরাগের বন্ধন ছিন্ন করেছেন। এ কবিতায় পথকে যখন কবি বলেন পথ হারা বৈরাগীর একতারা, আর সে-পথে বাজছে তারে ঝঙ্কৃত এক ধাতব তীব্র তান, তখন যৌবন বাউলে একটি ভাব আমাদের মনে জেগে ওঠে। এই বৈরাগী একটি বাউল কোনও বিশেষ পথের পথিক নয়, তাই সে পথহারা এবং পথে পথে একতারা বাজানোই তার কাজ। সে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ, তাই নির্লিপ্ত নিরাসক্ত। এই নিরাসক্ত যৌবনের যাত্রার পথকে কবি এখানে উৎপ্রেক্ষায় যুক্ত করে দিলেন বৈরাগীর একতারার তানের সঙ্গে। অবশেষে বলা যায়। দৃষ্টিতে শ্রুতিতে মেশানো এই চিত্রকল্পে 'বলাকা'-পর্বের নিরাসক্ত যৌবনের রূপ আভাসতি হয়েছে। এমন ভাবনায় প্রেরণায়ই কবির বৈরাগ্যে দীক্ষিত যৌবনের ভাবের টানেই এ চিত্রকল্পের জন্ম।

যৌবন সুখের খাঁচায় বন্দী থাকার জন্য নয়। যৌবন-ডানা-মেলে দেওয়া পাখি, উড়ে বেড়ায় আকাশে রোদে জলে হাওয়ায়। অন্যদিকে প্রবীরে দল খাঁচায় বন্দী পাখির মতো দিন কাটায়। তাদের প্রতি পদে পদে নিষেধ, অন্তরে কোনও তাগিদ নেই, এই ঘর তাদের বেঁধে রাখে, প্রাচীরঘেরা তাদের জীবন, পথ তাদের ডাকে না, নতুনের মাঝখান দিয়ে অচেনার বুক চিরে, অজ্ঞাত সন্ধানের কোনও ইচ্ছা তাদের জাগে না। বাঁধা পথেই তাদের চলাফেরা অর্থাৎ পুরোনোর ক্লান্তিকর অন্ধ পুনরাবৃত্তিতেই তাদের সমস্ত উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়ে, তাদের জীবনে পাঁজি পুঁথিপুরুতের বিধিবিধান মেনে চলার অভ্যাস, হাঁচি টিক্‌টিকি মশা অশ্লেষা অমাবস্যা ত্র্যহস্পর্শের নিষেধ প্রতি পদে পদে, শুধুই পুঁথি-পোড়োর কাছে বিধি-বিধান জেনে সেই মত জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—সব মিলিয়ে প্রবীণের দলকে মনে হয় খাঁচায় বন্দী, তবে তারা সত্যিকারের পাখিও নয়। সত্যিকারের পাখি খাঁচায় থাকলে একটু নড়ত, চরত, বুকের ওঠা নামায় একটু স্পন্দন টের পাওয়া যেতো। প্রথম কবির মনে হয়েছিল, এই বন্দী পাখির মতো প্রবীণের দল পাছে বাইরের দৃশ্য ও শব্দ তাদের প্রাণে সাড়া জাগায় এই ভয়ে নিজেদের চোখ কান দুই-ই ডানায় ঢেকে রেখেছে। সত্যিকারের প্রাণের লক্ষণ কিছু-না-কিছু টের পাওয়া যেতো। তাই শেষ পর্যন্ত কবি বললেন, এরা সত্যিকারের পাখি নয়, পটে আঁকা পাখির ছবি। তাস এমন নিশ্চল নিস্পন্দ। অন্যদিকে পুচ্ছ নাচিয়ে পাখিরা যেমন প্রভাতকে বন্দনা জানায় তাদের কলকাকলিতে, তেমনই তরুণের দলকে প্রাণের আবেগে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে। রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরের বন্দনা করতে হবে এদের। বাধানিষেধ, সংস্কার ও আচার-বিচারের শিকলদেবীর পূজার বেদি এতোকাল এই সমাজে খাড়া আছে। সে বেদি তরুণদের ভাঙতে হবে। তাদের মনকে মুক্তি দিতে হবে কর্তার ইচ্ছায় কর্মের দাসত্ব থেকে, 'খুঁটীশ্বরী'র পূজা থেকে স্বাধীন ইচ্ছার স্বচ্ছন্দ ক্ষেত্রে। প্রবীণের দল পাছে চলতে ফিরতে কাজ করতে ভুল করে বসে এই ভয়ে হাত পা গুটিয়ে অচল হয়ে আছে। বহির্বিশ্বের পরিবর্তনের দিকে এরা ফিরেও তাকায় না। তরুণদের কাছে কবির প্রার্থনা, তারা ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বাছা বাছা ভুলগুলি করুক। ভুল করতে করতে তারা একদিন সত্যের সন্ধান পাবে। প্রবীণদের সত্যলাভের কোনও কথাই ওঠে না। ভুলভ্রান্তির পথ পেরিয়ে সত্য লাভ করতে হয়। প্রবীনরা তা বোঝো না।

তরুণরা তা বুঝতে পারুক। বিবাগী হয়ে তারা বেরিয়ে আসুক। এই বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ার কল্পনার সঙ্গে শেষ কবিতার বৈরাগীর একতারায় ঝঙ্কৃত তীব্র দীর্ঘ একতানের চিত্রকল্পের যোগ। বাঁধা পথের বাইরে বাধানিষেধের গণ্ডি ছাড়িয়ে তারা সত্য পথের সন্ধান পাক। তরুণদের কাছে কবির প্রত্যাশায় যৌবনে তাঁর গভীর আস্থার পরিচয় পাই। অনমনীয় ঋজু চরিত্রে তরুণরা উন্নত শিরে পথ চলুক। 'সবুজের অভিযান' কবিতায় প্রবীণদের বিরুদ্ধে অভিযান যে-ভাবে বর্ণিত হয়েছে; তাতে যৌবনের প্রতি কবির শ্রদ্ধার পরিচয় ফুটেছে। মুক্ত ও বদ্ধ পাখির চিত্রকল্পে তিনি নবীন ও প্রবীণের স্বরূপ স্পষ্ট করে তুলেছেন। আমরা কবিতা পাঠে দেখিয়াছি এই চিত্রকল্প দুটি 'একটা আষাঢ়ে গল্প' থেকে কালান্তরের বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ এমনকি 'তাসের দেশ' পর্যন্ত দীর্ঘকাল রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রায়ই পুনরাবৃত্ত। 'বলাকা'র চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায়ও এই একই চিত্রকল্প 'যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে?/তুই যে পারিস্ কাঁটা গাছের উচ্চ ডালের 'পরে/পুচ্ছ নাচাতে'।

'বলাকা'র কবিতাগুলি লেখার আগে ১৯১২-তে কবি তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সময় য়ুরোপে তরুণদলকে দেখে এসেছেন। তাদের মধ্যে তিনি জীবনের এক তীব্র আবেগ অনুভব করেছেন। অন্যদিকে আমাদের বদ্ধ জীবনে সমাজের অচলায়তনে কোথাও কোনও গতি নেই। আমরা তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা বলে ভাবের ঘরে চুরি করি। এই আত্ম-প্রতারণা থেকে তরুণরা জাতির মনকে বুদ্ধির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিক্—এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। এই ইচ্ছাপত্রই রচিত হয়েছে 'বলাকা' পর্বে কবিতায় গানে নাটকে উপন্যাসে ছোট গল্পে। আর এজন্যই 'বলাকা'য় বারবার কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে ঋজু, বলিষ্ঠ, ভাবুকতায় উদ্দীপ্ত, শীতের জরাভেদী বাসন্তিক উল্লাসময় জীবনঘনিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ, ভাবালুতাবর্জিত যৌবন বন্দনা। এই যৌবনের কথাই 'বলাকা'র—

"মানে না সে বুদ্ধিসুদ্ধি বৃদ্ধজনার যুক্তি
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শক্তি।"

॥ পাঁচ ॥

‘বলাকা’য় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে দু’ফোঁটা বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে আশায় আশঙ্কায় দিন কাটিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) তিনি পুরোটা দেখেছেন, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)-র কিছুটা দেখার যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। কিছুটা কেননা যুদ্ধ শুরুর দু’বছর পরে ১৯৪১-এ তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছাপ ‘বলাকা’র কোনো কোনো কবিতায় পড়েছে। এই ছাপ পড়াকেই আমরা বলতে পারি ‘বলাকা’য় বা আরো বৃহত্তর অর্থে ‘বলাকা’ পর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত। ঠিক এরকম ভাষারই বলে থাকি তাঁর একেবারে শেষদিককার ‘সেঁজুতি’, ‘নবজাতক’, ‘প্রান্তিক’, ‘রোগশয্যায়’ বা ‘জন্মদিনের’ কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতের কথা। ‘বলাকা’ পর্বের অন্যান্য সমকালীন রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে ‘বলাকা’র মিল বা অমিল বিষয়ে আলোচনার সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তার মূল্য নিরূপণ কিছুটা করতে হয়েছে। তবুও আরেকবার ‘বলাকা’র বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কবিতা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক।

কিন্তু তার আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাসের নীরস তথ্য কিছু আমাদের জানা দরকার। একদিকে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও অন্যদিকে সার্বিয়া—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বই এই যুদ্ধের প্রথম কারণ। অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের অধিকারী যুবরাজ আর্যডিউক ফ্রান্সিস ও তাঁর স্ত্রী বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজিভো ভ্রমণে গেলেন। প্রথমবারের ব্যর্থ চেষ্টার পর দ্বিতীয় উদ্‌যোগে সন্ত্রাসবাদীরা এই যুবরাজকে ১৯১৪-র ২৮ জুন হত্যা করে। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে এই দেশের কাছে অনেকগুলি দাবি করে এবং সার্বিয়া সেসব দাবি পূরণ না করায় অস্ট্রিয়া এবং সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৯১৪-র ২৮-এ জুলাই। রাশিয়া সার্বিয়াকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হলে অস্ট্রিয়ার মিত্র জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ও পরে রাশিয়ার মিত্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে তুরস্ক ও বুলগেরিয়া জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। জাপান, ইতালি, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আঠারোটি রাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে ছিল এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধ হয়ে ওঠে এক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ।

এই যুদ্ধে বেলজিয়াম কোনও পক্ষেই ছিল না। অর্থাৎ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল। বেলজিয়াম দেশটি জার্মানি ও ফ্রান্সের মাঝখানে অবস্থিত। জার্মানি যখন ফ্রান্সে সৈন্যবাহিনী পাঠায়, তখন এই বাহিনীর দৌরাত্ম্যে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা অস্বীকৃত হয়। বেলজিয়াম দৃপ্ত প্রতিরোধে প্রথম উন্নত শির হয়ে দাঁড়ায়ে। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই পর্যন্তই আপাতত ‘বলাকা’র আলোচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস স্মরণ যথেষ্ট। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল।

কিন্তু তখনও যুদ্ধ শুরুই হয় নি। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪ বা ১৩২১ বঙ্গাবাব্দের গ্রীষ্মে রামগড় পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন, সঙ্গী ছিলেন এণ্ড্রুজ। কবি তখনকার কথায় লিখছেন,

'আমার জীবন পূর্ণ', কিন্তু এক অস্বস্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিসের আশঙ্কা তাঁর মনে জাগছে, মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে। আবার মনে করি, তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে নি। সেই অবস্থায় 'বলাকা' ২ ও ৪ সংখ্যক কবিতায় অর্থাৎ 'সর্বনেশে' ও 'শঙ্খ'তে কবির আশঙ্কিত সেই বিপর্যয়ের একটা রূপ ধরা পড়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন,—কবি যেন তারহীন টেলিগ্রাফে আগেভাগেই যুদ্ধের খবর পেয়েছিলেন, এ যেন টেলিপ্যাথি। আশ্চর্য ঘটনা! এভাবেই ভূকম্পন নির্ণয় যন্ত্রের (SEISMOGRAPH) চেয়েও বেশি সংবেদনশীল রবীন্দ্রচিত্তে অনাগত ও আগত সমস্ত সংকট ও সামূহিক বিপর্যয় তাঁর জীবনে বারবার ধরা পড়েছে।

অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে যারা হত্যা করেছিল, তাদের মধ্যে একজন পাগল ছিল। সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে যুক্তদের মধ্যে পাগল তো থাকেই। 'বলাকা'র দ্বিতীয় কবিতায় ('সর্বনেশে') একটি পঙ্‌ক্তি আছে ঃ 'কোন্ পাগল ওই বারে বারে/উঠছে অট্টহেসে গো'। ঠিক মনে করতে পারছি না কার লেখায় যেন পড়েছি এই পঙ্‌ক্তির পাগল শব্দে ঐ যুবরাজহন্তা উন্মাদের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে। কিন্তু তথ্য হিসাবে তা ঠিক নয়। কেননা ঐ হত্যাকাণ্ডের তারিখ ২৮-এ জুন, বাংলায় আষাঢ় মাসের প্রথম পক্ষের শেষ দিকে। আর এই কবিতা লেখা হয়েছে, একমাসেরও বেশি আগে ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। বরং এই পাগলের অট্টহাস্যের মধ্যে প্রলয়ের দেবতা মহেশ্বরের ধারণা সংবৃত হয়ে আছে। প্রথম কবিতায়ও ভোলানাথের অট্টহাস্যে 'আকাশখানা ফেড়ে' যাওয়ার কল্পনা ছিল। তারই জের চলছে দ্বিতীয় কবিতায়। শিবের ভাঙন শেষে এবং মরণ বিহার অন্তে নবযুগের অভ্যুদয় কবির অকম্পিত বিশ্বাস। 'বলাকা'র প্রথম দুটি কবিতা লেখার সময়ের ব্যবধান দশ/এগারো দিন হলেও, কবিতা দুটির ভাববস্তু ভিন্ন হলেও চিত্রকল্পের বুনট, দুটি কবিতারই একরকম হয়ে উঠেছে।

'বলাকা'র চতুর্থ কবিতা অর্থাৎ শঙ্খ সম্পর্কে আমরা এই পরিচ্ছেদের শেষে ও কবিতা পাঠ বিভাগে বিস্তৃত আলোচনা করবো। তাই আপাতত আমরা চলে যাচ্ছি পঞ্চম ('পাড়ি') কবিতার আলোচনায়। এই কবিতার 'অগৌরবা' ('অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী') বেলজিয়াম। এই দেশের কথা আমরা আগে বলেছি যে যুদ্ধে যোগ না দিয়েও বেলজিয়ামকে পদদলিত হতে হলো ফ্রান্স আক্রমণোদ্যত জর্মন সৈন্যবাহিনীর নির্মমতায়। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনায় খুবই আলোনিথ হয়েছেন। তখনকার একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'বেলজিয়ামের কীর্তি মনে খুব লেগেছে—সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেছিলুম—হয়তো দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে।' (চিঠিপত্র ॥ ৫ম খণ্ড॥) ৩১ নং চিঠি ॥ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। বাংলা তারিখ হবে ভাদ্র মাসের আঠারো-উনিশ-কুড়ি-একুশের মধ্যে। 'পাড়ি' কবিতাটি লেখা হয় ৫ই ভাদ্র ১৩২১। দেখতে পাচ্ছি, এই চিঠি লেখার বেশ কয়দিন আগে তিনি এই কবিতা লিখেছেন। তাই বুঝতে পারি নি কেন তিনি চিঠিতে লিখছেন, 'হয়তো দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে।' বেরিয়ে যেতে পারে কেন? বেরিয়ে তো গেছেই। ইতিহাসে যে-সব ঘটনা ঘটে, সে-সব নানা কার্যকারণে ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তা মানেন ও বোঝেন। তাঁর গদ্যে ও কবিতায় ইতিহাসকে বারবার বলেছেন ইতিহাস বিধাতা, বিধাতা-পুরুষ অথবা শুধুই বিধাতা আর সে ইতিহাস বিধাতাকে তিনি নাবিক (বা 'নেয়ে') বেশে অনেকবার তরী বেয়ে আসতে দেখেছেন। 'পাড়ি' কবিতায়ও

মস্ত সাগর পাড়ি দিয়ে ঝড়ো রাত্রির দুরন্ত হাওয়ায় জমাট আঁধারে এক নেয়েকে তরী বেয়ে আসতে দেখি। এই নেয়ে রবীন্দ্র-কল্পনায় ইতিহাস-বিধাতা। বেলজিয়ামের মতো একটি অখ্যাত অজ্ঞাত দেশ তার দৃপ্ত প্রতিরোধে জার্মানবাহিনীর যেভাবে মুখোমুখি হয়েছে তাতে কবি উল্লসিত বোধ করছেন। ইতিহাস বিধাতা নেয়ের বেশে এসে উপস্থিত হয়েছে বেলজিয়ামের মতো দেশের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য এবং তিনি কল্পনা করছেন যে বেলজিয়াম দেশ হিসাবে ছোটো হয়েও প্রবলের ঔদ্ধত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে-মানব-মহিমার পরিচয় দিয়েছে, আত্মশক্তির যে-আলো জ্বালিয়েছে তাতে 'কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ।' এ-আলো মানুষের নিজের ওপর আস্থার আলো। এই কবিতা লেখার একদিন আগে ('গীতালি'র ৩ সংখ্যক কবিতা) বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যেই যেন তিনি বলছেন, 'নিচে বসে আছিস কেরে,/ কাঁদিস কেন।/লজ্জাভারে আপনাকে রে/বাঁধিস কেন/ধনী যে তুই দুঃখ ধনে/সেই কথাটি রাখিস্ মনে,/ধূলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে।/বিনা অস্ত্র বিনা অসহায়/লড়তে হবে।'

'পাড়ি' কবিতায় বা 'গীতালি' থেকে উদ্ধৃতিতে আক্রান্ত দেশ বেলজিয়ামের বলিষ্ঠ প্রতিরোধ যে-ভাষায় কবি কামনা করেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের অন্য এক পরিচয় পাই। সেখানে তিনি মানেন শুধু শান্তির ললিতবাণী আওড়ালেই শান্তি আসে না, অনেক সময়ই বিপুল বীর্যের মূল্যে শান্তি লাভ করতে হয়। আক্রান্ত দেশ যদি প্রতিরোধে বলিষ্ঠ হয়, তাহলেই শান্তি বীরভোগ্যা হতে পারে; আক্রমণকারীর দুয়ারে দুয়ারে কাকুতি-মিনতিতে তদ্‌বীরভোগ্যা কখনওই নয় এই শান্তি। এখানেই য়ুরোপের তথাকথিত মানবপ্রেমিক শান্তিবাদীদের (Pacifist) থেকে তাঁর পার্থক্য। কেন না শান্তিবাদীরা মানেন না যে যুদ্ধ থামানোর জন্যও মাঝে যুদ্ধ প্রয়োজন হয়। তাঁরা যাবতীয় যুদ্ধহীন এক অলীক কল্পনার জগতে বাস করেন। যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের লোভের বিষয়ময় ফল—এই সত্য রবীন্দ্রনাথ মানতেন, যেমন এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন ইংল্যাণ্ডে রাসেল ও বার্ণার্ড শ' বা ফ্রান্সে রোমাঁ রোঁলা। তাঁরা নিজ নিজ দেশের যুদ্ধোন্মদনায় সারা দিতে পারেন নি। তাই তাঁরা মাতৃভূমিতে একঘরে হয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথও সেদিন তাঁর স্বদেশে নিঃসঙ্গ ও ধিকৃত। কিন্তু সে-ইতিহাস দীর্ঘ এবং 'বলাকা'র আলোচনায় তার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এজন্য আপাতত সে-ইতিহাস ঘাঁটা এখানেই শেষ হোক।

'বলাকা' এগারো সংখ্যক ('বিচার') কবিতায় কবি তাঁর ঈশ্বরের যে-রূপ কল্পনা করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে যে-ভাষায় প্রার্থনা জানিয়েছেন, তার মর্ম হচ্ছে এরকম ঃ—

প্রেমিক ঈশ্বর মানুষের লোভ-লালসার ওপর চুরি-বাট-পাড়ির ওপর নির্মম হয়ে রুদ্ররূপে দেখা দেন এবং তখন তাঁর মার্জনা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশ নেয়। কবি তখন তাঁর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ—

"হে রুদ্র আমায়
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নি শিখায়।
সূর্যাস্তের প্রলয় লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।"

মার্জনা বলতে আমরা বুঝি ক্ষমা। মেজে ঘষে পরিস্কার ঝকঝকে করে তোলা। ক্ষমাতেও মালিন্যমুক্তি ঘটে। এ কেমনতর মার্জনা যাতে গর্জায় বজ্র, জলে ওঠে অগ্নিশিখা, সেই অগ্নিশিখা সূর্যাস্তের প্রলয়শিখার মতো দেখায়, রক্ত বৃষ্টিধারার মতো বর্ষিত হয়—এই সমস্ত কল্পনারই ইঙ্গিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে য়ুরোপের দেশে দেশে বিজেতার রণরক্ত সফলতায় নারকীয় উল্লাস ও বিজিত দেশের অপমান ও বেদনাভোগের প্রতি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় তাঁর ঈশ্বর ইতিহাসের এই আন্তর্জাতিক সংকটে দণ্ডধর ও খড়্গপাণি হয়েও মানুষকে জননীর মতো ভালোবাসেন বলেই লাঞ্ছিতকে বাঁচানোর সংকল্পে দেখা দিলেন ১৯১৪-র যুদ্ধের তাণ্ডবে। সমগ্র কবিতাটি কবির ঈশ্বরবোধের সঙ্গে মিশে আছে সেদিনকার রাজনীতিকে ঘিরে তাঁর গভীর মনস্কতা।

'বলাকা' ষোলো সংখ্যক ('রূপ') কবিতায় কবি বলছেন আজকের মানুষের ভাবনা ও কঠিন চেষ্টা যে-রূপ নিয়েছে আধুনিক জীবনে ও সে-জীবনের পাদপীঠ নগরীতে, সে-সব রূপ বিলীন হয়ে যাবে ভবিষ্যতে, যেমন অতীত বর্তমানের মধ্যে তলিয়ে গেছে। আজকের জীবনভাবনা বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও ভবিষ্যতের 'সেই রাজপুরে, কোন এক 'হর্ম্যচূড়ে', এক সৌধশিখরে এ এক অন্য রূপ নেবে'—যদিও সে রূপের কোনো চিহ্ন আজকের দেশে কালে কোথাও কিছু নেই। কী রূপ নেবে তারই সংকেত শুনতে পাচ্ছেন সেদিনকার বিশ্বযুদ্ধে কবি ঃ—

> "কামানের ধূমে
> কোন্ ভারী ভীষণ সংগ্রাম
> রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম।"

এভাবে কবি বারবার সেই বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে বিশ্বাস মনুয্যসৃষ্ট বিশ্বযুদ্ধের সংকটে কবিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বলাবাহুল্য, সে-বিশ্বাস তাঁর ভবিষ্যৎকালে। বিশ্বযুদ্ধোত্তীর্ণ পৃথিবীতে সেই ভবিষ্যৎকাল দেখা দেবে। সে-ভবিষ্যৎ নবজীবনের আশ্বাসে নিঃশ্বেষিত হবে।

'বলাকা'র এসব কবিতা লেখার প্রায় বছর তিনেক পরে ১৯১৭-তে আত্মপরিচয় গ্রন্থভূক্ত 'আমার ধর্ম' (৩ সংখ্যক) প্রবন্ধে তিনি তার এই যৌবন বিশ্বাসে দীপ্ত হয়ে লিখেছিলেন ঃ—

'আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন তার জন্যে আয়োজন অনেকদিন থেকে চলছিল।'

তারপর আবার নিজের নাটক 'রাজা'র রাণীর সুদর্শদার সুবর্ণর বাহ্য রূপের চাকচিক্যকে আসল রূপ বলে ভাবনার ভুল করার প্রসঙ্গ টেনে তিনি এই প্রবন্ধেই লিখলেন ঃ—

'য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল—তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বলল। তাই তো যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে পথের ধূলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে।'

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধের এই উদ্ধৃতিতে শুধু নয়, ১৯১৪-র বিভিন্ন দিনে প্রদত্ত শান্তিনিকেতন ভাষণমালার অন্তর্গত 'বলাকা'র সমকালীন ভাষণ—'মা মা হিংসীঃ', 'পাপের মার্জনা', 'সৃষ্টির ক্রিয়া' ও 'আরো'তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ঘিরে রবীন্দ্রচিত্তের প্রতিক্রিয়া বেদনায় সজল ও

ক্ষোভে আগ্নেয় ভাষায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু সমস্ত বেদনার জলে সিঞ্চিত এবং বিশ্বাসের পাবকদূত ও দীপ্ত ভাষার মর্মার্থ একটিই এবং তা হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধ শেষে অন্ধ জাতিপ্রেম পররাজ্য গ্রাসের দুর্মর লোভ থেকে মুক্তি পেয়ে আর অন্ধ থাকবে না, অন্ধকারে আলো জ্বলবে, সে-আলো নবযুগের আলো। আলোকিত সৈকতের দিকে ঝড়ো রাত্রির অন্ধকারে কাণ্ডারীর নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ দাঁড়ীর তরী যাত্রার কল্পনায় তো 'বলাকা'র সাঁইত্রিশ সংখ্যক (ঝড়ের খেয়া) কবিতারও ভাবতন্তু বোনা হয়েছে। কবিতা পাঠ বিভাগে এই কবিতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই কবিতা প্রসঙ্গে 'পাপের মার্জনা' ভাষণটির অনেক কথাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবুও এখানে আবার আমরা 'ঝড়ের খেয়া'র—

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়।
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার কথা আজি বিদারিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।"

—এই পংক্তিগুলি মনে রেখে, বিশেষভাবে অন্ধ জাতীয়তাবোধ অর্থে 'জাতি-অভিমান' মনে রেখে, 'সৃষ্টির ক্রিয়া' থেকে প্রথম একটি অংশ ও পরে 'আরো থেকে অন্য' একটি অংশ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এই উদ্ধৃতি দুটির মূল কথা 'ঝড়ের খেয়া'রই পরিপূরক ঃ—(ক) মানুষের 'জাতীয়তা' ইংরাজিতে যাকে Nationality বলে, ক্রমশ উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎ রূপকে ব্যক্ত করবে ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎ মঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত কববে। কিন্তু সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ, কত আঘাত, কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে। মানুষের তপস্যা একদিকে, অন্যদিকে তপস্যা ভঙ্গ করবার আয়োজন—এ দুই-ই পাশাপাশি রয়েছে।

তপস্যা আর তপস্যা ভঙ্গ করার শয়তানিকে এক বন্ধু জুটির চরিত্রে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ১৯১৬-তে কি তিনি নিজেই দেখান নি? জাতীয়তার তপস্যা নিখিলেশের জীবনে মূর্ত হয়েছে, আর তপস্যা ভঙ্গের উন্মাদনায় বিকৃত হয়ে আছে তারই বন্ধু সন্দীপ; শুধু নিজেই বিকৃত হয় নি, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় গোটা সমাজকে বিকৃত করেছে।

না, আর আমাদের কথা নয়। 'আরো' ভাষণ থেকে সেই দীর্ঘ উদ্ধৃতি তোলা যাক ঃ

ইতিহাসের ডাক পড়েছে—সে ডাক জার্মান শুনেছে, ইংরাজ শুনেছে, ফরাসি শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা গ্রহণ করবেন; এ যুদ্ধের মধ্যে তার সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে—তা হবে না ইতিহাস বিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এতদিন ধরে নরবলির উদ্‌যোগ করেছে আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে ইতিহাস বিধাতা বলেছেন, 'এ জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ করে ধূলোয় লুটিয়ে দিতে হবে এ নরবলি আর চলবে না।' যেমনি এই হুকুম পৌঁছেছে অমনি কামানের গোলা দুই

পক্ষ থেকে সেই প্রাচীরের উপর এসে পড়েছে। বীরের দল ইতিহাস বিধাতার পূজায় তাদের রক্তপদ্মের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে ('ঝড়ের খেয়া'য় সেই রক্তপদ্মের অর্ঘ্য হাতে পূজারিদের তিনি দেখেছেন, তারা কাণ্ডারীর হুকুম মেনে নিয়ে অপদেবতার মন্দির ভাঙবার সংকল্পে দৃঢ়চিত্ত—বর্তমান লেখক। যারা আরামে ছিল তারা আরামকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছে, 'প্রাণকে আঁকড়ে থাকব না, প্রাণের চেয়ে মানুষের মধ্যে আরো আরো বেশি আছে।' কামানের গর্জনে মনুষ্যত্বের জয় সংগীত বেজে উঠেছে। মা কেঁদে উঠেছে, স্ত্রী পুত্র অনাথ হয়ে বক্ষে করাঘাত করছে। সেই কান্নার উপরে দাঁড়িয়ে সেখানে উৎসব হচ্ছে। বাণিজ্য ব্যবসায় চলছিল, ঘরে টাকা বোঝাই হচ্ছিল, রাজ্য সাম্রাজ্য জুড়ে প্রতাপ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল—ডাক পড়ল বেরিয়ে আসতে হবে। মহেশ্বর যখন তাঁর পিনাকে রুদ্র নিঃশ্বাস ভরেছেন তখন মাকে কেঁদে বলতে হয়েছে, 'যাও'। স্ত্রীকে কেঁদে নিজের হাতে স্বামীকে বর্ম পরিয়ে দিতে হয়েছে। সমুদ্রপারে আজ মরণযজ্ঞেও সেই 'প্রাণের মহোৎসব'।

'ঝড়ের খেয়া' কবিতা লেখার তারিখ ২৩ কার্তিক, ১৩২২, 'আরো' ভাষণের তারিখ ৪ পৌষ, ১৩২১। আট মাস পরে কবিতাটি লেখা। প্রতি পরিবার থেকে প্রতি স্বামীকে প্রতি পুত্রকে সবল কর্মক্ষম দেহের হলেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যেতে হয়েছিল। এভাবে য়ুরোপের দেশে দেশে মা বিদায় দিয়েছেন আদরের ছেলেকে, স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে। এই ভাষণের সঙ্গে কবিতার ভাষা যে মিলে যায় তাতে অমনোযোগী পাঠকের মনে পড়বে 'ঝড়ের খেয়া'-র এই পঙ্‌ক্তি দুটি ঃ

> "বাহিরিয়া এল কারা, মা কাঁদিছে পিছে,
> প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।"

আমরা কবিতাপাঠ পরিচ্ছেদে বলেছি। এই যুদ্ধ যাত্রার ছবিতে বাঘাযতীনের মতো অদম্য মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মাহুতি থেকে আভা এসে পড়ছে। 'আরো' ভাষণটির সঙ্গে মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের উদ্দিষ্ট য়ুরোপের বীর যোদ্ধারাও, শুধু এদেশের বিপ্লবীরা নন। যারা সাম্রাজ্যবাদের কামানে বারুদ হিসেবে জ্বলে পুড়ে মরেছে, যাদের মধ্যে ছিলেন তরুণ ইংরেজ কবি আওয়েন (এঁর মৃত্যুর পর যে-খাতা রণাঙ্গন থেকে তাঁর মার কাছে ফেরৎ এসেছিল তাতে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ১৪২ সংখ্যাক কবিতার ইংরেজি অনুবাদ যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই/যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই') তাদের আত্মদানে এক নবযুগ অনিবার্য হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী কবির শেষ আশা ছিল। এই যুদ্ধাবসানের পর আরও তেইশ বছর বেঁচে থেকে সেই আশা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তা দেখার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তবুও তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়াগ্রস্ত দিনগুলিতেও বলতে পেরেছিলেন 'বলাকা' পর্বের অন্তত পঁচিশ বছর পরে ঃ—

> "এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
> বীভৎস তাণ্ডবে
> এ পাপযুগের অন্ত হবে,
> মানব তপস্বী বেশে
> চিতা ভস্মশয্যাতলে এসে
> নবসৃষ্টি ধ্যানেয় আসনে।
> স্থান লবে নিরাসক্তমনে—

আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।"

—জন্মদিনে, ২১ সংখ্যক কবিতা।

মানব তপস্বীবেশে লক্ষ মানুষের চিতাভস্মের ওপর আসন পেতে নবসৃষ্টির তপস্যায় বিভোর। সে-সৃষ্টির আহ্বান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কামান গর্জনে তিনি শুনেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও বজ্রাগ্নিশিখায় রুদ্রের মার্জনা তিনি দেখেছিলেন। সভ্যতার সংকটে, ইতিহাসের বিপর্যয়ে, মানবজীবনের অবেলায় আর কালবেলায় আশা ছাড়া আর কীই বা পোষণ করার আছে কবিদের। এমন কি সেই কবি রবীন্দ্রনাথেরও যিনি 'জন্মদিনে'র একুশ সংখ্যক কবিতা লেখার মাস ছয় পর লিখবেন 'আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ উদাসীন ভীষণ স্বব্ধতা' (রোগশয্যায়, ৭ নং) অথবা 'আপনারি মূঢ়তায়, আপনারি রিপুর প্রশ্রয়ে/এ দুঃখের মূল জানি; সে জানায় আশ্বাস না পাই ('রোগশয্যায়' ২৯ নং)। লোভ ও মিথ্যার বেসতিতে মানুষের যুদ্ধোন্মদনায় বেদনাহত চিত্তেও এই একই কবিতার ভাষায় (রোগশয্যায় ২৯) 'মানবচিত্তের সাধনায়/গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ, সেই সত্যের রূপে স্থির আস্তা থেকে তিনি কখনওই বিচ্যুত হয় নি। সে-আস্থা থেকেই তিনি 'ঝড়ের খেয়া'য় লিখেছিলেন ঃ—

"মানুষ চূর্ণিলি যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

যুদ্ধে তিনি ভয়ে বিহ্বল হন নি। কেননা তিনি জানেন, মানুষ কখনো কখনো যুদ্ধ বাধালেও সে চিরদিন যুদ্ধ করতে পারে না। যুদ্ধ কোনো ক্ষেত্রে অপরিহার্য জেনেই যখন 'বাতাস আলো গেল মরে' অর্থাৎ যখন সংস্কৃতি ন্যায়নীতি বিবেক মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তখন বিধাতার মহাশঙ্খ ধূলো থেকে টেনে তুলে তিনি বাজানোর উৎসাহ প্রকাশ করছেন 'বলাকা'র চার সংখ্যক ('শঙ্খ') কবিতায়। শান্তির রজনীগন্ধা ছেড়ে যুদ্ধের রক্তপদ্মে তিনি মালা গাঁথতে চেয়েছেন। বিধাতার যে-শঙ্খ সেদিন ধূলায় পড়ে আছে কবি দেখতে পেলেন, সেই শঙ্খকে বলতে পারি মানবতার শঙ্খ। এ শঙ্খ ধ্বনি মানুষের ন্যায় নীতিবোধ জাগিয়ে তোলে। আজ সেই ন্যায়-নীতিবোধ, হারিয়ে য়ুরোপে মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মেতেছে। এই যুদ্ধ থামানোর জন্যও যুদ্ধ চাই, অন্যায় যুদ্ধ পর্যুদস্ত করার জন্য ন্যায় যুদ্ধ চাই। বীররসের মূলভাব উৎসাহ। সেই উৎসাহ ভরে এই বীররসাত্মক কবিতায় তিনি লিখলেন ঃ

"তোমরা কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
প্রহার সকল ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।"

War Poems from the Times August 1914-15 নাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধরত ব্রিটেনের পক্ষে ইংল্যাণ্ডে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। 'শঙ্খ' কবিতায় মানবতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সকল জাতির মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এ হেন কবিতাকে ব্রিটেনের যুদ্ধোন্মাদনায় মত্তদের উৎসাহ জাগানোর জন্য গ্রথিত এই সংকলনে একটি ছবি সহ ছাপানো হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সৈনিকরা একটি দূর্গের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে আছে। আর সেখানে 'শঙ্খ'র ইংরেজি অনুবাদ ছাপানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মতো ঐ যুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষ সমর্থন করেন নি এই আশায় সে

যুদ্ধ শেষে ইংরেজ ভারতকে স্বরাজ দেবে। আবার ব্রিটিশের দুঃসময়ে তার শত্রু জার্মানির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডেও তিনি উৎসাহ দেখান নি। এই যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা-চিন্তার পরিচয় আছে গদ্যে 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে। এটির কথা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছি। আমরা এখানে এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলি গতিস্পন্দিত বিশ্ব ও যৌবনদীপ্ত জীবনের উদ্দেশ্যে 'বলাকা'র কবিতার পর কবিতায় তিনি যে-বন্দনা জানিয়েছেন, তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি কবিতায় সমকালীন যুদ্ধকে ঘিরে তাঁর প্রতিক্রিয়া গোপন করতে চান নি, সে-প্রতিক্রিয়া অকপট বলিষ্ঠ ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

॥ ছয় ॥

'বলাকা'র ছন্দরীতি

বাংলা কবিতার ছন্দ প্রথম মুক্তি পেয়েছিল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে, দ্বিতীয় 'বলাকা'র ছন্দে, সর্বশেষ মুক্তি রবীন্দ্রনাথেরই 'পুনশ্চ'র গদ্যচ্ছন্দে। 'বলাকা'র ছন্দকে বলা হয় মুক্তক ছন্দ। মুক্তকের মূল বৈশিষ্ট্য এই কয়টি ঃ (১) পঙ্ক্তিগুলি অনেক সময় অসমান (২) প্রতি পঙ্ক্তিতে কম বেশি নানারকম পর্ব সংখ্যা, (৩) পর্বে মাত্রা সংখ্যায়ও বৈচিত্র্য, (৪) প্রবহমানতা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'লাইনডিঙ্গানো অভ্যাস—যাকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে বলেছেন, 'দু-একটা অক্ষর কম দিয়েছে যাতে একটা লাইনের ঝোঁকটা আর—একটা লাইনে থেমে না যায়।' পরে রবীন্দ্রনাথের ডায়ারির এই বাক্যটি প্রসঙ্গে কথা উঠবে। সবচেয়ে সার্থক মুক্তক মিশ্রবৃত্তেই (তানপ্রধান, অক্ষরবৃত্ত) সম্ভব। কেননা এখানে ৮, ১০, ৬, ৪, ২, মাত্রাবিশিষ্ট নানারকম পর্ব সমাবেশ যে-বৈচিত্র্য আনা যায়, তা আর বাকি দুই ছন্দে অর্থাৎ দলবৃত্তে ও কলাবৃত্তে সম্ভব নয়। এই দুই ছন্দের পর্বে মাত্রা সংখ্যা মোটামুটি এক রকমই হয়—দলবৃত্তে ৪ এবং কলাবৃত্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৫, ৬ অথবা ৭।

মিশ্রবৃত্তে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র 'ছবি'. (১৯১৪) কবিতা লেখার চৌত্রিশ বছর আগে 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' (১৮৮৭)য় মুক্তক এনেছিলেন। তারও আগে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' বইটির 'তারকার আত্মহত্যা'য়ও এই মুক্তকের আভাস ছিল। অনেক কাল আর তিনি মুক্তকের চর্চার করেন নি। 'বলাকা'য় ভাবে যে-মুক্তির সুর বেজেছে, তারই প্রেরণা এখানে এসেছে মুক্তক ছন্দ, শুধু মিশ্রবৃত্তে নয়, দলবৃত্তেও পরবর্তীকালে 'সেঁজুতি'র 'যাবার মুখে' কবিতায় কলাবৃত্তের মুক্তক এলো। রবীন্দ্রোত্তর কবিরা মুক্তকের এই জয়যাত্রায় উৎসাহিত হলেন। তার প্রমাণ আছে নজরুলের 'বিদ্রোহী'র মতো কলাবৃত্ত ছন্দে অতি বিখ্যাত কবিতার কোনো কোনো পঙক্তিতে যেখানে মুক্তকের প্রবহমানতা এসেছে কলাবৃত্তে মুক্তক বিষয়ে জীবনানন্দের সোৎসাহ মন্তব্যে, সুধীন্দ্রনাথের 'দশমী'র 'প্রত্নতত্ত্বর' কবিতায় মুক্তকের আশ্চর্য কারুকার্যে 'দশমী'র অনেককাল আগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'র, 'বেনামী বন্দর' কবিতায়, বিষ্ণুদের 'মন দেওয়া-নেওয়া'র 'ওলু যদি আজ ন্যাকামি করে' ইত্যাদি পঙ্ক্তিতে ফারুখ আহমেদের 'সাতসাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে তবে কলাবৃত্তে মুক্তক যেহেতু 'বলাকা'য় আসে নি, তাই বর্তমান আলোচনায় এ প্রসঙ্গ বিস্তারের আর প্রয়োজন নেই।

আগেই বলেছি, 'বলাকা'য় শুধু মিশ্রবৃত্তে ও দলবৃত্তে রবীন্দ্রনাথ মুক্তক রয়েছেন। মিশ্রবৃত্তের মুক্তক ছন্দের প্রথম দৃষ্টান্ত 'বলাকা'র 'ছবি' বা ৬ সংখ্যক কবিতা, আর দলবৃত্তে মুক্তকের প্রথম কবিতা এই 'বলাকা'য় 'মুক্তি' ২২ সংখ্যক কবিতা। এ কবিতার 'প্রবাসী'তে (ফাল্গুন, ১৩২১) প্রথম প্রকাশের সময়কার পাঠ বাঁদিকে ও ডানদিকে 'বলাকা'র পাঠ আমরা নীচে পাশাপাশি তুলে দিচ্ছি এবং তা শুধু কবিতার প্রথম স্তবকটি ঃ—

যখন আমায়/হাতে ধরে'/		
সমাদরে/	ঃ	যখন আমায়/হাতে ধরে/
ডাক্‌লে কাছে,/	ঃ	আদর করে/

ভয়ে ডরে/ ছিলেম, * পাছে/	ঃ	ডাকলে তুমি/আপন পাশে/
অসাবধানে/একটু আদর/হারাই; *	ঃ	রাত্রি দিবস/ছিলেন ত্রাসে
আপন মতে/	ঃ	পাছে তোমার/আদর হতে/
চল্‌তে আপন পথে/	ঃ	অসাবধানে/কিছু হারাই {
ভেবেই মরি/এক পা যদি/বাড়াই!	ঃ	
পাছে বিরাগ/কুশাঙ্কুরের/একটি		
কাঁটা মাড়াই *;		

আমাদের বিবেচনায় বাঁদিকে 'প্রবাসী'তে প্রকাশের সময়কার পাঠটিতেই দলবৃত্তে মুক্তক আরো সার্থক হয়েছে। কেন না যেটি মুক্তকের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ও মূল বৈশিষ্ট্য সেই প্রবহমানতা এখনকার তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে এসে যাচ্ছে। আমরা 'ভয়ে ডরে'র পরে ছন্দের প্রয়োজনে যতি দিয়েই মাত্র দুই মাত্রা পরেই আবার অর্থের প্রয়োজনে তারকাচিহ্নিত অংশে এসে ছেদ দিচ্ছি। ছেদ ও যতি এক জায়গায় না দেওয়ার কাজটির জন্য প্রবহমানতা সম্ভব হচ্ছে এখানকার ছন্দে। 'চলতে আপন/পথে' এই পঙ্‌ক্তিতে পূর্ণ পর্বের পরে দুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব থাকায় অনায়াসে তা গড়িয়ে চলে যেতে পারছে স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে। মুক্তক ছন্দের এই সূক্ষ্ম কারুকাজ কোনওটাই 'বলাকা'য় ধৃত ২২ সংখ্যক কবিতার পাঠে নেই। এই 'প্রবাসী' ধৃত পাঠ সংগ্রহ করে দিয়েছেন অধ্যাপক ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়।

'বলাকা'য় যে-ভাবে ৩০ সংখ্যক কবিতাটি আছে, তাতেও রথীন্দ্রনাথ কথিত অক্ষর কম পড়া বেশ বোঝা যায় ঃ

১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১
এই দেহ টির/ ভেলা নিয়ে
১ ১ ১ ১ ১ ১
দিয়েছি সাঁ/ তার গো
১ ১১১ ১১ ১ ১ ১ ১
এই দুদিনের/নদী পার হ/ ব গো

এই দুই পঙ্‌ক্তিতেই দুই মাত্রার অপূর্ণ পূর্ব আছে অর্থাৎ চার মাত্রার পূর্ণপর্বের চেয়ে দুই মাত্রা কম পড়ছে। তাতে দলবৃত্তে মুক্তক ছন্দে একধরনের গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ছন্দের পরিভাষায় একেই প্রবহমানতা বলা যায়। দলবৃত্তে মুক্তকে অপূর্ণ পর্বকে ১. ২ বা ৩ মাত্রা করায় যে-বৈত্র্যের সুযোগ থাকে, তা তিনি হাত ছাড়া করেন নি। এই বৈচিত্র্য 'বলাকা'র প্রথম কবিতায়ই তিনি নিয়ে এলেন ঃ

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সংঘাতে তোর / উঠছে ওরা / রেগে/
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১১
শয়ন ছেড়ে/আসবে ছুটে/ বেগে
১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১
সেই সুযোগে/ ঘুমের থেকে/জেগে
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১
লাগবে লড়াই/মিথ্যা এবং/সাচায়

তবে 'এই দেহটির' এবং 'সংঘাতে তোর' ইত্যাদি উদ্ধৃতি দুটির ছন্দকে আমরা মুক্তক বলতে পারি না, যেহেতু মুক্তকের সর্বশেষ এবং মূল বৈশিষ্ট্য প্রবহমানতা এখানে নেই। এই প্রবহমানতা আছে এমন একটি কবিতা 'বলাকা' থেকেই ছন্দোলিপি করে দেখানো যায় কিভাবে মাত্রা কম পড়ায় এক পঙ্‌ক্তি থেকে অন্য পঙ্‌ক্তিতে অনায়াসে ছন্দ প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

১১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১১১ ১১
এবারে ফাল্ /গুনের দিনে /সিন্ধু তীরের /কুঞ্জবীথি কায়
১ ১ ১ ১ ১১ ১১ ১
এই যে আমার /জীবন লতি কায়
১১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১১ ১১ ১১
ফুটল /কেবল /শিউরে ওঠা /নূতন পাতা/ যত
১১ ১১১ ১ ১ ১১ ১ ১
রক্ত বরণ/ হৃদয় ব্যথার/ মতো

প্রথম পঙ্‌ক্তির সর্বশেষ এক মাত্রার 'কায়' এভাবে থাকার জন্যই পরের পঙ্‌ক্তির 'এই যে' ইত্যাদি অংশে ছন্দ অনায়াসে গড়িয়ে চলে যেতে পারছে। অর্থানুসারে ছেদ ও ছন্দের অনুগামী যতিও এক জায়গায় পড়ছে না। তাই শব্দ ভেঙে মাঝখানে (ফাল্গুনের পদে 'ফাল্' এর পরে) যতি পড়েছে। এটাও প্রবহমানতারই আরেকটি লক্ষণ।

প্রেমের করুণ কোমলতা ১০
ফুটিল তা ৪
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জ/প্রশান্ত পাষাণে ৮ + ৬

আমরা 'কবিতা পাঠ' অধ্যায়ে বলেছি, 'কোমলতা'ও 'ফুটিল তা'র অন্ত্যানুপ্রাসের কারুকার্য 'ফুটিল' ও 'তা'র মাঝখানতার নিভৃত ফাঁকটুকুতে। এই সমিল মুক্তক ছন্দে সেখানেই আপনা-আপনি একটা মিল এসে যাচ্ছে, সেখানেই পঙ্‌ক্তির নটেশাক কবি মুড়িয়ে ফেলছেন, যদিও তখনও কথাটি ফুরোলো না। কথা না ফুরোনোটা প্রবহমানতা, আর নটেশাক মুড়োনাটা পঙ্‌ক্তির অবয়ব—কখনো বা পর্বের দৈর্ঘ্য, যদি পঙ্‌ক্তিতে একটি মাত্রই পর্ব থাকে, যেমন আমাদের উদ্ধৃতির প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে তবুও দুটো পর্ব আছে।

'বলাকা'য় ১৭ সংখ্যক কবিতার প্রথম স্তবকটি এভাবে সাজানো রয়েছে ঃ

"হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগণ
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।"

এখানে আসলে ১৪ মাত্রার ৫টি পঙ্‌ক্তি আছে কিন্তু ৫ পঙ্‌ক্তিতে সাজালে অন্ত্যমিলগুলি থাকে না। ৫ পঙ্‌ক্তিতে এই স্তবকটি বিন্যস্ত করা যাক্ ঃ—

"হে ভুব আমি যত/ক্ষণ তোমারে না/
বেসেছিনু ভালো * তত/ক্ষণ তর আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই/তার সব ধন।/**
ততক্ষণ নিখিল গগণ * হাতে নিয়ে
দীপ তার* শূন্যে শূন্যে/ছিল পথ চেয়ে**

ও * এই চিহ্ন দুটিতে যথাক্রমে ছন্দের প্রয়োজনে যতি ও অর্থানুসারে ছেদ বোঝানো হলো। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে * এভাবে ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' বইটিতে এভাবে সাজিয়ে এ কবিতার ছন্দ বুঝিয়েছেন। পঙ্‌ক্তিগুলি কমা দাঁড়ি সহ সাজিয়েছেন, তাতে অন্ত্যানুপ্রাস এসেছে। শেষ পঙ্‌ক্তির 'চেয়ে'র সঙ্গে মিল পরের স্তবকে তিনটি পঙ্‌ক্তির শেষে আছে। অন্ত্যানুপ্রাস, প্রবহমানতা, নানা মাপের পঙ্‌ক্তি ও পর্ব সমাবেশের, বৈচিত্র্য—এইসব বৈশিষ্ট্যে ১৪ মাত্রার ৫টি পঙ্‌ক্তিকে যেভাবে তিনি সাজিয়েছেন তাতে এ মিশ্রবৃত্তে মুক্তক ছন্দের আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

'বলাকা'র কবিতায় মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত এই দুই জাতীয় ছন্দ আছে। এবং আগেই বলেছি এই দুই ছন্দের রবীন্দ্রনাথ এখানে মুক্তক সৃষ্টি করেছেন। তবে মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই মুক্তক স্বাভাবিক বলে এই ছন্দে লেখা সকল কবিতায় মুক্তক সার্থক, যেমন ৬ (ছবি), (শাজাহান), ৮ (চঞ্চলা), ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৫, ২৮, ৩৬ (বলাকা), ৩৭ (ঝড়ের খেয়া), ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫ এই প্রতিটি কবিতায় মিশ্রবৃত্তে মুক্তক হয়েছে। ৪৫ সংখ্যক কবিতা (নববর্ষের আশীর্বাদ) থেকে একটু ছন্দেলিপি করে দেখানো যাক ঃ—

ওরে যাত্রী/	০ + ৪
ধূসর পথের ধুলা/সেই তোর ধাত্রী;/	৮ + ৬
চলার অঞ্চলে তোরে/ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি	৮ + ১০
ধরার বন্ধন হতে/নিয়ে যাক হরি/	৮ + ৬
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।/	০ + ১০

'ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি' (অর্থাৎ আবৃত করে, ঢেকে) এই অসমাপিকা ক্রিয়ার পর বাক্য চলে যাচ্ছে ছন্দের প্রবহমানতায় পরের পঙ্‌ক্তিতে। আর প্রতিক্ষেত্রে ৪, ৬, ৮, ১০-এর মধ্যে পর্বে মাত্রা সংখ্যা ঘুরে ফিরে আবর্তিত হচ্ছে। কোথাও বিজোড় সংখ্যার মাত্রাওয়ালা পর্ব আসছে না। কিন্তু তা আসে গদ্য কবিতা ছন্দে। কেননা গদ্য কবিতায় অর্থানুসারে যেখানে থামতে হচ্ছে সেখানে ছাড়া আর কোথাও থামছি না আর অর্থের জন্য থামাটা অনিয়িমিত। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে 'পত্রপুট' বইটির 'আফ্রিকা' কবিতাটির নিম্নলিখিত চারটি পাঠের তুলনামূলক আলোচনায় এবং এই এগুলি কবির নিজেরই রচনা ঃ

(ক) উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে	৮ + ০
রুদ্র সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করে নিয়ে গেল তোরে	৮ + ৬
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে	০ + ১০
রে আফ্রিকা	৪
রেখে দিল নির্বাসনে মহা অরণ্যের অন্ধকারে	৮ + ১০

(খ) উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে একদিন
আপনাতে স্রষ্টার আপন অসন্তোষ
বিক্ষত করিতেছিল বারবার নূতন সৃষ্টিরে
বিশ্বাভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ আশ্বিন, ১৩৫১
(গ) সেইদিন
রুদ্র সমুদ্রের বাহু তোমারে নিয়েছে ছিন্ন করি
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে
হে আফ্রিকা।
'কবিতা' পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৪৪
(ঘ) উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত
পত্রপুট, ১৬

প্রথম তিনটির ছন্দ মিশ্রবৃত্তের অমিল মুক্তক, 'ছবি' ইত্যাদির মতো সমিল নয়। আর চতুর্থটি পদ্যচ্ছন্দই নয়, গদ্যচ্ছন্দ।

আমরা 'বলাকা'র যে-কবিতাগুলির ছন্দ বলেছি মিশ্রবৃত্তে মুক্তক, সেগুলি ছাড়া বাকি সব কবিতা দলবৃত্তে লেখা। সব ক্ষেত্রে দলবৃত্তে মুক্তক হয় নি। যে-সব ক্ষেত্রে মুক্তক হয়েছে, সে-কবিতাগুলির সংখ্যা পরপর বসানো হচ্ছে—২১, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩। রথীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত ডায়ারি থেকে আমরা জানতে পারি। রমণীমোহন ঘোষ রবীন্দ্রনাথকে কথায় কথায় বলেছিলেন যে, 'আপনাকে তো আজকাল আবার সেই সাধুভাষায় ফিরে যেতে হল'—সেটার কিছু প্রতিবাদ করেন নি—কিন্তু মনে মনে ছিল যে এখন যে নতুন ছন্দ (মুক্তক) ব্যবহার করছেন তাতে সহজ বাংলা ভাষায় লিখতে চেষ্টা করবেন। সেই চেষ্টারই ফল 'বলাকা' দলবৃত্তে মুক্তক সৃষ্টি। সাধুভাষা বল্‌তে রমণীমোহন নিশ্চয়ই ছবি, শাজাহান ইত্যাদি কবিতার গুরুগম্ভীর শব্দ ও মিশ্রবৃত্তের ধীর লয়ই বোঝাতে চেয়েছিলেন। যার কান আছে, সেই কানেই ধরা পড়ে 'শাজাহানের'

"একথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শাজাহান
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।"
এবং "সবুজের অভিযানে'র

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

এই দুই কবিতার আরম্ভ দুটির শব্দধ্বনিগত, ভাষাগত এবং ছন্দোগত পার্থক্য আছে। প্রথমটির ভাষা সাধু, অন্যটির ভাষা চল্‌তি। সাধু ভাষার ছন্দ মিশ্রবৃত্ত, চল্‌তির ছন্দ দলবৃত্ত এই দলবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ এজন্য প্রকৃত বাংলার ছন্দ বলতেন। এই দলবৃত্ত 'বলাকা'য় মুক্তকের যে-পথ তিনি খুলে দিলেন, সেই পথে পরে 'পলাতকা'য় এসে উপস্থিত হলো পুলিন-মঞ্জুলিকা বা সেই অসুখে-বিসুখে হাড় জিরজিরে পতিগৃহে খেটে-খুঁটে পাতপাত হওয়া বিনু নামের মেয়েটি।

"বিনুর বয়স/বাইশ তখন,/রোগে ধরল/তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে/আধি হল/বড়ো;
নানা ছাপের/ জমল শিশি,/নানা মাপের/কৌটো হল/জড়ো।"

৪ মাত্রার পূর্ণ পর্বে ও ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে, প্রবহমাণেতায়, নানা মাপের পর্ব ও পঙ্‌ক্তি সমাবেশ, চল্‌তি ভাষার সহ্‌জ সরল সৌন্দর্যে যে কাণ্ডটা এখানে হলো, তারই সূচনা ঘটেছিল প্রথম 'বলাকা'র 'মুক্তি' কবিতায়। 'পলাতাকা'য় বিনুকে নিয়ে লেখা কবিতার নামও 'মুক্তি'। এই্ এক 'মুক্তি' থেকে আরেক 'মুক্তি'তে বাংলা চল্‌তি ভাষার ছন্দের যে-মুক্তি ঘটেছে, তা যদি অনেক কবি মিলে ঘটাতেন, তাহলে বিস্ময়ের কারণ থাকতো না। এখানে বিস্ময়ের কারণ এই্খানে যে এই্ মুক্তির সাধক রবীন্দ্রনাথ—একা রবীন্দ্রনাথ, তাও আবার সে-মুক্তি সম্ভব হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে। এক কথায় পদ্যচ্ছন্দে মুক্তক এবং গদ্যছন্দের মূল পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি এভাবে বলা যায় যে পদ্যচ্ছন্দ সমতাল, মুক্তকের ছন্দ বিস্মতাল, গদ্যকবিতার ছন্দ অতিতাল।

॥ সাত ॥

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের অভিনবত্ব

নিজের লেখার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—"আমার কাব্যে ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘরে নিজের অলক্ষ্যে। কালেকালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে। তখন মৌমাছির মধু যোগান নতুন পথ নেয়।" ('নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের সূচনাংশ) রূপ থেকে রূপান্তরে ভাব বীজের ক্রম-অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য ধারার বিবর্তন চলেছে—রবীন্দ্রনাথে জীবন বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য এর সঙ্গে কবি মিলিয়ে নিয়েছেন নতুন ভাবনা-চিন্তা এবং জীবন উপলব্ধিকেও। তাই এই যাত্রা কখন রূপ থেকে রূপান্তরে কখনো ভাব থেকে ভাবান্তরে কখনো বা বিপরীত ক্রমানুসারে। তবে কয়েকটি ধ্রুব চেতনা বা স্থায়ীভাব তাঁর কাব্য জীবন প্রবাহে। স্থিরভাবে মিশে আছে, তার বিকাশ হলেও বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য।

তবে একথা সত্যি যে প্রাক্ বলাকা রবীন্দ্রকাব্য ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বলাকার কবিতাগুলিকে অভিনব মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কেউ কেউ মন্তব্যই করেছিলেন রবীন্দ্রকাব্য ধারায় 'বলাকা' সম্পূর্ণ আকস্মিক রচনা। অর্থাৎ সেদিনের আলোচনায় বলাকার নতুনত্বকে প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন। বিষয়বস্তু অথবা আঙ্গিক উভয়ক্ষেত্রে এই নতুনত্ব স্বীকৃত হয়েছিল।

'খেয়া' থেকে আরম্ভ করে 'গীতালি' পর্যন্ত কবি আধ্যাত্মিক ভাবও অনুভূতির জীবনযাপন করেছিলেন। তুমি-আমির লীলা রসে তিনি এতদিন মত্ত ছিলেন। "কবি ছিলেন সমাজ থেকে বেশ একটু দূরে, আপন-পরাণ সখার সঙ্গে একান্তে আসীন বা একতরীতে-ফুলহারা কিন্তু প্রশান্ত—কানে কানে গান শোনান যায় এতটা প্রশান্ত-সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে যাবার জন্য ব্যাকুল।" (আধুনিকত্য ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সৈয়দ আয়ুব-পৃঃ ১০১) তাঁর কাব্যের দিক্‌চক্রবালে প্রকৃতি ও মানুষ সাধারণভাবে অদৃশ্য হয়েছিল। মাঝে মাঝে দু'একটা ক্ষীণ রেখা ভেসে উঠলেও তা লীলারস পুষ্টির সহায়ক হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে। 'গীতালি'র শেষের দিকে পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধির মধ্যেও একটা নতুন সুর আমাদের কানে ধ্বনিত হয়েছে। এই সময়ই অন্যদিকে বলাকার নতুন করে ফিরে পাওয়া নিসর্গ সৌন্দর্যবোধ এবং পুরাতন ধরণীর প্রতি বসত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে নিজের যৌবনের উৎসবে ধীরে ধীরে পুনরুত্থান করার চেষ্টা দেখা দিয়েছে। বলাকার কবিতা "দৃপ্তবেগে কালনৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে যেন ভাদ্রের ভরা জোয়ারের বিরাট নদী।" আর যৌবন যে ফিরিয়া আসিল তাহাত কবি নিজেই স্বীকার করিলেন—

"বহুদিনকার
ভুলে যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে
পত্রতার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে

অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।।" (১৩ সংখ্যক)

[রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়, পৃষ্ঠাঃ-১৩২]

বলাকার প্রায় সব কবিতাতেই প্রেম যৌবন-সৌন্দর্য-অথবা জীবন গতিবেগের জয়গানের অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীর আড়ালে কবির স্বদেশ ও সমাজের গণ্ডীর ভিতর থেকে বিশ্বজীবনের বিচিত্রকর্ম ও চিন্তার রাজ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে পদচারণায় অস্ফুট শব্দ বর্ণিত হচ্ছিল। "মাঝে মাঝে তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টাও আছে, একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে কি? লক্ষণীয় বিষয় তাই বলাকার কবিতাগুলি খুব উঁচুদরের একটি 'intellectual appeal' যাহা মানুষের টিকার প্রসব স্থানটিকে নাড়া না দিয়া পারে না।" (তদেব)

বলাকার কবি সমস্ত পৃথিবীর অবক্ষয়ে ব্যথিত তাই বিশ্বযুদ্ধের মুহূর্তে কেবল নিশ্চেষ্ট বেদনা-বিলাস নয় দেখা দিয়েছিল তাঁর কর্মীসত্বাক্ত "মানসী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল,' বলাকা সম্বন্ধে লিখতে পারতেন কবির সঙ্গে যেমন একজন কর্মী এসে যোগ দিল।" [আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—পৃঃ-১০১]। তাই কবি কর্মী রবীন্দ্রনাথ আত্মসমাহিত, বিনম্র আত্মনিবেদনের আকুতিতে পরিপূর্ণ নয়। সারা পৃথিবীর ব্যথা-বেদনা প্রকাশের 'পাপের মার্জনা'র ও রাত্রির তপস্যা শেষে দিন আনবার কবি। তাই প্রশান্ত আধ্যাত্মিক এক পরিবেশে যে রবীন্দ্রনাথ প্রার্থন করেছিলেন—

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।"

[গীতাঞ্জলি-১ নং]

সারা পৃথিবীর বিনষ্টিতে সেই রবীন্দ্রনাথ বলাকায় বলে উঠলেন—

'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।"

[বলাকা-৪ নং]

যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদেবতার কাছ থেকে বাঁশী বাজানোর ভার নিয়ে গানে গানে প্রাণের হাসি কান্নাকে গেঁথে চলেছিলেন, তিনি পুষ্পরথ থামিয়ে বেরিয়ে এলেন আপাত সংঘাত মুখর জনসমাজে। 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যের' শান্ত রসের পর বলাকার এই রৌদ্ররস একেবারে অভিনব।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহের ইতিহাস নিরন্তর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায় থেকে অন্যপর্যায়ে যাত্রার ইতিহাস। অতৃপ্তির চিরগতিই তাঁর চিরকাল। নব নব চৈতন্য উদ্‌বোধিতচিত্তই তিনি প্রার্থনা করেছেন। রবীন্দ্রজীবন এবং কাব্য উভয়েই 'Perpectual change' এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হেরাক্লিটাসের সঙ্গে কবি বলতে পারেন—'I can not bathe in the same river twice'—চিরযৌবনই তাঁর পূজা লাভ করেছে সকল অবস্থায়। বস্তুতঃ কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ আজীবন গতিবাদী। জীবনের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতেই সমগ্র কবিজীবনের রূপক মানচিত্রটি যেন অঙ্কিত হয়েছে। " কি জানি কি হল আজি--- জাগিয়া উঠিল প্রাণ/দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।" রবীন্দ্রনাথ চির চঞ্চল/অতৃপ্ত তাঁর সুদূরের পিয়াসা। 'মানসী' কাব্যের 'দুরন্ত আশা' কবিতায় তাঁর সেই গতি-আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে—'ইহার চেয়ে হতেম যদি/আরব বেদুইন।/চরণতলে বিশাল মরা/দিগন্তে

বিলীন।' 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাতেও সেই গতিবাসনার—"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে/নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,/মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।" 'চৈতালী' 'কথা' 'কাহিনী' কিংবা 'কল্পনা' প্রভৃতি কাব্যে এই গতি আকাঙ্ক্ষাই নতুন রূপ ধারণ করেছে। কবি প্রাচীন ভারত পরিক্রমা শুরু করেছেন অদূরবর্তী ইতিহাস কিংবা সুদূরবর্তী পুরাণের জগতে প্রস্থান করেছেন কবি। তাহলে দেখা যাচ্ছে বলাকার গতিবাসনা আকস্মিক নয়। বলাকার বিশিষ্টতা অন্যত্র। প্রাক্‌বলাকা পর্বেও কবি নিঃসন্দেহে গতিবাদী। কিন্তু তাঁর গতিবিদ্যা পরিণাম বিমুখ। বলাকার রবীন্দ্রনাথ এ যাত্রার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন। পথিক শাজাহানের মধ্যে তাই এ যাত্রার পরিণাম চিহ্নিত হয় ঃ—

'আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।'

বলাকার গতি কেবল—'চলেছে যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী নয়। এ কাব্যের সমস্ত গতিই শান্ত কল্যাণময় নিভৃত প্রেক্ষাপটে ব্যাপ্ত। তাই তার পরিণততর উপলব্ধি 'শান্তিসত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।' সত্যেরা এই 'একমএব অদ্বিতীয়নের' শিবচেতনার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিশ্বজাগতিক সকল গতি নিজেকে বিচিত্র ভাবে ও রূপে উপলব্ধি করেছে। 'ঈষোপনিষদে'র "ঈশাবাস্যাসিদংসর্বং যথ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই ভাবনার সঙ্গে সমধর্মী হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাও। বলাকার আকাশ সেই ব্যঞ্জনা, সেই 'সত্য', 'শিব' ও 'চিরন্তন' একের প্রতীক।

ছন্দের গতিময়তা এবং ভাষার সংহতি এই দুয়ের সার্থক সম্মিলনে বলাকার আঙ্গিক গঠিত। এ কাব্যের ভাষা তীক্ষ্ণ, দীপ্ত, শাণিত, ঝকমকে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও বোধিকে তীব্রভাবে সচেতন করে দেয়। তাছাড়া এর ছন্দ বৈচিত্র্যও একে অভিনবত্ব দান করেছে। তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দের যে প্রয়োগ এতকাল রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসমূহে করে চলেছিলেন—'বলাকায় তাতে স্বাতন্ত্র্য দেখা গেল। মূলতঃ তানপ্রধান ছন্দ হলেও এর প্রয়োগ কর্মে রয়েছে অভিনবত্ব। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় প্রতিচরণে চৌদ্দ অক্ষরের আদর্শ অনুসরণ করা হতো/রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ ভেঙে দিয়ে প্রতিচরণে যুগ্ম সংখ্যক অক্ষর সন্নিবেশ করে ছন্দের বৈচিত্র্য সাধন করলেন। যেন—'শুধু ধাও শুধু ধাও/শুধু বেগে ধাও/উদ্দাম উধাও ফিরে নাহি চাও/যা কিছু তোমার সব/দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।'

৮ + ৬, ৬ + ৬

এই ছন্দের প্রতি ছত্রে অক্ষরের সংখ্যার বৈচিত্র্য থাকায় কাব্যপাঠের উদার সময় বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ছন্দের মধ্যে যে গাঢ়বদ্ধতা আর ধ্বনির গৌরব আছে তা এই ছন্দকে 'মৃদঙ্গাঘাত গম্ভীর' ধ্বনিতে ধ্বনিত করে তুলেছে। এই কাব্যের ছন্দ ভাষা বাকরীতি, শব্দব্যঞ্জনা, কাব্যের সৌন্দর্য, গতি, স্থিতি এবং অভিনবত্বকে অপূর্ব সার্থকতায় অভিব্যক্তি করে তুলেছে। বলাকার আঙ্গিক প্রাক্‌-বলাকা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

আরও একটি দিক থেকে 'বলাকা' তার পূর্ববর্তী কাব্যে সমূহের তুলনায় স্বতন্ত্র। তা রবীন্দ্রনাথের 'অরূপ', উপলব্ধি দিক। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনায় অরূপ অন্বেষণ চলেছে

দীর্ঘকাল। বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 'নৈবিদ্য' থেকে 'খেয়া'—এই কাল পরিধিতে রবীন্দ্রনাথের অরূপ আবিষ্কার নিত্য নতুন বাঁক নিয়েছে। অবশেষে 'গীতাঞ্জলি'তে কবির দীর্ঘ প্রত্যাশিত অরূপ সাক্ষাৎকার ঘটলো—

'আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো....' (৪৫ নং)

এ পর্যন্ত অরূপকে ঘিরে কবির একক আকুলতাই লক্ষ্য করা যায়। বলাকায় দেখা গেল সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। অরূপ ও কবির জন্য সমভাবে ব্যাকুল প্রতীক্ষাপরায়ণ, তাই—

'সিংহাসন হতে নেমে
হাসি মুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।' (২৮ নং)

এখানে রবীন্দ্রনাথ জানেন, তাঁকে ছাড়া তার অরূপও একা অসহায় এবং ব্যর্থ। অরূপের সম্পূর্ণতা, সার্থকতা, তাঁর উপর অনেকখানি নির্ভরশীল ঃ—

'আমি এলেন, ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনল কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে।
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।' (২৯ নং)।

কবির এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী কাব্য ভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। কবির কাব্য চিন্তায় বিশেষ এক মানবিকতা বোধের প্রতিষ্ঠা ঘটলো। পরবর্তী 'পলাতকা', 'পুনশ্চ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে প্রতিদিনের পরিচিত মানুষের তুচ্ছ জীবনের প্রতি কবির মমতার পেছনে এই নবলব্ধ মানব-মহিমা যে প্রেরণারূপে কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

আবার "দুঃখ ও দুঃখের দেবতা বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধির ফলে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল সেই ভক্তিরসধারা যা নৈবিদ্য থেকে গীতালি পর্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। শুভ ও সুন্দরের দিকে পিঠ ফেরালেন না রবীন্দ্রনাথ বরঞ্চ শুভ ও সুন্দরের চেতনা তাঁর মনে আরো গভীর ও সুপরিণত হল। তবে তাঁর চরম মূল্যবোধের স্থানাঙ্কদ্বয় (Co-ordinates) গেল পাল্টে.....পুরাণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নতুন রবীন্দ্রনাথের বোঝাপড়া কিন্তু শেষ, অবাধ খণ্ডিতই রয়ে গেল। সেই আংশিক ব্যর্থতা শেষ পর্বের কাব্যকে অভূতপূর্ব সার্থকতা দান করেছে।" (আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সৈয়দ আয়ুব—১১৫) এই সমস্ত কারণে বলা যায় বলাকা রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কাব্যপ্রবাহে আকস্মিক বা সম্পূর্ণ অভিনব না হলেও অভিনবত্ব মণ্ডিত।

॥ আট ॥

'বলাকা' কাব্যের নামকরণের সার্থকতা

'গীতাঞ্জলি' কাব্যের পাশাপাশি যখন 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রকাশিত হল তখন রবীন্দ্রানুসারী সুধী ও সুহৃদগণ ভাবলেন বুঝি এমনি করে ছোট ছোট গান ও লিরিকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভা পরিসমাপ্তি লাভ করবে। রবীন্দ্র বিরোধীরা রবীন্দ্রপ্রতিভা শেষ হয়ে গেছে বলে যখন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুরু করলেন, এমনই পরিস্থিতিতে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ। অস্বীকার করা চলে না—প্রাক্‌গতি পর্যায়ে সংশয়ের যুগে কবি, বর্তমান কর্মমুখর জগৎ থেকে অবকাশ নেওয়ার জন্য ঈশ্বর ভাবনার জগতে প্রবেশ করেছিলেন। এই শান্তির বাণী তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদের বাণী থেকে। কিন্তু উপনিষদেব সেই মহাপবিত্রমন্ত্র 'চবৈবতী' (এগিয়ে চলো) কে অস্বীকার করতে পারেন নি। বলাকা পর্বে তাই তিনি ঈশ্বরের আরাধনার পরিবর্তে বিশ্বমানবের আহ্বান করলেন। ঐশ্বরিক ভাবনা পরিত্যাগ করে নেমে এলেন পথের ধূলায়, মানুষকে নিয়ে যেতে চাইলেন ক্ষুদ্র থেকে মানবতার বৃহৎ গ্রন্থীতে।

নামকরণের ভূমিকা একটি রচনার পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু 'চোখের দেখা' বা 'কানের শোনা'র আকর্ষণের ক্ষেত্রেই নয় ব্যঞ্জনাধর্মীতার ক্ষেত্রটি বিচার করে দেখলেও সে তাৎপর্য স্মরণযোগ্য। শোভনতার অপর নাম শিল্প, সাহিত্য যখন শিল্প তখন তার (কারুগঠনের) নামকরণের দিক্‌টিও বিবেচ্য। নামকরণের মোহময়তা বিষয়ের প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করে। নিপুণতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে সেটি অবয়বের সর্বত্র প্রার্থিতা অনেক গূঢ়ার্থ প্রতীতির উদ্ভব শিরোনামে। সাহিত্যের চেহারার মধ্যে যখন সূক্ষ্মতা এবং ব্যঞ্জনা প্রার্থিত হয়ে উঠেছে তখন শিরোনামে ও সেই সূক্ষ্মতা প্রার্থিত হয়ে ওঠে। 'বলাকা' নামকরণের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি বিবেচ্য হয়ে ওঠে।

বস্তুতপক্ষে আমরা যাকে কবিতার বই বলে সাধারণভাবে বুঝি, সে বইগুলির সবই বিশেষ কোন কবিতাগুচ্ছের কোন এক কবিতার সঞ্চয়ন মাত্র নয় অনেক কাব্যগ্রন্থই একেকটি সম্পূর্ণ পাঠ। এর অন্তর্গত বিভিন্ন কবিতা কাব্যের একেকটি একক হয়েও এগুলি সম্পূর্ণ এবং অন্য নিরপেক্ষ নয়। এরকম ক্ষেত্রে গ্রন্থভুক্ত ঐ এককগুলির পৃথক নামকরণ অনাবশ্যক হয়ে উঠতে পারে। কাব্যগ্রন্থের নামটি তখন সবকটি কবিতার পরিচয় হয়ে ওঠে। এমনকি অনেক সময় এরকমও হয় যে রচনা ও প্রথম প্রকাশকালে কবিতাগুলির পৃথক নামকরণ কবি করে থাকেন, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থ নামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে সেগুলি যখন সজ্জিত হয় তখন কবিতাগুলির পৃথক নামকরণ অনাবশ্যক মনে হয় কবির কাছে। বলাকা কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছে। কবিতাগুলির পৃথক নাম মুছে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে 'বলাকা' এই সাধারণ গ্রন্থ নামের ব্যাপক পরিচয়টিতে পরিচিত করতে চেয়েছেন। এই সামান্যা-করণের শিল্পশর্তই আমাদের বিচার্য।

'সন্ধ্যা সংগীত থেকে রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহে কবি পৃথক নামকরণ থেকে সরে এসে একটি গ্রন্থ নামের অন্তর্ভূক্ত করার ঘটনা প্রথম ঘটে স্মরণ কাব্যগ্রন্থে। এর আগে 'ভানুসিংহের

পদাবলী'তে এরকম ঘটলেও এগুলি যেহেতু আধুনিক অর্থে কবিতা নয় তাই এগুলিকে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যায়। 'স্মরণ' পরবর্তী আরো কয়েকটি কাব্যে কবিতার পৃথক নাম বৃহত্তর গ্রন্থ নামে বিলীন হয়ে গেছে দেখা যায়। যেমন নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি। সবকটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি একটি বিশেষ ভাবনা সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। ফলে একেকটি কবিতা তার স্বয়ং সম্পূর্ণ একক হিসাবে গৃহীত হচ্ছে না। সমস্তটি মিলে একটি সম্পূর্ণ পাঠ হয়ে উঠেছে। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রেও একই বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

'বলাকা'র কবিতাগুলি রচিত হয়েছে ১৩২১-এর বৈশাখ মাস থেকে ১৩২৩-এর বৈশাখ মাস পর্যন্ত। কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল রচনার প্রায় সাথে সাথে বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকায়। এর মধ্যে ২৪টি কবিতা প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। বাকি ২১টির মধ্যে ১০টি প্রবাসীতে এবং অন্যগুলি মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকায় প্রকাশকালে প্রতিটি কবিতাই ছিল পৃথক নামকরণ যুক্ত। যেমন সবুজপত্রে প্রকাশিত ১ সংখ্যক কবিতাটির নাম ছিল 'সবুজের অভিযান', ২ নং কবিতার নাম 'সর্বনেশে', ৮ নং কবিতার নাম 'চঞ্চলা', ৩৭ সংখ্যক কবিতার নাম 'ঝড়ের খেয়া' ইত্যাদি। কিন্তু ১৩২৩ বঙ্গাব্দে যখন 'বলাকা'র প্রকাশ ঘটল তখন কবিতাগুলির পূর্বোক্ত নাম আর থাকলো না। সবগুলি মিলে হয়ে উঠলো এক অখণ্ড পাঠ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়ত এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে বলাকা বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতোই তাবা মানসলোক থেকে যাত্রা করে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।" বলাকার উড্ডীয়মান হংসসারী যে ছবি নিয়ে আসে সেখানে প্রতিটি পাখী পৃথক সত্তা নয়। সমগ্র পঙ্ক্তিটি একটি তারা যেন সমগ্রভাবে অখণ্ড একক হয়ে ওঠে। 'বলাকা কাব্যগ্রন্থ কবির কাছে এরকমই এক অবিচ্ছিন্ন একক।

নামকরণের এই সামান্যকরণ তবু প্রশ্ন হীন নয়। ১৩২১ থেকে ১৩২৩ এই দুবছরে রচিত যে কবিতাগুলি 'বলাকা'তে পেয়েছে তার মধ্যে দু'একটি কবিতা অবশ্যই আছে যেগুলি বলাকা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হলেও কোন বিস্তর অসুবিধে হত না। যেমন ৩৯ সংখ্যক কবিতাটি যেটি শেক্সপীয়রের তিনশতম সত্য স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত হয়েছিল। কবিতাটি (শেক্সপীয়র সবুজপত্র, পৌষ ১৩২২) আঙ্গিকের দিক থেকেও বলাকার অন্য কবিতার সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে বসতে পারে না, এটি একটি সনেট। তবু এটি বলাকার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তবে এ ধরনের দু'একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া প্রায় সমস্ত কবিতাই একটি বিশেষ ভাব ও রূপবলয়ে অবস্থিত থেকে একটি সম্পূর্ণ পাঠ রচনা করেছে। বৃহত্তর এই সম্পূর্ণতাই একাব্যের কবিতাগুলির স্বকীয় নামমোচনের উদ্দ্যো। এবার 'বলাকা' এই নামকরণের সংহতি সূত্রের স্বরূপ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

'বলাকা' এই শব্দটিতে যে চিত্রকল্প আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার প্রেক্ষাপট আকাশ। আপাতভাবে আমাদের সীমায়িত দৃষ্টিতে বলাকার গতি অন্তহীন অনির্দেশ্য। কিন্তু আকাশকে ছাড়িয়ে সে গতির পঞ্চসম্বতারী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আকাশ সর্বত্র, সর্বব্যাপ্ত, আর এই আকাশ সম্পৃক্ত গতিতে 'বলাকা' শ্রেণী পেয়ে যায়। একটি সৌন্দর্য প্রকাশক্ষম চিত্রকল্পের অনির্বচনীয় রসাভিব্যক্তি, তাই তার নামের মধ্য দিয়ে গতি, আকাশ প্রেক্ষাপটে

তার বিস্তার এবং সৌন্দর্যময়তা এই ত্রয়ী ইঙ্গিত আভাসিত; কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির সমমাত্রিক নামকরণের ব্যঞ্জনাও তাই।

আলোচ্য কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতা এক একটি পৃথক বক্তব্যকে ধারণ করে আছে। যেমন—১ সংখ্যক কবিতার মূল বক্তব্য নবীনের বন্দনাগান। মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর পূর্বাভাস আভাসিত হয়েছে ২ সংখ্যক কবিতায়। ৬ সংখ্যক কবিতা ধরে আছে ব্যক্তির পার্থিব জীবন বাইরে অভিব্যক্ত জীবন ক্রিয়ার কেন্দ্রীয় অন্তরালে অবিকৃত সত্তার প্রেম প্রেরণার রূপতত্ত্বটি; বিশ্বজাগতিক গতির কল্পনা করেছে ৮ সংখ্যক কবিতা। ৩৭ সংখ্যক কবিতায় রাষ্ট্রীয় ক্লেদমুক্তির জন্য বিপ্লবের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র কাব্যটি প্রকাশ করে চলেছে এক অনির্বচনীয় গতিচেতনাকে। কবি অনুভব করেছেন সমস্ত আপাতঃ সচলতার অন্তরালে এক অস্থির গতির প্রেরণা। আভ্যন্তরীণ গতির প্রেরণাতে আমাদের বিশ্বজগৎ, জৈবজগৎ, সভ্যতা, ব্যক্তিমানুষ কেবলই বিবর্তিত হতে হতে চলেছে। "We change without change and·the state itself is nothing but change." (Creative Evlution–Bergson)

বলাকার সব কবিতাগুলি এই গতিচেতনাকেই ব্যক্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "...এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধারার মানুষে, সকলে এক জায়গায় চলেছে। তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ, তা জানি না। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি না, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী এখানে নয় এখানে নয়।" শান্তিনিকেতন পত্রিকা—১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ) আমরা লক্ষ্য করছি কবি অকারণ অবারণ চলার খুব কাছাকাছি এসেছেন। এরপর যখন চঞ্চলা কবিতায় তিনি বলেন 'চলেছ যে নিরুদ্দেশ, সেই চলা তোমার রাগিণী'— তখন তো তা অনির্দেশ্য গতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি এই উদ্দেশ্যহীণ গতির বাণীকে অতিক্রম করে দেখেছেন সমস্ত গতিই একটি শান্ত, কল্যাণময়, বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ব্যাপ্ত। তাই তাঁর পরিণততর উপলব্ধি—'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।'

সত্যের এই 'একম্‌এবঅদ্বিতীয়মে'র শিবচতেনার বিস্তৃতি আকাশ পটে বিশ্বজাগতিক সকল গতি নিজেকে বিচিত্রভাবে ও রূপে অভিব্যক্ত করেছে। ঈশোপনিষদের কবির যে উপলব্ধি গতিশীল এই জগতের গতিময় সকল কিছু ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত, 'ঈশোস্বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ'- তারই সমধর্মী হয়েছে রবীন্দ্র-চেতনা, বলাকার আকাশ সেই ব্যঞ্জনা সেই 'সত্য' সেই শিব সেই চিরন্তন একের প্রতীক।

'বলাকা' নামের কবিতাটির প্রেরণা পক্ষীদলের উড়ে চলার অপূর্ব সৌন্দর্যও কবির মনে মুদ্রিত করে দিয়েছিল তাদের পাখার আন্দোলন শুধু গতিকে আভাষিত করেনি। ঝঞ্ঝতামদরসে মত্ত, সেই পক্ষ সঞ্চালন, রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে বিস্ময়ের জাগরণ আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই গতি দর্শনকে অতিক্রম করে বলাকার কবিতাগুলি আনন্দময় উপলব্ধিতে অভিব্যক্ত। তিনি দর্শন বা তত্ত্বকথার পুঁথি তৈরী করেন নি। গতির সৌন্দর্যময়তাকে প্রকাশ করে তা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। 'বলাকা' নাম করণটিতে তত্ত্বগত ব্যঞ্জনার সঙ্গে সেই

সৌন্দর্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। সেদিক থেকেও নামকরণটি সার্থক।

'বলাকা' কাব্যের শুরু ও শেষ হয়েছে যৌবনের জয়গান দিয়ে। তারুণ্য গতির প্রতীক যা জীবনের স্থবিরতা দূর করে দেয়। নবীন জীবনশক্তি যা অবারিত প্রাণশক্তির প্রতিক। সকল দীনতাকে, জড়তাকে দূর করে নতুন জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে। চিরতারুণ্যই হল জীবনের পঙ্গুত্ব এবং ব্যর্থতাই সূচিত করে। গতি আছে বলেই প্রকৃতি চির জীবন্ত রূপের পরিচয় দিতে পারে। চিরকাল এগিয়ে যাওয়াই প্রকৃতি এবং মানুষের ধর্ম। বলাকা সেই যৌবন ধর্মের প্রতীক। তাদের উদ্দাম গতি তাদেরকে সজীব ও তরুণ করেছে। একটি সুন্দর ছন্দবদ্ধ গতিতে তারা এগিয়ে চলে অজানা, অচেনায়, সবকিছুকে ছেড়ে, পেছনে ফেলে সকল জড়ত্বকে অস্বীকার করে এই অচেনার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে বলাকা। বলাকা পাখিদের এই যৌবনধর্মের চলিষ্ণুতাকে কবি বন্দনা করেছেন। সেদিক থেকেও নামকরণ বেশ সার্থক বলে মনে হয়।

আসলে বলাকার কবিতাগুলি উৎসারিত হয়েছিল স্বদেশ, বিশ্ব, এবং ব্যক্তি জীবনের এক পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে আভ্যন্তরীণ এক সমূহ আলোড়নের অভিব্যক্তি হিসাবে। সকল জড়তার বিরুদ্ধে গতিদীপ্ত যৌবনের অভিযান-এ কাব্যের মূল সুর। ঈশ্বরের মহিমা নয় অনাগরিক মানুষের অভিযাত্রী স্বরূপ রচনাই কবিকে প্রাণিত করেছে। কবির নিভৃত স্বপ্নরাজ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপ্ত কর্ম প্রবাহের আহ্বানে এক নায়কের ভূমিকা নিচ্ছেন, কবির সঙ্গে যোগ দিচ্ছে এক কর্মী সত্তা। বিশ্বযুদ্ধের ক্লেদাক্ত রক্তপাত, জাতি বেরিতা এবং লোভ মানুষকে যে অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, বলাকার কবি সেই অন্ধকার মোচন করার জন্য দায়বদ্ধ। তাঁর এই অভিযাত্রীস্বরূপ আত্মস্থ করে নিয়েছে। সমকালীন ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বের্গসঁর গতিতত্ত্বটিকে ভাবনা কল্পনার এই বিশিষ্টতার ধারক হিসাবে। উপস্থিত হয়েছে এক বিশিষ্ট কাব্যআঙ্গিক। সমিলমুক্তবন্ধের Pattern রচিত হল বলাকার ছন্দে তা পরিচিত হয়েছে 'বলাকার ছন্দ' নামে। এইভাবে সমগ্র কাব্য হয়ে উঠেছে একটি সম্পূর্ণ পাঠ। এবং কবি এই কাব্যে গতির সৌন্দর্যময়তাকে এবং সৌন্দর্যের গতিময়তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। জীবনে জগতে সমাজে রাষ্ট্রে সর্বত্র গতির রসময় উপলব্ধিকে ধারণ করে আছে কাব্যের কবিতাগুলি। 'বলাকা' নামকরণটিতে তত্ত্বগত ব্যঞ্জনার সঙ্গে এই সৌন্দর্য ও অভিব্যঞ্জিত। সেদিক থেকেও নামকরণটি তুলনাহীন ইঙ্গিত গর্ভ।

॥ নয় ॥

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ঃ গতিরাগের জীবন-দর্শন

প্রাচীন ভারতবর্ষের দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে, সত্য স্থির ও অচঞ্চল। শঙ্করাচার্য সত্যের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'কাল এয়া বাধিতং সত্যম্।' অর্থাৎ, সত্য ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে সমভাবে অবস্থিত, সত্য ত্রিকালে অপরিবর্তিত ও চিরন্তন বিরাজিত। কিন্তু বর্তমান যুগে দর্শনের সিদ্ধান্ত হল সত্য গতিতে, স্থিতিতে নয়। প্রকৃত অর্থে, গতি এমন কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ভূ-বিশ্বে নেই, যাতে গতি নেই তা নিছক কল্পনামাত্র; তা সত্য নয়। যার জীবনীশক্তি আছে, সে আর সকল জিনিসকে নিজের করে তবে নিজেকে প্রকাশ করে। গতি বস্তুর এক্টা অবস্থা মাত্র নয়—কাজেই বস্তু ও স্থান—কালের সম্পর্ক মাত্র গতি নয়। কাল অবিভাজ্য, অনন্ত প্রবহমান এই কালচেতনায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নেই। স্থানও অনন্ত, কেবলমাত্র বস্তুর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের ক্ষেত্র বিশেষে কাল ও স্থানকে প্রভাবিত বলে মনে হয়। নিরবচ্ছিন্ন স্থান বা কাল বলে কিছু নেই। কেবল বস্তুর গতিতেই আমাদের মনে স্থান কালের বোধ জন্মায়। অতএব গতিই একমাত্র সত্য। অতএব সত্য অনন্ত প্রবহমান, সত্য অবিভাজ্য। অবশ্য গতিরুদ্ধ হলেই সত্য জীবনহীন হয়ে পড়ে এবং জড় বস্তুতে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথও বলাকা কাব্যের সমস্ত কবিতার মধ্যেই এই গতিবাদকে সত্য বলে প্রচার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' গতিরাগের কাব্য। চলমান বিশ্বজীবনে স্পন্দমান নিত্যগতির আনন্দবাণীই রবীন্দ্রবাণী। রবীন্দ্র ব্রহ্ম এই গতি ব্রহ্ম। রবীন্দ্র সাধনা এই গতির সাধনা। এই 'বলাকা' কাব্য রবীন্দ্র প্রতিভার পরিণত পর্বের প্রকৃষ্ট ফসল। এর রচনাকাল ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ খ্রিঃ। তখন পৃথিবীর পশ্চিমদিগন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ মারণ যজ্ঞে সারাবিশ্ববাসীর মনে ত্রাসের শঙ্কা করছে। 'বলাকা'র কবিতাসমূহ সেই অস্থির সময় চিত্রের গতিময় জীবনপ্রবাহের দোলায় মুখরিত। আন্দোলিত, স্থিতি বিরোধিতায় এই কাব্যের জন্ম। 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে' দুরন্ত প্রাণশক্তি সম্পন্ন নবীনের বন্দনায় এই কাব্যের সূচনা। সমাপ্তি পুরাতন বৎসরে জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'র অবসানে নববর্ষের আশীর্বাদ'-এ। আসলে 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ চলমান বিশ্বপ্রবাহের একটা নতুন দিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সেই দিকটা হল, বিশ্বের গতির দিক। এই 'বলাকা' কাব্য রচনার কিছুকাল পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনের মধ্যে যে গতিবাদী চিন্তাধারা তার অন্তরকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা বলা বাহুল্য। সেই সময় ইউরোপীয় দর্শনে বার্গসঁ বিশেষভাবে এই গতিবাদী চিন্তাধারাকে তাঁর দর্শনের মূল উপজীব্য করে তুলেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, সমগ্র বিশ্বপ্রবাহে রয়েছে এক স্পন্দমান গতির চাঞ্চল্য। বলাকার কবি সম্বন্ধে এই ধারণা সাধারণত প্রচলিত যে, কবি 'বলাকা' তেই এসে বিশ্বগতি উপলব্ধি করলেন। 'বলাকা' মূলত গতিরাগের কাব্য এই কথা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্বপ্রবাহের অন্তরালবর্তী এই গতির দিকে কবির সচেতনতা এই প্রথম বা আকস্মিক

নয়, বরং আজন্ম উপনিষদিক চেতনায় লালিতি। তবুও ভারতীয় ঔপনিষদীয় দর্শনের সাথে 'বলাকা'র গতিভাবনার সম্পর্ক আলোচনার আগে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ইংরেজী শব্দ Creation কে বাংলায় আমরা সৃষ্টি আর Evolution-কে বলি অভিব্যক্তি বা পরিণতি। এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে, তা নিয়ে এইসব প্রশ্ন দেশে দেশে, যুগে যুগে দার্শনিকেরা তুলেছেন। এই প্রশ্নগুলি হল—অসৎ থেকে সৎ হয়েছে? অর্থাৎ কিছুই ছিল না—সেই অবস্থা থেকে কিছু হয়েছে? ঈশ্বর কি সব সৃষ্টি করেছেন? অর্থাৎ, যাঁরা বলেন, অসৎ থেকে সৎ, শূন্যতা থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই পূর্ণতা তাঁরা সৃষ্টিবাদী। আর অপরিদকে পরিণতি বা অভিব্যক্তি বিশ্বাসীরা বলেন যে, অসৎ থেকে সৎ হয় না, অথবা প্রথমে কিছুই ছিল না বা, কিছু থাকতে বা হতে পারে না। কিন্তু কিছু সম্ভাবনা ছিল সেই সতের পরিণতির ঘটমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে, আর মূর্তির অদল বদলে তার থেকেই আর সবকিছু হয়েছে। এই যে রূপান্তর ঈশ্বর ঘটান না বা এ কারো কাজও নয়। এই সামগ্রিক পরিবর্তনের পক্ষেই টেথিস মহাসমুদ্র থেকে যেমন হিমালয় পর্বতের উত্থান, আবার ঠিক তেমনি সরীসৃপের বংশে একদলের পাখি হয়ে আকাশে ওড়া—যেন, সবকিছুই আপনা থেকেই নিজস্বতার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

তবে সকল অভিব্যক্তিবাদী ঈশ্বর অবিশ্বাসী নন। অভিব্যক্তিদের মধ্যেও দুইটি গোষ্ঠী। এক গোষ্ঠী বিশ্বাস করেন, এই যা কিছু জড়বস্তু তা কোনো একজন পরম স্রষ্টার সৃষ্টি। এই যা কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল অথবা এক কথায়। প্রাণ অর্থাৎ সেই আদিরূপের পশ্চাতে কোনো ঐশ্বরিক স্রষ্টা আছেন। জড়ের ধর্ম থেকে প্রাণের ধর্ম স্বতন্ত্র। প্রাণের এমনকিছু স্বয়ংক্রিয় ও স্বনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি বর্তমান যার স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য জড়ের মধ্যে নেই। এই প্রাণ সত্ত্বা কোনো ঐশ্বরিক সত্ত্বার থেকে সৃষ্টি হতে বাধ্য। শুধুই জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হয় নি। এইসব কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা প্রাণবাদী বা Vitalist। আর যাঁরা প্রাণকে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করেন যে, জড় থেকেই প্রাণের উদ্ভব, তাঁরা যন্ত্রবাদী বা Mechanist।

ভারতবর্ষের সাংখ্যদর্শনকে অভিব্যক্তিবাদী বলা যায়। নিরীশ্বর সাংখ্য, দর্শন এই পাশ্চাত্য অভিব্যক্তি বাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সদৃশতার সম্বন্ধে আবদ্ধ। 'সর্ববিৎ সর্বকর্তা' অর্থাৎ সব জানেন ও সব করেন এমন একজন সর্বশক্তিমান পুরুষে সাংখ্যদর্শনের বিশ্বাস আছে। কিন্তু সেই পুরুষ সৃষ্টিকর্তা—এই বক্তব্যে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, এই জগৎ সংসার প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলমাত্র। এই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে আবার মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত যোগদর্শন শাস্ত্রও আছে। এই যোগদর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাই একে বলা হয় সেশ্বর সাংখ্য। জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ, এই ধারণার পেছনে এমন বিশ্বাস কাজ করছে যে রূপের বিচিত্র পবির্তনে, সব কিছুই অন্যতর, নতুনতর সৃষ্টি বলে মনে ভ্রম সৃষ্টি করছে। কিন্তু যা আদিতে ছিল অর্থাৎ, সত্যসম্ভব স্বরূপাদি থেকেই সমস্ত কিছুই রূপ থেকে রূপান্বয়ে কালক্রমে নিজে থেকেই আপনাকে ব্যক্ত করেছে। এইসব ভাবনার বীজসূত্র ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সৃষ্টি সূক্তের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এই সূক্তের প্রতি আগ্রহবশতঃ তাঁর কুড়ি বছর বয়সে লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর 'প্রকৃতি পুরুষ' রচনায় যে কথা বলেছিলেন ঠিক তদনুরূপ উক্তিই তিনি আবার আশি বছর বয়সে রোগশয্যা থেকে

লেখা একটি চিঠিতে সেই সূক্তেরই উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন, 'আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী যা কো বেদঃ অর্থাৎ কে জানে।' তার রবীন্দ্রনাথ যে উপনিষদের গতি মন্ত্র 'চরৈবতি' ছাড়াও যে সাংখ্যদর্শন ও ঋগ্বেদের সৃষ্টি সূক্তের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বলা যেতে পারে। ভারতীয় দর্শনের মূল প্রস্থানগুলির (বিভাগ) মধ্যে সাংখ্যদর্শনকে নিঃসন্দেহে অভিব্যক্তিবাদী বলা যায়, সাংখ্যদর্শন মতে, জগৎ প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জের আধার। ইউরোপীয় দর্শন সম্প্রদায়ে অনেক উনিশ শতকীয় অভিব্যক্তিবাদী জগৎকে প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্র বলেন। কিন্তু তার অতিরিক্ত কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব তাঁরা অস্বীকার কবেন। সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তিবাদ বা পরিণামবাদ আর আধুনিক ভৌত ও জীববিজ্ঞান ভিত্তিক অভিব্যক্তিবাদ কখনোই এক নয়। কিন্তু 'বলাকা' কাব্যে প্রতিফলিত রবীন্দ্রগতিদর্শনের অভিব্যক্তি, চিন্তা ও ভাবনা, অনুভব ও কল্পনা আধুনিক ইউরোপীয় ভৌত ও জীব বিদ্যার জ্ঞান বিজ্ঞানের সমধর্মী। কাজেই 'বলাকা'র গতি দর্শনে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা পদ্ধতিতে যে ঔপনিষদিক 'চরৈবতি' গতির মন্ত্র দর্শনের প্রভাব সর্বাংশে প্রত্যক্ষ একথা খুব জোরের সাথে একতরফাভাবে বলা যাবে না।

তবে একথা সত্য যে, উপনিষদে জগতের সবকিছুকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এই ব্রহ্ম যেমন স্থিতিস্বরূপ, তেমনি গতি স্বরূপ। ব্রহ্ম যেখানে অক্ষর ও অব্যয়, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত সেখানে তাঁর কোনো বিকার নেই, তিনি অকার, অব্রণ, অস্নাবির (শিরাহীন) আবার যেখানে তিনি কবি ও মনীষী, সেখানে তিনি সচল ও গতিস্বরূপ। ঈশোপনিষদের অষ্টম বচন বা সূক্তো তা বলা আছে, 'তদেজতি তন্নৈজতি'—পঞ্চম বচন বা সূক্তে বলা হয়েছে, 'তদেজতি তন্নৈজতি'—অর্থাৎ, ইনি চলেন, ইনি চলেন না। যেখানে যেখানে তিনি চলেন না, সেখানে তিনিই অবিচল স্থিতিস্বরূপ। কাজেই তিনি এইভাবেই আপাতঃ বিচারে পরস্পর বিরোধী গুণান্বিত। ঈশোপনিষদের গতিস্বরূপ ব্রহ্মের ধারণা থেকে 'বলাকা'র কবির মনে গতির ধারণা আসে নি। গতিভাবনার মূলে আছে অভিব্যক্তির ধারণা। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ধারণায় কবির মন তখন সমৃদ্ধতর হচ্ছিল। তার বহুপ্রমাণ আমরা রবীন্দ্ররচনাবলীর ভেতর থেকেই আমরা সন্ধান করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ত্রিশ বছর বয়সে লেখা য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি নামক ভ্রমণ গ্রন্থের একজায়গায় তিনি লিখেছিলেন, 'Wallace-এর Darwinism পড়ছি, বেশ লাগছে..ইত্যাদি।' আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ছিলেন ডারউইনের সমসাময়িক একজন জীববিজ্ঞানী। বলা যেতেপারে যে, এদেরই যুগ্ম প্রচেষ্টায় প্রাণের জগতে বিবর্তনবাদী চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ বার্গসঁর পূর্বসূরীদের অভিব্যক্তি তত্ত্বের সাথে বার্গসঁর রচনা প্রকাশের আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। আবার এই কথাও সত্য নয় যে, উপনিষদের জগৎতত্ত্বে গতির ধারণা নেই এবং অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মের ধারণায় গতির ধারণার কোনো অবকাশ নেই। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য দর্শনে, ঔপনিষদীয় চিন্তায় কিংবা বৌদ্ধদর্শনের প্রতীত্য সমুৎপাদতত্ত্বে গতির ধারণা থাকা এক ব্যাপার আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ভিত্তিক অভিব্যক্তির তত্ত্ব ব্যাখ্যান আরেক জিনিস। কাজেই 'বলাকা'র কবিতার অনন্বয়ী ভাবনায় গতিসূত্র একদিকে যেমন ইউরোপীয় অভিব্যক্তিবাদ ভিত্তিক বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে এসেছে আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রভাবনায় আজন্ম লালিত ঔপনিষদীয় চরৈবতি গতি মন্ত্রের ঐতিহ্যসূত্রেও এসেছে। তবে বার্গস-র Creative

Evolution মূল ফরাসি ভাষায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজি অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বার্গর্সঁর লেখাপড়া ও না পড়ার থেকে বার্গসর পূর্বসূরীগণের গতিভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাহ্যিক ও আন্তরিক পরিচয় যথেষ্ট রয়েছে। অবশ্য ইউরোপীয় চিন্তাদর্শনে গতিবাদের ধারণা গ্রীকদর্শনের যুগ থেকে বিদ্যমান ছিল। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পারমেনাইডিস বা, পারমেনডিস বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে গতি বিদ্যমান কিন্তু সত্য স্থির ও গতিহীন। পারমেনাডিসের চিন্তায় ছিল সত্য ও ধ্রুবত্বের চেতনা কিন্তু তাঁর পরবর্তী গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের ভাবনা ছিল, এর বিপরীত। তিনি বিশ্বাস করতেন গতি সত্য ও চিরন্তন—গতি ও বিরোধের সংঘাতেই বিশ্বসৃষ্টি। হেরাক্লিটাস 'being'-এর ধারণা যত না বিশ্বাস করেছেন তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছেন শাশ্বত নিয়তির শক্তিতে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস উপলব্ধি করেছেন গতির রহস্যে—'You can not stay twice into the same river, for fresh water are everflowing upon you.' আবার জার্মান দার্শনিক হেগেলের চিন্তায় সৎ ও গতি এই দুই তত্ত্ব অদ্বয় মূর্তি হয়ে সহাবস্থান করে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। এই পূর্ণ পরিণতি হল এক অন্তহীন প্রয়াসের দ্বারা পূর্ণাভিমুখী। হেগেলের তত্ত্বে এই পূর্ণকে বলা হয়েছে 'Perfection' আসলে এই জীবন তত্ত্ব একাধারে পূর্ণতা ও অপূর্ণতা এই দুই তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে। তার Infinite তত্ত্ব প্রকাশ অপ্রকাশ, সীমা অসীমা, বিশেষ অশেষের দ্বন্দ্ব লীলায় নিত্য চঞ্চল। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সাথে হেগেলের চিন্তার সাদৃশ্য। বার্গর্সঁ-এর তত্ত্বে স্থিতিতে বস্তুর রূপ ও স্তূপ জমা হয়ে ওঠে। বস্তুর গতিতেই প্রাণের জন্ম। শুধুমাত্র বস্তুর সঞ্চতায় জড়তার বন্ধন জন্মায়। তাই বার্গস তাঁর Creative Evolution তত্ত্বে বলেছেন—Change alone is real. তাঁর ভাষায় এরই নাম elan vital বা প্রাণপ্রেতী—একটা প্রচণ্ডশক্তি যার প্রেরণায় এই শক্তি চলমান, চৈতন্যময়ী। শাশ্বতী বুদ্ধির পক্ষে-এর পালাবদলের কার্যকারণ বিচার করা একেবারে অসম্ভব। super intellectual Intution-এর পক্ষেই সম্ভবপর। বৈজ্ঞাদিক তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও তিনি এই Intution-এর সহায়তা নিয়েছিলেন। আর এই বোধের শুভ জাগরণেই বার্গস উপলব্ধি করেছেন বিশ্বমানুষ হল ব্যক্তি, মানুষেরই বৃহত্তম সংস্করণ। আসলে বিশ্বমনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিত্য নিয়ন্ত্রণ করে সে সৃষ্টিতত্ত্বকে অবিচ্ছিন্ন গতিধারায় রাখে অব্যাহত রচনা করে নব নব পৃথিবীর। বার্গর্সঁ-র কথিত ঈশ্বর ও এই বিশ্বজীবনের গতিলীলার অন্তরঙ্গ প্রেরণা শক্তি। এখানে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব চিন্তার সঙ্গে বার্গর্সঁ চিন্তার সাদৃশ্য আছে। কবির 'Creative Unity' ও 'Personality' গ্রন্থে এইরূপ চিন্তাই ভিন্নতর রূপে প্রকটিত হয়েছে। বিশ্বসৃষ্টি, প্রাণীজগতের জন্ম-মৃত্যু দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত কোনো কোনো বার্গসীয় তত্ত্বের সাথে রবীন্দ্র চিন্তার সাদৃশ্য আছে।

গতির আহ্বান প্রসঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারেই কবির আন্তরিক পরিচয় ছিল। 'পথিক' কবিতাতে দেখি পাখির রূপকে কবির অন্তপুরুষের চলার আকুলতাকে—

"তোমরা তরুণ পাখি পড়েছ প্রভাতে
সকলে মিলিয়া এক সাথে
এ পাখি এ শুষ্ক শাখে একেলা কেমন থাকে।
এই ছিন্ন জীর্ণ পাখা বিছায় গগনে যাব প্রাণপণে।"

এই পাখিই তো দেখি 'বলাকা'র ৩৬ সংখ্যক কবিতায় বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিতা চলিল আকাশে। আবার—

'এই বাসা ছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন পার হতে কোন পারে।'

এইভাবে গতিকে নদীর চিরচঞ্চলময় স্রোতের রূপকে দেখি প্রভাত সঙ্গীতে'র স্রোত কবিতাটিতে—

'জগৎ স্রোতে ভেসে চল যে যেথা আছ ভাই
চলেছে যেথা রবিশশী চলবে সেথা যাই।'

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এ কবির জীবন নির্ঝরের প্রধান হল—আমি যাবো, আমি যাবো, সেই নির্ঝরই বলাকাতে নদী হয়ে দেখা দিয়েছে। 'কল্পনা' কাব্যের 'দুঃসময়' কবিতাটিতে দেখি কবির অন্তরে অস্তিবাচক প্রশান্তি—আছে শুধু পাখা আছে মহানভ—অঙ্গন। 'বলাকা'র অব্যবহিত পূর্বেই তাঁর সঙ্গীতের ডালি গীতাঞ্জলি (১৯১০) গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৫)-তে সাজান হয়েছিল। এখানেও তো চলার কথা বলা হয়েছে। তবু বলাকা কেন পৃথকরূপে গতিবাদী কাব্য বলে চিহ্নিত? আসলে এই 'গতির পরিমণ্ডলে কবি নিভৃত গৃহকোণের পূজায়তি ঘণ্টাধ্বনিকে উপেক্ষা করে জীবন ও ভুবনের ডাক শুনে চলার কথা বললেও এখানে কবি ঈশ্বর বিশ্বাসীভক্ত। আত্মনিবেদনই সেখানকার প্রধান সুর। অহং বা Supreme anality বিসর্জিত হয়েছে। এখানে যে গতির আহ্বান তা স্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েই। এই দিকটি 'বলাকা'র গতিবাদের ঠিক উল্টো।

'বলাকা'র অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাব্যদ্বয় 'গীতাঞ্জলি' অথবা 'গীতিমাল্য'তে রবীন্দ্রনাথ প্রায় আত্মসমাহিত বিনম্র। আত্মনিবেদনের আকুতিতে পরিপূর্ণ সেই রচনা। প্রশান্ত আধ্যাত্মিক এক পরিমণ্ডল সেই কবিতা বা গানগুলিকে ঘিরে রেখেছে। সেখানে কবির আন্তরিক প্রার্থনা—

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।........'

(গীতাঞ্জলি-১ নং)

গানে কবি ঈবারের জয়গান করেছেন। কিন্তু 'বলাকা'তে তাঁর অন্তরতর পুরুষটির বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তাই বলাকা গতিবাদ বিবর্তন ধর্মীতাতে বিশিষ্ট—

'মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।'

এখানে ঈশ্বরকে কবি স্বীকার করেছেন। কিন্তু কবি পুরুষটির অহং বিস্ফারিত, সম্প্রসারিত ও বিবর্তিত। 'বলাকা' এই আত্মসম্প্রসারণের কাব্য। 'গীতাঞ্জলি'-তে আত্মনিবেদনের পর্ব। আর এই তিনটি 'গীতিকাব্যে'র পরেই কবির বজ্রকণ্ঠের আহ্বান ধ্বনিও হল 'বলাকা'র কবিতায়। তাই কাব্যটির গতিচেতনা অভিনব বলে মনে হয়েছে।

অবশ্য বলাকার মূল গতিতত্ত্বটি হল পৃথিবীতে জীবাত্মার প্রবাহ অনাসক্ত রূপে স্থিত। এই তত্ত্বকে আত্মস্থ করে ভাবের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করেছেন কবি। কারণ সাহিত্যের

প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নয়, ভাবের বিষয়। 'বলাকা'য় শুধুমাত্র ভাবনা প্রাধান্য ঘটলে তা সাহিত্যের রস সার্থকতা থেকে নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হতো। কবি তাঁর বক্তব্যকে ভাবের বিষয় করে তুলেছেন। কারণ, অন্তরের জিনিসকে বাইরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে চিরকালের করে তোলাই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। 'বলাকা'-য় রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়ে সচেতন। তাই এই দার্শনিক চেতনা দেশ কাল সমাজ সচেতন কবি সৃজন কল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রে রূপময় এবং রসময় করেছেন। 'বলাকা'র গতি তার চিহ্ন রেখে যায় রাষ্ট্রে, ইতিহাসে, প্রেমে। রাষ্ট্রের দুঃসময়ে তিনি সচেতন করেছেন যুবশক্তিকে তাদের প্রাণের গতিটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে—

'চিরযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।'

(১ নং)

পৃথিবীর ইতিহাস এই গতি প্রবাহেই কালে কালেপরিবর্তিত। প্রমত্ত এই গতিতেই সভ্যতা প্রাণ পায়। তাজমহল সম্রাট শাজাহানের প্রেমের কীর্তি, কিন্তু এই কীর্তি রক্ষিত হচ্ছে আজ কার দ্বারা? সম্রাট আজ নেই, তার সৈন্যবাহিনীও নেই, তবু প্রেম আছে মৃত্যুর প্রবাহেই। যেখানে শাহজাহানের দীর্ঘশ্বাস নিত্যকার আকাশকে সকরুর আর্তিতে আচ্ছন্ন করে রাখলো সেখানে তাজমহল মৃত্যুঞ্জয়ী বিলুপ্তির মাঝখানেও তাজমহল প্রেমের অবিনশ্বর মহিমাকে ঘোষণা করে চলেছে—

'এক বিন্দু নয়নের জল।
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল। (৭ নং)
কিন্তু 'যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে।'

(৭ নং)

সে প্রেম মৃত হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রেম —ৰআবর্জনা নয়, তা সম্মুখের পথ রুদ্ধ করে না। তাই মৃত্যুর পরেও কবির প্রেম বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। তাই—

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।'

(৬ নং)

'বলাকা'য় স্পষ্টরূপে যাত্রার কথা তো বলা হচ্ছেই এছাড়া এখানে রক্তসন্ধ্যা, রক্তজবা, রক্ত আলো, লালচেলি, রক্তবাস, রক্তমেঘ সমস্তই পর্যায়ভাবে যাত্রার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত।

'রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয়না বধূর বেশে গো।'

(২ নং)

বিবাহের লালচেলির অনুষঙ্গেই বলাকায় লালরঙের আভা প্রসঙ্গটি অনুসন্ধেয়। বিবাহবধূর প্রসঙ্গেই 'বলাকা'য় লালরঙের তাৎপর্য। বিবাহবধূর তাৎপর্যই এখানে জীবনের একটি অধ্যায়ের

অবসান ও নবজীবনের যাত্রীরূপে নতুনকে বরণ করে নেবার রূপকে অভিব্যঞ্জিত। রবীন্দ্র-কল্পনায় বিবাহ কখনো বা মৃত্যুর রূপক, কেননা মহৎ মৃত্যু তাঁর কাছে জীবনের সমাপ্তি নয়।

এও একপ্রকার যাত্রা——
'সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার'

(শেষ লেখা' ১ নং)

আবার এই যাত্রার ভাবানুষঙ্গেই 'বলাকা'য় কবির প্রিয় প্রতীক নদী আর পাখি। জগৎকে তিনি বলেছেন—

'হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিকল
চলে নিরবধি।'

(৮ নং)

জগতের চলা নদীর প্রতীকে উপস্থাপিত। আবার 'জগৎ' শব্দে তো গতিই বোঝায়। 'জগৎ' শব্দটি তো 'গম্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। 'গম্'-এর অর্থই হল গমন করা। সেই অনুভবকে কবি রূপকায়িত করেছেন—

'মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।'

(৮ নং)

এতে বহুজন্মের মধ্যে আগত একটা প্রাণ প্রবাহের বোধ প্রকাশ পেয়েছে। ৩৬ নং কবিতায় জগৎব্যাপী গতিশক্তির প্রকাশ ও পরিণাম যুগপৎ লক্ষ্য করা যায়। এই কবিতার মুখপত্র নিশ্চল পরিদৃশ্যমান জাগতিক বস্তুর মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল বিপুল বেগের আবেগ। পর্বতকে বলা হয় অচল, কিন্তু গতিবেগের আবেগে স্পন্দিত কবি উৎপ্রেক্ষায় অনুভব করলেন, পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। শুধু তাই নয়, গিরিমূলের পাদপশ্রেণী সেদিন মাটির বন্ধন মোচন করে 'বলাকা'র পাখার শব্দের বিদ্যুৎছটায় যেন দিশেহারা হতে চাইল। তাদের প্রাণে, তাদের বুকে যেন এই বাণীই উচ্চারিত—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে—এখানেই গতিবাদী দার্শনিক ও রূপবাদী কবির মধ্যে পার্থক্য।

বার্গসঁ-এর লেখা রবীন্দ্রনাথের পড়া বা না পড়াটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হল তাঁর নিজস্ব মননের বিকাশের ক্ষেত্রে সেই উপাদানিক সত্যের সাথে আপন দেশ ও কালের একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন, রবীন্দ্রজীবন ভাবনার উদ্দীপন বিভাব হিসাবে বহির্বিশ্বের উপাদানিক সত্য স্বরূপ যেমন উপনিষদও ছিল, তেমনি আবার ইউরোপীয় সাহিত্যবিজ্ঞান

দর্শনও ছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যে সমালোচকদের অনেকের মধ্যে নানা পরস্পর বিরোধীগোষ্ঠী দেখা যায়। শুধুমাত্রই উপনিষদ সন্ধানীদের আমরা যেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি, তেমনি ইউরোপীয় ধ্যানধারণা রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখে যাঁরা আনন্দিত হন তাদের এই একদেশদর্শী ধারণাতেও আমরা আহত হই। এই দুই গোষ্ঠীই অবশ্য ভুলে যান যে, যারই সারবস্তু আছে, তা আত্মস্থ করার দিকেই রবীন্দ্রনাথের ঝোঁকছিল সারাজীবন।

দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করলে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হতে পারে। 'বলাকা'র ২৯ সংখ্যক কবিতায় যখন কবি বলেন যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা/আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা। তখন বলতে পারি এখানে উপনিষদ আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার একাকিত্বের ভীতি জেগেছিল অর্থাৎ 'সোহবিভেৎ সঃ' (তিনি অর্থাৎ প্রজাপতি) 'অবিভেৎ' (ভীত হয়েছিলেন) [১/৪/২] সেই ভীতি থেকে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ-সঃ (তিনি) দ্বিতীয়ম্—দ্বিতীয় (অর্থাৎ, একজন স্ত্রী) ঐচ্ছৎ (ইচ্ছা করলেন অর্থাৎ চাইলেন) —১/৪/৩। অর্থাৎ পরম স্রষ্টার একা থাকতে ভালো লাগছিল না। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন—তিনি তাঁর দেহকে দুইভাগে ভাগ করলেন—এভাবে পতি ও পত্নীজাত হলেন। তাঁদের মিলনে মানুষের জন্ম হল। প্রজাসিসৃক্ষু প্রজাপতি অপত্যোৎপাদন করলেন। তাঁর নিজেকে দেখা হচ্ছিল না, আত্মদর্শনের ইচ্ছাতৃপ্ত হচ্ছিল না, সেই ইচ্ছা থেকে তাঁর মনের মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছা জেগে ছিল। একা থাকার সময় আপনাকে দেখাব সুযোগ মিলছিল না, তাই নিজেকে দেখার জন্য, নিজের কামনা তৃপ্তির জন্য তাঁর পুত্র হলো, কন্যা হলো এবং এঁরা তাঁর প্রিয় হলো। এইরকম ঔপনিষদিক ভাবনা থেকে 'বলাকা'র ২৯ সংখ্যক কবিতাটি উৎসারিত। এই পর্যন্ত যা বলা হলো তা সত্য। কিন্তু এর পরেও আরেকটি গভীরতর সত্য কথা উচ্চারণ করতে হয়। এই কবিতায় ডারউইন ওয়া-লেস প্রমুখের অভিব্যক্তি সম্মত তত্ত্বকথা ও পরে আছে। যেমন--'আমায় তুমি মরণ মাঝে লুকিয়ে ফেলে। ফিবে ফিরে নূতন করে পেলে।' মানুয অনেক প্রাণীপর্যায় অতিক্রম করে বিবর্তনের সূত্রে বর্তমানের আকৃতি ও প্রকৃতি পেয়েছে। পরম স্রষ্টা তাঁর লুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে মানুষকে লুকিয়েছেন। এই লুকানো বা স্বেচ্ছায় হারানোব পালা সঙ্গে করে আজ তিনি মানুষকে বর্তমান রূপে পেয়েছেন এবং মানুষের সঙ্গে মিলনে স্রষ্টা নিজেকে ধন্য বোধ করছেন। কবিতার এই উদ্ধৃতিতে অভিব্যক্তিতত্ত্বের এই অতি সাধারণ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত আছে। এমন ইঙ্গিত উপনিষদে খুঁজতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা মাত্র। তবে ঐতরেয়োপনিষদে আছে—'আত্মা বা ইদমেক এ বাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষতে লোকান্নু সৃজা ইতি। (অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছু ছিল না। সেই আত্মা এইরূপ ঈক্ষণ করলেন—আমি লোকসমূহ সৃষ্টি করবো)। তার যেভাবে পরম স্রষ্টা ক্রত মানুষকে চক্ষু, মুখ, নাসিকা, কর্ণ, লোম, মন, আপস, নাভি, রেতঃ, শিশ্ন সব মিলিয়ে সৃষ্টি করলেন। কাজেই এইভাবেই তাঁর কবিতা প্রাচীন ঔপনিষদীয় ভাবনায় আরম্ভ হয়ে অচিরেই গিয়ে পৌঁছায় আধুনিক বিশ্ববীক্ষায়। আধুনিক বিশ্ববীক্ষার ও জীবন বিষয়ে ভাবনার মূল কথাটাই হল, এই বিশ্ব, তার অন্তর্ভুক্ত আমাদের পরিচিত এই ক্ষুদ্রায়ত পৃথিবী এবং এই পৃথিবীতে জড়রাজ্যে উন্মোচিত প্রাণকলা থেকে আরম্ভ করে মানুষের আবির্ভাব সমস্ত ব্যাপার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছে। এমনকি যাঁরা পরম স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁরাও বলেন যে, সৃষ্টি অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে রূপ থেকে রূপান্তরে ক্রম অগ্রসরমান হচ্ছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিবর্তনের ধারণা সাক্ষ্য প্রমাণ সহ বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়ে চালর্স ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) মানুষের চিন্তায় এক যুগান্তর আনেন। ডারউইন ও ওয়ালেসের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল যৌবনেই। কিন্তু এই অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রমাণের চেয়েও আমাদের এই মুহূর্তে গুরুতর কাজ হল অভিব্যক্তিবাদী চিন্তাধারার মোট চারটি শাখার কথা বলা। এই চারটি শাখার মধ্যে প্রথমটি যান্ত্রিক অভিব্যক্তির ধারণা, দ্বিতীয়টি লক্ষ্যমুখী অভিব্যক্তির ধারণা তৃতীয়টি অভ্যুদয়মূলক অভিব্যক্তি এবং চতুর্থ হল সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তি এবং চতুর্থটি হল সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির ধারণা। এই চারটি ধারণাই বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ হলেও বর্তমান প্রবন্ধে সেই চেষ্টা না করে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, পূর্বে যাঁদের যন্ত্রবাদী বলা হয়েছে, তাঁরা যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের ধারণা পোষণ করে। যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদীরা ঈশ্বরে অর্থাৎ সৃষ্টির পশ্চাতে কোনো পরম স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না অর্থাৎ, তাঁরা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অজ্ঞেবাদীদের মূল কথা হল—পরম স্রষ্টা আছেন কি নেই তা জানার উপায় নেই, তা কোনো দিনই জানা যাবে না অর্থাৎ ঈশ্বর অজ্ঞেয়। অর্থাৎ, তাঁরা মানবজ্ঞানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু এরও পশ্চাতে এক অজ্ঞের জগৎ আছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, মানুষ শান্ত ও সীমিত বস্তকেই জানতে পারে, পরম সত্ত্বা আদি কারণ, অনন্তকে জানা আমাদের জ্ঞানের অতীত। জ্ঞান সাপেক্ষ সম্পর্ক দ্বারা নিচার্য ও নিয়ন্ত্রিত এবং পরমসত্ত্বাকে কোনো কিছুর দ্বারা তুলনা বা ভেদ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। যদি পরম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান সৃষ্টি নাও করতে পারি, তবু মাত্র এই কারণের জন্যই তার সত্ত্বাকে অস্বীকার করতে পারি না। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই একটি বিষয়ে একমত যে সমস্ত দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতেই আছে একটা সত্ত্বা অর্থাৎ পরমসত্ত্বা। শক্তি দুই প্রকার, একটি দ্বারা প্রকৃতি আমাদের কাছে তার নিজস্ব সত্ত্বার পরিচয় দেয়। আরেকটি শক্তি কাজের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়—অর্থাৎ, সত্ত্বার এবং ক্রিয়ার পরিচায়ক শক্তি। অবশ্য, চালর্স ডারউইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Orgion of species প্রকাশের সময়ও (১৮৫৯ খ্রিঃ) ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই বিশ্বাসেই তিনি তখন সৃষ্টি কথাটা লেখেন। তারপর তিনি তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশের সময় (১৮৬৭ খ্রিঃ) নিজেকে 'অজ্ঞেয়বাদী' বলে পরিচয় দেন।

অভিব্যক্তি বিষয়ে যে চারটি ধারণার কথা বলেছি, চতুর্থ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁর Creative Evolution-এ। এ বই রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি অনুবাদে ১৯১১-র পরে পড়েছিলেন,—এমন বাহ্য প্রমাণ নেই যদিও 'বলাকা'র কবিতার সঙ্গে বার্গসঁর এই বই মিলিয়ে পড়ে ড. ক্ষুদিরাম দাসের মনে হয়েছে যে কবি ১৯১২-১৩-তে বিলেতে থাকার সময় এই বই উল্টে পাল্টে দেখেছেন এবং তাঁর ধারণার সঙ্গে কতক মেলে বলে Creative Evolution-এর কিছু কিছু প্রকাশভঙ্গি তাঁর কবিতায় চলে এসছে। কিন্তু একই সঙ্গে বার্গসঁর চিন্তার থেকে বলাকায় প্রতিফলিত রবীন্দ্রদর্শনের পার্থক্যের প্রতি এই সমালোচক রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় গ্রন্থে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'বলাকা'র আশ্বিন ১৯৩৫ এর নূতন সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে ১৭৭ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অবিস্মরণীয় সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি সংকলিত হয়েছে। এ চিঠিতে বিলেতের ডাকঘরের ছাপ ৩০ আগস্ট ১৯১২ অর্থাৎ এ চিঠি তৃতীয় য়ুরোপযাত্রার সময়কার।

সে চিঠিতে বার্গসঁর নিজের লেখা তিনি পড়ছেন—এমন খবর পাইনি বটে, তবে Bergson সম্বন্ধে একটি চটি বই....সেটা ভারি চমৎকার, সহজে ওঁর মতটা ব্যাখ্যা করে দিয়েছে'—এ জাতীয় বই পড়ার খবর পাচ্ছি। বার্গসঁর লেখা না পড়লেও তাঁর সম্বন্ধে কবি পড়েছিলেন—এ বিষয়ে এই চিঠিটিই যথেষ্ঠ প্রমাণ। তারপর দুয়েক কথায় বার্গসঁ ও কবির অমিলের কথাও এ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, কিন্তু এসব কথায় পরে আসছি।

বার্গসঁর দর্শন চিন্তা সম্পর্কে আলোচনার আগে প্রথমেই গোটা কতক কথা বোঝা প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিক কিছু কথা আগেও বলা হয়েছে যে জড়ের মধ্যে যাঁরা প্রাণকণা অ্যামিবার উন্মেষকে স্রষ্টার সৃষ্টি বলে মনে করেন, তাঁদের প্রাণবাদী Vitalist বলা হয়। এই অ্যামিবা নানা পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদীদের ভাষায় অভিযোজনের (Adaptation) এর মধ্য দিয়ে নিয়ত রূপান্তরিত হতে হতে আজকের মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রারম্ভে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও স্বাভাবিক পরিণামে তাঁরা বিশ্বাসী। এজন্য তাঁদের প্রারম্ভবাদী ও পরিণামবাদী বলা যেতে পারে। বার্গসঁর দর্শনকে বলা হয় তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত Creative Evolution গ্রন্থের নামানুসারে সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তিবাদ।

জলের মতো তরতর গতিময় বাংলা ভাষায় মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর বিচিত্র জগৎ (রামেন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১৪ বইটির 'প্রারের কাহিনী আলোচনায় বার্গসঁ সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা প্রথম উদ্ধৃত করছি ঃ)

"প্রাণ কিন্তু পুরাতনকে ফেলে না বটে; কিন্তু পুরাতনের উপরে নূতনকে সংযুক্ত করে; ইহা বিশুদ্ধ Evolution নহে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে epigenesis—অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি বা সৃষ্টি। Bergson-এর ভাষায় Creative Evolution, প্রাণ চলিতেছে; চলিবার কালে আপনাকে ফুটাইতেছে, প্রকাশ করিতেছে, বিকাশ করিতেছে, আপনার ভিতরের তথ্য বাহিরে আনিতেছে; কিন্তু কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত নাই; সঙ্গে সঙ্গে ইহা নূতনের সৃষ্টি করিতেছে; যাহা ছিল না কোথা হইতে তাহার উদ্ভাবন করিতেছে। এই সৃষ্টি ক্রিয়ার অন্ত নাই—ইয়ত্তা নাই, সীমা নাই।

এ যদি শুধুই Evolution বা অভিব্যক্তি হতো, তাহলে যা অব্যক্ত তাকে ব্যক্ত করেই প্রাণ সন্তুষ্ট হতো। কিন্তু তা যে হয় না তার কারণ epigenesis অর্থাৎ আরও কিছু নতুন সংযোজনও পুরোনোর ওপর নতুন সৃষ্টি চলছে। সেই সৃষ্টির এক অন্ধ আবেগ কাজ করছে। সে আবেগে প্রাণ কোন্ খাতে বইবে তা পূর্বে জানার উপায় নেই। পরিণামের দিকে চলেছে বটে, কিন্তু পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তার যাত্রা নয়।

ড. ক্ষুদিরাম দাস এখানেই বার্গসঁর চিন্তাভাবনা থেকে 'বলাকা'র কবির অনুভবের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনোই প্রাণের লক্ষ্যহীন যাত্রার কথা ভাবতে পারেন না। তাহলে যে সৃষ্টিকে বিশৃঙ্খল ভাবতে হয়। এমন ভাবা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতে Bergson সম্বন্ধে চটি একটি বই পড়ার খবর জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

উনি (অর্থাৎ Bergson) যে দিকটা দেখিয়েছেন সেটা খুব চমৎকার কিন্তু অন্য দিকটাকে একেবারে অস্বীকার করবার কোনো মানেই নেই। গতি তত্ত্বও যেমন সত্য স্থিতিতত্ত্বও তেমনি সত্য এবং সেইজন্যেই গতিকেও আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই পারি নে—

সেটা কেবলমাত্র আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির মানা নয়—সেটা সত্য বলেই তার হাত আমরা এড়াতে পারি নে।

কয়েকটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত গন্তব্যে বার্গসঁর দর্শন ভাবনা এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আর তার সঙ্গে এই দর্শনে তাঁর নিজের আপত্তির কথা তো আছেই। প্রথম কবির আপত্তির কথা বলে নিই। 'বলাকা'র ২৯-সংখ্যক কবিতার আলোচনায় গ্রন্থ পরিচয়ে দেখছি, কবি বলেছিলেন, Nucleus-এর চারিদিকে electron গুলি সৌরজগতে আবর্তনের মতো ঘুরছে, কিন্তু এদেরও অসীমের Background আছে। এখানে পরমাণুর ভেতরকার গঠনের কথা বলা হচ্ছে। পরমাণুর মধ্যে বিজ্ঞান যেমন ইলেকট্রনগুলির গতি মানে, তেমন রাশভারী প্রোটনের স্থিতিও মানে। পরমাণুলোকের রহস্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক কালের অধ্যয়ণ— যাঁর বিজ্ঞানসম্মত প্রকাশ ছিয়াত্তর বছর বয়সে লেখা 'বিশ্বপরিচয়' বইটির 'পরমাণুলোক' প্রবন্ধে। ইলেকট্রন প্রোটনের স্থান ও গতিমাত্রা সব সময় বদলাতে থাকলেও বৈদ্যুতিক প্রভাব (Charge) ও ভর (Mass) অপরিবর্তিত থাকে। এই অপরিবর্তিত থাকার মধ্যেই পরমাণুর স্থিতির দিকটা। কিন্তু বার্গসঁ শুধু গতির কথা বলেন, এই স্থিতি অস্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে এই সংক্ষিপ্ত চিঠিতে বার্গসঁর দর্শন বিষয়ে এই আপত্তিটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

পরমাণুর গঠনের মধ্যে ইলেকট্রনের গতি ও প্রোটনের স্থিতির সামঞ্জস্যে, এদের নৃত্যের তালে তালে যে ছন্দ আছে, তা যদি একবার থেমে যায়, তাহলে কী, ভয়াবহ অবস্থা ঘটতে পাবে—তার কথা 'চঞ্চলা' কবিতায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ 'অনুতম পরমাণু আপনার ভারে সঞ্চয়ের অচল বিকারে/বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে/কলুষের বেদনার শূলে।' এখানে 'সঞ্চয়ের অচল বিকার' বলতে ইলেকট্রনের গতি নেই। শুধুই প্রোটনের স্থিতিই আছে— এমন 'পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা/স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা'ই আমাদের চোখের সামনে ভয়াবহরূপে ভেসে ওঠে।

এ কবিতায় 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অকারণ চলা' পড়ে আমরা যদি ভাবি যে এখানে কবি বার্গসঁর মতো লক্ষ্যহীন অভিব্যক্তির কথা বলেছেন, তাহলে ভুল হবে। বার্গসঁ সৃষ্টির প্রেরণা শক্তির নাম দিয়েছেন elan vital (ক্রেমাঁ ভিতাল)। 'অকারণ অবারণ চলা'র ধারণা elan vital সদৃশ হলেও এ কবিতায় লক্ষ্যহীন অভিব্যক্তির কথা কবি বলেন নি। 'চঞ্চলা' কবিতা সম্পর্কে 'কবিতাপাঠ' বিভাগে আমরা এ কবিতার স্তবক ধরে ধরে চিত্রকল্পের এবং সব চিত্রকল্প মিলিয়ে ভাবগত ঐক্যের আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ যে লক্ষ্যহীন অভিব্যক্তির ধারণা পোষণ করেন না, তার আভাস পাই দ্বিতীয় স্তবকের অভিসারিকার চিত্রকল্পে। অভিসারিকা লক্ষ্যহীন যাত্রায় মাতে না। সমগ্র সৃষ্টিকে কবি যখন অভিসারিকার মতো চলতে দেখেছেন, তখন কোথাও না কোথাও তাঁর প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের সংকেত কুঞ্জ রয়েছে। লক্ষ্যে পৌঁছোনোই সৃষ্টির ঐকান্তিক ইচ্ছা, যেমন অভিসারিকার ইচ্ছা প্রিয়ের সঙ্গে মিলন। এখানেই বার্গসঁর ভাবনা থেকে রবীন্দ্রনাথের মৌল পার্থক্য।

বার্গসঁর মতে প্রতিটি মুহূর্ত অভিনব। মুহূর্ত পরম্পরা নিরবচ্ছিন্ন। একটানা বয়ে চলছে, কোথাও ছেদ নেই। আবেগ মুহূর্তটিকে আমরা ফিরে যেতে পারি না। স্মৃতি ব্যাপারটা অতীতের কিছু কিছু অবশিষ্টকে মনের ভাণ্ডারে জমিয়ে রাখা নয়। জমিয়ে রাখার কাজ আমাদের সচেতন মনের কাজ। এদিক থেকে বিচার করলে স্মৃতি কোনও মানসিক বৃত্তি (faculty) নয়। মানসিক

বৃত্তি হয়ে তা থেকে কাজ করতো। অবিরাম স্মৃতির কাজ সম্ভব হতো না। অথচ আমরা অভিজ্ঞতায় জানি, স্মৃতি একটানা কাজ করে চলেছে—কি থাকছে, আবার কি হারিয়ে যাচ্ছে—সবটাই আমাদের অজান্তে হচ্ছে। তাই ইচ্ছা করলেই আমরা অতীতের মুহূর্তে ফিরে যেতে পারি না শুধু এই কারণে যে-মুহূর্তগুলি এসেছে—সেগুলি মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। ভাসমান মুহূর্তগুলির ঠিক আগেরটি পরেরটিতে মিশে যাচ্ছে। এভাবে এরা পরম্পরায় মিশে যাচ্ছে, শুধু দুটি মুহূর্ত পরস্পর মিশছে না। আর এজন্যই অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

হেরাক্লিটাস নামে একজন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এজন্যই বলেছিলেন যে এক নদীতে আমরা দুবার স্নান করতে পারি না। যৌবনে বার্গসঁ সক্রেটিস-পূর্ব দুজন গ্রীক দার্শনিকের গতিভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাদের একজন Zend এবং অন্যজন এই Heraclitus. নদীর জল এক চঞ্চল প্রবাহ। আমরা আগমন যে মুহূর্ত পরম্পরার মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছি, তারা এমনই নিরববিচ্ছিন্ন ও নিরবচ্ছেদ্য যে আগের মুহূর্তে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, যেমন নদীর স্রোতকে উজানে ফেরানো অসম্ভব, অসহায়ভাবে অসম্ভব। আগে যে নদীর জল স্নান করেছিলাম, সে-জল এখন ভাঁটার টানে চলে গেছে। তাতে ফিরে স্নান করা সম্ভব নয়। তাই শুধু যে মুহূর্তটি এসে উপস্থিত হলো, তার রূপে-রঙে-রসে তাকেই জীবনে নেওয়া যায়। সে-মুহূর্তের মূল্যই বা কম কিসে? বার্গসঁর ভাষায় 'এ এক অনন্য মুহূর্ত, তার ইতিহাসও কিছু মাত্র কম অনন্য নয়' অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তোমার ওই অনন্ত-মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি। কোনো কালে' (বলাকা, ৩২)। ঠিক এই বাক্যটি যেভাবে সাজিয়েছি, তাতে মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ এসব ভাবনা বার্গসঁ থেকেই পেয়েছেন। মোটেই তা ঠিক নয়। বার্গসঁ থেকে পেয়েছেন বললে বলতে হয়, 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা'য় ব্যক্ত বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ভেসে চলার ইচ্ছা অথবা 'ক্ষণিকা'র প্রথম কবিতা 'উদ্‌বোধনে' ক্ষণিকের গান গাওয়ার উৎসাহ—এসবও বার্গসঁর লেখা থেকে তাঁর মনে এসেছে। বলাবাহুল্য, বার্গসঁর রচনা পড়ার কথা 'সোনার তরী' বা 'ক্ষণিকা' লেখার সময় ওঠেই না।

বার্গসঁর লেখা থেকে যে-বাক্যটি বাংলা অনুবাদে তুলে দিয়েছি, তারপরেই তিনি লিখেছেন যে আমরা প্রত্যেকে নিজেকে দিয়ে নিজেকে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে চলেছি। কেন না প্রতি মুহূর্তেই আমরা পুরনো মুহূর্তের মানুষটি থেকে এক স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে উঠছি। এই অর্থে মানুষকে তিনি বলেছেন কারুশিল্পী (artisan).

ধরা যাক, তন্তুবায়ের মতো একজন কারুশিল্পীর কথা। তিনি যতো পূর্বপরিকল্পনা নিয়েই একটি বস্ত্র বয়স শুরু করুন না কেন, সে-কাজ ওই পূর্বপরিকল্পনামত শেষ হয় না। পরিকল্পনার অদলবদল ঘটে বিশেষ বিশেষ উপস্থিত ক্ষেত্রে। কারুশিল্পীর বেলায়ই যদি এ-ই হয়, তাহলে প্রকৃতির চারুশিল্পীর (artist) কাছ থেকে আমরা সৃষ্টির ছক আদৌ আশা করতে পারি না। সেই মহাশিল্পী পূর্বে বলতে পারেন না, তাঁর সৃষ্টি এরকম বিশেষ রূপ নেবে। কেন না তিনি তো ছক মিলিয়ে কাজ করছেন না। তিনি নিজেকে প্রতিনিয়ত ভাঙছেন, গড়ছেন, নিজেকে দিয়ে নিজের সৃষ্টির অবিরাম ভাঙাগড়ার অবিরাম প্রবাহ চলেছে। এঁকেই আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে গীতাখ্যপর্বের পথিক ঈশ্বর বলেছিলাম। এই প্রবাহের সঙ্গে মুহূর্ত পরম্পরায় মধ্য দিয়ে প্রবহমান মানুষের চেতনার সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

প্রকৃতির যে মহাশিল্পীর কথা বার্গসঁ বলেন, তাঁর কথা কুড়ি বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ

তাঁর 'বিবিধ প্রসঙ্গ'র 'প্রকৃতিপুরুষ' রচনায় ঋগ্বেদের সৃষ্টি সূক্ত থেকে উদ্ধৃতি সহ লিখেছিলেন যে কিভাবে একটি ভাব কবির মনে গোপনে লালিত হয়ে কবিতারূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তা কবির পক্ষে যেমন আগেই বলা সম্ভব নয়, তেমনি বিশ্বস্রষ্টাও বলতে পারেন না, কী থেকে কী হয়েছে বা কী হবে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বার্গসঁ-র প্রভাব খুঁজতে গেলে 'প্রকৃতিপুরুষ' রচনায় এই ফরাসি দার্শনিককে দেখার আনন্দে মশগুল হতে হয়। কিন্তু কুড়ি বছরের রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সের বার্গসঁর লেখা পড়া যে অসম্ভব, তা না বললেও চলে। আর যদি দর্শন খোঁজার বাতিক চরিতার্থই করতে হয়, তাহলে এখানে সাংখ্যদর্শন থেকে আরম্ভ করে য়ুরোপের অভিব্যক্তি প্রস্থানের দর্শন পর্যন্ত অনেক দর্শনই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট যে রবীন্দ্রচিন্তা ও অনুভবকে দর্শনের বিশেষ বিশেষ খোপে না পুরলেই বরং কবির সৃষ্টির স্বকীয়তা নির্ণয় সহজ হয়। সে দর্শন ভারতের কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট্যদ্বৈতবাদ, সাংখ্য বৌদ্ধ অথবা য়ুরোপীয় অভিব্যক্তি প্রস্থানের দর্শন যা-ই হোক না কেন।

তবুও দার্শনিক আলোচনা 'বলাকা' প্রসঙ্গে করতে হচ্ছে। কেন না সমালোচক-গণ বার্গসঁর কথা পূর্বে অনেকবার তুলেছেন। তোলায় ভালোই হয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় বিকাশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বার্গসঁর ধারণায় সত্তা ও গতি সমার্থক। সত্তা (সৎ + তা) হচ্ছে যা ছিল এবং আছে, যার অস্তিত্ব আছে। এই সত্তাই নিরন্তর হয়ে উঠছে। অসৎ থেকে সৎ— এই সত্তাকে আমরা বলতে পারি সৃষ্টি। আর সত্তা যখন হযে উঠছে, তখন তা অভিব্যক্তি। তার ভেতরকার যা অব্যক্ত তা ব্যক্ত হচ্ছে, যা ব্যক্ত তার রূপরূপান্তর ঘটছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উদ্ধৃতি দিয়ে আগে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সত্তা Being, আর গতি বা অভিব্যক্তি Becoming. অসৎ থেকে সৎ সত্তার আত্মপ্রকাশের ফলে সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বার্গসঁর মতে যা সৃষ্টি, তাই অভিব্যক্তি। তাই একে তিনি বলেছেন Creative Evolution, বাংলায় বলতে পারি সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তি। Bertrand Russell তাঁর 'A History of Western Philoshopy' গ্রন্থে বার্গসঁ সম্পর্কে আলোচনায় বার্গসঁরই দেওয়া প্রাণের অভিব্যক্তির একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তিতত্ত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। অভিব্যক্তির যে-স্তরে কোনও কোনও প্রাণীর চোখ ছিল না, সে-স্তরেও বাইরের নানা জিনিসের সংস্পর্শে আসার আগেই সে-সব বস্তু চক্ষুষ্মানদের মতো দেখতে পারার একটা আবছা ইচ্ছা ওই প্রাণীদের জেগেছিল বলে ধরে নিতে পারি। কোন পর্যন্ত সে-ইচ্ছা থেকেই ও-সব প্রাণীর চোখ সৃষ্টি হলো। তারপর দৃষ্টিশক্তি পেয়ে ইচ্ছাটা পূর্ণ হলো। এই দৃষ্টিশক্তিলাভেই যে সে অভাব পূর্ণ হবে—সেটা আগে ভাবাই যায় নি—এই যে দৃষ্টিশক্তি পেলো দৃষ্টিহীন প্রাণীরা নতুন পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ফলে বা অন্য ভাষার অভিযোজনের (Adaptation) ফলে এটাই অভিব্যক্তি। তবে বার্গসঁর মতে অভিব্যক্তি কোন্ পথে অগ্রসর হবে—তা বলার উপায় নেই। ঠিক তেমনি বলা যায় না, শিল্পীর সৃষ্টি কোন্ অবস্থায় কোন্ রূপ নেবে। সৃষ্টি আর অভিব্যক্তির এই আদ্যাত্ম্য মনে রেখে বার্গসঁ অভিব্যক্তিকে বলেছেন সৃষ্টিশীল।

'বলাকা'র কবিতায় দার্শনিকতা প্রসঙ্গে আমরা এখন পর্যন্ত 'কবিতাপাঠ' বিভাগে আলোচিত এই বইটির বিখ্যাত কবিতাগুলি থেকে শুধু 'চঞ্চলা' কবিতার কথাই বারবার

তুলেছি। আমরা মনে করি না, 'ছবি', 'শাজাহান', বা 'ঝড়ের খেয়া'য় বার্গসঁর লেখা বা বার্গসঁ সম্বন্ধে লেখা পড়ার কোনও ছাপ পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস এসব কবিতা আলোচনায় পূর্বাপর রবীন্দ্রনাথের মনোজীবন অনুসরণই যথেষ্ট। তাই এ পরিচ্ছেদের আলোচনায় এসব কবিতা সম্পর্কে আমরা নীরব থাকছি। বিখ্যাত কবিতার মধ্যে আরেকটি কবিতার কথা পরে উঠবে এবং তা ৩৬-সংখ্যক নাম কবিতা 'বলাকা'। আপাতত 'চঞ্চলা' নিয়ে আরও কথা আছে আর সেই সূত্রে বার্গসঁর সময়, স্মৃতি ও টিঁকে থাকার (Duration) তত্ত্বের কথা সংক্ষেপে সারতে হবে।

বার্গসঁর মতে সময় দু'প্রকার। আমরা (Time) অর্থে 'কাল' না বলে 'সময়' বলছি। সময় শব্দটিতে যাওয়া অর্থে ই ধাতু আছে। ই ধাতুর মধ্যে সময়ের গতির ধারণাটি আছে। বার্গসঁর ধারণার সময় দুইরকম 'ঘড়ির সময়' ও 'যথার্থ-সময়'। এই যথার্থ সময়কে তিনি Duration বা টিঁকে থাকা বলেছেন। যথার্থ সময়ের মধ্যে শুধুই গতি অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। আর ঘড়ির সময় এই গতি-চঞ্চল যথার্থ সময়ের জ্যামিতিক ছায়া মাত্র। তাই ঘড়ির সময়ের জ্যামিতিক ছায়া মাত্র। তাই ঘড়ির সময়ের মধ্যে আমরা গাতি অনুভব করতে পারি না। ঘড়ির সময়ের ধারণা জাগে আমাদের বুদ্ধিতে (intellect-এ) গতি অনুভব করার জন্য, যথার্থ সময়ের বোধ জাগার জন্য, আমাদের অপরোক্ষানুভূতি (intution) প্রয়োজন। শুধু বুদ্ধিতে গতিকে স্থিতি বলে আমরা ভুল করি। এই স্থিতিকে বার্গসঁ 'বুদ্ধিবৃত্তির মায়া' মাত্র ভেবেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি সংক্ষিপ্ত হলেও বিশেষ অর্থবহ এজন্যেই যে স্থিতিকে 'বুদ্ধিবৃত্তির মায়া' বলায় বার্গসঁর instinct (উপজ্ঞা—যা শুধু কীটপতঙ্গেব আছে), intellect (বুদ্ধি—এ আছে স্তন্যপায়ীদের) এবং intution (অপরোক্ষানুভূতি—এ শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই সম্ভব)—এই তিন ভাগ এবং বুদ্ধিতে বোঝা ঘড়ির সময়ে গতিকে স্থিতি বলে ভ্রম—বার্গসঁর এই সমস্ত দর্শনচিন্তা এখানে সংহত হয়ে আছে। গতিকে স্থিতি বলে ভ্রমকেই তিনি বুদ্ধিবৃত্তির মায়া বলেছেন।

যা যথার্থ, তার সার হচ্ছে পরিবর্তন। এই নিত্য পরিবর্তমান বাস্তবকে ঘড়ির সময়ে বোঝার উপায় নেই। তাই বার্গসঁর ধারণায় এসেছে অন্য একসময় আগেই বলা হয়েছে একে তিনি বলেছেন যথার্থ সময় বা real time। এই real time-ই Duration. এই Duration—(টিঁকে থাকা বা 'তিষ্ঠিয়া থাকা') এর সংজ্ঞার্থে তিনি দিয়েছেন এ রকম ভাষায় ঃ 'ভবিষ্যৎকে আঁকড়ে ধরা অতীতের অবিরাম প্রগতি এই টিঁকে থাকা'। অতীত চলে যাওয়ার জিনিস নয়, অতীতের রেশ চলছে বর্তমানের মধ্যে। এই মুহূর্তের বর্তমান পরের মুহূর্তেই অতীত, 'চঞ্চলা' কবিতার ভাষায় 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই।' এই প্রসঙ্গটি আমরা আগেও আলোচনা করে এসেছি। বর্তমানের মধ্যে অতীতের রেশ সম্পর্কে বার্গসঁর চিন্তা 'ছবি' কবিতায় দেখিয়ে দেওয়া যায় ঃ 'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা'/বিস্মৃতির মর্মমাঝে রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা'। কিন্তু এভাবে দেখিয়ে দিলে ভুল হবে। কেননা এ সব অনুভব রবীন্দ্রনাথের মতো কবির বার্গসঁর কাছ থেকে নিতে হয়েছিল ভাবাটাই কাণ্ডজ্ঞানহীনের কাজ। যে-মুহূর্তে তা পূর্ণ, সে-মুহূর্তে যা শূন্য। বার্গসঁর ভাষায় 'অস্তিত্বের অর্থ পরিবর্তন, পরিবর্তনের অর্থ পরিণতি, পরিণতির অর্থ নিজেকে নিরন্তর সৃষ্টি করে চলা।'

'বলাকা' নাম কবিতায় পর্বত, তরুশ্রেণী, তৃণ, মাটির তলদেশের বীজ, বন, নক্ষত্র—

এমনিতর বস্তু ও উদ্ভিদের যে গতিময় রূপ কবির অনুভূতিতে সোজাসুজি ধরা পড়েছে, তার সঙ্গে বার্গসঁর দর্শনচিন্তা মিলিয়ে আলোচনা হতে পারে। এই দার্শনিকের ধারণা এক জীবনপ্রবাহ থেকে বিশ্ব উদ্ভূত, তারই চৈতন্যময়, প্রকাশ আমরা এই মানুষেরা। গাছগাছড়া, কীটপতঙ্গ, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং এই প্রাণীদের মধ্যে মানুষ—এভাবে ধাপে ধাপে উন্নতি ঘটেছে। সর্বনিম্ন ধাপে আছে জড় (matter) অর্থাৎ 'বলাকা' কবিতার পর্বত ও নক্ষত্রের মতো নিরেট (solid—রবীন্দ্রনাথ solid-এর বাংলা 'কঠিন' না বলে 'নিরেট' করেছেন) matter (অর্থাৎ জড়)। বার্গসঁ বলেন সবই চৈতন্য, তবে প্রাণে যা তরল, জড়ে তা নিরেট—এই যা পার্থক্য। প্রাণ গতিময় আর জড়কে যে স্থির মনে হয়, তাও আমাদের 'বুদ্ধিবৃত্তির মায়া'। প্রাণ যদি হয় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারণের মতো তরল, তা হলে জড়-জমাট-বাঁধা লাভার মতো। প্রাণ যদি হয় হাউই, তাহলে জড় সে হাউইয়ের ছাই। প্রাণের গতি উর্ধ্বমুখী। জড়ের গতি অধোমুখী। বর্গসঁর এসব চিন্তা-ভাবনা মনে রেখে বলা যায় হংসবলাকা থেকে আরম্ভ করে বীজ; তৃণ, বনের মতো উদ্ভিদ পেরিয়ে পর্বত ও নক্ষত্রের মতো জড় পর্যন্ত সর্বব্যাপী একপ্রাণপ্রৈতি বা বার্গসঁর ভাষায় elan vital-এ গিয়ে কবির অন্তর্দৃষ্টি পৌঁছেছে। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন সকলেই চলেছে—পাহাড় উড়ে চলছে বৈশাখের দিক থেকে দিগন্তে ধেয়ে চলা মেঘের মতো, আলো হয়ে জ্বলে ওঠার কান্না-ভরা আকাঙ্ক্ষায় আলোর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে অন্ধকার চমকে উঠছে একই সঙ্গে শুনতে পেলেন মানবের বাণী উড়ে চলছে যুগ থেকে যুগান্তরের পথে। সব মিলিয়ে এই গতিচঞ্চল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একই সঙ্গে এপিক ও লিরিক ক্রন্দন, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।' এ এপিক ক্রন্দন, কেননা এ ক্রন্দন আমাদের ধারণার অতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতো বিরাটের। একই সঙ্গে এ লিরিক ক্রন্দন, কেননা এ ক্রন্দন পদতলের তৃণের ও বীজের মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছেরও।

অনেকে মনে করেন, বার্গসঁর গতিতত্ত্বেরই কাব্যরূপ বলাকা। বার্গসঁর মতে মানুষের যারা বিরামহীন। যান্ত্রিক পরিবর্তন রোহিত ও পরিণামহীন। কেননা—ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞতা আমরা শুধু বর্তমান মুহূর্তটুকুই জানতে পারি, যে-হেতু তা সেই মুহূর্তে ইন্দ্রিয়গোচর পরিবর্তনটুকুই আমাদের কাছে একমাত্র সত্য—"We charge without Ceasing, and the state itself is nothing but change." ('Creative Evolution'—Bergson) এই পরিবর্তনই নামান্তরে হওয়া বা 'becoming'। তিনি আরো বলেছেন সনাতন সত্যের অস্তিত্ব নেই। সমগ্রবস্তু জগতের ও মনোজগতের দিকে চেয়ে বের্গসঁ দেখেছেন—"There is no feeling, no idea which is not undergoing change every moment. If a mental state ceased to very, it guration would cease to flow." (তদেব)। রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বের জলে স্থলে-অন্তরীক্ষে এই বেগকে স্বীকার করেছেন ঃ

'দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।' (৩৬ নং)

লক্ষণীয় যে বের্গসঁ কেবল গতিসর্বস্ব। তাঁর গতি কেবল গতিসর্বস্ব। তাঁর গতি কেবল 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।' তা কোন লক্ষ্য দ্বারা নির্দিষ্ট নয়, আনন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। এখানেই বার্গসঁ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব। কবি কেবল গতিতে তৃপ্ত থাকতে পারেন নি, তিনি আনন্দরসের সন্ধানে যাত্রা করেছেন। বার্গসঁ জীবনের মধ্যে কেবল গতি দেখেছেন, তিনি অসীমের সঙ্গে জীবনের কোন যোগ দেখতে পান নি; সত্য তাঁর কাছে ভালোমন্দের অতীত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্যে তিনি জীবনের উদ্দেশ্যে, গতির লক্ষ্য নির্দেশ করতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল গতিতে মানবের মুক্তি নয়।

"মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে।
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে॥"

(৩৭ নং)

তবে তো সমস্তই বৃথা। তাই কবি যেমন বিশ্বের গতিকে দেখেছেন তেমনি এর পরিণাম ও সত্য বলে স্বীকার করেছেন ঃ

"হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে!"

(৩৬ নং)

এই 'কোনখানে' ঠিক কবি জানেন না। কিন্তু এই কোন্ শব্দটিতেই বোঝা যায় কবি যতই অকারণ অবারণ চলার কথা বলুন, আসলে দার্শনিকের লক্ষ্যহীন গতি কবির গতি লক্ষ্য অভিমুখী পরিণত পিয়াসী। দার্শনিক বলেছেন 'কেবলগতি'র কথা কবি বলেছেন পরিণামী গতির কথা। হয়তো তার ঠিকানা জানা নেই—'মাটির আঁধার নিচে কে জানে ঠিকানা,' তবু ঠিকানা একটা আছেই, চলাতেই সে বাসা পাবে। কিন্তু মানস সবোবরের পাখি বলাকা শ্রেণীর মতোই কেবল বিশ্বের ঋতুর ছন্দে এক্‌বাসা থেকে আর বাসায় ধায়। 'ঋতু' এই কথাটি 'ঋত' শব্দ থেকে এসেছে। বেদে সত্যের মহনীয় নাম 'ঋতু'। 'ঋ' অর্থ গতি। অর্থাৎ গতিই সত্য। বের্গসঁর সদ্য আলোড়নকারী বাণী ও সেই সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধোত্তর দামামা কবির অন্তরকে তীব্র বলিষ্ঠভাবে নাড়া দেয় ঠিকই কিন্তু এই গতিভাবনা ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরাতন কথা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে 'চরৈবেতি' মন্ত্রের কথা। আবার বৈদিক সাহিত্যের এই গতিবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যের ক্ষণিকত্ববাদের কথা স্মরণীয়।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস উপলব্ধি করেছেন—গতির রহস্যে—'You can not stay twice into the same river, for fresh water are ever flowing upon you.'

বার্গসঁ গতিতত্ত্বে এই কথাই বলেছেন খুব সূক্ষ্মভাবে। আর ১৯১০ সালে যখন বিশ্বে পুরনো মূল্যবোধ, জগৎকে দেখার পুরনো ভঙ্গি একটা বদলের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে, তখনই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কবি বের্গসঁর ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন আরও তীব্রভাবে। এর প্রমাণ আমরা পাই তাঁর কবিতায় দুই ভাবের দ্বিধা বিভক্তিতে তিনি বলেছেন—

"হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষহারে।
ঘন ঘন লাগে দোলা......" (৮-সংখ্যক)

এখানে ভৈরবী বৈরাগিণীর কথা বলা হয়েছে, যাঁদের চলাই জীবনের মন্ত্র, কোন কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা যাদের নেই। অথচ পরেই বলা হয়েছে, 'উন্মত্ত সে অভিসারে',—অভিসার এ তো প্রেম কাঙ্ক্ষিতের সঙ্গে মিলনের বাসনা থাকে, অতএব মিলনটা লক্ষ্য। তাই এখানে Poetic Contradiction ঘটেছে। কবিতাটিতে এর পরেই বলা হয়েছে—নদীকে উদ্দেশ্য করে, 'রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ'—আসলে নদী প্রবাহের তো লক্ষ্য আছে, সে মহাসমুদ্র। তাহলে কবির গতি লক্ষ্য অভিমুখী। অভাবে পাক্ষেয় ক্ষয় করতে করতে সে এগিয়ে চলবে 'অতল আঁধারে—অকুল আলোতে'। কবির গতি আলোর পিয়াসী। শুধু এই কবিতায় নয়, বলাকার প্রতিটি কবিতায়-ই কবি আলোর দিশারী। কবির স্থির প্রত্যয়—'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন' এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রভাতের প্রত্যাশী অমৃতের প্রত্যাশী। নূতন সৃষ্টির উপকূলের অভিমুখে তাঁর যাত্রা। তাই দার্শনিক বের্গসঁর মতো চলার কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, উদ্দেশ্যও ঘোষণা করেছেন।

কাব্যগ্রন্থটির নাম 'বলাকা'। এই নামটিই বিশেষ তাৎপর্যময়। বলাকা বলতে বোঝায় হংসশ্রেণী যারা দেশ হতে দেশান্তরে বেয়ে যায়। কাব্যগ্রন্থটিতে কবিতাগুলি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। কোন কবিতা পৃথক নামে চিহ্নিত নয়। আসলে সব কবিতা মিলিয়ে একটি বলাকা শ্রেণী। তারা পৃথক রূপে বিশিষ্ট নয়। বরং নির্বিশেষে এই গতির সঙ্গে কবিতাগুলোর অন্তর্গত যোগ রয়েছে বলে কবিতা পঙক্তির নাম বলাকা। আমাদের শাস্ত্রে আত্মাকে বলা হয়েছে হংস। 'এষঃক্ষলু আত্মাহংস' (উপনিষদ)। সংসারের মলিনতার আত্মার শুভ্রতা কখনোই মলিন হয় না। এদিক থেকে কবির যাত্রী বলাকা বড়ো তাৎপর্যময়।

কবির এই গতিচেতনা বলাকার ছত্রে ছত্রে অন্তরে যেমন, তেমনি কবিতার অবয়বেও। বলাকার ছন্দই কবিতাগুলির বাণীর দ্যোতিক—

'অজানা সমুদ্র তীর, অজানা সে দেশ ১৪ মাত্রা
সে থাকার লাগি ৬ মাত্রা
উঠিয়াছে জাগি ৬ মাত্রা
ঝটিকার কোন কণ্ঠে শূন্যে শুন্যে প্রচণ্ড আহ্বান ১৮ মাত্রা

মুক্তির বাণী যেন মুক্তক ছন্দে বেজে উঠেছে শৃঙ্খল ভেঙে। বলাকায় এই ছন্দের প্রয়োগ যে বৈচিত্রের সৃষ্টি করেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর তা বলাকার অতি মুখরতাকেই সার্থক করে তুলেছে। পর্ববিন্যাসের নবতর রীতি গ্রহণেই যে প্রবহমানবতার সৃষ্টি হয়েছে তা বলাকার ভাবগত গতিময়তার সহায়ক হয়ে উঠেছে। কবিতাগুলির অঙ্গসংস্থাই যেন চলমান। প্রথম দিকের কবিতা থেকে পরের কবিতাগুলো যেন কবির গতির রূপক নদী, স্রোতের আকল্পেই চলমান। যেমন ৮-সংখ্যক কবিতাটি। এখানে কবিতাটির ভাবের চলার সঙ্গে কবিতার বাইরের Pattern ও চলমান। পঙক্তিগুলি ভেঙে চলেছে নদীর মতোই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে।

বলাকার প্রতিটি কবিতা তার শব্দ চয়নেও এক গতির সুরে বাঁধা। প্রত্যেকটি কবিতা যেন বাঁধন ছিঁড়তে চায়। এই ভাব এসেছে যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহারে। প্রতিটি শব্দে যেন মুক্তি দ্যোতিত হয়েছে। জগৎকে কখন বলা হয় ''ওগো নটী চঞ্চল, অপ্সরী', তখন এই অপ্সরী শব্দটি দেশের ক্লাসিকের অনুসঙ্গে অন্য তাৎপর্য নিয়ে আসে। 'অপ্সরী' কথাটির শব্দার্থ যাত্রার কথা বলেছে কবির প্রিয় প্রতীক 'অপ' বা জলের দ্বারা। জল হল 'অতিষ্ঠতি নাম, আস্থাবরানাং' (নিরাক্ত) এই জল স্থিতিরহিত এবং বিশ্রামরহিত ও গতিশীল। এই কথাটিই অপূর্ব চিত্রকল্পে এসেছে ৩৬-সংখ্যক কবিতায়—

> 'শব্দময়ী অপ্সররমণী
> গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।'

পৌরাণিকী কথায় পাই স্ব-পদ লোভভীরু দেবতা ইন্দ্র মত্যবাসী মুনিঋষিদের শ্রেয় তপস্যা ভঙ্গের জন্য লাস্যময়ী অপ্সরীদের প্রেরণ করতেন। তারা মৌনমুনি-ঋষিদের তপস্যার স্তব্ধতা নৃত্যগীতে ভঙ্গ করে দিতেন। এখানে কবি হংস বলাকার পক্ষধ্বনিকে শব্দময়ী অপ্সররমণী বলে উল্লেখ করে গতির সৌন্দর্য বিরোধী শক্তির বা স্থবিরতার পরাভবের দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এ পর্ব আলোচনায় দেখলাম বলাকা গতি চেতনার বা গতিবাদের কাব্যরূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই মন্তব্যে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু বার্গসঁ প্রভাবে কবির এই চেতনা তথা গতিচেতনা এসেছে তা সমর্থন করা যায় না। আসলে বিশ্বের সংকটময় কালে আসন্ন যুদ্ধের সর্বনাশের আশঙ্কায় যখন কবিচিত্ত আলোড়িত, ভাবিত তখন বার্গসঁর গতি তত্ত্ব কবিচেতনায় উদ্দীপন বিভাব রূপে কাজ করেছে। এখন আমাদের কবিরাই নিজস্ব কথা দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহারে আসা যাক—

''য়ুরোপের মনীষীদের গতির কথা পড়ে আমি মনে যে প্রভূত আনন্দ ও সায় পেয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। আর প্রাণের সহজ ধর্মে যদি তার কিছু প্রভাবত্ত আমার মধ্যে এসে থাকে তাতেই বা কি? মোট কথা, গতিই আমার—ও ভারতীয় চিন্তাধারার প্রধান কথা। বলাকাতে সেই গতির জয়গান করা হয়েছে। এখানে দেশী ও বিদেশী প্রভাবের বিচারে কোন লাভ নেই।''

রবীন্দ্রনাথের এই গতিবাদ বলাকার যুগে নতুন উপলব্দি নয়। এ তাঁর আবাল্যের কবিতার মধ্যেই বরাবর ছিল। কবি অকৈশোর অনুভব করেছেন যে, কি জড় বিশ্ব, আর কি প্রাণী বিশ্ব দু'য়েরই মাঝে এক অবিশ্রাম গতিবেদ আছে। কিন্তু বলাকার যুগে এই গতিবাদ একটি বিশেষ বেগ ও রূপ লাভ করেছে। কবি বলেছেন যে—এই গতির মধ্যেই বিশ্বের প্রাণশক্তির বিকাশ।

॥ দশ ॥

কবিতা-পাঠ

॥ ক ॥

সবুজের অভিযান

(১ সংখ্যক কবিতা)

॥ এক ॥

রচনাকাল ও নামকরণ

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হিসাবে এটিকে নির্বাচন করছেন কবি স্বয়ং। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের সব কবিতার মতই এটিও প্রথমে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি কবি রচনা করেন ১৩২১ সালের ১৫ই বৈশাখ শান্তিনিকেতনে। কবিতাটি প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায়, অর্থাৎ বৈশাখ ১৩২১ সালে। পত্রিকায় প্রকাশের সময় এবং বলাকা প্রথম তিনটি সংস্করণে কবিতাটির নাম ছিল 'সবুজের অভিযান'। পরে অবশ্য 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে এবং এই কবিতার সংখ্যা হয়েছে ১।

কবিতাটির নামকরণে যা লক্ষণীয় তা হল, কবি একটি বিশেষণ পদকে বিশেষ্যের মত ব্যবহার করেছেন। সবুজ বলতে রবীন্দ্রনাথ যে তরুণ-শক্তি ও নবীন সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন সে কথা আমরা বুঝি এবং প্রবীণ সম্প্রদায়ের পরিবর্তে তাদেরই হাতে নেতৃত্বের ভার তুলে দেবার ব্যাপারে তিনি যে বেশি আগ্রহী, সে কথাও আমরা বুঝি। কিন্তু সেই যুবশক্তি বা তরুণ সমাজের কথা তিনি একবারও উচ্চারণ করেন নি। তিনি যেমন রূপকের মাধ্যমে সমস্ত কবিতাটির ভাববস্তু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, তেমনি বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বিশেষণ পদ দিয়েই এই সম্প্রদায়কে সর্বদা চিহ্নিত করেছেন। যেমন,—নবীন, কাঁচা, সবুজ, অবুঝ, প্রযুক্ত প্রভৃতি। নামকরণেও রবীন্দ্রনাথ সবুজ বলতে সবুজ হৃদয়ের মানুষকেই বোঝাতে চেয়েছেন। এই রকম প্রয়োগ বাংলা ভাষায় খুবই কম, তবে একেবারে নেই এমন নয়। অতুল প্রসাদের গানে আমরা পাই—"সবারে বাইরে ভাল নইলে তোর মনের কালো ঘুচবে নারে।"

কবিতার ভাববস্তুর সঙ্গে নামকরণটি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজেই বিকল্প নামকরণের কথা চিন্তা করা অবান্তর। তবে কবি সর্বদাই একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে চেয়েছেন এই কবিতায়, সেই হিসাবে কেবল নবীন সম্প্রদায়কে মুখ্য না করে নবীন ও প্রবীণ সম্প্রদায়ের একটি তুলনামূলক নামকরণও তিনি বেছে নিতে পারতেন।

এ কবিতার প্রথম স্তবকের 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে'র কল্পনা থেকেই যৌবন চঞ্চলদের প্রসঙ্গে 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা'য় পাখির চিত্রকল্প ভোরের আলোয় ডানা মেলে প্রথম উড়ে এলো। আবার ৪৪-সংখ্যক কবিতায় যৌবনের কথায় এই একই পুচ্ছ

নাচানো পাখির চিত্রকল্পে লিখেছেন ঃ 'তুই যে পারিস কাঁটা গাছের উচ্চ ডালের পরে/পুচ্ছ নাচাতে।' এ কাঁটাগাছ আপদ-বিপদের কাঁটাগাছ, এ হেন 'যৌবনরে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে?' প্রভাতসূর্যকে পাখির পুচ্ছ নাচাতে নাচাতে কলকাকলিতে বন্দনা জানানোর দৃশ্য এক পরিচিত দৃশ্য।

একবার কবিতাটিতে তরুণদের সম্পর্কে পাখির চিত্রকল্প যখন এলো, তখন অচিরেই একই চিত্রকল্প আসতে দেখি প্রবীণদের স্থবির জীবন প্রসঙ্গেও। তবে তখন সেই পাখি স্বভাবতই খাঁচায় বন্দী পাখি। কিছুক্ষণ পরেই খাঁচায় বন্দী এ পাখি সত্যিকারের পাখিও থাকে না, 'চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা' 'চিত্রপটে আঁকা' এক নিশ্চল নিস্পন্দ পাখি এসে যায় যুগযুগান্তরের স্তব্ধ-প্রাণ গতিহীন ভারতীয় জীবনের যথার্থ প্রতিরূপ সৃষ্টির প্রেরণায়।

এই চিত্রকল্প বলাকার আগেও কিভাবে একই প্রসঙ্গে আছে, তা প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি। তবুও 'সবুজের অভিযান' কবিতাভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজনে আবার সেই আলোচনায় যাচ্ছি, তবে এবার উদ্ধৃতি সহযোগে আরও বেশি বিস্তৃত আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের একত্রিশ বছর বয়সে লেখা 'একটা আষাঢ়ে গল্প'। তিপ্পান্ন বছরে লেখা 'সবুজের অভিযান' কবিতার সঙ্গে এর ভাব ও চিত্রকল্প গত সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। এ গল্পের সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যৌবন নির্বাসিত। স্থবিরদের রাজত্ব, কারও কোনও ইচ্ছা নেই, কাজে উৎসাহ নেই, নতুনের সন্ধান নেই, শুধুই পুরানোর পুনরাবৃত্তি, নিষেধের সহস্র বন্ধন, 'সনাতন বিধানের অলক্ষ্য মহিমা' একসুরে একতানে শুধু ঘোষণা করে এসেছে এই দ্বীপের মানুষ এতোকাল। এ রাজত্বের স্বরূপ বর্ণনায় গল্পটিতে শুনি ঃ

''কাহারো কোনো আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচর মধ্যে পাখি যেমন ঝট্‌পট্ করে, এই চিত্রিতবৎ মূর্তিগুলির অন্তরে সে রূপ কোনো একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগুলিব মধ্যে জীবের বসতি ছিল তখন খাঁচা দুলিত এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শুনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত। এখন কেবল পিঞ্জরের, সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত লৌহ শলাকাগুলিই অনুভব করা যায়—''পাখি উড়িয়াছে কি মরিয়াছে কি জীবন্মৃত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে।''

এই জীবন্মৃত পাখির চিত্রকল্প আমাদের সনাতন ব্যবস্থায় নির্জীব সামাজিকদের বর্ণনায় 'সবুজের অভিযান' কবিতায়ও পাই ঃ

> ''ঐ যে প্রবীণ ঐ যে পরম পাকা,
> চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
> ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
> অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়॥''

একটা আষাঢ়ে গল্পে'র পাখির মতোই এ 'পাখি উড়িয়াছে কি মরিয়াছে কি জীবন্মৃত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে।' এ গল্পে দ্বীপের মানুষগুলি 'চিত্রিতবৎ মূর্তি', 'খাঁচার মধ্যে যেমন পাখি ঝট্‌পট্ করে, এই চিত্রিতবৎ মূর্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোনো একটা

জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।' এই চিত্রিতবৎ মূর্তিগুলি সত্যিকারের পাখির মতো ঝট্‌পট্‌ করে না, নড়ে না, চরে না।

এই গল্প যখন সাতাত্তর বছর বয়সে 'তাসের দেশ' নাটকে রূপান্তরিত হয়, তখনও তরুণদের প্রসঙ্গে ডানা মেলে-দেওয়া-পাখির চিত্রকল্প আসে। আমরা নাটকের প্রারম্ভিক সংলাপ এই ফাঁকে একটু শুনে নিতে পারি ঃ

রাজপুত্র। আর তো চলছে না, বন্ধু।

সদাগর। কিসের চাঞ্চল্য তোমার, রাজকুমার।

রাজপুত্র। কেমন করে বলব। কিসের চাঞ্চল্য বলো দেখি। ঐ হাঁসের দলের, বসন্তে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে হিমালয়ের দিকে।

সদাগর। সেখানে যে ওদের বাসা।

রাজপুত্র। বাসা যদি, তবে ছেড়ে আসা কেন। না না, ওড়বার আনন্দ অকারণ আনন্দ।

এই ওড়বার আনন্দে, অকারণ আনন্দে বছরের পর বছর কবি নিজেই তো হিমালয় থেকে পদ্মাতীরে, আবার পদ্মাতীর থেকে 'আর কোন্‌খানে' বাসা ছাড়া পাখির উদ্দাম চঞ্চল যাত্রা দেখেছেন। বদ্ধ আর মুক্ত জীবন প্রসঙ্গে বন্দী আর মুক্ত পাখির চিত্রকল্প রবীন্দ্র সাহিত্যে ফিরে ফিরে আসে। 'তাসের দেশ' নাটকের বিখ্যাত গান ঃ—

"আমরা নূতন যৌবনেরি দূত
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত॥"

এ সেই নাটক যা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন সেদিকের যৌবনের প্রতিমূর্তি তাঁর স্নেহভাজন সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে। নাটক কেন তাঁর উদ্দেশ্য উৎসর্গ করেছেন, তা কবি উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন। এই অদ্ভুত চঞ্চল যৌবনের দূতদের অভিযান বর্ণিত হয়েছে 'সবুজের অভিযান' কবিতায়।

এবার 'বলাকা'র সমকালীন একটি প্রবন্ধের কথা বলতে পারি—'কালান্তর' গ্রন্থভুক্ত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ। এখানেও খাঁচা ও শলাকা এবং আকাশ ও ডানার উপমার ছড়াছড়ি। তথাকথিত বিবেচনায় যাদের জীবন গতিহীন তাদের প্রতি এই প্রবন্ধে কবি আকর্ষণ বোধ করেন নি। আকর্ষণ বোধ করেছেন অবিবেচনায় চঞ্চলদের প্রতি। আমাদের সমাজ প্রথমোক্ত বিবেচকদের নিরুদ্যম জীবনে নিশ্চল, 'অচলায়তন' নাটকের আচার্যের ভাষায় 'এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এ তো নিশ্চল শান্তি' এ সমাজ খাঁচার মতো বদ্ধ। বিবেচনা করে যারা প্রতি পদক্ষেপ নেয়, তাদের জীবনে 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধের ভাষায় শুধুই নিষেধ—এটা করো না, সেটা করো না—এ জাতীয় নিষেধ, তার ফলে প্রবীণ ভয়, মৃত্যু, স্থূলের স্থাবরতা পক্ককেশের ধবধবে সাদা রঙ-মরুভূমির মতো ধূসরতা। এই মানুষগুলি কলের পুতুল, সারাটা সমাজ যেন পুতুলবাজির কারখানা। এদের জীবনে চারদিকে প্রাচীর তোলা। এরা যেন সব জটাজুট বিলম্বিত তপোমগ্ন ধূর্জটি। অন্যদিকে মুক্ত সমাজ খাঁচা হয় না। সে সমাজ আকাশ—ডানা মেলে ওড়ার আকাশ। এখানে মৃত্যুর স্তব্ধতার বদলে থাকে চঞ্চল প্রাণ। এই প্রাণ প্রাচীরে বাঁধা পড়ার জন্য নয়।

নিত্য নতুন পথ সন্ধানী। স্থলের মতো এদের জীবন নিশ্চল স্থাবর নয়, জলের মতো চিরচঞ্চল জলে শুধুই রূপ থেকে রূপান্তরে নিত্যসচলতা—সমুদ্রে সে জল, আকাশে জল মেঘের রূপ নেয়, মাটিতে ঝরে পড়ার সময় আবার জলধারা হয়ে নেমে আসে এই বদ্ধ সমাজ তপস্বী। শিব সেজে বসে নিতান্ত নিষ্ক্রিয়। শিবের সঙ্গে উমার মিলনে কুমারের জন্ম, নবীনের আবির্ভাব। মুক্ত সমাজের শিবের মতো নির্বিকার থাকার উপায় নেই। উমা এসে সে সমাজের তপোভঙ্গ সম্ভব করে তোলেন। ধূর্জটির উদ্দেশ্যে কবির সম্বোধন 'বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হ'ল অবসান। জটিল জটার মধ্যে জাহ্নবীর অশ্রু কলতান শুনিলে তন্ময়'—তপোভঙ্গ 'পূরবী,' 'পূরবী' 'বলাকা'র পরবর্তী কাব্য। কিন্তু 'তপোমগ্ন' কবিতার ভাবনাটি 'বলাকা'র সমকালে রচিত। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'য় আমরা এসব কথায় পেয়ে যাই।

'অচলায়তন' প্রাচীর ভাঙার নাটক আরও অনেক রবীন্দ্র নাটকের মতো পথের জয়গানে মুখর নাটক। 'তপোভঙ্গ' কবিতায়ও স্থবিরের শাসন নাশনের কথা, তপোমগ্ন ধূর্জটির সঙ্গে উমার মিলনের কথা, নবীন প্রাণ কুমার কার্তিকের জন্মকথা। 'অচলায়তন' নাটকের উপাধ্যায় বলেন ঃ

'তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই কিন্তু সনাতন বিধি তো চিরকালের।'

এই সনাতন বিধির বাঁধা খাঁচার কথায় 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'য় লিখেছেন ঃ

"আমাদের সমাজে যে, পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে বাহবার ঘটা কাড়িয়া গিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে বলিতে হয় 'খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখা দুটোকে অসাড় করিয়া দিল নয় বলিতে হয় ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাকাগুলি পবিত্র, কারণ পাখাতো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে, কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, কিন্তু কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন, অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখার ঝাপট সেইটুকুই বিধি। তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যেই যদি থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।"

কর্তা, গুরু, পুরোহিত, পাঁজি, মোল্লামৌলবী, পুঁথি, স্মৃতিশাস্ত্র, শরিয়ত, আমরা দীর্ঘকাল মেনে চলেছি। ভুল করবার স্বাধীনতা, অবিবেচনার তাগিদ এখানে অস্বীকৃত শুধু নয়, ধিকৃত। তাই সত্যলাভ থেকে আমরা বঞ্চিত। পাখার চেয়ে শলার পবিত্রতা আর সনাতনত্ব ঘোষণায় আমরা মুখর। ক্ষণিক প্রাণের চেয়ে সনাতন বিধির মহিমাকীর্তনে 'অচলায়তনে'র উপাধ্যায়ের মতোই আমরা উচ্চকণ্ঠ। আকাশকে আমরা ওড়বার আনন্দে জানি নি, জেনেছি নিষেধভরা প্রবীণ ভয়ের রূপে। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধেও কবির প্রিয় খাঁচা আর মুক্তিপ্রিয় কূজনে মুখব পাখির চিত্রকল্প সবুজের অভিযানে বা আগে ও পরে লেখা অনেক রচনায় এসে যায়। শুধু এ কথা বলার জন্য গল্প, নাটক ও প্রবন্ধের সাক্ষ্য নিতে হলো।

কবিতা রচনার সময় চিত্রকল্পগুলির একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। একটি চিত্রকল্প থেকে আরেকটি বেরিয়ে আসে, আগেরটি নাকচ করে কিছুটা অগ্রসর হয়। কখনো বা নাকচও কবে না। একটি আরেকটিব পরিপূরক হয়ে ওঠে। এখানে খাঁচা বন্দী পাখি ও খাঁচার বাইরে মুক্ত পাখিব দুটি চিত্রকল্প পরস্পরের পরিপূরক। চিত্রকল্পের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় ইংরেজ কবি ডিলান টমাস লিখেছিলেন ঃ

প্রত্যেক চিত্রকল্পের মধ্যে তার নিজের ধ্বংসের বীজ থাকে, এবং আমি যেরকম বুঝি তাতে আবার এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় বীজ থেকে উদ্ভিন্ন চিত্রকল্প পরম্পরায় নিরন্তর একটি ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়া। Each image holds within it the seed of its destruction, and my dialectical method, as I understand it, is a constant building up and breaking down of the image that come out of the central seed—ডিলান টমাসের এই মূল বাক্য কয়টির বর্তমান লেখককৃত অনুবাদ। দেওয়া হয়েছে। এই কথাগুলি Robin Skelton-এর the Poetic Pattern বইটিতে উদ্ধৃতি হিসেবে আছে।

এই ভাঙাগড়ার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া 'সবুজের অভিযান' কবিতার এই দুটি চিত্রকল্পের মধ্যেও চলেছে। তাছাড়া এ কবিতার বুনট থেকে একটি ভেতরের ছক ফুটে ওঠে। চিত্রকল্পে ভেতরের সেই ছকটি আছে। এই ছক কখনোই বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। আকাশের গা থেকে উপচে পড়া প্রভাতসূর্যের আলোর মদ আর সেই মদে মাতাল তরুণ দল—প্রথম স্তবকের এই চিত্রকল্প অনেক দূর অগ্রসর না হলেও হারিয়ে যায় নি, বরং কবিতার বুনটের মধ্যে কাজ করেছে। তাই কবি যে তরুণদের 'ঝড়ের মাতনে' মেতে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে শেষ স্তবকে এসে বলেছেন যে এরা 'সবুজ নেশায়' পৃথিবীতে বিভোর হয়ে নাচছে। প্রতি স্তবকের শেষে তরুণদের উদ্দেশ্যে সম্বোধনের ভাষার শুধুমাত্র বিশেষণটি পালটে কবিতার যে ধুয়ো রচনা করেছেন, তাতে পঞ্চম স্তবকের শেষে তরুণদের বলেছেন, 'আয় প্রমত্ত আয়রে আমার কাঁচা।' এই 'প্রমত্ত' প্রকৃষ্টভাবে মত্ত। তাই এখানেও মত্ততার ভাবটি রয়েছে। প্রথম স্তবকেই এই ভাবের সূচনা ঘটেছিল। কবি তরুণদের প্রতি স্তবকের শেষে ডেকে বলেছেন : আয় রে আমার কাঁচা, দুরন্ত জীবন্ত, অশান্ত, প্রচণ্ড, প্রমত্ত, প্রমুক্ত, অমর—এই কয়টি বিশেষণের বৈচিত্র্য দেখি সাতটি স্তবকের শেষ পঙ্ক্তি সপ্তকে। মাতাল, মাতন, প্রমত্ত, নেশা—সারা কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শব্দ চারটিতে একটি চিত্রকল্পই আভাসিত হয়েছে যে তরুণদের হতে হবে নতুনের সন্ধানে মাতাল এবং সেই মত্ততার সূচনা প্রথম স্তবকে নবযুগ প্রভাতের আলোর উচ্ছল সুরাপানে। 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে'—প্রথম স্তবকের এই পঙ্ক্তিতে এ চিত্রকল্পের উন্মেষ এবং তার পরিণতি শেষ স্তবকের 'সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা'য়। সবুজের নেশায় অর্থাৎ যৌবনের নেশায় সারা পৃথিবী বিভোর করে তুলেছে এই তরুণ দল। প্রথম স্তবকের 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে'র কল্পনা থেকেই সেই ভোরে নীড় ছেড়ে বেরিয়ে আসা কাকলিমধুর মুক্ত পাখির চিত্রকল্পটি এসেছিল, তারই বৈপরীত্যের আকর্ষণে বন্দী পাখির চিত্রকল্পে এবং অবশেষে শেষ স্তবকে সবুজ নেশায় বিভোরের কল্পনায় প্রথম স্তবকে যা ছিল আভাসে, তাই উন্মোচিত হয়েছে ক্রমে ক্রমে। এই বিশেষ কবিতার চিত্রকল্পের সূচনা থেকে পরিণতিতে এই ক্রমের মধ্যে ইংরেজ কবি ডিলান টমাস যাকে বলেছেন চিত্রকল্পের দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়া, তারই নিঃশব্দ ক্রিয়া অনুভব করি। এমনকি এ কবিতার প্রথমে যে-মত্ততার কথা, সেই মত্ততা বাচক শব্দ ফিরে ফিরে শুনি 'বলাকা'র পরবর্তী কবিতাগুলিতে। যেমন, 'জীবন এবার মাতল মরণ বিহারে' (দ্বিতীয় কবিতা), 'আলোর নেশায়, গেছি খেপে' (তৃতীয় কবিতা)। 'সবুজের অভিযান' কবিতার চিত্রকল্পগুলির ভেতরে ভেতরে একটা বুনট আছে এবং সেই বুনটের অভাব কিভাবে কোনও কোনও কবিতায় থাকে, যেমন—নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় এ বিষয়ে অন্য বইতে আমরা আলোচনা করেছি।

আমরা এ কবিতার চিত্রকল্পের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া ও সমকালীন অন্য রবীন্দ্রপ্রবন্ধ ও নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্যের আলোচনা সূত্রে আরম্ভের দুটি স্তবকের ব্যাখ্যা এখন পর্যন্ত করেছি। দ্বিতীয় স্তবকের নিশ্চল প্রবীণদের চিত্র আরও বিস্তীর্ণ হয়েছে তৃতীয় স্তবকে। প্রবীণদের কেউ বাইরে তাকায় না। য়ুরোপে নতুন নতুন চিন্তা ও কর্মের জোয়ার উঠেছে, বান ডেকেছে—তাতে এদের কারও কোনও কৌতূহল নেই। এরা এমনই আত্মতৃপ্ত, আত্মাভিমানে স্ফীত যে মনে হয় আপন উচ্চ বাঁশের মঞ্চে অচল আসন পেতে অনড় হয়ে বসে আছে। এক তো শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান, তাই উচ্চ বাঁশের মাঁচা, আর এই অভিমান দৃঢ় ও অনমনীয়, তাই পাতা-আসনটি অচল। এই মঞ্চ সংকীর্ণ জাত্যভিমানের মঞ্চ। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে এরা আচ্ছন্ন, মিথ্যা অহমিকায় এরা অন্ধ। বহির্বিশ্ব থেকে কিছুই এদের জানার নেই। সবই জানা হয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও জীবনের প্রশ্নের উত্তর কিনা প্রাচীন শাস্ত্রেও অন্য গ্রন্থে আছে। এ রকম ভাবের ঘরে চুরিতে এরা মশগুল। পাছে মাটির মলিন স্পর্শ লাগে, তাই পথ চলতে এদের ভয়। আসলে আত্মদৈন্যকে ঢাকার জন্য শ্রেষ্ঠত্বের আত্মাভিমানে বা সেঁধিয়ে আছে। অনেক কাল আগে 'মানসী'র 'বঙ্গবীর' কবিতায় আমাদের এ জাতীয় মানসিকতায় কিভাবে কবি ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনেছিলেন, প্রথম পরিচ্ছেদে (৬ পৃ.) সেই উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি। যে আধ্যাত্মিকতার বড়াইকে তিনি ওখানে বিদ্রূপ করেছিলেন সে-বড়াই থেকে 'সবুজের অভিযান' কবিতায় এরা "আছে অচল আসনখানা মেলে যে-যার উচ্চ 'বাঁশের মাচায়'।"

চতুর্থ স্তবকে প্রবীণদের মিথ্যা আর তরুণদের সত্যের লড়াই বেঁধেছে। ওরা তো বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিল। তার মধ্যে হঠাৎ নতুন ভাবনা-চিন্তার আলো হাতে তরুণদের আসতে দেখে দু'দলের বিরোধ বাঁধবে। অসময়ে ঘুম ভাঙায় রেগেমেগে তেড়ে আসবে। তাতে ভালোই হবে, এই সুযোগে তো ঘুম ভাঙবে, সত্য মিথ্যার লড়াই শুরু হবে, যেমন লড়াই বেঁধেছিল 'অচলায়তন' নাটকে স্থবিরক আর শোণপাংশু এই দুই দলে। এই লড়াইতে মিথ্যা হারবে, সত্য জিতবে।

তারপর শিকল দেবীর পূজাবেদী চিরকাল খাড়া রাখায় অথবা পুঁথিপোড়োর কাছে/পথে চলার বিধিবিধান যাচা'য় অভ্যস্তদের কথায় সমাজের স্থিতাবস্থার প্রহরীদের স্বরূপের প্রতি ইঙ্গিত থাকলেও বাকি স্তবক কয়টিতে শুধু তরুণদের কথা। শিকল দেবীর পূজাবেদী বলতে তিনি বিদেশী শাসনের শিকলের কথা ভাবেন নি। এই শিকলকে বিকল করা যায়। কিন্তু আমাদের অন্তর যে-শিকলে বাঁধা, হাঁচি-টিকটিকি মঘা-অশ্লেষা-অমাবস্যা, পাঁজি-পুঁথি, বারবেলা—কালবেলা, তাগা-তাবিজ মাদুলির মতো শত সহস্র ভয়ের বন্ধনে বাঁধা—তা থেকে মুক্তি লাভ আরও কঠিন। সনাতন আচার-বিচার, নিষেধ ও মানা, সংস্কার ও বিধানের যে দেবীর প্রতি আমাদের সমাজ ভক্তিতে গদগদ, সেই দেবীকে 'কালান্তরে'র 'সমস্যা' প্রবন্ধে বিদ্রূপের ভাষায় কবি বলেছিলেন 'খুঁটাশ্বরী'। এই খুঁটির দেবীকেই এ কবিতায় তিনি বলছেন 'শিকল-দেবী'। বন্ধদ্বার অর্গলমুক্ত করে এসে একমাত্র তরুণরাই এক শিকল-দেবীর পূজা বেদী ভাঙতে পারে। ঝড়ের মত্ততায় বিজয় পতাকা উড়িয়ে এই তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে, 'অচলায়তন' নাটকের আচার্য পঞ্চককে বলেছিলেন : 'যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে—তুমি ভুল করো গে—আমাদের কথা শুনো না।' এ কবিতায় এদেশের নবযুগের পঞ্চকদের উদ্দেশ্যে কবি বললেন : 'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে/ভুলগুলি

সব আন রে বাছা বাছা।' আচার্য আশা করেছিলেন, তাদের গুরু আসবেন, তাঁর কাছে পঞ্চকের মতো বালক হয়ে বসবেন, আর গুরু তাঁকে 'ভুল করে সত্য জানাবার অধিকার' দেবেন, তখন তার মনের ওপর থেকে 'দু'হাজার বছরের পুরাতন ভার' নেমে যাবে। সেই ভারমুক্ত তরুণদের উদ্দেশ্যে লেখা এই কবিতা। ভুল করতে করতেই মানুষ সত্যপথের সন্ধান পায়। একমাত্র মানুষেরই ভুল হয়। গাছ বা পাথর বা অন্য কোনও প্রাণীর বেলায় ভুল করবার কথাই ওঠে না। কেন না আর কারও সত্য লাভের দায় নেই। এ দায় শুধু মানুষের। তাই মানুষই একমাত্র ভুল ভ্রান্তি পেরিয়ে সত্যসন্ধানী। এ কবিতার পঞ্চম স্তবকে কবি যে- মুহূর্তে বললেন, 'অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে' তখনই মেঘদূত কাব্যের 'ত্র্যম্বকস্য অট্টহাস' ঃ—এই অনুষঙ্গেয় পথ ধরে এলেন ভোলানাথ। তাঁর কাধে ঝোলাঝুলি। তাতে ভিক্ষার খুদকুঁড়ো নেই। ভোলানাথ নামের সঙ্গে মিলিয়ে কবি বললেন, তাঁর ঝোলাঝুলিতে আছে বাছা বাছা ভুল। তাঁর আবির্ভাব ঘটে বজ্রে বিদ্যুতে জড়ের মত বর্ষার বর্ষণে, কালবৈশাখীর রুদ্র রূপে। তিনি যৌবন তথা চঞ্চল প্রাণ সঞ্চারের জন্য জীর্ণতা ঘোচানোর সাধনায় প্রলয়ের দেবতা হন। তাই তরুণদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন ঃ 'ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা। এই ভাষা শেষ স্তবকের। প্রলয়ের দেবতা শিবকে বার বার কবির মনে হয়েছে যৌবনের মূর্তি। যৌবনও ভাঙে, এই ভাঙার মধ্য দিয়েই তার গড়া। ভাঙতে হয় গ্রীষ্মের শুষ্কতা। তবেই না দাহজয়ী বর্ষার আবির্ভাব সম্ভব। 'অচলায়তন' নাটকেও বার বার গ্রীষ্মের দাহজয়ী বর্ষার কথা, ভিজে মাটির গন্ধের কথা। এখানে আচারে শুষ্ক শিকল-দেবীর পূজা-বেদী ভেঙে বর্ষার প্রাণ নেমে এসেছে।'

ষষ্ঠ স্তবকে বাঁধা পথের শেষে অজানাদের দেশে নতুন পথ কেটে বাধা বন্ধনহারা গতিতে বিবাগী চিত্তে ছুটে চলার কথা। আপদে-বিপদে, আঘাতে-বেদনায় বক্ষে তরুণদের প্রাণ নেচে ওঠে। পুঁথিপোড়োর কাছে বিধিবিধান যাত্রার পালা চুকিয়ে তাদের নতুনের সন্ধানে তরুণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছুটতে হবে। চশমা চোখে তুলট কাগজের মস্ত বড়ো বড়ো পুঁথি চণ্ডী মণ্ডপের দাওয়ায় বসে পড়ে সমাজপতিরা দীর্ঘকাল অনেক বিধান দিয়েছেন। এ সব বিধান শোনার জন্য সামাজিকরাও উৎকর্ণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষায় 'মানুষকে পুঁথিকে, ইশারাকে গণ্ডিকে বিনা বাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনোমতেই ঠাহর হয় না, এমনকি বিলাতি চশমা পরিলেও না।' য়ুরোপের বিজ্ঞান শিখেও আমাদের বুদ্ধির মুক্তি সম্ভব হয় না। এই বিজ্ঞান-পোড়োরাও প্রাচীন পুঁথি-পোড়োদের কাছে ছুটে যান। 'ফাল্গুনী' নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে গ্রামের মানুষগুলি বলছে ঃ

> 'এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই
> পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপে।
> পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়।

কী ভুলটাই করেছিলুম। ভেবেছিলুম চলাটাই বাহদুরি। কিন্তু না চলাই যে গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়া সমস্তর উলটো। সেটেইতো তেজের কথা হল'।

চণ্ডীমণ্ডপের সেই পুঁথি-পোড়ো আমাদের গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়ার মতো চলতে নিষেধ করছেন। আমরা সেই নিষেধ মেনে দীর্ঘকাল প্রকৃতির বিরোধিতা করে তেজ দেখিয়েছি।

কিন্তু এবার তরুণদের উদ্দেশ্যে কবির আহ্বান পুঁথি-পোড়োদের রাজত্ব তারা ঘুচিয়ে দিক্।

এই তরুণরা চিরযুবা, দীর্ঘজীবী। জরা ঘোচানোই তাদের কাজ। অফুরান প্রাণশক্তিতে তারা ভরপুর। এই নিষ্প্রাণ-স্তিমিত দেশে সেই প্রাণ চারদিকে দেদার ছড়াতে হবে তরুণদের যাতে আধমরাও সম্পূর্ণ বেঁচে ওঠে, জীবন্মৃত অস্তিত্বের মোহ থেকে জেগে ওঠে। যৌবনের ঋতু বসন্ত। বসন্তের ফুল বকুল। যৌবন তার নিজের গলার বকুলমালা বসন্তের গলায় পরাবে। শুধু কি বসন্তের মতো কবির বন্দিত যৌবন কোমল পেলব হবে? কবি বলেন, না ঝড়ের মেঘে তার তড়িৎ ভরা থাকবে। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতো সে হবে কঠিন কঠোর। কোমলে কঠোরে এ যৌবন হবে সম্পূর্ণ। তার মধ্যে থাকবে ঋজুতা, অনমনীয়তা, সংকল্প সাধনের দৃঢ়তা, একই সঙ্গে এক প্রমত্ততা, ঝড়ের মাতন, রক্ত আলোর মদের মাতলামি, কেননা এমন মত্ততার মধ্যেই প্রাণ শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

এ কবিতার ছন্দ দলবৃত্ত। এই ছন্দ স্বরবৃত্ত। ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দ নামেও পরিচিত। এর ছন্দ শুধু লৌকিক নয় শব্দচয়নেও অনায়াসে সাবলীল লৌকিক ভঙ্গি আছে। তাই এখানে অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে যায়। ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বাছা বাছা ভুল আনার কথা কবি বলেন। ফেড়ে ঝেড়ের মতো লোক-ব্যবহারের ক্রিয়াপদে কবিতার ভাষায় অনায়াসে নিজেদের ঠাঁই করে নেয়। অফুরান প্রাণ দেদার ছড়িয়ে দেবার কথাও কবি অসংকোচে বলতে পারেন। দেদারের মতো ফার্সি শব্দ, যজ্ঞা থেকে যাচাব মতো তদ্ভব শব্দ শয়ন-সংঘাত-অট্টহাস্যের মতো তৎসম শব্দ মিলেমিশে কবিতায় শব্দের ঐকতান রচনা করেছে, শব্দে শুচি ও অশুচির, কাব্যিক অকাব্যিকের পার্থক্য সেই ঐকতানে লুপ্ত হয়ে যায়। এ কবিতার ভাষার এই উদারতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভাবেও যেমন যৌবন, ভাষাতেও তেমনি শব্দের শুচি-অশুচি না মানা যৌবনের স্পর্শ।

॥ দুই ॥

কবিতার আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের যে পাশ্চাত্য ভ্রমণ ছিল খুবই দীর্ঘায়ত, সেই পাশ্চাত্য দেশ ঘুরে এসে কবি সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার একটি স্পষ্ট তুলনা করবার সুযোগ পেয়েছেন। ভারতবর্ষের মানুষ কেবল প্রাচীন ঐতিহ্য এবং প্রাচীন বংশ মর্যাদার মোহে কিভাবে বৃথা কালক্ষেপ করছে সে কথা কবি বুঝতে পেরেছেন। পাশ্চাত্য জীবনে যখন কর্মের উন্মাদনা জেগেছে, মানুষ বিভিন্ন ধরনের কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করছে, তখন ভারতবর্ষের জীবন অতি মন্থর। এখানে প্রাচীন শাস্ত্রের নানা বিধি নিষেধে মানুষ জর্জরিত। প্রাচীন সম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবেই সব ব্যাপারে বেশি চিন্তা করেন—তাঁদের চিন্তাভাবনা অত্যন্ত বেশি, কর্মসাধনা সে তুলনায় অনেক কম। এঁরা বেশির ভাগই কূপমণ্ডূক হওয়ার জন্য ভারতবর্ষের বাইরে মানুষের জীবনে কেমন কর্মোদ্দীপনা জেগেছে সে দৃশ্যও এঁরা দেখতে চান না। তাই কবি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এ দেশে যদি জীবনের জোয়ার আনতে হয়, প্রাচীন জীবনযাত্রার জড়ত্ব ঘোচাতে হয় তবে প্রবীণ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব আমাদের ত্যাগ করতেই হবে, আহ্বান জানাতে হবে নবীন সম্প্রদায়কে। কারণ, বাঁধা পথের নিশ্চিন্ত

যাত্রা ত্যাগ করে বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে নবীনই। প্রবীণের বিচার-বুদ্ধি তার হয়ত থাকে না, তাই ভুল করার সম্ভাবনাও থাকে তারই বেশি, কিন্তু অতিরিক্তি সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে যদি চলাই বন্ধ হয়ে যায় একেবারে তার চেয়ে চলতে গিয়ে ভুল করাও অনেক ভাল।

সাতটি স্তবকের এই কবিতায় কবি নবীন এবং প্রবীণের একটি তুলনামূলক আলোচনা করে প্রায় প্রথম থেকেই জয়মাল্য দিয়েছেন নবীনের গলায়। নবীনের সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকেও তিনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু যৌবনের প্রাণ শক্তিতে তা ঢাকা পড়ে যাবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। কবিতার প্রথম দুটি স্তবকে নবীন এবং প্রবীণকে পাখির রূপকে কবি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন, অবশ্য পরবর্তী স্তবক সমূহে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে যৌবনকে নিয়ে বলাকা কাব্যগ্রন্থের আরো দুটি কবিতা আছে—১৩ সংখ্যক কবিতা 'যৌবনের পত্র' এবং ৪৪ সংখ্যক কবিতা 'যৌবন'। বলাকার বিশিষ্ট গতিবাদের সঙ্গে এর মিল এইখানে যে যৌবনের ধর্মই স্থবিরত্ব ঘুচিয়ে এগিয়ে চলা। তার মধ্যে এমন এক দুর্দম প্রাণশক্তি আছে যে সে কোনরকম কর্মচাঞ্চল্য ছাড়া স্থির হয়ে থাকতে জানে না। নবীন সম্প্রদায় ঠিক করুক, ভুল করুক, এগিয়ে সে চলবেই—এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। এক অর্থে জীবনেরও ধর্ম তাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় অন্যত্র বলেছেন যে জাতি এই চলিষ্ণুতার ধর্মবর্জিত অচল এবং অসার, সেই জাতিকেই সহস্র লোকাচার এসে ঘিরে ধরে এবং সেই জাতি এক অপদার্থ স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বলাকা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে কবির সে মানসিকতা ছিল বলে আমরা জানি, ১ নং কবিতাটি তার অনুরূপ বলেই আমরা মনে করি। তবে বলাকার কিছু কবিতা যে বিশেষ ছন্দভঙ্গীতে রচিত, এই কবিতা রচনায় সেই ছন্দভঙ্গি অবলম্বন করা হয় নি।

এই কবিতা সম্বন্ধে এবং এর ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় কিছু মন্তব্য করেন। সেই মন্তব্য এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কবিতাটির রস-গ্রহণে সহায়ক হবে মনে করে সেগুলি অবিকল উদ্ধার করার চেষ্টা করা হল। কবিতার আলোচনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন :

"গতির ছন্দে ও নৃত্যেই অরূপ করে রূপ-পরিগ্রহ। যাঁরা রূপের উপাসক তাঁরা গতিকে বরণ না করে পারেন না। আচারের অতি বন্ধনে মানবসমাজ যখন আপন সার্থকতার প্রকাশ (expression) হারিয়ে ফেলে তখন কবিরাই তাকে আঘাত করে গতির জন্য করেন জাগ্রত। বৈদিক ঋষিরাও এ-কাজ করেছেন। মধ্যযুগে সাধক কবির প্রভৃতির দলও এই ধাক্কাই দিয়েছেন, আর বাউলদের তো কথাই নেই।

আমাদের দেহ চায় বসে পড়তে, অথচ আত্মা নিত্য-সচল। জড় প্রকৃতির বাঁধনে বদ্ধ হলেও চিন্ময় আহ্বান শুনে আত্মাকে জাগাতেই হবে। স্থিতিশীলেরা তাই প্রকৃতির দোহাই দেন আর গতিশীলেরা করেন আত্মার জয় ঘোষণা। জীবনের ধর্মগতি, দেহের ধর্মস্থিতি।"

কবিতার মূল ভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"এই কবিতার মূলগত ভাবটি এই—যৌবনের যে একটি প্রবলতা সে সমস্তকে ভেঙে পরখ করে, প্রত্যক্ষ করে দেখতে চায়। শাস্ত্রবাক্য আপ্তবাক্য এ সব তার জন্য নয়। প্রবীণতা চায় যে কোনো মতে পরের অভিজ্ঞতার বলে বিঘ্ন-ব্যথাকে এড়িয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তারা আবার তাদের প্রবীণতার বোঝা চাপিয়ে দেবে। বাঁধা বুলি না মেনে প্রত্যক্ষের দ্বারা সব কিছু অনুভব

করার মধ্যে বেদনা আছে। কারণ তাতে পরের অভিজ্ঞতার কর্ণধারত্ব নেই এবং বাঁধা পথের নির্বিঘ্নিতাও নেই—কিন্তু এই তো যৌবনের ধর্ম। যৌবনই বিশ্বের ধর্ম, জরাটা মিথ্যা। যৌবন জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।"

কবিতাটির আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বীজের মধ্যে প্রাণ এলেই অঙ্কুর হয়ে সে বীজের আবরণ বিদীর্ণ করে। প্রাণের ধর্মই এই। পুরাতনের অর্থহীন বন্ধনকে ভাঙাই হল তার কাজ। আপ্তবাক্য ও শাস্ত্রের বাঁধন যৌবনের জন্য নয়। যৌবন সব কিছু ভেঙে ভেঙে পরখ করে করে সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চায় প্রবীণতা চায় সব বিপদ-ব্যথা-ক্ষতি এড়িয়ে পরের অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে নিরাপদে থাকতে। এই অভিজ্ঞতার বোঝা আবার সে তার উত্তরাধিকারীদের ঘাড়েও চাপিয়ে রেখে যেতে চায়। আপ্তশাস্ত্রের বাঁধা বোল না মেনে সব কিছু প্রত্যক্ষ করতে গেলেই পদে পদে বেদনা আছে। অথচ পরের অভিজ্ঞতাকে জীবনের কর্ণধার করতে যৌবন নারাজ। বাঁধা পথের নির্বিঘ্নতা সে চায় না, এই তো যৌবনের ধর্ম। কাজেই প্রবীণ ও নবীনের পথ ভিন্ন। যৌবনই বিশ্বে শাশ্বত ধর্ম। জরাই মিথ্যা। জরাসন্ধের জরাবন্ধন দুর্গ ভেঙে চূর্ণ করে যৌবন উড়ায় জীবনের জয়ধ্বজা। ঝুনো প্রবীণদের পাকা আর যৌবন-পথের পথিকদের কাঁচা বলা হয়েছে।

প্রবীণেরা চারিদিকের প্রাণ-চেষ্টাকে কিছুতেই দেখবেন না। চারিদিকের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ যেন নেই। মাটিতে তাঁদের পা পড়ে না। নিজেদের কৃত্রিমতার বাঁশের উচ্চ মাচাতে বসে বসেই তাঁরা তৃপ্ত। এই কৃত্রিম মাচাই তাঁদের অচলায়তন।

যৌবনকে ঠেকাতে গিয়ে সাঁচায় মিছায় যে যুদ্ধ লাগবে সেটাই পরম লাভ। তাঁর জন্যই যৌবনকে আহ্বান করা।

যিনি বিশ্বস্রষ্টা তিনিই তো নিয়মভাঙা ক্ষ্যাপা ভোলানাথ। সেই নটরাজের তালে তালে নৃত্য করতে করতে যৌবন-পতাকা নিয়ে যৌবন করুক তার জয়যাত্রা। বাঁধানের পূজাবেদী ভাঙুক। দ্বার ভেঙে ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি আসুক।

বাঁধা পথ শেষ হয়ে যাক। অবাধ অজানার পথে যাত্রা শুরু হোক। পুঁথির বিধান না মানলে যদি বিপদ আসে তো আসুক। এই বিপদের দেখা পাওয়া যাবে বলেই হৃদয় নৃত্য করছে।

তুই চিরযুবা। সব জীর্ণতা ভেঙে ফেলে অফুরন্ত প্রাণ লুটিয়ে দে। নবজীবনের উন্মত্ততায় তুই মাতিয়ে দিবি। বজ্র-বিদ্যুতে ভরা ঝড়ের মেঘই তো জয়পতাকা। নবীন বসন্তই তোর চিরদিনের বন্ধু। তারই মতন তুই চির নবীন, তুই অমর।

॥ তিন ॥

সার-সংক্ষেপ

(প্রথম স্তবক)

নবীন এবং কাঁচা প্রাণের তরুণকে ডাক দিয়ে বলা হয়েছে তারা যেন অধকৃতদের জীর্ণ প্রাণে আঘাত করে তাদের জড়ত্ব ঘুচিয়ে দেয়। সকালের সূর্যের লাল রঙ যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। সুতরাং এমন উদ্দীপণা পূর্ণ একটি প্রভাতে সকলের কথা অবহেলা করে সমস্ত কূটতর্ক

ভুলে গিয়ে দুরন্ত প্রাণের নবীনকে এগিয়ে আসতে হবে কাজ করার জন্য।

(দ্বিতীয় স্তবক)

নবীন ও প্রবীণকে পাখির সঙ্গে তুলনা করে কবি বলেছেন, নবীনকে পুচ্ছ নাচিয়ে নতুন প্রভাতের আলো বরণ করে নিতে। অন্যদিকে প্রবীণকে তাঁর মনে হয়েছে যেন এক বৃদ্ধ পাখি, যার চোখ এবং কান দুটি ডানা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। এই পাখি একেবারেই নড়ে না, কেবল যে খাঁচায় সে বদ্ধ হয়ে আছে সেই খাঁচাটি অল্প অল্প দুলছে হাওয়ায়। প্রবীণ পাখি ছবির মত, স্থানুর মত অন্ধকারে খাঁচায় বসে কেবল ঝিমায়, প্রাণের আর কোন লক্ষণ তার মধ্যে নেই। সুতরাং জীবন্ত নবীনকে ছুটে আসবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

(তৃতীয় স্তবক)

প্রবীণদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, তারা যে যার আপন বংশ মর্যাদার কথা, ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে অচল হয়ে বসে আছে। বাইরের পৃথিবীতে যে জীবনের বান ডেকেছে, প্রাণশক্তির জোয়ারে ভেসে মানুষ কত দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী হয়েছে—এ সংবাদ তারা রাখবার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। বাস্তব পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে তারা মোটেই বিব্রত নয়, কারণ মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কই তাদের অল্প। সুতরাং নবীনকে কবি অশান্ত হিসাবে সম্বোধন করে এই সমস্যা সমাধানের জন্য আসতে বলেছেন।

(চতুর্থ স্তবক)

এতদিন ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দিয়েছে এই স্থবির প্রবীণ সমাজ, সুতরাং আজ যদি হঠাৎ নবীন শক্তি এসে সেই নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চায় তাহলে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে অবশ্য জড়ত্বের অন্ধকারে অভ্যস্ত প্রবীণ হঠাৎ প্রগতির আলোয় চকিত হয়ে নবীনদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতে সফল না হলেই বাঁধবে সংঘর্ষ। মিথ্যা এবং সত্যের এই সংঘাতে অবতীর্ণ হবার জন্য অশান্ত নবীনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবি।

(পঞ্চম স্তবক)

মানুষের সব রকমের প্রগতি ও মুক্ত ইচ্ছাকে বেঁধে রাখার জন্য যে শিকলদেবীর বেদী নির্মাণ করা হয়েছে তা কি চিরকালই সমান প্রতাপে অধিষ্ঠিত থাকবে, এটাই কবির প্রশ্ন। কবি কখনই এ অবস্থা চলতে দিতে চান না। তাই প্রমত্ত নবীনকে তার সমস্ত পাগলামি নিয়েই এগিয়ে আসতে বলেছেন। তার আছে উন্মত্ত শক্তির তাণ্ডব এবং বিবেচনাহীন অগ্রগতি। তারা ভুলও যদি করে, কবি সেই ভুলগুলিকেই বর্তমান অবস্থায় কাম্য বলে মনে করেছেন।

(ষষ্ঠ স্তবক)

নবীন যেভাবে এগিয়ে যেতে চায় তাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, নিশ্চিন্তে সে পথকে মঙ্গলের পথ বলা যায় না। কিন্তু একই জায়গায় দিনের পর দিন বদ্ধ হয়ে থাকার চেয়ে অনিশ্চিত অজানার দিকে এগিয়ে যাওয়াও অনেক ভাল, কারণ তাতে অন্তত চলা

হয়। তাছাড়া অজানা উদ্দেশ্যে বিপদ ও আঘাত থাকতে পারে বলেই সে চলাতে রোমাঞ্চও আছে। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের কথা শুনতে শুনতে ভারতবর্ষের মানুষ এখন নির্জীব হয়ে পড়েছে, এখন দরকার প্রমুক্ত যৌবনের, যে পথে চলার নিয়মানুন দেখতে চায় না—অজানা পথে চলতে চায়।

(সপ্তম স্তবক)

শেষ স্তবকে নবীন যৌবনকে কেবলই বন্দনা করেছেন কবি। যৌবনের মৃত্যু নেই, সে অমর। জীর্ণ জড়া ঝরিয়ে দিয়ে সে অফুরন্ত প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে চলে সর্বত্র। এই যৌবনশক্তিই নতুন যুগের নতুন প্রভাত নিয়ে আসে, ঝড়ের মেঘে বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের যে শক্তি সে সেই যৌবনেরই শক্তি বসন্তের সঙ্গে যৌবনের চিরকালের সখ্য। সেই কঠোর ও কোমল যৌবনকে, চিরজীবী যৌবনকে কবি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

॥ চার ॥

শব্দার্থ ও টীকা

(প্রথম স্তবক)

ওরে নবীন....ওরে অবুঝ—লক্ষ্য করবার মতো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিশেষণ ব্যবহার করে বিশেষ্য পদকে বোঝানো হয়েছে। নবীন সম্প্রদায়কে কবি বোঝাতে চান, কিন্তু তাদের সম্বোধন করেছেন তিনি চারটি নামে—নবীন, কাঁচা, সবুজ, অবুঝ। এগুলি ওদের প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে সার্থক বিশেষণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। **আধমরাদের......বাঁচা**—আপাত অর্থে একটি বৈপরীত্য আছে। যে অর্ধমৃত, তাকে আঘাত করলে সে বাঁচে না, বরং মৃত্যু বরণ করে। এখানে কবি বলতে চান সেই যে প্রবীণ সমাজ জড়ত্বে অর্ধমৃত হয়ে আছে, জীবনের কর্মচাঞ্চল্য যাদের মধ্যে অন্তর্হিত, তাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে। **রক্ত আলোর মদ**—মদ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যাতে নেশা হয় সেই জিনিস। নতুন প্রভাত এসেছে জাতির জীবনে, নতুন সূর্যের আলো রক্তের মত লাল। এই প্রবহমান রক্তিম আলো মনে যেন আশা জাগিয়ে তোলে। সেই জন্যই প্রভাতের এই রক্ত আলোয় মত্ত হবার কথা তিনি বলেছেন। **যে যা বলে বলুক**—প্রবীণ সমাজ এই প্রাণ উন্মাদনাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবে না, এর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তারা সোচ্চার হয়ে উঠবে। **পুচ্ছটি তো......নাচা**—এতগুলি বিশেষণ দিয়ে যে নবীন সম্প্রদায়কে কবি আহ্বান জানিয়েছেন তাদের নিশ্চয়ই পুচ্ছ বা লেজ নেই। এখানে নবীন ও প্রবীণকে তিনি দুই পাখির রূপকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা পরবর্তী স্তবকেই ধরা পড়বে, এখানে তা আকস্মিক বলেই তার অর্থ বোধ হতে একটু দেরি হয়। পাখি খুশি হলে পুচ্ছ নাচিয়ে নিজের মনের আনন্দ প্রকাশ করে। নতুন প্রভাতে নবীন সম্প্রদায়েরও খুশি মনে নতুন কর্মোদ্যোগ নেবার সময় এসেছে—তাই কবি তাদের পুচ্ছ নাচাতে বলেছেন।

(দ্বিতীয় স্তবক)

খাঁচাখানা......ঘরের দাওয়ায়—পাখির রূপক এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবীন যদি প্রভাতের প্রাণচঞ্চল পাখি হয়, প্রবীণ তাহলে স্থবির বৃদ্ধ পাখি—জীবনের কোন লক্ষণই যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যে খাঁচায় তারা বদ্ধ হয়ে আছে তা জীর্ণ লোকাচার এবং সংস্কারের খাঁচা। বহুদূর পাশ্চাত্যে আন্দোলিত জন-সমুদ্রের ঘূর্ণিবাত্যা সামান্য যা কিছু এখানে এসে পৌঁছায় তাতে সেই খাঁচা মৃদুমন্দ আন্দোলিত হয়, এই মাত্র খাঁচার বাসিন্দার মনে তার কোন প্রতিক্রিয়াই জাগে না। **পরম পাকা**—এই বিশেষণ দুটি ভাল করে লক্ষ্য করবার মতো। নবীনকে কবি বলেছেন কাঁচা, কাজেই প্রবীণকে পাকা তিনি বলতেই পারেন—কিন্তু পাকারও যে বিশেষণ তিনি দিয়েছেন তাকে চলিত বাংলায় বলে ঝুনো, অর্থাৎ এদের কাছ থেকে ভাল বা নতূন কিছু আশা করা একেবারেই অসম্ভব। **চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা**—চোখ এবং কান দুইই ডানায় ঢাকা, কারণ বাইরে জীবনের যে জয়গান উঠেছে, পাশ্চাত্যে যে কর্মের উন্মাদনা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে প্রবীণ যে বিশেষ উৎসাহী নয় এমন কথা বললে ভুল বলা হয়, তারা এর ঘোর বিরোধী। তাই যাতে উত্তেজনাবর্ধক কিছু চোখে না পড়ে সে জন্য চোখ তারা ঢেকে নিয়েছে, কোন জীবনের কলরোল যাতে তাদের জড় জীবনের স্থবিরত্ব নষ্ট না করতে পারে সে জন্য ঢেকেছে কান। এখন তারা পরম নিশ্চিন্ত। **ঝিমায় যেন......খচ**—কোনরকম প্রগতিত চিহ্ন যাদের মধ্যে নেই তাদের পটে আঁকা ছবি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কূপমণ্ডুকের মত যারা সমাজপ্রগতির আলো থেকে বঞ্চিত তারা তো সংস্কারের অন্ধকারেই পড়ে রয়েছে।

(তৃতীয় স্তবক)

বাহির পানে—'বাহির বলতে কি বোঝায় কবি নির্দিষ্ট করে বলেন নি বটে, কিন্তু আমরা অনুমানে বুঝতে পারি তিনি পাশ্চাত্য জাতির কথাই বুঝিয়েছেন। **দেখে না যে... প্রবল ঢেউ**—এইসব কথাই বলা হয়েছে রূপক অর্থে। বান ডেকেছে জীবনে এবং জোয়ার এসেছে কর্ম-উদ্দীপনার। **চলতে ওরা......ফেলে ফেলে**—যে পৃথিবীতে বাস করা হয় তার সঙ্গে সম্পর্করহিত হয়ে কেউ সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারে না। প্রাচীনপন্থী মানুষেরা আধ্যাত্মিক চিন্তা অনেক করে কিন্তু মাটির পৃথিবীতে সুখে বাস করা যায় কিভাবে, সে চিন্তা তাদের মাথায় নেই। **উচ্চ বাঁশের মাচায়**—পৃথিবীর মাটির সঙ্গে সম্পর্ক নেই মনে করলেও মাচায় যেসব ফল তুলে দেওয়া হয় তারা মাটি থেকেই প্রাণরস সংগ্রহ করে, এই অর্থে কবি এ সব কথা বলে থাকতে পারেন। অথবা, উচ্চ বাঁশ বলতে উচ্চ বংশও তিনি বোঝাতে পারেন। প্রবীণপন্থীরা নিজেদের উচ্চ বংশ মর্যাদার কথা চিন্তা করে সাধারণ মানুষের থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখেন—ফলে দেশের কোন অগ্রগতিই তাঁদের দ্বারা সাধিত হয় না।

(চতুর্থ স্তবক)

হঠাৎ আলো—অন্যান্য দেশে যেসব জ্ঞান সংগৃহীত হয়েছে সেই জ্ঞানের আলো এখানে অত্যন্ত আকস্মিক বলেই মনে হবে কারণ এখানে অজ্ঞানতার অন্ধকার দীর্ঘকালের। **সাঁচা**—সত্য। **লাগবে লড়াই....সাঁচায**—নবীন সমাজকে কবি বলেছেন দুরন্ত, জীবন্ত এবং, অশান্ত। তিনি মনে করেন এই শ্রেণীটিই জাতির প্রকৃত শক্তি। এতদিন যে প্রবীণ সমাজ দেশের নেতৃত্ব হাতে নিয়ে বসে আছে তাতে জাতির প্রকৃত উন্নতি বা শক্তিবৃদ্ধি কিছুই হয় নি। সেই জন্যই এই সম্প্রদায়কে কবি বলেছেন মিথ্যা এবং যুবশক্তিকে বলেছেন সত্য। এদের সংঘাত আসন্ন বলেই কবির মনে হয়েছে।

(পঞ্চম স্তবক)

শিকল দেবী—শিকল মানেই বন্ধন, শিকল বন্ধনের প্রতীক। তাই যে জাতি জীবনের বন্ধনকেই বড় করে নিয়েছে, অগ্রগতিতে যার অত্যন্ত অনিচ্ছা সেই জাতি শিকল দেবীর পূজারী, এ কথাই কবি ধরে নিয়েছেন। **পাগলামি**—স্বাভাবিক জীবনের নিয়মকেতা যে কিছুই মানে না তাকেই সাধারণ ভাবে আমরা পাগল বলে থাকি। আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এমনই স্থবির, জড় ও বৈচিত্র্যহীন যে কবি এক অস্বাভাবিক ও নিয়ম না মানা জীবনের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি সেই অস্বাভাবিককেই আহ্বান করেছেন পাগলামি বলে। **বিজয়কেতন**—বিজয়চিহ্নিত পতাকা। **ভোলানাথ**—মহাদেব। **ভোলানাথের......বাছা বাছা**—এতদিন পথ যাতে না হয় সেইজন্য অত্যন্ত সন্তর্পণে, শাস্ত্রপুঁথি ঘেঁটে সঠিক পথের সন্ধান করা হয়েছে এবং সেই সন্ধানেই দিনের পর দিন কেটে গিয়েছে—চলা আর হয় নি। কবি এখন বুঝতে পেরেছেন চলাটাই দরকার সবচেয়ে আগে, তাই চলতে গিয়ে পথ ভুল হবে কিনা তা নিয়ে তিনি আদৌ উদ্বিগ্ন নন। বরং তিনি চান, নবীন সম্প্রদায় ভুল করেই এগিয়ে যাক। স্বয়ং মহাদেবকে বলা হয় ভোলানাথ, তিনি অসংখ্য ভুল করেন, অথচ শক্তির প্রচণ্ডতা তাঁরই বেশি। সেই শক্তি যদি থাকে তবে ভুলগুলি সঙ্গে থাকলে কোন অসুবিধা নেই।

(ষষ্ঠ স্তবক)

বাঁধা পথের শেষে—যে পথকে এতদিন বাঁধা বলেই মনে হয়েছিল, কারণ স্থবির মানসিকতার প্রবীণ সমাজ তার বাইরে বেরুবার ঝুঁকি নিতে পারেন নি এতদিন। **বিবাগী**—যার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল নেই। আপদ আছে—বিপদ আপদ থাকাটাই স্বাভাবিক কারণ যে পথে কোনদিন কেউ পরিক্রমা করেনি পথ চলার ঝুঁকি সেখানেই থাকে। **ঘুচিয়ে দে ভাই......বিধান খাঁচা**—পথে চলবার নানা বিপদ আপদ আছে বলে, কিভাবে পথ চলা যায় সে সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের মধ্যেই যারা আবদ্ধ তাদের চলাটাই হয় না শেষ পর্যন্ত। দিনক্ষণ মেনে পথ চলার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থের পাঠেই যারা নিমগ্ন, তাদের কাছে পথ চলা সম্বন্ধে কোন উপদেশ নিতে কবি বারণ করেছেন। কারণ তারা পথে না চলার বিধি-বিধান যত ভাল করে জানে, পথ চলতে তত ভাল জানে না। **যাচা**—প্রার্থনা করা।

(সপ্তম স্তবক)

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী—এখানেও একটি আপাত বিরোধিতা আছে। যৌবন চিরকাল ধরে স্থায়ী হতে পারে না এবং চিরকাল কেউ বাঁচতে পারে না। কবি আসলে বলতে চান যৌবন আসলে মনের এক বিশেষ ধর্ম বয়সের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃত যৌবন অমর, তা কোনদিন স্থবির হয় না, জীর্ণ হয় না—তার স্থায়িত্ব চিরদিনের। **সবুজ নেশা**—প্রথম স্তবকে কবি বলেছিলেন প্রভাতের রক্ত আলো যেন মদের মত নেশা জাগায়। এখানে বলছেন তারুণ্যের যে সবুজ দীপ্তি তারও যেন একটা নেশা আছে এবং সেই নেশা জাগিয়ে তুলেছে নবীন সম্প্রদায়। **ঝড়ের মেঘে......মাল্যগাছা**—যৌবনের মধ্যে ললিত এবং কঠোর—দুটি দিকই যে আছে সমানভাবে, এটি বোঝাবার জন্যেই কবি এই বর্ণনা দিয়েছেন। ঝড়ের মেঘে যে বজ্র লুকিয়ে থাকে তার ধ্বংসাত্মক শক্তি অপরিসীম। কবি মনে করেন, তা যৌবনের একদিকের প্রকাশ। আবার যৌবনের মধ্যে আছে সৌন্দর্য ও কোমলতার আর একটি দিক—রোমান্টিক সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ বসন্তকে যেন যৌবন তার নিজের গলার বকুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেয়। অর্থাৎ ললিত এবং কঠোরের সম্মিলিত প্রকাশেই যৌবনের পূর্ণ রূপ প্রকট হয়—ধ্বংসাত্মক ও গঠনাত্মক রূপ তার পরিপূরক মাত্র।

॥ পাঁচ ॥

- **ব্যাখ্যা**

(এক)

'আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সবুজের অভিযান' কবিতায় এ কথা বলেছেন ভারতবর্ষের নবীন যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে।

দেশের নবীন সম্প্রদায় যাতে অর্ধমৃত প্রবীণ সম্প্রদায়কে বাঁচাতে পারে, সেই কারণেই তাদের প্রতি এই আহ্বান রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন।

সাধারণভাবে প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে অর্ধমৃতকে আঘাত করে বাঁচানো সম্ভব নয়, কারণ যার অবস্থা এই রকম তাকে পুনরায় আঘাত করলে তার বাঁচার সম্ভাবনা অল্প—বরং সেই আঘাতে তার মৃত্যুর সম্ভাবনাই প্রবল। কিন্তু এখানে কথাটি বলা হয়েছে রূপক অর্থে। দেশের প্রবীণ সম্প্রদায় তাদের প্রগতিবিমুখ জড় মানসিকতার জন্যই অর্ধমৃত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে প্রাণের বিশেষ কোন লক্ষণ নেই। প্রাণের লক্ষণ সচলতা, অথচ তারা তাদের নিজেদের সনাতন জীবনবৃত্তেই স্থবির। সেইজন্য নতুন চিন্তাধারা এবং সচলতার আঘাতে তাদের আন্দোলিত করার কথাই কবি বোঝাতে চেয়েছেন যাতে তাদের চিন্তার স্থবিরত্ব ঘুচে যায় এবং যে সচলতা জীবনের প্রধান লক্ষণ, সেই সচলতা তারা আবার ফিরে পায়।

(দুই)

'সবুজের অভিযান' কবিতায় প্রথম দুটি স্তবকে যে রূপকের মাধ্যমে দেশের নবীন ও প্রবীণ সম্প্রদায়কে কবি উপস্থিত করতে চেয়েছেন তা কতখানি সুষ্ঠু হয়েছে দেখাও।

'সবুজের অভিযান' কবিতায় কবির উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের প্রবীণ সমাজকে সমালোচনা করা এবং দেশের নবীন সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো। প্রবীণ এবং নবীন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক তুলনা তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই কবিতায় দেখা গিয়েছে। কবিতার প্রথম দুটি স্তবকে তিনি পাখির রূপক আশ্রয় করে এই দুই সম্প্রদায়ের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম স্তবকে তিনি বলেছেন, নতুন যুগের নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। যুগান্তরের এই প্রভাতে দেখা দিয়েছে রক্তাভ আশার আলো। নবীন পাখি এই আলোর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মাতাল হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। মনের খুশিকে পাখি নেচে ওঠে, তার মনের খুশি বোঝাবার জন্য তার পুচ্ছ উর্ধ্বে আন্দোলিত হয়। কবি মনে করেন, নতুন কর্মোদ্দীপনায় জেগে ওঠবার এই প্রকৃষ্ট সময়। সুতরাং বিপদ ও বাধার ভয় দেখিয়ে পাখিকে যতই নিরস্ত করার চেষ্টা করা হোক, সে যেন তা না শুনে দুরন্ত বেগে তার যা খুশি তাই করতে শুরু করে—নবীন পাখির রূপকে নবীনকে এ কথাই কবি বলতে চেয়েছেন।

প্রবীণকে পাখির রূপকেই কবি চিত্রিত করেছেন দ্বিতীয় স্তবকে। তাঁর মতে প্রবীণ এখন এক বৃদ্ধ পাখি যাকে বলা যেতে পারে 'পরম পাকা'—অর্থাৎ নবীনতা বলতে যার মানসিকতায় কিছুই নেই। সে নিজে যেমন অনড় অচল, তেমনি যে খাঁচায় সে বাস করে সে খাঁচাও প্রায় অনড়—কেবল জীবনের পালে যে হাওয়া লেগেছে দূর প্রান্তে, সেই হাওয়ায় তার খাঁচাখানি অস্বস্তিকর ভাবে মাঝে মাঝে আন্দোলিত হয় এই পর্যন্ত। খাঁচাটি টাঙানো আছে অন্ধকার দাওয়ায়। তাও যদি বা অকস্মাৎ নতুন যুগের চকিত সূর্যোদয় চোখে এসে পড়ে পাখির সুমহান জাড্য ভেঙে যায়—যদি বাইরে জীবনের উন্মত্ত কলরোলে তার স্থবিরতার শান্তি বিঘ্নিত হয় সেই কারণে এইসব উপদ্রব ঠেকাতে এই প্রবীণ পাখি তার দুটি ডানায় ঢেকে নিয়েছে চক্ষু এবং কর্ণ। এখন এই পাখিকে চিত্রপটে আঁকা একটি ছবি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। দুটি দুই জাতীয় পাখিব রূপকে কবি নবীন ও প্রবীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে চমৎকার বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

(তিন)

'আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।'

অচল আসন বলতে এই কবিতায় বোঝানো হয়েছে এক অনড় আসনে অধিষ্ঠিত থাকার কথা, যেখান থেকে কোন সক্রিয়তা বা সচলতাই আশা করা যায় না।

এই অচল আসনে অধিষ্ঠিত আছে দেশের প্রবীণ সম্প্রদায়, যারা এতদিন পর্যন্ত দেশের কর্ণধার হয়ে এসেছে।

'উচ্চ বাঁশের মাচা' কথাটির তাৎপর্য বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করবার মত। কবি স্বয়ং কবিতাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই অংশের বিশ্লেষণে বলেছেন "নিজেদের কৃত্রিমতার বাঁশের উচ্চ মাচাতে বসে বসেই তাঁরা তৃপ্ত। এই কৃত্রিম মাচাই তাঁদের অচলায়তন।" অর্থাৎ কবি এখানে কৃত্রিমতাকেই বাঁশের মাচা বলে মনে করেছেন।

দ্বিতীয়ভাবে ব্যাখ্যা করলে বলতে পারি দেশের মাটির সঙ্গে গূঢ় সংযোগ না থাকলে দেশের পরিচালনার দায়িত্ব সার্থকভাবে নেওয়া যায় না। দেশের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এবং বৃহত্তর জন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে দেশের প্রবীণ কর্ণধারগণ। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য উচ্চ বাঁশের মাচা কথাগুলি ব্যবহার করা হতে পারে।

তৃতীয় একটি তাৎপর্যও আমরা ভাবতে পারি, দেশের বর্তমান প্রবীণ গোষ্ঠী নিজেদের বংশ মর্যাদার কথা চিন্তা করেই অন্যান্য অনেক জাতি অপেক্ষা নিজেদের বড় বলে মনে করে। অথচ তারা অনেকেই আত্যন্তিক প্রচেষ্টায় পথে অগ্রসর হয়েছে। কবি প্রবীণের সেই অপদার্থ বংশমর্যাদার অহমিকাকে 'উচ্চ বাঁশের মাচা' বলে মনে করে থাকতে পারেন।

(চার)

'সবুজের অভিযান' কবিতায় যে শিকল-দেবীর উল্লেখ আছে তার পরিচয় দাও। ভোলানাথ কে? তাঁর ঝোলাঝুলি ঝাড়ার কথা এই কবিতায় বলা হয়েছে কেন?

হিন্দুদের দেবদেবীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, 'সবুজের অভিযান' কবিতায় একটি নতুন দেবীর নাম পাওয়া যায়—শিকল-দেবী। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে প্রকৃতপক্ষে ইনি কোন নতুন দেবী নন, কবি রূপক অর্থেই এর ব্যবহার করেছেন। শিকলকে বলা যায় বন্ধনের প্রতীক। সেই বন্ধনকেই যার জীবনের চরম উপাস্য বলে মেনে নিয়েছে, বলা চলতে পারে তারা শিকলকেই দেবী হিসাবে পূজা করে। ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে যে আদর্শে চালিত হতো, বর্তমান কালেও সে আদর্শের পরিবর্তন ঘটে নি। পরিবর্তমান জগৎ ও জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলে চাই সচলতা ও সজীব মানসিকতা। কিন্তু প্রবীণ ও জড় মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ, যাঁরা এতদিন দেশের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন, তাঁরা চলা অপেক্ষা থামাকেই বড় বলে মনে করেন। সহস্র বাধা নিষেধ এবং জীর্ণ লোকাচারের বন্ধনে নিজেদের ও ভারতবর্ষের অগণিত মানুষকে বন্দী করে রেখেছেন। তাই কবি রূপকের মাধ্যমে এই কবিতায় পঞ্চম স্তবকে আক্ষেপ করে বলেছেন, শিকল-দেবীর এই পূজার বেদী আর কতকাল পূজা পাবে সাধারণ মানুষের।

ভোলানাথ দেবাদিদেব মহাদেবের একটি নাম। ধ্বংসের দেবতা তিনি, বিস্মরণেরও দেবতা—তাই তাঁর নাম ভোলানাথ।

ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বাছা বাছা ভুলগুলি সংগ্রহ করে নবীন সম্প্রদায় যাত্রা শুরু করুক, এই উপদেশ কবি দিয়েছেন। এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। সাধারণভাবে মানুষ এটাই চায় যে, তাদের যারা নেতৃত্ব দেবে তারা সঠিক পথে চলুক, ভুল পথে গিয়ে তাদের ভ্রান্ত পথ নির্দেশ করুক এ কথা কেউ বলে না। কিন্তু সঠিক পথ নির্বাচনের জন্য সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করার মত স্থবিরত্বও কারও কাম্য হতে পারে না। দেশের প্রবীণ সমাজের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল যে জড় নিশ্চলতার আবদ্ধ, তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই

কবি নবীন সম্প্রদায়কে আহ্বান করে বলেছেন তারা যেন সঠিক পথের নির্বাচন না করেই সচল হয়ে ওঠে। এতে যদি ভুলভ্রান্তি ঘটে তবে তা ঘটুক। একেবারে অচল হয়ে বসে থাকার চেয়ে ভুল পথে অগ্রসর হওয়াও অনেক ভাল। আসলে এখানে যে ভুলগুলিকেই কাম্য বলে মনে করা হয়েছে, কবির বক্তব্যের তাৎপর্য ঠিক তা নয়, তিনি বলতে চান অন্য কথা। পথ পরিক্রমা যে করে তারই ভুল হওয়া সম্ভব, রাস্তায় যে হাঁটে না তার কখনো পথ ভুল হয় না। কবি চান, সমস্ত জাতি সচল হয়ে উঠুক, তাতে যদি ভুল পথও অনুসরণ করা হয় তাতে এর চেয়ে বেশি সংকট ঘটবে বলে তিনি মনে করেন না।

(পাঁচ)

'ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল মাল্য গাছা।'

নবীন সম্প্রদায় যে তারুণ্যের শক্তিতে মহাশক্তিমান, সে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ 'সবুজের অভিযান' কবিতায় পূর্বেও দিয়েছেন, কবিতাটির শেষ স্তবকে তিনি এই তিন পংক্তির সাহায্যে তাদের এক সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নবীন সম্প্রদায় এক অফুরন্ত শক্তির উৎস। এই শক্তির একটি দিক ধ্বংসাত্মক। যে কোন বাধা-বিপত্তিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার শক্তি নবীন সম্প্রদায়ের আছে, তাই তাদের তুলনা করা হয়েছে বজ্র-বিদ্যুতের সঙ্গে। দুরন্ত জড় যে জলধর মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে, তার মধ্যে থাকে বিধ্বংসী তড়িৎ। এই মেঘবাহিত বিজলী কঠিনতম সৃষ্টি এবং প্রবলতম প্রতিবন্ধককেও নিমেষে দগ্ধ করতে পারে—সে শক্তি তাঁর আছে। এই অমিত শক্তিধর তড়িতের ধ্বংসাত্মক শক্তি নবীন সম্প্রদায়ের ধ্বংস করবার শক্তির সঙ্গেই সমতুল্য।

কিন্তু কেবল ধ্বংসের কাজেই নবীন তার শক্তিকে নিয়োজিত করে না। গঠনমূলক এবং সৃষ্টিধর্মী কাজেও তার সমান উৎসাহ এবং সেখানেও তার শক্তির অমিত প্রকাশ। বস্তুত সেখানেই তার সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভার নিয়ে রোমান্টিক আকুতি নিয়ে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। তার সঙ্গে নবীন নিবিড় সখ্য স্থাপন করে, তাকে আপন করে নেয়। বসন্তের সঙ্গে তার যে গভীর মিতালি, সে কথা প্রমাণ করার জন্য নিজের গলার বকুলের মালা সে পরিয়ে দেয় বসন্তের গলায়। একথা বলার উদ্দেশ্য, বসন্তের কোমল সৌন্দর্যের সঙ্গেও তার আত্যন্তিক যোগ আছে।

একই সঙ্গে ঝড়ের মেঘের তড়িৎ এবং বসন্তের উল্লেখ করবার অর্থ, নবীনের মধ্যে ধ্বংসাত্মক ও সৃজনমূলক উভয়বিধ শক্তিই যে লুকিয়ে আছে এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া। আসলে এই দুরকম শক্তির সম্মিলনেই নবীন সম্পূর্ণ—এই দুটি শক্তি তার প্রকৃতির পরিপূরক মাত্র। ললিত এবং কঠোরের নিখুঁত সমন্বয়েই নবীন সম্প্রদায় সার্থক, এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন এখানে।

(ছয়)

'সবুজের অভিযান' কবিতায় বিভিন্ন স্তবকে কবি নবীন সম্প্রদায়ের প্রতি যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলির উল্লেখ কর এবং এগুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

'সবুজের অভিযান' কবিতাটির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কবি প্রথম স্তবকে অনেকগুলি এবং পরবর্তী স্তবকে এক বা একাধিক বিশেষণ প্রয়োগ করে তারুণ্যকে সম্বোধন ও উৎসাহদান করেছেন—বস্তুত কবিতার নামেও তিনি এক বিশেষণই প্রয়োগ করেছেন। তরুণ গোষ্ঠীর মন সতেজ ও সবুজ, এ কথা বোঝাবার জন্যই তিনি তাদের সবুজ বলে চিহ্নিত করেছেন। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে সবুজ শব্দটি বিশেষ্য নয়, বিশেষণ এবং এই বিশেষণ পদকেই বিশেষ্য হিসাবে প্রয়োগ করেছেন সমগ্র কবিতায়।

প্রথম স্তবকে রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি হল—নবীন, কাঁচা, সবুজ-অবুঝ এবং দুরন্ত। এই বিশেষণাদির সাহায্যে তরুণ সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত প্রকৃতিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা নবীন বলেই সবুজ এবং কাঁচা ভাব তাদের মধ্যে রয়েছে—জড়ত্বের অবসাদ তাদের পেয়ে বসে নি। চিন্তা-ভাবনা না করে, লাভ-ক্ষতি বিচার না করে যারা কাজ করে না সেই হিসেবী লোকের তুলনায় নবীন নিশ্চয়ই অবুজ, এ কথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। নবীনেব সবচেয়ে বড় গুণ তাদের সচলতা। তারা প্রবীণ সম্প্রদায়ের মত একই জীবনবৃত্তে রুদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না—তাই কবি তাদেব প্রকৃতি বোঝাতে একটি সার্থক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন এবং সেটি হল 'দুবন্ত'।

দ্বিতীয় স্তবকের বিশেষণ 'জীবন্ত'। এটিও অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত বলেই আমরা মনে করি। যে প্রবীণ নেতাদের হাতে দেশ পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল তাবা মানসিকতার দিক থেকে অর্ধমৃত, এই অর্ধমৃত মনগুলিকে নাড়া দিযে সজীব করবার জন্য কিছু জীবন্ত মনেরই প্রয়োজন। তৃতীয় স্তবকে নবীন সম্প্রদায়কে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 'অশান্ত' হিসাবে। নিজেদের গড়া অচলায়তনে কৃত্রিম শান্তির আবরণ গড়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির থেকে বিচ্ছিন্নভাবে যারা বাস করছে তাদের জীবনে অশান্তির আঘাত আনা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই অশান্ত নবীনকেই কবির আজ সবচেয়ে বেশি দরকার। চতুর্থ স্তবকে নবীনের শক্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে কবি তাদের বলেছেন 'প্রচণ্ড'। একথা বলার দরকার ছিল, কারণ সেখানে কবি প্রবীণের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানিয়েছেন। কবি বিশ্বাস করেন প্রবীণের সমস্ত অহমিকা মিথ্যা, তাই সত্যকার নবীন শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে তাদের পরাজয় অনিবার্য। সেই জন্যই নবীনকে কবি উৎসাহিত করেছেন প্রচণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করে। পঞ্চম স্তবকে কবি তাদের বলেছেন প্রমত্ত। কারণ শক্তির সঙ্গে এখন মিলিত করতে চেয়েছেন কবি সেই মত্ততার, যে মত্ততায় সঠিক এবং ভুল নির্বিশেষে যে কোন পথে চলার নেশায় মানুষ মেতে ওঠে। চলাটাই যখন সবচেয়ে আগে দরকার তখন ঠিক এবং বেঠিকের হিসাব গৌণ। তাকে গৌণ হিসাবে গণ্য করে, বাঁধা পথ ছেড়ে নবীন এগিয়ে চলতে পারে বলেই ষষ্ঠ স্তবকে কবি তাদের স্বীকৃতি দেন 'প্রমুক্ত' হিসাবে। সপ্তম স্তবকে কবি তাদের বলেছেন 'চির যুবা', 'চিরজীবী', এবং 'অমর'। নবীনের বয়স বৃদ্ধি হয় না, তার মৃত্যু নেই কারণ বয়সের

সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মানুষ নবীন হয় বয়সে নয়, মানসিকতায়, তাই কবি আপাত বিরোধী এই সব বিশেষণ প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন নি।

॥ ছয় ॥

'সবুজের অভিযান' ঃ মূল বক্তব্য

দীর্ঘ পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সেখানে গণ-জাগরণের জোয়ার এসেছে। জীবনকে ভালভাবে উপভোগ করবার জন্য আরো ভালভাবে বাঁচবার জন্য মানুষ এগিয়ে চলেছে নতুনতর পথ সন্ধান করে। তাদের মধ্যে এক প্রবল প্রাণ চঞ্চলতা আছে, কর্মের উদ্দীপনা আছে। অথচ ভারতবর্ষের মানুষ এই জাতীয় কর্মের প্রেরণা খুঁজে পায় নি। এক ধরনের স্থবির জীবনযাত্রা তাদের আচ্ছন্ন করে আছে। আমরা জ্ঞানবাদী, সুতরাং কর্মের প্রয়োজন আমাদের অল্প—এই বাণী শুনিয়ে দেশের প্রবীণ সমাজ আপামর জনসাধারণকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং এই স্থবির নেতৃত্ব পরিহার করে পরিচালনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করার জন্য তিনি দেশের নবীন সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন।

কবিতার প্রথম দুটি স্তবকে কবি পাখির রূপকে প্রবীণ ও নবীনের একটি তুলনা করতে চেয়েছেন। প্রভাতের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে সজীব নবীন পাখির দল আনন্দে পুচ্ছ নাচায় এবং রাত্রির জড়ত্ব ঘুচিয়ে ফেলে নতুন দিনের কর্ম-উদ্দীপনায় যাত্রা শুরু করে। কবি মনে করেছেন, একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। নতুন যুগের ভোরে সূর্য উঠেছে নিশান্তকালের বার্তা বহন করে—তার রক্তাভা সজীব মনে এখন নেশা জাগিয়ে তোলে। নবীন সম্প্রদায় এই নতুন দিনের সূর্যকে বরণ করে নিয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক, এই তার কামনা। এটার সঙ্গে তিনি পাখির রূপকেই দেখাতে চেয়েছেন প্রবীণ সমাজকে। নিজেদের অন্ধ সংস্কারের মধ্যে কূপমণ্ডুকের মতো বাস করতে যারা ভালবাসে তারা জ্ঞানের আলো সহ্য করতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক। প্রবীণ সমাজকে যে পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সে পাখিও তাই আলো সহ্য করতে পারে না, সহ্য করতে পারে না প্রগতির আলোড়ন। তাই যে দাওয়ায় সংস্কারের খাঁচার মধ্যে সেই পাখি বদ্ধ হয়ে আছে সেখানে বাইরের গতিশীল মুক্ত হাওয়া এসে পৌঁছয় না, বাইরের আলোরও সেখানে কোন প্রবেশাধিকার নেই। প্রবীণ নামক পাখি সেখানে বসে কেবল ঝিমুতে চায়। কিন্তু বাইরের জীবনের কোলাহল পাছে তার জাড্যের শান্তি নষ্ট করে, জ্ঞানের প্রজ্জ্বলিত আলোয় পাছে বিঘ্নিত হয় অন্ধকারের স্থবির বিশ্রাম—সেই জন্য বড় বড় দুটি ডানায় সে ঢেকে নিয়েছে তার চোখ এবং কান। অন্ধকারে আবদ্ধ খাঁচায় তাকে দেখলে চিত্রকরের চিত্র বলেই ভ্রম হয়।

কবিতার পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথ পাখির রূপক ত্যাগ করে প্রত্যক্ষ ভাবেই নবীন ও প্রবীণের তুলনামূলক চিত্র উপস্থিত করে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তৃতীয় স্তবকে কবির সমালোচ্য প্রবীণ সমাজ। তিনি বলেছেন সমগ্র বিশ্বেই এখন গণজাগরণের ঢেউ উঠেছে। জীবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ দেশ-দেশান্তর প্লাবিত করছে—এ কথা ভারতবর্ষের বাইরের দেশগুলিকে দেখলেই বোঝা যায়। অথচ আমাদের প্রবীণ সমাজ সে দিকে দৃক্‌পাত

করতে নারাজ, জীবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ তাদের জমাট জড়ত্বে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারে না। জ্ঞানযোগকেই একমাত্র আরাধ্য মনে করে তারা ব্যবহারিক জ্ঞান সম্বন্ধে আশ্চর্য উদাসীন হয়ে রয়েছে। অথচ যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তাকে উপেক্ষা করলে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যাবে না। আমরা আর্যজাতির বংশধর সুতরাং কর্মযোগ আমাদের জন্য নয়—এই বংশমর্যাদার অহঙ্কারী মনোভাব নিয়ে মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে আমাদের দুর্দশা বাড়বে বই কমবে না।

এরপর কবি দেশের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আহ্বান করেছেন নবীন সমাজকে, যারা জীবনের কলরোল এদেশে নিয়ে আসতে সমর্থ। অবশ্য যে প্রবীণ সম্প্রদায় এতদিন দেশের নেতৃত্ব দিয়েছে তারা খুব সহজে এদের আধিপত্য মেনে নেবে না, একথা বলাই বাহুল্য। কূপমণ্ডূক প্রবীণেরা যখন কর্মযোগের আধিপত্য দেখতে পাবে এখানে তখন তারা অবশ্যই নবীন সমাজকে বাধা দেবে। কবি মনে করেন তখনই বাধবে আসল সংঘাত। এই সংঘাতে কোন্ পক্ষ জয়ী হবে কবি এই স্তরকেই সে কথা স্পষ্ট করে বলতে চান নি, কিন্তু এ লড়াই যে সত্য ও মিথ্যার লড়াই সে কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এবং সত্যের জয় সম্বন্ধে কবির যেহেতু কোন সংশয় নেই—আমরা কবির অভিমতও এখানে স্পষ্ট করেই বুঝতে পারি; পরবর্তী স্তবকে সে কথা কবি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন। সংস্কারের বন্ধন চিরকাল খাড়া থাকতে পারে না বলেই কবি দুর্জয় শক্তি নিয়ে নবীনকে এগিয়ে আসতে বলেছেন। তাদের প্রমত্ত শক্তির যে জয়গান কবি করেছেন তাতেই বোঝা যায় নবীন ও প্রবীণের সংঘাতের পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা নেই। এই সঙ্গে কবি কিন্তু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গও চিন্তা করেছেন এবং সে বিষয়ে অভিমত জানিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। প্রবীণের আছে এতোদিনের অভিজ্ঞতা, নবীনের নিশ্চয়ই তা নেই—সুতরাং এগিয়ে চলার ব্যাপারে ভুল তার হতে পারে পদে পদে। কবি এই আশঙ্কাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তিনি জানেন, ভুল হতে পারে বলে নিশ্চল ভাবে বসে থাকার চেয়ে ভুল পথে এগিয়ে যাওয়াও অনেক ভাল। তাই তিনি নবীনের কাছে সেই ভুল পথে যাত্রাই প্রার্থনা করেছেন—তাতেই তিনি খুশি হবেন।

এরপর প্রবীণের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু উল্লেখ থাকলেও একচ্ছত্র প্রাধান্য পেয়েছে নবীন। এই সম্প্রদায়কে আহ্বান করেই কবি তাদের পথনির্দেশের দায়িত্ব তুলে নিতে বলেছেন। যে ধরনের জীবনের প্রতি অগ্রসর হতে হবে ভারতবাসীরা সে জীবনে অভ্যস্ত নয়, কারণ সে পথে তাদের চালানো হয় নি কখনো। কিন্তু নতুন পথের এই বিবিধ আশঙ্কার রোমাঞ্চই যাত্রাপথকে বরণীয় করে তুলবে। পাঁজি-পুঁথি দেখে যাত্রা করার, পথের দিক্‌নির্দেশের কোন প্রয়োজনই আর নেই এখন।

কবিতার শেষ স্তবকে কবি নবীনের সম্পূর্ণ প্রকৃতির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। নবীনের মধ্যে যে কেবল প্রমত্ত শক্তি আছে তাই নয়, সেই সঙ্গে আছে রোমাণ্টিক স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতা। সৌন্দর্য ও শক্তির সমন্বয়েই সে সার্থক, সেইজন্য তার শক্তির মধ্যেও আছে সংহতি, আছে ছন্দ। আসলে নবীনতার এক ধরনের সজীব মানসিকতা—বয়সের সঙ্গে-এর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। সেইজন্যেই নবীনকে কবি বলতে পারেন চিরযুবা এবং চিরজীবী। কবি আশা ব্যক্ত করেছেন, জীর্ণ জরা সরিয়ে ফেলে তারা প্রাণোচ্ছ্বাসের বন্যা বইয়ে দেবে।

এই দেশে এবং তারুণ্য শক্তি-স্পন্দিত সেই নবযুগের প্রভাত আমাদের জাতীয় জীবনে আশার আলো দেখাতে সমর্থ হবে।

॥ সাত ॥

'সবুজের অভিযান' ঃ কাব্যসৌন্দর্য

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সমস্ত কবিতাই এক অভিনব চেতনা এবং কবি-দৃষ্টির বিশিষ্টতার কারণে মূল্যবান। কিন্তু কোন মহৎ কবি যখন কোন কবিতা রচনা করেন তখন বিষয়ের অমেয় গুরুত্ব থাকলেও প্রকাশভঙ্গিও এক বিশিষ্ট সৌন্দর্য লাভ করে। আসলে, বিষয় ও প্রকাশের স্বতন্ত্র আলোচনাও বোধ হয় অর্থহীন, কারণ কবির মনে যখন কোন বক্তব্য গুঞ্জরিত হয় তখন তা ভাষার আচ্ছাদন নিয়ে এক অদ্বৈত প্রচেষ্টাতেই তা কবির মনে উদিত হয়ে থাকে। আমরা পৃথকভাবে তার আলোচনা করতে পারি, এই মাত্র। সেই হিসাবে এই কবিতাটিরও প্রকাশ সৌন্দর্যের এক পৃথক বিশ্লেষণে আমরা মনোযোগী হতে পারি।

কবিতাটির সর্বত্র কবি রূপক ব্যবহার করেন নি। এবং সর্বত্র অভিন্ন রূপকের আশ্রয়ও তিনি নেন নি। প্রথম দুটি স্তবকে তিনি পাখির রূপকে নবীন ও প্রবীণের প্রকৃতিগত পার্থক্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই অংশের চিত্রধর্মিতা অসাধারণ। নেশা যে কেবল মদে হয় না, রক্ত-আলো যখন তরলের মত চুঁইয়ে পড়ে তাতেও যে নেশা ধরিয়ে দেয়, অপরূপ কিছু সংলাপে 'রক্তকরবী' নাটকে সে অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। এখানে নতুন যুগের আবির্ভাবকে নবারুণ সূর্যোদয়ের চিত্রের সঙ্গে তিনি অঙ্কিত করেছেন সার্থক ভাবেই। প্রবীণকে অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায় তিনি যেভাবে দেখাতে চেয়েছেন তারও নিখুঁত এক প্রতিলিপি আমাদের চোখের সামনে আঁকা হয়ে যায়। এই চিত্রধর্মিতা থেকে চিত্রকল্পের এক আশ্চর্য উত্তরণ আমরা লক্ষ্য করি কবিতার অন্তিম স্তবকে, যেখানে তিনি বলেন—

> "সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
> ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
> বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
> আপন গলার বকুল মাল্যগাছা।"

কবি কিছু আপাতবিরোধী উক্তি এখানে সার্থকভাবে ব্যবহার করে অসামান্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অলংকারের ভাষায় যাকে বলে বিরোধাভাস এখানে তারই দেখি বেশ কিছু সার্থক দৃষ্টান্ত। প্রথম স্তবকে কবি বলেছেন আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে, যা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বলেই মনে হবে। কবি আসলে অর্ধমৃত ও জড় মানসিকতাসম্পন্ন মানুষকেই যে বোঝাতে চান সে কথা আমরা বুঝতে পারি এর ব্যঞ্জনায়। নবীনকে কবি বলেছেন চির যুবা। যৌবন মানুষের জীবনকালের এক বিশেষ পর্যায় মাত্র, চিরকাল কারো যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। ঠিক সেইভাবেই বলা যায় নবীন সম্প্রদায়কে চিরজীবী বলাও স্বতোবিরোধী বলে মনে হতে পারে আমাদের, কারণ মানুষ কখনো চিরকাল বাঁচে না। সমার্থক আর একটি বিশেষণ কবি ব্যবহার করেছেন নবীন সম্পর্কে, সেটি হল, অমর।

রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার এই কবিতার আর একটি প্রধান সম্পদ। সমগ্র

কবিতায় নবীন সম্প্রদায়কে তিনি সম্বোধন করেছেন কিছু বিশেষণ পদ দিয়ে, বিশেষ্য পদ তিনি কোনখানেই ব্যবহার করেন নি। অথচ নবীনের প্রকৃতিগত কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি যখন ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন তখনই সেই বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষণটি ব্যবহার করায় এই জাতীয় প্রয়োগ যেমন সার্থক হয়েছে, তেমনি হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতার নামে পর্যন্ত তিনি দুঃসাহসিকভাবে বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন বিশেষণ পদ।

এছাড়াও এমন কিছু অব্যর্থ শব্দ আছে যার প্রয়োগ বিস্ময়কর, যেমন—

"ওই-যে প্রবীণ, ওই-যে পরম পাকা"—

এখানে 'পরম পাকা' শব্দ দুটি নিঃশেষে প্রবীণের পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছে। পাকামির একেবারে চূড়ান্ত অবস্থায় যখন কোমলতার তিলমাত্র বজায় থাকে না, প্রবীণ একেবারে সেই অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে।

এইরকম শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আরো আছে। দেশজ শব্দ এবং বিদেশী শব্দ সঠিক ভাব প্রকাশের জন্য নিঃসঙ্কোচে কবি প্রয়োগ করেছেন এই কবিতায়। বিজয় কেতন এবং অট্টহাস্যের মতো শব্দের পরেই তিনি লেখেন একটি দেশজ-শব্দ, 'ফেড়ে'—"অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে।"

শেষ স্তবকে একটি বিদেশী শব্দ অসাধারণ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। শব্দটি আছে এই পংক্তিতে—

"জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে।
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিদি।"

এখানে 'দেদার' শব্দটি অফুরন্ত প্রাণশক্তির ক্ষেত্রকে যেন বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে।

এইসব কারণে বলা যায় বক্তব্য বিষয় 'সবুজের অভিযান' কবিতায় অভিনব তো নিশ্চয়ই—কেবল কবি-কল্পনা নয়, এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার সুনিশ্চিত ইঙ্গিত। কিন্তু সেই বক্তব্য বিষয় পরিবেশন করবার ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অতি সচেতন, তাই চিত্র রচনায়, চিত্রকল্প নির্মাণে, শ্বাসাঘাত প্রধান বা দলবৃত্ত ছন্দের পরিমিত ও নিপুণ দোলায় এবং সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগে কবিতাটিকে তিনি এক দুর্লভ সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন।

॥ খ ॥

শঙ্খ

(৪ সংখ্যক কবিতা)

॥ এক ॥

রচনাকাল ও নামকরণ

কবিতাটি প্রকাশিত হয় আষাঢ, ১৩২১ বঙ্গাব্দের 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। কিন্তু রচনাকালের সঠিক পরিচয় এবং কবির তৎকালীন মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন। তিনি লিখেছেন, "পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এবং কন্যা মীরা দেবীকে লইয়া কবি রামগড় পর্বতে গেলেন। রামগড় হিমালয় প্রদেশে আলমোড়ার নিকটে। গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতন হইতে অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেপালী ছাত্র নরভূপ রায় প্রমুখ অনেকে বদ্‌রিকা বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহারাও হাঁটিতে হাঁটিতে রামগড় গিয়া পৌঁছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে কবি অতুলপ্রসাদও সেখানে গিয়া যোগ দিলেন। খুবই আনন্দ ও উৎসব চলিতেছে। তার মধ্যেও কবির মনে একটা বেদনা।...ইহার পরই য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর আসিল। তখন বুঝা গেল কবির মনে তাহারই পূর্বাভাস বেদনা রূপে জাগিয়াছিল।...১২ই জ্যৈষ্ঠ লিখিলেন চতুর্থ কবিতাটি।"

কবিতাটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় যখন প্রকাশিত হয় তখন এটির নাম ছিল 'শঙ্খ'। কবিতার সঙ্গে নামকরণ সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই কথা বলা যায়। কারণ কবির ধারণায় 'শঙ্খ' বিধাতার আহ্বান শঙ্খ এবং এই মহা আহ্বানের কথাই তিনি তাঁর এই কবিতায় বলেছেন। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে কোন কবিতারই শীর্ষনাম নেই, তাই কালানুক্রমিক বিন্যাসে তিনি এটিকে ৪ সংখ্যক কবিতা হিসাবে বিন্যস্ত করেছেন।

'বলাকা'র ৪ সংখ্যক (শঙ্খ) কবিতা, কবিতা হিসেবে 'বলাকা'র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরাজির অন্যতম। ছয়টি স্তবকের প্রতিটির অন্ত্যানুপ্রাসে, পঙ্‌ক্তির বিন্যাসে, দলবৃত্ত ছন্দে যথাসম্ভব

১ ১ ১ ১ ১১ ১১ ১ ১ ১১ ১১

মুক্তকের স্বচ্ছন্দ গতিতে (যেমন শেষ পঙ্‌ক্তি— 'দেব সকল/শক্তি লব/অভয় তব/শঙ্খ (এখানে অর্থের প্রয়োজনে ছেদ চিহ্নিত অংশে, কিন্তু যতি 'লব'র পরে—এই ছেদ ও যতি এক জায়গায় না পড়া মুক্তকের একটি বৈশিষ্ট্য—'বলাকা'র ছন্দ শিরোনামে এসব আলোচিত হয়েছে), বীর রসের মূলভাব উৎসাহ উদ্দীপনে, কল্পনার রূপলাভেব আভ্যন্তর সুষমায় এ কবিতা এমন সুডৌল হয়ে উঠেছে যার তুলনা 'বলাকা' বইটির অন্য কবিতায় দুর্লভ।

এ কবিতায় আবেগের অতিরেক অপরিমিত উচ্ছ্বাসে কখনোই পরিণত হয় নি। প্রতি স্তবকের শেষ শব্দটি 'শঙ্খ'। অভয়শঙ্খ, মহাশঙ্খ, নীরব (তব) শঙ্খ, জয়শঙ্খ, মহাশঙ্খ, অভয় (তব) শঙ্খ—এভাবে প্রতি স্তবকের শেষে একই শব্দ ফিরে ফিরে এসেছে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে যে অন্ত্যমিলটি কানে বাজে, তাতে 'শঙ্খ'র মতোই দুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব সাতটি স্তবকে যথাক্রমে আছে 'শঙ্খ', 'লঙ্ক', 'অঙ্ক', 'তঙ্ক,' 'যঙ্ক,'

১১১ ১ ১১
(এখানে ছন্দোলিপি হবে:—সুপ্তির পর্/যঙ্ক, 'সুপ্তির' পদটির শেষে 'অ' উচ্চারণ ছাড়া
১ ১ ১১ ১১
বোধ হয় ছন্দ এখানে, মেলানো যায় না)। 'ডঙ্ক' (এখানেও বাজবে জয়/ডঙ্ক পড়লে ছন্দ মেলে। ঐ 'সুপ্তির' মতো 'জয়' অ-কারান্ত করেই পড়তে হবে)।

এসব অন্ত্যমিলের কারুকার্য ছাড়া তৃতীয় স্তবকের 'কোল' অর্থে 'অঙ্ক'র সঙ্গে পঞ্চম স্তবকের 'পর্যঙ্ক'র অন্তর্গত সুষমা পাঠক হিসাবে আমাদের মনে প্রাপ্তির যে-আনন্দ জাগায়, তার মূল্যই বা কম কি? পরি + অঙ্ক = পর্যঙ্ক; এই তৎসম শব্দ পর্যঙ্কের তদ্ভব রূপ পালঙ্ক, অর্থ—খাট। পালঙ্কে যখন ঘুমাই, তখন তো চারদিকে কোলের আশ্রয় মেলে। কবি একদিন ঈশ্বরের ক্রোড় প্রত্যাশী ছিলেন। ঈশ্বরকে বলছেন যে তিনি ভেবেছিলেন তাঁর অঙ্কে শান্তি জুটবে ('লব তোমার অঙ্ক')। তৃতীয় স্তবকের শব্দার্পিত এই ভাব পঞ্চম স্তবকে একই শব্দের আশ্রয় নিলেও অন্য এক রূপ পেয়েছে। ঈশ্বরের ধূল্যবলুণ্ঠিত শঙ্খে যখন মানবতার বাণী উদ্ঘোষিত হবে, অন্ধ জাতিপ্রেম নিন্দিত হবে, ন্যায় নীতি সাহিত্য সংস্কৃতির বাণী ধ্বনিত হবে, তখন এবং শুধু তখনই অনেকে উৎসাহ ভরে ছুটে আসবে, অন্যেরা ঘুমুচ্ছিল যে পালঙ্কে— সেই পালঙ্ক হঠাৎ দেখা দুঃস্বপ্নের ভয়ে কেঁপে উঠবে। ঘুম ভাঙার পর, ভয় কেটে যাওয়ার পর তারাও মনুষ্যত্ব রক্ষার রক্তাক্ত রণে লিপ্ত হবে। তৃতীয় স্তবকের 'অঙ্ক' শব্দটিই আগে 'পরি' উপসর্গ নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। নিশ্চিন্তে ঘুমন্তদের কাছে এই শঙ্খধ্বনিকে দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কীই বা মনে হতে পারে। অনুভূতিশূন্য সুখের মধ্যে তারা তলিয়ে থাকতে চায়। তারই মধ্যে মানবতার, ন্যায় নীতির, অন্যায় প্রতিরোধের বীর্য যখন তূর্য হয়ে বাজে, তখন স্বভাবতই তারা তাকে দুঃস্বপ্ন ভেবে অস্বস্তিতে. জেগে উঠেই আবার ঘুমুতে চায়। কিন্তু তা কি এতো সহজ? একবার ঘুম ভাঙলে কি সাত-তাড়াতাড়ি আবার ঘুম আসে? শেষ পর্যন্ত তারাও শঙ্খধ্বনিতে সাড়া দেবে 'অঙ্ক' ও 'পর্যঙ্ক' শব্দ দুটির মধ্যে কবিতায় ব্যবধান অনেকটা, আগেই বলেছি, 'অঙ্ক' আছে তৃতীয় স্তবকের একই অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে। আবার ভাবের দিক থেকেও এই দুই শব্দের দূরত্ব দুস্তর। কেননা প্রথমটিতে কবির নিজের কথা খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির অরূপানুভূতিতে শান্তি লাভের কথা, আর দ্বিতীয়টিতে অগণন সাধারণ মানুষের সুপ্তির পর্যঙ্ক দুঃস্বপ্নে কেঁপে ওঠার কথা। তা সত্ত্বেও বৈপরীত্যের আঘাতে এই দুই শব্দের আত্মীয়তার সুর আমাদের মনের তারে যেমন বেজে ওঠে, তেমন অভিজ্ঞতা সচরাচর জোটে না।

প্রতি স্তবকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ, প্রথম ও তৃতীয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ সপ্তম ও নবম, অষ্টম ও দশম পঙ্‌ক্তির আবর্তমান অন্ত্যানুপ্রাসে যে শব্দ সুষমা সৃষ্টি হয়েছে, তা কি কারও কানে ও মর্মে প্রবেশ না করে পারে? অন্ত্যমিলের এই ভেতরের ছক থেকে কোনও স্তবকেই এতোটুকু বিচ্যুতি নেই। আর কোনও কারণে না হোক, শুধু প্রতি স্তবকের এই গড়নের কথা মনে রাখলেও 'শঙ্খ' কবিতার রূপগত উৎকর্ষেই আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই।

শুধু কবিতায় কবির রূপদক্ষতা কেন? ভাবের দিক থেকেও এ কবিতা উচ্চস্তরের। রূপের আলোচনায় ভাবের কথা এমনিতেই কিছু এসে গেছে। এখন শুধুই ভাবের কথা। কবি তাঁর ঈশ্বরকে ডেকে কথা বলছেন। ঈশ্বরের শঙ্খ আজ ধুলোয় পড়ে আছে। যুগে যুগে সেই শঙ্খ মনুষ্যত্বের বাণী উদ্ঘোষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন নি, তবুও আমরা

বলতে পারি, এমনই পাঞ্চজন্য শঙ্খ শ্রীকৃষ্ণের নিঃশ্বাস বায়ুতে কুরুক্ষেত্রে ধ্বনিত হয়েছে অথবা এজিদের বিরুদ্ধে ন্যায় যুদ্ধে কারবালা প্রান্তরে এমনই রণতূর্য বেজেছে। রবীন্দ্রনাথ এ কবিতায় যে শঙ্খকে বলেছেন দণ্ডধর ঈশ্বরের শঙ্খ—যে-শঙ্খ বাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বানে, সেই শঙ্খকে অনায়াসে মানবতার শঙ্খ বলতে পারি, সেই শঙ্খ বাজান যুগে যুগে ইতিহাস স্রষ্টা যুগন্ধর পুরুষরা। এভাবে কবিতাটি নিলেও এর মর্মলোকে প্রবেশ পথে কোনও অন্তরায় থাকে না। ঈশ্বরের শঙ্খ হিসেবে একে না নিলেও চলে। 'বলাকা'র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত বিষয়ে আলোচনার সময় বলেছি, এ কবিতা লেখার সময় পর্যন্ত যুদ্ধ য়ুরোপে বাধে নি। কবি ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে গেলেন বন্ধু এণ্ড্রুজকে নিয়ে রামগড় পাহাড়ে। অনাগত যুদ্ধের আশঙ্কায় আচ্ছন্ন তাঁর মন। 'বাতাস আলো গেল/এ কি রে দুর্দৈব।' একটা গুমোট হাওয়া, চারদিক থমথমে, নিরালোক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার দিগন্ত ছেয়ে ফেলছে। মানুষের যে-মূল্যবোধে তার সংস্কৃতি রূপ পেয়েছে, সে-মূল্যবোধের অপমৃত্যুতে যুদ্ধের আশঙ্কা, সংস্কৃতির দুর্দশার ইঙ্গিত আছে বাতাস আর আলোর মৃত্যুর মধ্যে। মনুষ্যত্বের এই মড়কের বিরুদ্ধে, চৈতন্যের এই অসাড়তার বিরুদ্ধে তিনি বীরসেনাদের ডাকছেন ধ্বজা হাতে লড়ার জন্য, প্রাণের ভেতরকার মৃত্যুঞ্জয় গান গেয়ে ওঠার জন্য। এই বীরসেনারা নিঃশঙ্ক, নির্ভীক।

তারপর কবির অব্যবহিত অতীতের নিজের ভাবের কথা। পূজার ঘরে তিনি ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে সারাদিনের শ্রান্তিক্লান্তশেষে শান্তিবর্গ খোঁজার জন্য চলেছিলেন। জগদীশ্বরকে তিনি জগতের মধ্যে সর্বত্র অনুভব করে তাঁর পদপ্রান্তে কোথাও মাথা নত করছিলেন, কোথাও নিজেকে 'হৃতভাগিনী' ভাবছেন আর তাঁর পাশে ঈশ্বর এসে বসেছিলেন অথচ তাঁর ঘুম ভাঙলো না বলে অনুতাপ করছেন, কোথাও ঈশ্বর তাঁর 'পরাণ সখা বন্ধু' হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য অভিসারের পথ ধরে আসছেন, আবার কোথাও বা কবির ঈশ্বর 'আলোয় আলোকময় করে' 'আলোয় আলো' হয়ে এসে তাঁর 'নয়ন হতে/আঁধার' মিলিয়েছেন। খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির অধ্যাত্ম অনুভূতির জগৎকেই এ কবিতায় 'পূজার ঘর' তিনি বলেছেন। সে ঘরে তিনি পূজায় আবিষ্ট হয়েছিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা এ সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছি। কিন্তু 'বলাকা'য় এসে তাঁর মনে হচ্ছে, তাঁর হৃদয়ক্ষত ব্যথা-বেদনা পূজার স্নিগ্ধ প্রলেপে দূর করার ভাবনা আর শরীর মনের যাবতীয় মালিন্য ধুয়ে নিষ্কলঙ্ক হওয়ার সাধনা—সবই বুঝি ব্যর্থ!

যে সন্ধ্যায় তিনি মনুষ্যত্বের শঙ্খ ধূলিলুণ্ঠিত দেখলেন, সভ্যতার বিপর্যয় অনুভব করলেন, সংস্কৃতির সঙ্কটে অস্তিত্ব বিপন্ন হলো, তখন তিনি ভাবছেন এ সন্ধ্যা কি আরতিদীপ জ্বালানোর সন্ধ্যা? হ্যাঁ, এ সন্ধ্যাও আরতির দীপ জ্বালানোর এবং মালা গাঁথারই সন্ধ্যা। তবে সে মালা রজনীগন্ধার নয়, রক্তজবার মালা। শুভ্র রজনীগন্ধা শান্তির দ্যোতক। কিন্তু আজ অবিমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সময় নয়। তাই সাদা রজনীগন্ধার বদলে লাল জবায় এই আরতিদীপ জ্বালানোর প্রহরে তাঁকে মালা গাঁথতে হবে। রক্তজবায় বেদনাসংক্ষুব্ধ জীবনের প্রতি ইঙ্গিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথ্বী চায় রজনীগন্ধার পরিবর্তে রক্তজবার মাল্য অর্ঘ্য। একদিন তিনি ভেবেছিলেন জীবনের সব 'বোঝাবুঝি', সংগ্রাম সংঘাত বুঝি শেষ হলো! তিনি এবার আরাম পাবেন, এক মহা বিরামের মধ্যে জীবনের সব খোঁজাখুঁজি বিরত হবে, ঈশ্বরের সব

ভালোবাসার ঋণ শোধ ক'রে তিনি তাঁর কোলে ঠাঁই পাবেন ব'লে ভেবেছিলেন। কিন্তু এহেন প্রত্যাশাঘন প্রাপ্তিস্তব্ধ সান্ধ্যক্ষণে বেজে উঠলো বিধাতার শঙ্খ।

'বলাকা'র কবিতার পর কবিতায় অজর-অমর যে-যৌবনের বন্দনা বারবার শুনেছি, সে যৌবনের পরশমণির স্পর্শে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের যৌবন জেগে উঠুক, বেজে উঠুক দীপক রাগ, তার তালে তালে প্রতিটি প্রাণ হর্ষে দীপ্ত হয়ে উঠুক এই কবির কামনা। দীপক হচ্ছে সেই তান যার ছোঁওয়ায় আগুন দীপ্ত হয়। আগুনের অন্য নাম পাবক। যে পূত করে, পবিত্র করে, তা পাবক। এই পাবক আমাদের কলুষ বা কল্মষ এবং অন্যায়ের অন্ধকার বিদীর্ণ করে জ্বলে উঠুক। রুদ্ধালোক নৈশপ্রহরবিদারী আলোর উদ্বোধনে আকাশ ভরে যাক্। চতুর্দিকে আতঙ্ক ব্যাপ্ত হোক। তারই মধ্যে উৎসাহোদ্দীপ্ত কবি দুই হাতে সেই শঙ্খ তুলে নিয়ে মানবতার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করবেন।

যখন একবার তিনি জেগে উঠবেন, তখন তন্দ্রা তাঁর চোখে আর থাকবে না। শ্রাবণের অবিরল জলধারার মতো তাঁর বুকে এসে পড়বে বাণ। যুদ্ধকে যুদ্ধ দিয়ে থামানোর সেই মহাযুদ্ধে বেদনার শরাঘাত তাঁকে এসে হানবে শ্রাবণবর্ষণের মতো। মনুষ্যত্বরক্ষার সেই মহাযুদ্ধে কেউ কবির সহযোগী হয়ে তাঁর পাশে ছুটে দাঁড়াবে, কেউ ভয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাঁদবে, আর বাকিরা সুপ্তির পর্যঙ্কে দুঃস্বপ্নে কাঁপবে। তবুও এতো সব ভীতি-বিহ্বলতার মধ্যে মহোল্লাসে সে শঙ্খ বাজবে। শেষ পর্যন্ত সকলের ভয় দূর হবে।

কবিতার শেষে আবার বীরযোদ্ধা কবি তাঁর ঈশ্বরকে ডেকে বলেন, ঈশ্বরের কাছে আরাম চেয়ে তিনি শুধু লজ্জাই পেয়েছেন। সে-লজ্জা কাটিয়ে তিনি আজ রণসজ্জায় সজ্জিত হতে চান। একদিন 'নৈবেদ্য'র ৪৭ সংখ্যক কবিতায় বিধাতাকে রণগুরু ব'লে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, তাঁর প্রবল পিতৃস্নেহ ধ্বনিত হয়ে উঠুক কঠিন আদেশে—ব্যক্তিজীবনের দুখ জয়ের মহাযুদ্ধ যাত্রার আদেশে এবং সেখানে বিধাতাকেই বলেছিলেন তাঁকে বর্মসজ্জায় সাজিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু 'শঙ্খ' কবিতায় এই রণসজ্জার উৎসাহ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়, মানবতার বৃহত্তর প্রয়োজনে। এখানে কবি একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাগ্রস্ত পৃথিবীর সকল মানুষের একজন প্রতিনিধি। ব্যক্তি থেকে সমূহে, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে এই ঝোঁক পালটানোর কথা মনে রাখলেই 'নৈবেদ্য'র সনেটের সঙ্গে 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা'—এই প্রার্থনার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সমস্ত আসন্ন আঘাত এবং ব্যাঘাতের মধ্যে, বুকের ভেতরে দুঃখের কম্পনের মধ্যে তিনি অটল থাকবেন। সমস্ত দুঃখের বক্ষের দরজায় আঘাতের মধ্যে তিনি তাঁর ঈশ্বরের হস্তস্খলিত জয়শঙ্খ হাতে তুলে নিয়ে জয়ডঙ্ক বাজাতে চান।

সমস্ত কবিতার মূল ভাব উৎসাহ। আর সেই মূল ভাব থেকে যে রস সৃষ্টি হয়েছে, তা বীররস। আমরা কি ভাবতে পেরেছিলাম দলবৃত্তের চতুর্মাত্রিক পর্বের দ্রুতালয়ে, প্রতিপর্বের আদিতে তীব্র শ্বাসাঘাতে, প্রতি এক পঙ্ক্তি পরপর দুই মাত্রার একটি অপূর্ণপর্ব সমাবেশের বৈচিত্র্যে, ঘোষ আর কোথাও অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির জোরালো উচ্চারণে এমন একটি বীররসের কবিতা লেখা যায়? অঘটন-ঘটন পটীয়সী রবীন্দ্র-প্রতিভা ছড়ার ছন্দেও বীররসের কবিতা সৃষ্টি করতে পারে—'শঙ্খ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

॥ দুই ॥

সার-সংক্ষেপ

(প্রথম স্তবক)

কবিতাটির সার সংক্ষেপ এবং নিহিতার্থ কবি নিজেই করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই সংক্ষিপ্ত রূপটিই আমরা প্রথমে গ্রহণ করলাম।

যে শঙ্খে তোমার আদেশ ধ্বনিত হচ্ছে তা নিয়ে কি খেলা করতে পারি? যে শঙ্খ নতুন পথের যাত্রীদের অভয় দিয়ে পথ দেখাবে তাকে পূজার ছলে অকর্মণ্য করে রাখবার কী অধিকার আমার? যারা তাঁর পতাকা তুলে দুঃখ দুর্গতির মধ্যে গান গেয়ে চলবে তাদের চালাবার জন্যই তো তোমার এই শঙ্খ।

(দ্বিতীয় স্তবক)

মন চাচ্ছিল শান্তি। তাই পূজার ঘরে অর্ঘ্য সাজিয়ে বসা গেল। যে শঙ্খে বিশ্বযাত্রীদের কাছে যুগের আহ্বান আসবে সেই শঙ্খকে আমার পূজার সামান্য উপকরণমাত্র করে রাখার অর্থ হল তাকে অপমান করা।

(তৃতীয় স্তবক)

আরতির শান্ত প্রদীপে বা রজনীগন্ধার রম্য আনন্দে আমার সান্ধ্যকৃত্য আজ সম্পূর্ণ হবার নয়। বৃহৎ জগতের ডাক আজ এসেছে। জাতীয়তা প্রভৃতি ছোট-খাট দেবতার সংকীর্ণ পূজায় আপনাকে বাঁধতে গেলে চলবে না। হে প্রভু, তোমার নীরব শঙ্খ ধ্বনিত করবার জন্য আমাকে আজ ডাক দিয়েছেন। এখন আরাম বিরাম খুঁজলে চলবে কেন? রক্তজবার মালা গেঁথে যুদ্ধযাত্রায় বের হতে হবে। পূজা বা সৌন্দর্যের রজনীগন্ধার সময় তো আজ নয়।

(চতুর্থ স্তবক)

অন্তরে আমার যৌবন সঞ্চার কর, দীপ্ত দীপকতান শোনাও, যাত্রা শুরু হোক। মানব তপস্যার প্রসার কতদূর তা তো জানি না। অনভ্যস্ত পথে যাত্রায় মন ভয় পায়। সেই পথে যাত্রার আহ্বানই তোমার শঙ্খে। তোমার এই শঙ্খে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তা হোক— বিশ্বমানকে ডাক দেবার জন্য তবু তাকে দুই হাত তুলে ধরব। মাটিতে তাকে পড়ে থাকতে দিলে আজ চলবে কেন?

(পঞ্চম স্তবক)

সহজসাধ্য নয় এই যাত্রা। চক্ষের ঘুম বিদায় নেবে। সর্বাঙ্গে অস্ত্রক্ষত হবে, চারিদিকে হাহাকার ধ্বনিত হবে, তারই মধ্যে মহোল্লাসে বাজবে তোমার শঙ্খ।

(ষষ্ঠ স্তবক)

তোমার কাছে আরাম চাইতে গিয়ে এখন লজ্জায় মরি। মালা না দিয়ে যদি তোমার রণখড়্গা দাও তবেই আজ হয় ভাল। দুঃখ আঘাত যা আসে আজ সব সইতে হবে। তোমার শঙ্খ আমার বুকের মধ্যে বাজবে। আমার প্রাণের সব ভয় দূর হবে। সর্বশক্তিতে তোমার অভয় শঙ্খকে আজ বাজিয়ে তুলতে হবে।

॥ তিন ॥

কবিতার আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শঙ্খ প্রায় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই কবিতায় তার স্বরূপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পেলাম। কবি নিজেও এই প্রতীকটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বানশঙ্খ, এতেই যুদ্ধের ঘোষণা করতে হয়—অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে। সময় এলেই, উদাসীনভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। দুঃখ স্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।"

শঙ্খের এই অনুষঙ্গ আমাদের কাছে একেবারে যে অভিনব তা নয়, বিষ্ণুর শঙ্খ পাঞ্চজন্য যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং যুদ্ধযাত্রায় সজ্জিত দেবী দুর্গাকে অন্যতম অস্ত্র হিসাবে শঙ্খও দান করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই পৌরাণিক অনুষঙ্গ এখানে পুনরায় ব্যবহার করেছেন, এই তাঁর কৃতিত্ব এবং সেই সঙ্গে শঙ্খের তিনি একটি প্রকারভেদও নির্দেশ করেছেন বলাকা কাব্যগ্রন্থের অন্য কবিতায় যেখানে তিনি বলেছেন—'ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে।'

কবিতার স্বাভাবিক বিবর্তন মনে রেখে বলা হয় 'বলাকা'-য় রবীন্দ্রনাথ এক অস্বাভাবিক বিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছেন। সেই অনুযায়ী 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের বিবর্তনে এক স্বতন্ত্র পর্ব। বর্তমান কবিতাটি কবির মানসিকতার এই পরিবর্তন স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে। মনের রোমান্টিক ধারণার ভাঙাগড়া চলেছে কবির 'মানসী' কাব্য পর্যন্ত, জগৎ ও জীবনের তত্ত্ববিহীন সৌন্দর্য-অনুধ্যান চলেছে চৈতালি কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত। সৌন্দর্য স্নাত কবি ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় নিমগ্ন হবেন এটিই ছিল স্বাভাবিক বিবর্তন এবং হয়েছিলও তাই। প্রধানত 'সেরা' কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতায় অধ্যাত্ম ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর চূড়ান্ত ফসল তাঁকে নোবেল পুরস্কারের সম্মান এনে দিয়েছিল। এর পর অকস্মাৎ তিনি যে মানুষের বাস্তব সমস্যার তুচ্ছতায় চকিত প্রত্যাবর্তন করতে পারেন সে প্রত্যাশা আমরা কখনই করতে পারিনি। অথচ সেই সমস্যাই 'শঙ্খ' কবিতাটির মর্মকথা।

এ সম্বন্ধে কবি যেসব কথা বলেছেন তা থেকেই এর মর্মবাণীর সন্ধান করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, এমন একটা সময় এসেছিল যখন তাঁর মনে এসেছিল অবসাদ, মনে হয়েছিল জীবনের কাজ তো সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, এখন পূজার্চনা করবার ও বিশ্রাম নেবার সময় এসেছে। এরকম সময়েই মনের মধ্যে কিসের যেন একটা বেদনা তিনি অনুভব করলেন। অনেকে বলেন এই বেদনাবোধকে বলা যায় কবির ভবিষ্য-দৃষ্টি বা Poetic

prophecy 'শঙ্খ' কবিতায় কবির এই বেদনাবোধের বাস্তব কোন ভূমি ছিল না, কারণ বিশ্বযুদ্ধ তখনও বাধেনি বা তার সংবাদ কবির কাছে এসে পৌঁছায় নি—কবি বলেছেন, 'এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ শুরু হতে দু'মাস বাকি আছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের এই পূর্বভাষ জেগে উঠেছে 'শঙ্খ' কবিতায়।

এই বিশ্বযুদ্ধকে বা তার পূর্বাভাসকে কবির মনে হয়েছে বিধাতার আহ্বান শঙ্খ। মানুষের নিদারুণ সংকটের দিনে মানুষের পাশে মানুষকে দাঁড়াবার জন্য এই শঙ্খে আহ্বান পাঠান বিধাতা। স্বার্থান্ধ মানুষের ছোট বৃত্ত ভেঙে মানুষকে এখন বেরিয়ে আসতে হবে বৃহৎ মনুষ্যত্বের মুক্তাঙ্গনে। কবি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করে বলেছেন, জীবনের সন্ধ্যায় শুভ্র রজনীগন্ধার মালা নিয়ে পূজা-অর্চনা করবেন—এটাই ছিল স্বাভাবিক। তার পরিবর্তে অশান্তিতে রাঙানো রক্তজবার মালা তাঁকে এখন গাঁথতে হচ্ছে সেই বিধাতারই নির্দেশে। কারণ মানুষ হয়ে জন্মানোর মনুষ্যত্ব অর্জনের কিছু ঋণ-বিধাতার কাছে না হোক, ভাবীকালের কাছে আমাদের সঞ্চিত আছে—সে ঋণ আমাদের শোধ করতেই হবে। কবি তাঁর জীবন-সন্ধ্যাতেও তাই পূরবী রাগিণীর পরিবর্তে শুনেছেন দীপক-তানের ধ্বনি, প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণেও যৌবনের পরশমণি স্পর্শ করতে বলেছেন। গীতাঞ্জলির কবি মানুষের এই সংকট সময়ে যদি বিশ্রাম চাইতেন কবিকে কেউ দোষারোপ করতেন না, অথচ কবি কিছু আগেই বিশ্রাম চাইবার সংকোচে তিনি বলেছেন—

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।"

এখন সমস্ত অঙ্গে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন রণসজ্জার।

আসলে, মানুষের মহাসংকটের সময় কবি যে বিধাতার আহ্বান ধ্বনি শুনতে পান তার দুটি কারণ আছে। প্রথমত, মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতা যখন চরমে ওঠে তখনই নতুনকালের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। স্বার্থান্ধ মানুষ মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয় সত্য, কিন্তু চরম এই সংগ্রাম ব্যতীত মানুষের সভ্যতার যুগান্তরও তো ঘটে না। দ্বিতীয় কারণ, মানুষের এই ভয়াবহ সংকটের দিনেই প্রকৃত মানুষের দেখা পাওয়া যায়। মনুষ্যত্বের অবমাননা যাঁরা সহ্য করতে পারেন না তাঁরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং মনুষ্যত্ব-ধ্বংসকারী অশুভ শক্তির বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় মানুষের এই মহাসংকট যাঁরা নিয়ে এসেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে অসংকোচে লিখেছেন। এই দলে পড়তে পারেন রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষী, যাঁরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে এবং সার্বজাতিক কল্যাণের কথা উচ্চারণ করে অপমানিত হয়েছেন, তিরস্কৃত হয়েছেন—এমনকি জেলও খেটেছেন।

কিন্তু এই কবিতাটির একমাত্র মূল্য মহাযুদ্ধের পূর্বাভাষ ঘোষণা এবং সেই আসন্ন সংকটে মানুষের প্রস্তুতির নির্দেশে সীমায়িত নেই, একটি প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি হিসাবেও কবিতাটি অনবদ্য, কবি তাঁর সমগ্র বক্তব্যই উপস্থিত করেছেন এক পরিচ্ছন্ন রূপকের মধ্য দিয়ে। তার মধ্যেই কিছু অনিবার্য প্রতীক তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করেছে। যেন একজন পূজারী সারাদিন পথ-পরিক্রমার পর পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে চলেছিলেন সন্ধ্যাহ্নিক করবার জন্য। এমন সময় মহা দুর্যোগের সংকেত এলো—'বাতাস আলো গেল মরে,' সুতরাং তিনি বুঝতে পারলেন

পূজা নয়, এখন মানবত্বের ধ্বজা বহন করে লড়াই করবার সময়। সারাদিনের পর শান্তির নিরাপদ আশ্রয় খুঁজবার চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল। রজনীগন্ধার ডালা সাজিয়ে পূজার ঘরে চলেছিলেন, আহ্বান এলো মহাদেবতার—যে দেবতা সর্ব মানুষের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কেবল সংগ্রামের ডাক দিলেন সমস্ত মানুষকে তাই নয়, নিজেও প্রস্তুত হয়ে নিলেন সংগ্রামের জন্য। তাঁর দেবতার কাছে তিনি প্রার্থনা করলেন যেন তিনি যৌবনরাগে তাঁকে উজ্জীবিত করে তোলেন, প্রাণে যেমন এখন তিনি আগুন জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে চোখের তন্দ্রা ঘুচে যাবে, তিনি জানেন। প্রচণ্ড দুঃখের আবর্ত ঘনিয়ে আসবে জীবনে, তাও তিনি জানেন। কিন্তু তাই পাবার জন্য তিনি এখন ব্যস্ত। কারণ জীবন-সন্ধ্যায় দেবতার কাছে যে আরাম চেয়েছিলেন—মানুষের ঘনায়মান গভীর সংকট যে তিনি বোঝেন নি এবং সে ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন তার জন্য এখন তিনি লজ্জিত। সকল অঙ্গে এখন তিনি রণসজ্জা পরতেই চান।

কতকগুলি সুন্দর অথচ অব্যর্থ প্রতীক কবি এই কবিতায় সৃষ্টি করেছেন। মহাদেবতার আহ্বানকে তিনি প্রতীকায়িত করেছেন শঙ্খে, শুভ্র আরাম ও বিশ্রাম সংবদ্ধ হয়েছে রজনীগন্ধায়, সংগ্রামের প্রতীক হয়েছে রক্তজবা, প্রাণে সংগ্রামের আগুন জ্বালা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন সুচিন্তিত ভাবে দীপক-তান। সমগ্রভাবে কবিতায় এক চঞ্চল উন্মাদনা সৃষ্টি করবার জন্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার করেছেন দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। এক কথায় এই কবিতাকে বলাকা কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসাবে আমরা মেনে নিতে পারি নির্দ্বিধায়।

॥ চার ॥

শব্দার্থ ও টীকা

(প্রথম স্তবক)

শঙ্খ—শঙ্খ বলতে কবি বুঝিয়েছেন ঈশ্বর যার মাধ্যমে নিজের আহ্বান ধ্বনিত করে তোলেন নীরবে মানুষের হৃদয়ে। মনে হয় ভগবান বিষ্ণুর পাঞ্চজন্য বা শঙ্খের ধারণা থেকে এই প্রতীক তিনি গঠন করেছেন। **ধুলায় পড়ে**—অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে, শঙ্খের আহ্বানে কারো সাড়া ঈশ্বর পান নি। অথবা, দেবতার শঙ্খ সর্বদা পূজার ঘরে পবিত্রতায় রাখা থাকে—সেই শুচি-শঙ্খ পথের ধূলায় পড়ে আছে জেনে শঙ্কের অপমানেই কবি শঙ্কিত। **বাতাস আলো গেল মরে**—দুভাবে ব্যাখ্যা হতে পারে—প্রকৃতির নিজস্ব যে অকৃপণ দান তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ দেবতা তা সংবরণ করে নিলেন অথবা মানুষ নিজেই তা বিষিয়ে তুলল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে, কবি একটি মহাসংকট বা ধ্বংসের আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য বাতাসের স্তব্ধতা এবং আলোকের অপমৃত্যু দেখাতে চেয়েছেন। **দুর্দৈব**—অঘটন। **লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে**—পতাকা বেয়ে কেউ লড়াই করতে আসে না, ইঙ্গিতময় ভাষা ব্যবহার করেছেন এখানে। যে কোন দেশপ্রেমমূলক লড়াইয়ে মানুষ সংগ্রাম করে তার জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য। পতাকা এখানে তাই সম্মান রক্ষার সংগ্রামের দিকেই ইঙ্গিত করেছে, তার এই পতাকা জাতীয়তাবোধক নয়, আন্তর্জাতিকতাবোধক এবং

কোন বিশেষ দেশের মানুষের কথা কবি বলেন নি, বলেছেন মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ বিশ্বের সমস্ত মানুষের কথা। **গান আছে....গেয়ে**— হৃদয়ে স্ফূর্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্যই কবি এ কথা বলেছেন। **নিঃশঙ্ক**—শঙ্কাবিহীনচিত্তে। **অভয়শঙ্খ**—শঙ্খ কেবল বিধাতার আহ্বান ধ্বনিত করে না, তাঁর অভয়বাণীও শোনায়। এই অভয়বাণীর মূল কথা, মানুষের সংকট মাঝে মাঝে ঘনিয়ে আসতে পারে বটে কিন্তু মানবতার মৃত্যু নেই।

(দ্বিতীয় স্তবক)

চলেছিলেম....ফুলের অর্ঘ্য—কথাগুলি কবি রূপক অর্থে বললেও কবির কাব্য সাধনার অধ্যায় সম্বন্ধে এই কথাগুলি সুপ্রযুক্ত বলেই মনে হয়। বলাকা পর্বের ঠিক আগের পর্বটিকে আমরা আখ্যা দিতে পারি গীতাঞ্জলি পর্ব। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের যে অধ্যাত্মমুখিতা শুরু হয়েছিল তা বিস্তৃত হয়েছিল গীতালি গীতিমাল্য পর্যন্ত। কবির মন যেন সৌন্দর্য সাধনার পালা সমাপ্ত করে পূজা-মন্দিরে নিজেকে নিমগ্ন করেছিল। সেইজন্যই কবি বলেছেন তিনি ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজা নিবেদন করতে চলেছিলেন। **সারাদিনের পরে**— রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা রচনার সময় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছিলেন, সুতরাং সারাদিনের পরে তিনি বলতেই পারেন এবং জীবন সায়াহ্নে মানুষ শান্তি খোঁজে, এটাও স্বাভাবিক। **হৃদয়... ক্ষত**—সংসারে অনেক রকম মানুষ থাকে। তাদের সঙ্গে নিয়ত সম্পর্কে অনেক রকমের তিক্ত বেদনা হৃদয়ে জমা হতে থাকে। বিশেষত কবিরা হন স্পর্শকাতর, তাঁদের অনুভূতিতে ছোটখাট ঘটনাও অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। সংসার-পথে চলবার সময় এইরকম নানা ঘটনার মাঝে হৃদয়ে অনেক ক্ষত এবং গ্লানি জমা হয়েছিল, সেই ক্ষতের কথাই কবি এখানে বলতে চেয়েছেন। **নিষ্কলঙ্ক**—এই কথার মধ্যে একটি যে আভাস আছে, সেটি হল সমালোচকদের অভিযোগ। বাস্তবতাবোধহীনতা অশ্লীলতা সৃষ্টি এবং দুর্বোধ্য কাব্য রচনার অনেক অভিযোগ সমালোচকগণ তাঁকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছেন। সেসব থেকে কবি মুক্তি চেয়েছেন।

(তৃতীয় স্তবক)

রক্তজবার মালা—'রক্তজবা' এখানে রূপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। রক্তজবার সঙ্গে শক্তি দেবীর সম্পর্ক। রক্তাক্ত সংগ্রাম যখন এগিয়ে আসছে, শক্তি দেবীর সাধনা না হোক রূদ্রের সাধনা যখন আসন্ন তখন পূজার অঞ্জলিতে রক্তজবাই প্রত্যাশিত। **রজনীগন্ধা**— এই ফুলটিকেও কবি ব্যবহার করেছেন ব্যঞ্জিত অর্থে। শুভ্র ও সুগন্ধ রজনীগন্ধা শান্তি, আরাম ও রোমান্টিক ভাবনার অনুষঙ্গেই আমাদের ধারণায় আসে। কবি জীবন—সন্ধ্যায় শান্তি এবং আরাম চেয়েছিলেন বলেই রজনীগন্ধা দিয়ে পূজা সমাপণের প্রসঙ্গ এখানে এনেছেন।

জীবনের মধ্যাহ্নে অনেক বিরূপ সমালোচনা এবং প্রতিকূলতা পেরিয়ে এসেছেন কবি। এই প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে সংগ্রাম বোঝাতেই তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। **বিরাম**—এখানে অর্থ, বিশ্রাম। **ঋণের পুঁজি**—কিসের ঋণের কথা কবি বলেছেন তা খুব স্পষ্ট হয় নি। মানুষ জন্মের সময়ই বোধ হয় তার কিছু ঋণ থাকে, কর্মী মানুষ তার উপযুক্ত কর্ম করে, স্পর্শকাতর মানুষ এই পৃথিবীকে ভালবাসেন এবং ভালবাসার অভিজ্ঞান

তাঁর সাহিত্য ও শিল্পে ফুটিয়ে তোলেন। ঈশ্বর সুন্দর করে সাজিয়েছেন তাঁর সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন মানুষকে। মানুষ তার এই জন্মকালীন ঋণশোধ করার চেষ্টা করে ঈশ্বরের মহৎ সৃষ্টির প্রতিরূপ নির্মাণ করে, তিনি কত মহৎ সে সম্বন্ধে তার অনুভূতি প্রকাশ করবার চেষ্টা করে। সম্ভবত একেই তিন ঋণের পুঁজি বলতে চেয়েছেন, কারণ ইতিপূর্বেই গীতাঞ্জলি-পর্বে সে দায়িত্ব তিনি সমাধা করেছেন। **অঙ্ক**—কোল। **হেনকালে...তব শঙ্খ**—কবি যে বিশ্বদেবতার আহ্বান শুনতে পেয়েছেন তার সবটাই যে অনুভবগম্য বাস্তবে যে কোন শ্রাব্য ব্যাপার এর নেপথ্যে ছিল না সে কথা বোঝাবার জন্যই কবি 'বুঝি' ও 'নীরব' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন।

(চতুর্থ স্তবক)

যৌবনেরই পরশ-মণি—পরণ-মণি বা Elixir বলা হয় কল্পিত সেই পাথরকে যার স্পর্শ পেলেই নাকি সব কিছু শোনা হয়ে যায়। যৌবন বলতে এখানে কবি সেই প্রাণস্পন্দন এবং উন্মাদনাকে বুঝিয়েছেন যা হৃদয়ে জাগলে নতুন করে দায়িত্ব তুলে নেবার শক্তি জন্মায়। বয়সের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, কারণ যে বয়সে কবি তাঁর চিত্তে যৌবন জাগিয়ে তুলতে বলেছেন সেটি তাঁর প্রৌঢ় বয়স। **দীপক-তানে**—এখানে একটি সুন্দর আলংকারিক প্রয়োগ ঘটেছে। দীপক একটি শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগবিশেষ। কথিত আছে সম্রাট আকবরের সভায় শ্রেষ্ঠ গায়ক তানসেন এই রাগে সংগীত সাধন করলে আগুন জ্বলে উঠতো। তাই প্রাণে অগ্নিময় তেজ সঞ্চার করার জন্য কবি দীপক-তানের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় কবির গানের এই পংক্তি—আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে/এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে, **নিশার**—রাত্রির। **নিশার বক্ষ বিদার করে রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে**—এই রাত্রি আসলে আসন্ন দুর্যোগের রাত্রি। **উদ্‌বোধনে...আতঙ্ক**—অন্ধকার রাত্রির আকাশে নতুন বাণীর যে উদ্‌বোধনে হবে তা ভয়ঙ্কর কিছু বলেই কবি মনে করেন। তাই পূজার ঘরে চলেছিলেন যে কবি তিনি এখন উদ্‌বোধন চেয়েছেন যাতে রাত্রির দিক দিগন্তে জেগে ওঠে চরম আতঙ্ক। **জয়শঙ্খ**—এই শঙ্খে বিশ্ব দেবতার বিজয় ঘোষিত হবে। 'তোমার বলতে কবি ঈশ্বরকে নিশ্চয় বুঝিয়েছেন, কিন্তু সঠিকভাবে কোন্ ঈশ্বরকে বুঝিয়েছেন তা কবি বলেন নি। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় অবশ্য তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন এই দেবতা আসলে ধ্বংসের রুদ্র।

(পঞ্চম স্তবক)

জানি শ্রাবণ...বাজিবে বক্ষে—শ্রাবণ ধারা অশ্রুধারার সঙ্গেই তুলনীয়, সুতরাং দুঃখের অনুষঙ্গে শ্রাবণ ধারার প্রসঙ্গ আসতেই পারে। কিন্তু শ্রাবণ ধারার মত বাণ বুকে এসে বিঁধবে কি করে এই উপমা চিত্রটি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয় না। বৃষ্টির ধারা দেহে অবশ্য বিদ্ধ হয়, কিন্তু শ্রাবণ মাসে সেই বর্ষণ আমরা দেখি না। **কেউ বা ছুটে....দীর্ঘশ্বাসে**—একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে। সেই ভয়ঙ্কর যখন সত্যিই আসবে তখন ভয়ে মানুষ ছুটোছুটি করবে, মহা-আশঙ্কায় কেউ বা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। **পর্যঙ্ক**—খাট। **দুঃস্বপনে...পর্যঙ্ক**—মানুষের গভীর ঘুমের সুখশয্যা দুঃস্বপ্ন দেখে চুরমার হয়ে যাবে। এর অর্থ, যে বিরাট সর্বনাশ

এগিয়ে আসছে তাতে মানুষের আরামের ঘুম আর থাকবে না—যা ঘটবে, তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে তাকে মনে হবে রাত্রির দুঃস্বপ্ন। **বাজবে যে আজ মহোল্লাসে**—কবি এই আসন্ন সর্বনাশ বুঝতে পেরেও বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত নন। তিনি জানেন সৃষ্টির দেবতার কাজ শেষ হলে ধ্বংসের দেবতা কাজ শুরু করেন—উভয়ের কাজেই পরস্পরের পরিপূরক। তাই সৃষ্টির দেবতাকে যেভাবে এতদিন কবি তাঁর কাব্যে বরণ করে নিয়েছেন আজ ধ্বংসের দেবতাকেও সেই আনন্দ ও উল্লাস নিয়েই তিনি বরণ করে নিতে প্রস্তুত।

(ষষ্ঠ স্তবক)

তোমার কাছে...লজ্জা—জীবনের দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করার পর মন স্বভাবতই আরাম বা অলস বিশ্রাম চায়, কিন্তু কবি জানতেন না আরাম গ্রহণের প্রশস্ত অবকাশ তখন নেই। মানবেতিহাসে ঘনিয়ে আসছে যে মহাসংকট তাকে বরণ করে নেবার জন্য মানুষকে তৈরি থাকতে হবে। এখন সংগ্রামের দিন, আরামের নয়—এই বোধ কবির মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্রাম চাইবার জন্যই এখন লজ্জিত বোধ করছেন। **বক্ষে আমার...জয়ডঙ্ক**—কবি মনে করেন এখনকার যে সাধনা তা দুঃখের সাধনা। দুঃখের তপস্যা অথবা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সংকট কাটবে এবং অনাগত নতুন যুগ আবির্ভূত হবে। সুতরাং দুঃখের বেশে দেবতা আজ দেখা দিয়েছেন বলেই কবি তাতে ভয় পাবেন না, বরং দুঃখকে স্বীকার করে নেবেন—দুঃখ তাঁর প্রাণে সেই বিজয়ের ডঙ্কা বাজাবে যে ধ্বনিতে তিনি প্রত্যাশামধুর নবযুগের আশ্বাস শুনতে পান। **দেব সকল....অভয় তব শঙ্খ**—কবি মনে করেন শঙ্খের আহ্বান মানেই দেবতার অভয় আহ্বান, জয় মানুষের হবেই—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তবে মানুষকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। সংকট যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন সেই সংকট উত্তীর্ণ হবার জন্য মানুষকে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, মানুষের দুর্দিনে মানুষকে তার দায়িত্ব এড়িয়ে বসে থাকলে চলবে না। সেই জন্যই কবি বলেছেন, দেবতার অভয় শঙ্খ পেলে তিনি তাঁর দেহের সমস্ত সামর্থ্য উৎসর্গ করবেন মানুষের সংকটমোচনের জন্য।

॥ পাঁচ ॥

● ব্যাখ্যা

(এক)

"তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
কেমন করে সইব?'

সাধারণভাবে বলা যায় কবি 'তোমার' বলতে এখানে বিশ্বদেবতার কথা বলেছেন, কিন্তু ঠিক কোন দেবতাকে তিনি তাঁর নিবেদন জানিয়েছেন সে কথা এই কবিতায় তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি। অবশ্য 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন এই দেবতা ধ্বংসের ঈশ্বর রুদ্র।

শঙ্খ বলতে কবি বুঝিয়েছেন দেবতার নীরব আহ্বান। বিষ্ণুর পাঞ্চজন্য বা শঙ্খ থেকে তিনি সম্ভবত এই অনুষঙ্গ প্রস্তুত করে নিয়েছেন।

শঙ্খ ধুলায় পড়ে আছে একথা কবির মনে হয়েছে এই কারণে যে, তিনি তাঁর কবি চেতনা দিয়ে অনাগত সংকটের এক আভাস পেয়ে গিয়েছেন। সংকট এগিয়ে এসেছে বলেই তাঁর শঙ্খে তিনি শব্দবিহীন আহ্বান জাগিয়েছেন কিন্তু সেই আহ্বান নিশ্চয়ই বিশেষ কারো কাছে পৌঁছায়নি। সেই কারণেই বিধাতার আহ্বান শঙ্খ যেন অপমানে অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে পথের ধুলায়, সে আহ্বানকে সম্মান জানাবার জন্য এগিয়ে আসেনি কেউ।

কবি সুন্দরের পূজারী অধ্যাত্ম চেতনায় দীক্ষিত। দেবতা যখন মানুষের সংকট মুহূর্তে মানুষকে আহ্বান করেন, তার সে আহ্বানের অর্থ বুঝতে না পেরে সাধারণ মানুষ যখন প্রবল অনাদরে সে আহ্বানকে উপেক্ষা করে তখন কবির অন্তরে গভীর বেদনা জাগাই স্বাভাবিক। বিশ্বদেবতার এই অসম্মান তিনি তাই সংগত কারণেই সহ্য করতে পারেন নি।

॥ দুই ॥

শঙ্খ যে ধুলায় পড়ে আছে এ কি কবি দেখেছেন? তখন কবি কি করতে যাচ্ছিলেন? কেন? কবির মানসিক অবস্থা তখন কেমন ছিল? কবি উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছিল?

শঙ্খ যে ধুলায় পড়ে আছে এ দৃশ্য কবি দেখেছেন, অনুভব করেছিলেন। সে কথা বোঝা শক্ত, কারণ একবার তিনি বলেছেন, 'পথে দেখি ধুলায় নত তোমার মহাশঙ্খ'। কিন্তু কবিতাটির অর্থ উপলব্ধি করলে এ কথা বলতেই হবে যে এ জিনিষ অনুভবের, দেখবার নয়। এর সমর্থনেও অবশ্য কবিতায় দুটি পংক্তি পাই—

'হেন কালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।'

শঙ্খ যে ডেকেছে বা আহ্বান করেছে এ সম্বন্ধে কবি সন্দিগ্ধ বলেই 'বুঝি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এবং তারপর স্পষ্ট করেই শঙ্খকে বলেছেন নীরব। যে শঙ্খ আহ্বান আনে সে যদি নীরব হয় তবে তার দৃশ্যরূপেরও খুব দরকার হয় না।

কবি তখন রজনীগন্ধা ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে যাচ্ছিলেন পূজার ঘরে বিশ্বদেবতার পূজা করতে।

কারণ, জীবনের এ যাবৎ কাল কবি অনেক সৃষ্টি করেছেন। তিনি এখন শ্রান্ত। যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে, তাঁর অনুধ্যানে এবং তাঁর কাছে বসে শান্তি সুধা পান করাকেই তিনি প্রকৃষ্ট কাজ বলে ভেবেছিলেন।

কবির মানসিক অবস্থা ছিল অবসন্ন ও শ্রান্ত। জীবনের প্রৌঢ়ত্বে তিনি উপনীত হয়েছিলেন অনেক সংগ্রাম পেরিয়ে৺ নিজের সাহিত্য সাধনার জন্য অনেক তীক্ষ্ণ ও রূঢ় সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হৃদয় তাঁর বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল বলেই ভেবেছিলেন সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নিয়ে তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হবেন।

কবির উদ্দেশ্য সফল হয় নি। পূজার ঘরে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য যাত্রা করেই তিনি শুনতে পেয়েছেন বিশ্বদেবতার আহ্বান—এখনো সংগ্রাম শেষ হয় নি এবং মানুষের যে তীব্র সংকট ঘনিয়ে আসছে তাতে মানুষকে তার বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং পূজার সাজ খুলে ফেলে যুদ্ধ সাজ পরিধান করার সংকল্পই তিনি নতুন করে গ্রহণ করেছিলেন।

॥ তিন ॥

কবি 'শঙ্খ' কবিতায় যে সংকটের অনুভূতি লাভ করেছিলেন তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সাধারণের মধ্যে কি হবে বলে তিনি মনে করেছেন? নিজের জীবনে কি ভোগ করতে হতে বলে তাঁর মনে হয়েছিল?

মানুষের জীবনে যে সংকট ঘনিয়ে আসছে তার সঠিক প্রকৃতি কবি বুঝতে না পারলেও এক মহা সর্বনাশ যে আসন্ন একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সাধারণ মানুষ এই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে বিহ্বল হয়ে পড়বে, তারা দিগ্‌ভ্রান্তের মত ছোটাছুটি করবে। কেউ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে, কেউ দূরে সরে যাবে। কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আতঙ্কে কেউ ক্রন্দন করে উঠবে। সুখশয্যায় যারা নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছে তাদের ঘুম ভেঙে যাবে চকিতে এবং সহসা যা দেখছে তাকে নিশীথ রাতের দুঃস্বপ্ন মনে করে ভয়ে তাঁরা কেঁপে উঠবে।

কবি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, ভক্তিরসের আবিলতা যে তন্দ্রা তার চোখে দিয়েছে সেই তন্দ্রা আর তাঁর চোখে থাকবে না, তার পরিবর্তে দুঃখের শ্রাবণ ধারা তাঁকে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করবে। তিনি জানেন, পূজার সাজ পরিত্যাগ করে যে যুদ্ধের সাজ তিনি পরিধান করতে চান তা বহন করার দুঃখ অনেক। প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত আসবে পদে পদে, অনেক আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হবে, পরিবেশ সর্বদাই থাকবে বিপদসঙ্কুল, কিন্তু এত ব্যাঘাত এবং আঘাত সহ্য করেও কবি অটল থাকবেন; এই সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন।

॥ চার ॥

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।"

কবি আরাম চেয়েছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত, তিনি বয়সের বিচারে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছেন, মানুষের কর্মদক্ষতার একটা সীমা আছে—তিনি তাঁর প্রৌঢ়ত্বের দিনগুলি মধুর বিশ্রামে অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, শিল্পীর সৃষ্টি ক্ষমতা একটা সীমা আছে। যৌবনের দিনগুলি রোমান্টিক কাব্য সম্পদে তিনি পূর্ণ করেছেন, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ প্রাণ ভরে উপভোগ করেছেন এবং কবিতায় তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এরপর অনিবার্য নিয়মেই তাঁর কাব্য জীবনের বিবর্তন ঘটেছে আধ্যাত্মিক-চিন্তায়। গীতাঞ্জলি পর্বে তিনি আধ্যাত্মমহিমায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন। এবার বহুপ্রসবী লেখনীকে বিশ্রাম দিয়ে তিনি অবসরের আরাম উপভোগ করতে চেয়েছিলেন।

এতে তিনি লজ্জা পেলেন এই জন্য যে, স্বার্থপরের মত কেবল তিনি নিজের কথাই ভেবেছেন—মানুষ হিসাবে মনুষ্য সমাজের ওপর তাঁর যে একটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে সে কথা তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। বিশ্রাম নেবার যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা কার্যকর হবার আগেই তাঁর কাছে এসে পৌঁছাল এক বৃহৎ সংকটের পূর্বাভাস। মানবজীবনের এই মহাসংকটে তাঁর মত কবির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে—সে কর্তব্য সমাধা না করেই তিনি স্বার্থপর মানুষের মত আচরণ করতে চলেছিলেন, এই তাঁর লজ্জা।

কবি এবার এমন কাজ করবেন যাতে তাঁকে আর লজ্জায় পড়তে না হয়। তিনি অবসন্ন সংগ্রামের কথা স্মরণ করে পরিধান করবেন রণসজ্জা এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবসভ্যতার এই অভিশপ্ত অধ্যায়কে প্রতিহত করার চেষ্টা করবেন। সেই জন্যই তিনি আরামের পরিবর্তে বিশ্বদেবতার কাছে এখন প্রার্থনা করেছেন যৌবনের উন্মাদনা এবং দীপ্ত প্রাণের তেজ।

॥ ছয় ॥

॥ ক ॥

'শঙ্খ' ঃ ৪ সংখ্যক কবিতা—মর্মার্থ

সমগ্র 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এক মহৎ কবির সচেতন প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন মাত্র। ৪ সংখ্যক কবিতা, সাময়িক পত্রে প্রকাশের সময় যার নামকরণ করেছিলেন কবি 'শঙ্খ', সেই কবিতাটি সম্পর্কে কবি স্বয়ং বলেছেন যে, যুদ্ধ শুরু হবার দু'মাস আগে তিনি তা রচনা করেন। পক্ষান্তরে ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা' গ্রন্থে জানিয়েছেন, যুদ্ধের সংবাদ এসে যাওয়ার পরই কবি এই কবিতা রচনা করেন। অর্থাৎ এই কবিতায় কবির ঋষিসুলভ দৃষ্টিসঞ্জাত যুদ্ধের পূর্বাভাস লিপিবদ্ধ আছে অথবা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রতিক্রিয়া—সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত নই। কবিতার আলোচনায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও মনে হয় না।

শুধু 'শঙ্খ' কবিতায় নয়, সমগ্র 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে মানুষের যে মহাসংকটের পরিচয় আছে তা বিধ্বংসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪ খ্রিঃ-এ শুরু হয়ে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলেছিল ১৯১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত, অত্যন্ত বিধ্বংসী তীব্রতায়, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির রচনা অবশ্য তার অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়। পশ্চিমী জাতিগুলির সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা খুব উঁচু ছিল, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানোও তিনি পাপ মনে করতেন। সুতরাং মানুষের নগ্ন লোভ, আগ্রাসী ঔপনিবেশিক নীতি এবং ঘৃণ্য স্বার্থপরতার ফল হিসাবে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল তার কল্পনাও তিনি করতে পারেন নি, তাই অধ্যাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন রবীন্দ্রনাথ এই যুদ্ধের এই আকস্মিক অভিঘাতে মর্মাহত হয়ে পড়েন। কিন্তু মানুষের বর্বরতায় যে সংকটের জন্ম মানুষকেই প্রাণের মূল্য দিয়ে তা থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে, এ কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের আদর্শে দীক্ষিত কবি এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এই কাব্যগ্রন্থে। সামনে যে বিশাল সংকটের দিন, তাকে গ্রহণ করে দুঃখের তপস্যায় উত্তীর্ণ হবার নির্দেশ তিনি রেখেছেন সমগ্র জাতির কাছে। সে কবিতা তাঁর কাছে ছিল সৌন্দর্যের আকর এখন তাই হয়ে উঠেছে মানবত্ব রক্ষার মহান নির্দেশ। এই কবিতায় তিনি নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন সেটাই আসলে দেশবাসীর আচরণীয় বিধি বলে তিনি মনে করেন।

কবি তার ভবিষ্যৎদৃষ্টির সাহায্যেই যেন অনুভব করেছেন হঠাৎ যে এক মহা-সর্বনাশের দিন আগত। কবি চলেছিলেন ফুলের সাজি নিয়ে পূজার ঘরে পূজা করবার জন্য। অর্থাৎ কবির যৌবন সাধনা এবং সৌন্দর্য সাধনার কাব্য শেষ হবার পর অধ্যাত্ম সাধনা শুরু হয়েছিলে। তাঁর গীতনৈবেদ্য দেবতার পায়ে অর্পণ করে ভেবেছিলেন এবার ছুটি নেবেন,

নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগের দিনগুলি কাটিয়ে দেবেন প্রশান্ত আরামে, এমন সময় তাঁর মনে অকস্মাৎ এল এই বোধ যেন আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি ঘটেছে—

'বাতাস আলো গেল মরে,
একি রে দুর্দৈব!'

এবং তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন বিশ্বদেবতার আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে, তাদের প্রত্যেককে মানুষের এই চরম সংকটের কালে প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে আসবার জন্য। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্নরকম। এর বিরুদ্ধে অর্থাৎ সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি যাদের আছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে বৃহৎ মানবতার ও অখণ্ড মানবজাতির পতাকা বহন করে। সুন্দরের পূজারী যারা তাদের শিল্প সাহিত্য সংগীতে ধ্বনিত করে তুলতে হবে মানুষের বর্বরতার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার চেষ্টা করে যেতে হবে তাদের আপ্রাণ। যারা রাজনৈতিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রের মানুষ তাদেরও বিরূপ সমালোচনা ও নিন্দা—প্রশংসার অপেক্ষা না করে ধ্বংস যজ্ঞ থেকে মানুষকে উদ্ধারের প্রয়াসে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

এই আহ্বান শুনতে পেয়ে কবি নিজের মানসিকতার কথা বলেছেন, মানসিক দিক থেকে তিনি কত ক্লান্ত ছিলেন এবং শ্রান্তিযাপনের ও বিচ্ছিন্নভাবে অবসরের সংকল্প কিভাবে তাঁর মনে এসে গিয়েছিল। তাও তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন—তিনি প্রার্থনা করেছেন বিশ্বদেবতার কাছে যেন এই প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর মনে লাগে যৌবনের উন্মাদনা, প্রাণে যেন তিনি পান অগ্নির উষ্ণতা এবং সেই তেজ ও উজ্জ্বলতা নিয়ে আবার যেন ফিরে আসতে পারেন তাঁর সৃষ্টির অবলম্বন হাতে করে। কারণ তাঁর কর্তব্য এইভাবেই মানুষকে সচেতন করা—তাঁর একমাত্র অস্ত্র কবিতা, তাই তাঁকে শাণিত করে তুলতে হবে। তিনি আতঙ্কগ্রস্ত না হবারও শপথ গ্রহণ করেছেন। ধ্বংসের দেবতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, অন্ধকার দুর্যোগময় সংকটের দিনে অনিশ্চয়তার দিক দিগন্তে তিনি যতই আতঙ্ক উদ্‌বোধিত করে তুলুন, তাঁর জয়শঙ্খের আহ্বান নির্ভীকভাবে প্রচারের দায়িত্ব কবি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।

বরং কবি পূর্বে যে আরাম চেয়েছিলেন, স্বার্থপর বিশ্রাম চেয়েছিলেন সেই জন্যই আজ তিনি সঙ্কুচিত এবং লজ্জিত। মানুষের জীবনে যে এই দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে মানুষের কবি হিসাবে সে কথা তাঁর পূর্বেই বোঝা উচিত ছিল। অথচ এই ঘনায়মান মহা সংকটের কিছু আভাস তো তিনি পান নি, উপরন্তু মানব সমাজের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব সারা হয়ে গেছে মনে করে তিনি ব্যক্তিগত চিন্তায় মন দিয়েছিলেন। অবশ্য এই সঙ্কুচিত মনোভাব কবি অচিরেই ত্যাগ করেছেন এবং শান্তির পোষাক খুলে ফেলে যুদ্ধের সাজ প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন আঘাত যতই আসুক, বিঘ্ন বিপদ যতই পর্য্যুদস্ত করার চেষ্টা করুক, পরিবর্তিত পরিস্থিতি যতই প্রতিকূলতা করুক তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটল থাকবেন এবং নিজের সব শক্তি উজাড় করে দিয়ে দেবতার অভয়বাণী প্রচার করবেন সংকটের অবসান না হওয়া পর্যন্ত।

॥ খ ॥

'শঙ্খ' ঃ ৪ সংখ্যক কবিতা—কাব্য-সৌন্দর্য

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৪-সংখ্যক কবিতাটি গভীর উদ্বেগে ভারাক্রান্ত। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের এত নগ্ন স্বার্থপর রূপ, মানুষের ঘৃণ্য স্বার্থপরতা এবং বর্বরতা আর কখনো দেখা যায় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেই রক্তক্ষয়ী অমানবিকতার সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে কবি এই কবিতায় নিজেকে এবং দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়েছেন আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে, অতি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যে এখন চলতে হবে এবং দুঃখ ও আঘাত ছাড়া এখন প্রাপ্তি বলতে যে আর কিছুই থাকবে না। সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই গভীর বিষাদময় কবিতাটি রচনা করতে গিয়েও কবি তাঁর শিল্পী-স্বভাব বিসর্জন দিতে পারেন নি: সমগ্র কবিতাটি উদ্দেশ্যমূলক হয়েও এক নিপুণ সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। কেবল 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে নয়, 'শঙ্খ' কবিতাটি সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য ভাণ্ডারেও এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলেই আমরা মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি বিশুদ্ধ রূপক আশ্রয় করে লিখেছেন এবং সেই রূপকের সমগ্রতা কোথাও বিচ্ছিন্ন হয় নি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন নিজেকে এমন একটি মানুষ হিসাবে যিনি সারাজীবন প্রাত্যহিক জীবনাচরণে অনেক প্রতিকূলতা এবং বাধাবিঘ্নে বিক্ষত চিত্ত। সেই প্রতিবন্ধকতার দিন তিনি পেরিয়ে এসেছেন, তাই জীবন-সায়াহ্নে তিনি দেবতার আশ্রয়ে পূজার ঘরে কিছু শান্তিও আরামের প্রত্যাশা করে এসেছেন, সঙ্গে রয়েছে তাঁর অবসন্ন চিত্ত এবং সমর্পিত হৃদয়। পূজার ডালিতে রজনীগন্ধা পূর্ণ করে যখন তিনি ঠাকুর ঘরে ঢুকতে যাবেন তখনই মনে হয়েছে দেবতার পূত শঙ্খ যেন অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে ধূলিতে। শঙ্খে দেবতার আহ্বানই ধ্বনিত হয়। সেই শঙ্খ যখন পথের ধূলায় অনাদৃত, তাঁর মনে হয়েছে দেবতা কোন আহ্বান পাঠিয়েছেন যে আহ্বান কেউ শুনতে পায় নি বা যার অর্থ কেউ বুঝতে পারে নি।

কবি নিজে এবার একটু সতর্ক হতেই লক্ষ্য করেছেন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া কেমন, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। বাতাস এখন নিথর আকাশের রঙ এসেছে ফুরিয়ে—এসব এক মহা দুর্বিপাকের ইঙ্গিতই বহন করছে। তিনি এবার নিশ্চিত হয়েছেন, এক মহা সর্বনাশই ঘনিয়ে আসছে—বিধাতার আহ্বান ছিল মানুষকে জাগ্রত করবার জন্য। সেই আহ্বানই সকলের মত তিনিও শুনতে পান নি। কবি লজ্জিত হয়েছেন একটু আগেই তিনি আরাম চেয়েছিলেন বলে, মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি কর্তব্যের কথা ভুলে স্বার্থপর বিশ্রামের শান্তি পেতে চেয়েছিলেন বলে। তিনি বিশ্বদেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, যৌবনের তেজ যেন তাঁর মধ্যে আবার ফিরে আসে, প্রাণে যেন তিনি উদ্দীপনা বোধ করেন নতুন করে মানুষকে সচেতন করবার, তাদের শুভ বুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার। এখন মানুষের ভাগ্যে রয়েছে কেবলই বিষাদ, কেবলই যন্ত্রণা,—এসব সত্ত্বেও যেন তিনি হতোদ্যম না হয়ে পড়েন। শত আঘাত এবং বেদনাতেও যেন অটল থেকে দেবতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি দেহের সমস্ত শক্তি এই মহৎ উদ্দেশ্যে ঢেলে দিতে পারেন, এস তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

রূপকটি যেমন কবি বিস্ময়কর দক্ষতায় পরিবেশন করেছেন, ঠিক তেমনি ব্যঞ্জনাময় কয়েকটি চিত্র উপস্থিত করেছেন অসীম নৈপুণ্যে। একটি অসাধারণ শব্দ ব্যবহার আমরা উপস্থিত করতে পারি—

"আরতি দীপ এই কি জ্বালা?
এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথব রক্তজবার মালা?
হায় রজনীগন্ধা!"

এখানে রক্তজবার মালা এবং রজনীগন্ধা দুটি আশ্চর্য ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে। রক্তজবার মালা শক্তিদেবীর পূজার্চনার প্রধান উপকরণ শুধু নয় তার মধ্যে আছে উজ্জ্বল লাল রং—সুতরাং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। তুলনায় রজনীগন্ধা শুভ্রতা ও শান্তির প্রতীক। কবি আরতি দীপ নিয়ে সন্ধ্যার উদ্যোগ করছিলেন রজনীগন্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে এখন তাঁকে গাঁথতে হবে রক্তজবার মালা—কেবলমাত্র এই চিত্রের উল্লেখই তাঁর যাবতীয় বক্তব্যকে সংহত অথচ অব্যর্থভাবে প্রকাশ করেছে। এই জাতীয় আর একটি প্রয়োগ—

"দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।"

দীপক রাগ সঠিক পরিবেশনে আগুন জ্বালতে পারে বলে জনশ্রুতি আছে। কবি অন্যত্র যে বলেছেন, 'আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে', এখানে সেই বক্তব্যই ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন দীপক রাগের ব্যবহারে।

কবির সংহত বাগ্‌ভঙ্গী মাঝে মাঝে বৈপরীত্যজনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। সাধারণত শুভ কাজেই আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনের প্রয়োজন হয়। এখানে অন্ধ দিক্‌দিগন্তে বিশ্বদেবতা যে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলবেন, সমস্ত গগন ভরে তারই উদ্‌বোধন করতে বলেছেন কবি। আর একটি সুন্দর অংশ—

"জানি শ্রাবণ-ধারা সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।"

একই সঙ্গে আঘাত বেদনা এবং অশ্রু সমন্বিত করার এক আশ্চর্য প্রয়াস আমরা এই আপাত-অসম্ভব উপমাটির মধ্যে পাই। শ্রেষ্ঠ কবি এবং সাহিত্যিকদের হাতেই এই জাতীয় প্রয়োগ সম্ভব। শেক্সপীয়রের নাটকেও আমরা পাই—

"Pluck from the memory a rooted sorrow.
Raze out the written troubles of the brain."

এই অপরূপ ভাষা-ভঙ্গিতে, নিপুণ চিত্র নির্মাণে এবং একটি নিটোল রূপক নির্মিতে আলোচ্য কবিতাটি প্রথম শ্রেণীর কাব্য সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

॥ গ ॥

ছবি

(৬ সংখ্যক কবিতা)

॥ এক ॥

রচনাকাল ও নামকরণ

'বলাকা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ছবি' তথা '৬' সংখ্যক কবিতাটির রচনাকাল ৩রা কার্তিক—রাত্রিকাল, স্থান এলাহাবাদ। কবিতাটি ঐ বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। কবি উত্তর ভারত পরিভ্রমণ-কালে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল এলাহাবাদে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের জামাতা প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। ঐ স্থানে একটি বিশেষ ছবি-দর্শনে কবির পূর্বস্মৃতি জাগরূক হয়, ফলে তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন বলে জানা যায়। কিন্তু কবির কোন্ প্রিয়জনের চিত্র তাঁর স্মৃতিকে এমন উদ্বেল করে তুলেছিল, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। কবির অন্যতম প্রিয়জন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ অনুমান করেন যে, এই আলেখ্যটি সম্ভবতঃ ছিল কবির প্রিয় বৌঠান কাদম্বরী দেবীর। কিন্তু অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় বলেন, "...সেইখানে বোধ হয় কবি নিজের পত্নীর প্রতিকৃতি দেখিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।" অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও বলেন, "কোনো আত্মীয়ের গৃহে মৃত পত্নীর ছবি দেখিয়া কবি যে ভাব-চিন্তা ও আবেগের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন 'ছবি' কবিতায়।" বস্তুতঃ কবিতাটির বিষয়-বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা আলোচনায়ও ছবিটি যে কবি-পত্নীরই ছিল, এই বিশ্বাসকেই স্থির সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করতে হয়।

'বলাকা' কাব্যে যে কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের কয়েকটি প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন সেই কবিতা কবির একটা করে শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল, অপর কবিতাগুলির কোন নামকরণ করা হয় নি, সংখ্যাদ্বারাই সেগুলি পরিচিত হয়ে থাকে। অবশ্য পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 'বলাকা' কাব্যের সব কবিতাই সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আসছে, কখন বা কবিতার প্রথম চরণটির দ্বারাও পরিচিত হয়ে থাকে। তবে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য : " 'বলাকা'র ভিন্ন ভিন্ন কবিতাগুলির আমি কোন নাম দিতে চাই না। বলাকার অখণ্ড পংক্তিই মনোহর। তার মধ্যে বিশেষ একটি পংক্তিকে বিযুক্ত করে দেখানো চলে না।" প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখযোগ্য, কবিতার প্রথম পংক্তি—'তুমি কি কেবল ছবি'।

'ছবি' কবিতাটি রচনার সঙ্গে কবির অপর একটি ভাবাবেগের প্রসঙ্গও জড়িত রয়েছে। যেদিন তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন, ঐ দিনই কবি একটি গান ও একটি সনেট রচনা করে তাঁর 'গীতালি' কাব্যটি সমাপ্ত করেন। বিষয়টির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত লক্ষ্য করে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : "বহুকাল কবি সুরের রাজ্যে বাস করিয়াছেন, যথার্থ ছন্দোময় কাব্যের মধ্যে আপনার চিত্তকে ও কল্পনাকে অবাধ বিচরণের

অবসর দিতে পারেন নাই। সুরের মধ্যে, ছন্দের মধ্যে, রূপের মধ্যে, রূপকের মধ্যে আপনার ভাবনা-রাশিকে মুক্তি দিতে না পারিলে কবির সাহিত্যিক চিত্ত যেন তৃপ্ত হয় না। তাই এতদিন পর ছন্দের মধ্যে আপনার আনন্দ মূর্তি লইল।"

কবির প্রথম জীবনের কাব্যরচনার প্রেরণাস্বরূপ নতুন বৌঠান কাদম্বরীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ বছর বয়সে। ১৮৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল এই মৃত্যুশোকের অব্যবহিত পরে তিনি 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে কিছু গদ্য রচনা লিখেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে এলাহাবাদে তিনি তাঁর প্রয়াতা এক প্রিয়জনের ছবি দেখতে পান। সে ছবি কারও মতে তাঁর প্রয়াতা স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর, কারও মতে কাদম্বরী দেবীর। এই ছবি দেখে 'বলাকা'র 'ছবি' কবিতা তিনি লেখেন। তবে কবি নিজে বলেছেন, 'ছবি' কবিতা রচনার নেপথ্যে কাদম্বরী দেবীর ছবিই ছিল। 'পুষ্পাঞ্জলি'র 'প্রভাতে' 'বলাকা'র 'ছবি' এবং 'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'—এই তিন সৃষ্টির পশ্চাতে কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি কাজ করেছে। এই তিনটির মধ্যে শুধু বাইরের মিলন নেই, মিল আছে এদের ভেতরকার চিত্রকল্পেও।

প্রভাতের আলো, রজনীর অন্ধকার আর সেই আলোয় অন্ধকারে সাদা কালো এক পথ—এই তিনটিকে বলতে পারি 'ছবি' কবিতার মূল চিত্রকল্প। এই পথ ধরেই মহাকাশের নীড়ের সন্ধানে চলেছে গ্রহ-তারা-নক্ষত্র, এরা সব 'আলো হাতে আঁধারের যাত্রী'। এরা আলোকপুঞ্জ কিন্তু চলেছে মহাকাশের অন্ধকারে। যে-পথে এরা চলেছে, সে-পথেই পৃথিবীতে ঋতুর পর ঋতু চলছে। সেই পথেই মানুষও চলছে তার সমস্ত যাত্রায় যুগে যুগে। সে-যাত্রায় তিনি একদিন ছিলেন দিনের আলোয় কবির সহ-যাত্রিণী, তাঁর পথ চলা আজ থেমে গেছে, আলোর পথে চলতে চলতে রজনীর আড়ালে মৃত্যুর অন্ধকারে তিনি আজ থমকে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পথ চলা আজ থেমেছে। তাই তিনি আজ ছবির মধ্যে স্থির, নিশ্চল, গতিহীন।

কিন্তু কবিতার শেষার্ধে কবির মনে হয়, এ সত্য নয়। কেননা যাকে তাঁর মনে হয়েছিল ছবিতে নিশ্চল, কবির নিয়ত সচল জীবন থেকে দূরবর্তিনী, স্থিরতার চিরঅন্তঃপুরে বন্দিনী; এখন তাঁর মনে হচ্ছে—তিনি তাঁর সমগ্র চেতনায় মিশে আছেন, তাঁকে পথের প্রেমে নিত্য সচল রেখেছেন। মৃত্যুর অন্ধকারে লীন হয়েও তাঁর মর্মে তিনি ঠাঁই নিয়েছেন। যখন তিনি তাঁকে ভুলে থাকেন, তখনও তাঁর মগ্নচৈতন্যের গভীরে তিনি নিঃশব্দে বিরাজ করেন। তাঁকে ভুলে থাকা সত্যিকারের ভোলা নয়, বিস্মৃতির মর্মের মধ্যে তিনি রক্তে ঢেউ তোলেন। আমরা শুধু স্মৃতির মূল্যই বুঝি। কিন্তু বিস্মৃতির গভীরে স্মৃতির যে নিঃশব্দ প্রবাহ চলছে তার মূল্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সেদিনকার শোকের আগুন আজ তার দাহমুক্ত হয়ে শান্তির স্নিগ্ধ আলোয় কবির চোখ ভরে দিয়েছে। সেই আলোয় তিনি তাকিয়ে দেখেন—প্রকৃতির শ্যামলে সেই মহীয়সী নারী শ্যামল, প্রকৃতির নীলে তিনি আজ নীল। মৃত্যু-শোকের আঘাতে একদিন কবি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বের সঙ্গে আজ কবির বিরোধ ঘুচে গেছে, সমগ্রের সঙ্গে তিনি অন্তরের নিবিড় যোগ অনুভব করছেন। এভাবেই কবির পথ চলাতেই সেই মৃত প্রিয়জনের অলক্ষ্য পথ চলা চলছে।

'ছবি' ও 'শাজাহান' দুটি কবিতার শিল্পরূপের একটি সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। 'ছবি'র প্রথম চারটি স্তবক জুড়ে যা বলা হয়েছে, তা এককথায় 'তুমি ছবি,

তুমি শুধু ছবি।' কিন্তু তারপরই পঞ্চম স্তবক আরম্ভ হচ্ছে : 'কী প্রলাপ কহে কবি!/তুমি ছবি?/ নহে নহে, নও শুধু ছবি।' 'শাজাহান' কবিতারও প্রথম চার স্তবকে তাজমহল চলেছে শাজাহানের দূত হয়ে মৃত্যুলোকে লীনা মমতাজের উদ্দেশ্যে এই বার্তা নিয়ে : 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।' কিন্তু তারপরই পঞ্চম স্তবকের আরম্ভে শুনি : 'মিথ্যা কথা— কে বলে যে ভোলা নাই?/কে বলে রে খোল' নাই/স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার?' কবিতা দুটির আরম্ভে যা বলা হয়েছে, তা নস্যাৎ করে বিপরীত সত্য পরে উদ্ভাসিত হলো। নেতির আশ্রয় নিয়ে বিস্মৃতির ইতিবাচক মূল্য স্বীকৃতি এই দুই কবিতারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শুধু শিল্পরূপের সাদৃশ্য নয়, রচনাগত মিল নয়, পূর্বার্ধে প্রতিষ্ঠিত সত্য অস্বীকার করে উত্তরার্ধে ভিন্ন সত্যের উচ্চারণ নয়, এই দুই কবিতার ভাবগত সাদৃশ্যও আমাদের ভাবায়। ছবি যদি শুধু ছবিই হয়, রেখার বন্ধনে শোকের ক্রন্দন যদি নীরব হয়ে থাকে ছবিতে, তাহলে স্মৃতির মধ্যে মুখ থুবড়ে জীবন নিশ্চল হয়ে পড়তো! কিন্তু যে-জীবনভাবনা কবিকে আজ উতলা করেছে, সেখানে স্মৃতির স্থবিরতার চেয়ে বিস্মৃতির জঙ্গমতাই বন্দনীয় হয়ে উঠেছে। বিস্মৃতির গভীরে স্মৃতির নিঃশব্দ প্রক্রিয়া আজ কবির আগ্রহ জাগিয়েছে। এই ভাবনাই অন্যভাবে 'শাজাহান' কবিতায় রূপ পেলো। শাজাহান একদিন ভেবেছিলেন, স্মরণের আবরণে মমতাজের মরণকে তিনি যত্ন করে ঢেকে রাখবেন, তাঁর প্রশান্ত পাষাণপুঞ্জেও গড়া তাজমহলে মৃত্যু শোককে তিনি চিরস্থায়ী করে রাখবেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? আমরা যতোই শোক নিয়ে গর্ব করি না কেন যে শোককে চিরদিন বুকের মধ্যে পুষে রাখবো, কিন্তু আমাদের সমস্ত গর্ব টুটে যায়। সর্বসন্তাপহর সময়ের সচলতায় আমরা শোকবিধুরতা কাটিয়ে এমনই সঞ্জীবিত হয়ে উঠি যে শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতির জয় ঘটে। বিস্মৃতির গভীরে প্রেমের স্মৃতি আমাদের 'চলিতে চালাতে' শেখায়। এভাবে এই দুটি কবিতারই স্মৃতিকে---আত্মসাৎ-করা বিস্মৃতির জয়ধ্বনি আমরা শুনি।

'প্রভাতে' রচনার সন্ধ্যা ও প্রভাত, রাত্রি ও দিন, বিস্মৃতি ও স্মৃতি, মৃত্যু ও জীবনের মধ্যেকার বৈপরীত্য তাঁকে পীড়া দিয়েছে। কোনও ক্রমেই এই দুইকে মেলানো যায় না বলে তিনি দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু 'ছবি'তে এসে এ দুয়ের অন্তর্লীন অলক্ষ্য সামঞ্জস্য বোধে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখানে বৈপরীত্যের বেদনা দূর হয়েছে। এখানে বেদনার তাপ নেই, আছে সেই তাপ থেকে জ্বলে ওঠা আলো। এ যেন প্রযুক্তিবিদ্যার কৌশলে তাপশক্তির আলোক-শক্তিতে রূপান্তর। এ যেন তাপবিদ্যুৎ জ্বালানো। 'বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি কেবল মাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই না কেন'— 'প্রভাতে'র এই উপলব্ধিতে তাঁর স্বদেশ মনে হয়েছিল মৃত্যুলোক। বিস্মৃতির সুখলীন মৃত্যুলোক থেকেই এসে আমরা স্মৃতিতে আলোকিত জন্মের বন্ধনীতে বাঁধা পড়েছি দুদিনের জন্য। তাহলে আমরা মৃত্যুলোকেই ফিরে যাই না কেন? কিন্তু 'ছবি'তে স্মৃতি বিস্মৃতির এই দ্বন্দ্ব ঘুচে গেছে : 'ভুলে থাকা নয়, সে তো ভোলা/বিস্মৃতির মর্মমাঝে রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা'। মৃত্যুতে হারানো প্রিয়জনের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন নেই, আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যেই হারানো প্রিয়জনকে ফিরে পেতে পারি। সে পাওয়া স্মৃতির দাহে নিজেকে পুড়িয়ে নয়, স্মৃতির তাপকে বিস্মৃতির আলোতে রূপান্তর করেই সম্ভব। কিন্তু এসব ভাবনা 'প্রভাতে' গদ্যে রচনায় ছিল না, রূপ পেয়েছে 'ছবি' কবিতায়।

'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'—গদ্য-কবিতা এমনই এক উর্ধ্বলোকে পৌঁছে গেছে যে জন্ম ও মৃত্যু, স্মৃতি ও বিস্মৃতি—এসব বিপরীত ভাবযুগ্ম ভুলে গেলেও আমরা যে যার ইচ্ছামত এ কবিতায় সাড়া দিতে পারি। সন্ধ্যায় যাত্রাবসান ও প্রভাতে যাত্রারম্ভ, সন্ধ্যার পূরবী ও প্রভাতের বিভাস—দুয়ের বৈপরীত্য, ঘোচানোর ইচ্ছায় সারাটি কবিতা এভাবে দুলে উঠেছে যে এখানে 'পুষ্পাঞ্জলি' ধৃত এর আদি রূপ—'প্রভাতে'র মৃত্যুর অনুষঙ্গ ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই, 'প্রভাতে'র মতো কাব্যধর্মী গদ্যে পড়ি ঃ

"সূর্যদেব তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? এদিকে তুমি জুঁইগুলি ফুটাইলে, কোন্‌খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে, প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল-লাবণ্যে গাছগুলির উপর পড়িয়াছে। এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিলে, সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে।"

'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে' এসে অমোঘ একেকটি চিত্রকলেপ তা গদ্যকবিতা হয়ে উঠলো ঃ

"এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হল। অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।.....জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যার জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রের গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা।"

অন্ধকারে কেঁপে ওঠা রজনীগন্ধার সঙ্গে বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর উপমায় যে-চিত্রকল্প রজনীগন্ধার মতোই এখানে ফুটে উঠেছে তাতে পাঠকচিত্ত শুধু তার নীরব সৌরভে ভরে যায়। তাতে অর্থের স্পষ্টতা আসে নি, বরং স্পষ্ট গদ্যের অর্থ নববধূর মতোই অবগুণ্ঠিত হলো, আমাদের মন স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে লীন হলো এবং এভাবেই 'পুষ্পাঞ্জলি'র কাব্যধর্মীগদ্য কবিতা হয়ে উঠেছে, এ শুধু 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে'র বেলায় সত্য নয়, 'লিপকা'র 'সতেরো বছর', 'প্রথম শোক', 'বাঁশি', 'কৃতঘ্নশোক'—এই সবগুলি গদ্যকবিতা সম্পর্কেই সত্য।

'পুষ্পাঞ্জলি'র মতোই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'কোথায়', 'শান্তি,' 'পাষাণী'—এসব কবিতায় কবির ঘোলাটে আবেগ থিতিয়ে স্বচ্ছ হতে পারে নি। পঙ্কিল আবেগ পরিস্রুত হয় সময় ও মনের পাতনযন্ত্রে। তখন পর্যন্ত মনের পাতনযন্ত্র বসানোই হয় নি। আর সময়ের ব্যবধানও আসে নি। তাই শান্তি'তে দুয়েকটি এমন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে যায় যাদের ঠাঁই হতে পারে না কবিতার নৈর্ব্যক্তিক সাধারণীকৃত জগতে। কবিরা ব্যক্তিগত আবেগ কবিতায় প্রকাশ করলেও এভাবে তা প্রকাশ করেন যাতে তা সকলের হয়ে ওঠে। 'শান্তি' কবিতা পড়ে মনে হয়, কাদম্বরী দেবী ঠাকুরবাড়িতে দুঃখ পেয়ে গেছেন। 'একটি ছেলের কোলে নিয়ে বলেছিল সোহাগের ভাষা।'—এমন পঙ্‌ক্তিতে এসে যায় সেই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ যে তাঁর নিঃসন্তান নতুন বৌঠান তাঁর ননদ স্বর্ণকুমারীর ছোট্ট মেয়ে উর্মিলাকে মাতৃস্নেহে লালনপালন করতেন। 'কোথায়' কবিতার পঞ্চম স্তবকে পড়ি ঃ 'দেখো, এই ফুটিয়াছে ফুল/বসন্তেরে করিছে আকুল;/পুরনো সুখের স্মৃতি বাতাসে আনিছে নিতি।' 'পুষ্পাঞ্জলি'তেও এসব প্রসঙ্গ ছিল যে কাদম্বরী দেবী যে-গাছ পুঁতেছিলেন, তাতে আজও ফুল ফোটে, গন্ধ ছড়ায়; কিন্তু তিনি আজ এখান থেকে বহুদূরে মৃত্যুর

অগমতীরে, সেই ফুল শুধুই তাঁর স্মৃতি জাগায়। এই একই প্রসঙ্গ পুষ্পাঞ্জলি'র 'কোথায়' কবিতার ব্যক্তিগত গণ্ডি ছাড়িয়ে শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠা পঞ্চান্ন বছর পরে জ্যোতিদাদা আর নতুন বৌঠানের সঙ্গে দিনযাপনের স্মৃতি-জাগানিয়া চন্দননগরের গঙ্গাতটে লেখা 'বীথিকা'র অন্তর্ভুক্ত 'বাদলরাত্রি' গানটিতে ঃ

"ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা
আমার ভবনদ্বারে
রোপণ করিলে যারে
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে মালতী বিকশিতা
ওগো সে কি তুমি জান।"

ব্যক্তিগত শোকের আঘাত থেকে বহুদূরে এসে তিনি অনুভব করতে পেরেছেন, একদিকে ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ, সুখ-আনন্দ, অন্যদিকে বিশ্বশিল্প—এ দুয়ের মধ্যে ঐক্য আছে, যেমন তিনি লিখেছেন ঃ

"সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে।"

নাট্যশেষ ঃ 'বীথিকা'।

'কড়ি ও কোমল', 'পুষ্পাঞ্জলি'তে ব্যক্তি হৃদয়ের বেদনার অজন্তাগুহার অন্ধকার ভিত্তিপটে ছবি ফুঠে ওঠে নি বলেই বিশ্বশিল্পের সঙ্গে ঐক্য ধরা পড়ে নি। সে-ছবি ফুটেছে এবং সে-ঐক্যও ধরা পড়েছে 'বলাকা'র 'ছবি'তে, 'লিপিকা'য় ও 'বীথিকা'য়। এ ছবির গদ্যে আভাস ছিল 'জীবনস্মৃতি'র 'মৃত্যুশোক' পরিচ্ছেদে। এত কথা বলার জন্যই 'ছবি' কবিতার আগে তার পেছনে আমাদের আলোচনা ছড়াতে হয়েছে।

এখন আবার শুধু 'ছবি' কবিতার আলোচনাতেই চলে যাই। 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা'র দীর্ঘকাল পরে এখানে কবি মুক্তকছন্দে কবিতা লিখলেন, ভাষায় নিয়ে এলেন এক সাবলীল গতি। প্রথম চারটি স্তবকে স্থির নিশ্চল ছবির বৈপরীত্যে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুর চলিষ্ণুতার কথা বলা হলো। প্রথমেই কবির ঊর্ধ্বলোকচারী দৃষ্টি পৌঁছালো নীহারিকায় সৌরজগতের বাইরে। সেখানে সেই সুদূরলোকে নক্ষত্রপুঞ্জ অনেকক্ষেত্রে সুস্পষ্ট রূপ পায় নি। আছে মারুত অবস্থায়। এরা মহাকাশের নীড়ে ভিড় করে আছে। এরা নিয়ত-চঞ্চল, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে গতিময়। আকাশের গ্রহতারা রবি আলো হাতে চলেছে, যদিও এরা আঁধারের যাত্রী। গ্রহ তারা রবি সব জ্যোতিঃপুঞ্জ, তাই হাতে আলো এমন কল্পনার সার্থকতা। আলো হাতে মহাকাশের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এদের অনন্ত পথ চলা। এই গতিমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মতো ছবি কি সত্য নয়? এই প্রশ্নে কবিতার আরম্ভ।

তাহলে এই চিরচঞ্চলতার মধ্যে 'ছবি' কেন স্থিরতার চির অন্তঃপুরে বন্দী? সবাই যখন পথিক, তখন কেন পথহীন ছবির এই স্বেচ্ছাবৃত বন্দিত্ব? এইসব প্রশ্নের পর ঊর্ধ্বাকাশ থেকে, মহাজাগতিক কল্পনা থেকে ঋতুপর্যায়ে আবর্তিত পৃথিবীতে কবির দৃষ্টি নেমে এলো। বৈশাখে পৃথিবী শুষ্ক রুক্ষ নীরস বৈধব্যে শুভ্র। বিধবার এই সাজসজ্জা খুলে বাতাসে ওড়া ধূলি পৃথিবীকে তপস্বিনীর রূপে সাজায়, গেরুয়ায় রাঙা বাস পৃথিবীকে পবিয়ে দেয়। তখন

তপস্যায় শুচিস্মিত রূপ উঠে পৃথিবীর গ্রীষ্মের খররৌদ্রে। পৃথিবীর এই তপস্যাপূত রূপ অনেককাল আগে 'কল্পনা'র 'বৈশাখ' কবিতায় ছিল। তবে সেখানে এখানকার মতো পৃথিবীকে তপস্বিনী না বলে বৈশাখকেই কবি বলেছিলেন তপস্বী ঃ 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।/ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল/তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল/করে দাও ডাক/হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।' বৈশাখ কবির কল্পনায় হয়ে উঠেছে তপস্বী শিব। আর এখানে পৃথিবী তপস্বিনী। গ্রীষ্মে যেমন বর্ষারম্ভ, বসন্তে তেমনি বর্ষশেষ। কবি দ্রুত চলে এলেন আরম্ভ থেকে শেষে বসন্তের মিলন-উষায়! বসন্ত যৌবনের ঋতু, প্রেমের ঋতু। বসন্ত তার কচি পাতায় পাতায় পৃথিবীকে সাজিয়ে দেয়, অঙ্গে যেন পত্রলিখা লিখে দেয়। ঋতু পর্যায়ে ধূলিরও একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। ধূলিই বিধবা থেকে তপস্বিনী সাজায় এই পৃথিবীকে। এমন যে-তৃণ, যে শুধু চরণশীল, পদদলিত হওয়ার জন্যই জন্মেছে, সে-তৃণও অস্থির চঞ্চল। এই ধূলি তৃণের মতো উপেক্ষিত অবজ্ঞাতরাও তাদের নব নব রূপে ও রূপসৃষ্টিতে সত্য। তার মধ্যে শুধু ছবিই স্থির। প্রথম স্তবকে কোথায় কবির কল্পনা ছিল নভোবিহারী, আর এখানে দ্বিতীয় স্তবকে কোথায় কবির কল্পনা নেমে এসেছে পৃথিবীর ধুলোয় আর ঘাসে! এমনই কবি কল্পনার ত্বরিত গতি।

তৃতীয় স্তবকে আর বৈপরীত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ছবির নিশ্চলতার কথা নয়; এ ছবি যে-প্রিয়জনের, তাঁর কথা এখানে কবি বলছেন। সে প্রিয়জন একদিন কবির সহযাত্রিণী ছিলেন, একই পথের পথিক ছিলেন। সেদিন তাঁর নিশ্বাসস্ফুরিত বক্ষের স্পন্দন ছিল। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ ছন্দোময় হয়ে উঠতো। তাঁর নাচে গানে বিশ্বের ছন্দ স্পন্দিত হতো। কিন্তু 'সে যে আজ হল কত কাল'। তাঁর সমস্ত সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা নিয়ে তিনি সেদিন কবির জীবনেও ভুবনে সত্য ছিলেন। পৃথিবী সেদিন কবির চোখে সুন্দর হয়ে উঠেছিল, সে শুধু তাঁরই গুণে। কেননা তিনিই কবির চোখে রূপের তুলি দিয়ে রসের মূর্তি এঁকেছিলেন। তাঁর দেখার আলোয় কবি পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলেন বলেই পৃথিবী এমন সুন্দর রূপে ধরা দিয়েছিল। জীর্ণতা ঘুচে গিয়ে পৃথিবীর অফুরান বিস্ময়কম্পিত রসমূর্তি কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল। কবির প্রথম জীবনের বাণীর সাধনায়—সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টিতে সে-নারীই ছিলেন 'এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী'। বাণী তাঁর মধ্যেই মূর্তি নিয়েছিল। এভাবে বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাস্বরূপা কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে এ কবিতায় কবির বিনম্র স্বীকৃতি শুনি।

চতুর্থ স্তবকে সেই প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা পরোক্ষে আভাসিত হয়েছে। এক সঙ্গে তাঁরা পথ চলছিলেন। রজনীর আড়ালেতে মৃত্যুর অন্ধকারে সেই সহযাত্রিণী পথ থেকে নেমে থেমে দাঁড়ালেন। তারপরও কবির পথ চলা চলছে। সুখে-দুঃখে রাত্রি-দিন তিনি সম্মুখে চলছেন। তার মধ্যে আকাশ সমুদ্রে চলছে আলোর জোয়ার আর অন্ধকারের ভাঁটা, চলছে দিন-রাত্রির আবর্তন, আনন্দবেদনার অন্তহীন পর্যায়। জীবনপথের দু'ধারে রঙবেরঙের ফুল ফুটছে, আবার ঝরেও পড়ছে। কেউ স্থির হয়ে নেই। মরণের কিঙ্কিণী বাজিয়ে সহস্রধারায় জীবন-নির্ঝরিণী ছুটে চলছে। প্রতি মুহূর্তের ধ্বংস ভাঙা ও মৃত্যুই জীবনের গতি অবধারিত করে রেখেছে। ভাঙা ছাড়া কি গড়া সম্ভব ছিল? ধ্বংস ছাড়া কি সৃষ্টি সম্ভব ছিল? বা মৃত্যু ছাড়া জীবন? মৃত্যুই তার কিঙ্কিণী বাজিয়ে জীবনের ধারাকে কলধ্বনিত করেছে। মৃত্যুহীন

জীবনের কথা ভাবাই যায় না। 'বলাকা'রই 'চঞ্চলা' কবিতার ভাষায় মৃত্যুহীন সে-জীবন 'পঙ্গু' মূক কবন্ধ বধির আঁধা। স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা।' কবিকে সম্মুখের অজানা পথ ডেকেছে। তাই অতীতের পিছুটান কাটিয়ে তিনি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়েছেন, পথের প্রেমে মেতেছেন। প্রতি পদে পদে বন্ধন ছিন্ন করতে করতেই তাঁর এই নিরন্তর চলা। পথপার্শ্বের সৌন্দর্যে তাঁর পথ চলা নিবৃত্ত হয় নি। কিন্তু যাঁর ছবি দেখে কবিতা লেখা, তিনি পথ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে চিরদিনেব জন্য থেমে আছেন। এই স্তবকের শেষে আবার আগে যে-চিরচঞ্চল তৃণ, ধূলি, তারা, সূর্য, চন্দ্রের কথা বলেছেন, এদের কথা উল্লেখ করে বলছেন—'সবার আড়ালে/তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।'

পঞ্চম স্তবকে কবিতা চলতে চলতে এক নতুন দিকে বাঁক নিল নতুনই বা বলি কেন? হয়তো তা-ই ছিল কবির উদ্দিষ্ট। এতো করে যে তিনি বলছিলেন—ছবি স্থির, তা নস্যাৎ করার জন্যই হয়তো বা একথা এভাবে তিনি বলছিলেন। তা অস্বীকার করে এখানে আরম্ভেই বললেন 'কী প্রলাপ কহে কবি তুমি ছবি?/নহে, নহে, নও শুধু ছবি?'—রেখার বন্ধনে নিস্তব্ধ ক্রন্দনে ছবি স্থির হয়ে নেই। স্থির রেখার বন্ধনে ছবিতে প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে কান্না স্তব্ধ হয় নি। যদি স্তব্ধই হতো, তাহলে পৃথিবীর নিত্যপরিবর্তমান রূপপরম্পরা হারিয়ে যেতো। মৃত্যুর শোকে আকুল মানুষ তরঙ্গ বেগে উচ্ছ্বাস নদী দেখতে পায় না, মেঘে মেঘে উদয় বা অস্ত সূর্যের সোনালি আভা তার চোখে পড়ে না। কেন না তখন যে শোকের অন্ধকার গুহায় তার চেতনা লীন, বাইরে তার দৃষ্টি রুদ্ধ। কিন্তু কবির মৃত প্রিয়জনের চিকন চুলের ছায়া পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যায় নি। চেতনাও শোকের গুহায় লীন হয় নি। তার প্রমাণ এখনও তরঙ্গবেগে চলিষ্ণু নদী চোখে পড়ে। মেঘের স্বর্ণাভা চোখ জুড়িয়ে দেয়, দক্ষিণের বাতাসে চঞ্চল মর্মর মুখের মাধবীবনের ছায়া স্বপ্নের মতো মিথ্যা হয়ে যায় নি। কবি তাঁর মৃত প্রিয়জনকে আপাতবিচারে ভুলে গেলেও সত্যি ভোলেন নি। কেননা তিনি তাঁব অস্তিত্বের মর্মমূলে বাসা নিয়েছেন। স্মৃতিকে আত্মসাৎ করা বিস্মৃতির মধ্যে তিনি আছেন। তাই তার চিকন চিকুরের ছায়া বিশ্ব থেকে মিলিয়ে যায় নি। মাধবী বনের ছায়ায় সে চুলের ছায়াই তিনি দেখতে পান। পৃথিবীর রূপ যে এখনও তাঁর চোখে ধরা দেয়—এই রহস্যের মূলে আছে তাঁর সমগ্র সত্তাব্যাপী সেই প্রিয়জনের নিঃশব্দ অস্তিত্ব। আনমনা হয়ে যখন আমরা পথ চলি, তখন পথের পাশের ফুল বা আকাশের তারার সৌন্দর্য আমাদেব মনে থাকে না—এ কথা ঠিক। তবে আবার একথাও ঠিক, আমাদের ভুলের শূন্যতা ভরে ওঠে সে-সব ফুল আর তারার সুরে এবং তাতেই প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ু সুমধুর হয়ে ওঠে। নইলে যে জীবন রিক্ত হয়ে যেতো। নিঃশ্বাস বায়ু নেওয়া আর ছাড়া শুধুই দেহ যন্ত্রের একটি কর্ম হতো। তা হয় না বলেই জীবন এমন পূর্ণ, এমনকি সৌন্দর্য-বিস্মৃত মুহূর্তেও। এই ফুল আর তারার কথা থেকে কবির কণ্ঠে সেই দ্বিধাহীন উচ্চারণ শোনা গেল :

"ভুলে থাকা, নয় সে তো ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা।"

আপাত বিচারে বলা যায়, মৃত প্রিয়জনকে তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু গভীর বিচারে বিস্মৃতির মধ্যেও স্মৃতির রেশ বেজে চলছে। সেই রেশ রক্তে ঢেউ তুলছে। দেহেব প্রতিটি স্নায়ু তন্ত্রী তাতে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। চোখের সম্মুখ থেকে তিনি আড়াল হয়েছেন বলেই চোখের

মাঝখানে তিনি ঠাঁই নিয়েছেন, কবির মর্মে তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। পৃথিবীর যেখানে যা-কিছু শ্যামল যা-কিছু নীল, যা কিছু সুন্দর গভীর নিঃসীম আর সুদূরের আভায় মণ্ডিত সে অরণ্যই হোক আর আকাশ সমুদ্র পর্বত যা-ই হোক, সবই অন্তরের মিল খুঁজে পেয়েছে সেই মৃত প্রিয়জনের মধ্যে। বিশ্ব-শিল্পের ছন্দ আর প্রিয়জনের ছন্দ একসঙ্গে মিশে আছে। এই দুই ছন্দের মিল না হলে ছন্দের পতন অনিবার্য ছিল। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, কবি তাঁর মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করছেন। আকাশের নীলিমা বন্যায় তাঁর লাবণ্য উচ্ছ্রিত। শ্যামল তরু-রাজিতে তাঁরই রূপ পল্লবিত। তাঁরই কণ্ঠের সুর বাজে কবির গানে, কবির অন্তরে তিনি কবি। জীবনের কোন্ প্রাতে তিনি তাঁকে পেয়েছিলেন, আবার বিচ্ছেদের রাত্রে তাঁকে হারিয়ে ছিলেন। তারপর ফিরে ফিরে তাঁকে চেতনার গভীরে তিনি পেয়েছেন। হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে এই অন্তহীন ফিরে পাওয়ায় মৃত্যুর বিচ্ছেদ পেরিয়ে সেই নারী ছবির নিশ্চলতা থেকে মুক্তি পেয়ে কবির জীবনে নিত্য সচল হয়ে আছেন। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির গভীরে তিনি আছেন বলেই তাঁকে তিনি বলেছেন ঃ 'কবির অন্তরে তুমি কবি।' এমনভাবে যিনি কবির জীবনে ও সৃষ্টিতে আছেন, তিনি কখনোই শুধু ছবি হতে পারেন না। কবিতার সমস্ত পঞ্চম স্তবক জুড়ে এই মহীয়সী নারীর নিত্য সচল রূপ চিত্রিত হয়েছে, আর বলা হয়েছে যে তিনি শুধু স্থির ছবি নন, পৃথিবী ও মহাকাশের জঙ্গম সব কিছুর মতো তিনিও সচল, চঞ্চল ও গতিবেগে নিত্য-স্পন্দিত।

॥ দুই ॥

কবিতার আলোচনা

'বলাকা'র ৬ সংখ্যক কবিতা 'ছবি'কে যে 'বলাকা' কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা কেবল সমকালে রচিত কবিতাগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ করা নয়, বলাকায় যে, বিশেষ কবি ধর্ম আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে, তারই ভিন্নজাতীয় প্রকাশ ঘটেছে 'ছবি' কবিতাটিতেও। এই ভাবগত ঐক্যের কারণেই 'ছবি' কবিতাকে 'বলাকা'য় স্থান দেওয়া হয়েছে। অতএব একান্ত প্রাসঙ্গিক কারণেই 'ছবি' কবিতাটির বিচারকালে 'বলাকা'র কাব্যধর্ম প্রসঙ্গ অনিবার্য।

'বলাকা'কে 'যৌবনের কাব্য', 'বিদ্রোহের কাব্য' প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করা হলেও এর প্রধান পরিচয় যে এটি 'গতিরাগের কাব্য'। রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম ও তৎপ্রসঙ্গে 'বলাকা' বিষয়ে আলোচনায় মনীষী-অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বলেন ঃ "বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহের ইতিহাস নিরন্তর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায়ে যাত্রার ইতিহাস অতৃপ্তির চিরগতিই তাঁহার চিরকাম্য, নব নব চৈতন্যে উদ্বোধিত চিত্তই তিনি প্রার্থনা করেন। চিরযৌবনই তাঁহার পূজা লাভ করিয়াছে জীবনের সকল অবস্থায়; এবং যৌবনের ধর্মই গতিচঞ্চল প্রাণাবেগ।...এই গতিতত্ত্ব কবি চিত্তকে অধিকার করিল এবং ক্রমশ কবিকে মুগ্ধ করিয়া অন্তরে এক নূতন অনাস্বাদিত-পূর্ব রহস্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিল। কবি চিত্তে যখন কোনও তত্ত্ব বা সত্য অনুভূতির স্তরে আসিয়া পৌঁছায় তখন তাহা কোন নির্দিষ্ট রূপের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তত্ত্ব কবির মায়াকাঠির স্পর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপবস্তু হইয়া উঠে। বলাকায় এই গতিতত্ত্বই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, কখনও আপাতদৃষ্ট জড়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া

(যেমন, 'ছবি' অথবা 'তাজমহল' কবিতায়), কখনও চঞ্চল গতিময় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া (যেমন, 'চঞ্চলা' অথবা 'বলাকা' কবিতায়)।"

'ছবি' (৬ নং) কবিতা হতেই 'বলাকা'র মূল সুরটির সূত্রপাত। একটি ছবির রূপবস্তুকে আশ্রয় করে কবি গতিতত্ত্বের চিন্তাতত্ত্বটিকে উপভোগ করেছেন। এই গতিতত্ত্বের সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই; সত্যে তিনি আগেই পৌঁছেছেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি যে চিন্তাধারা অবলম্বন করে লাভ করেছেন, সেই চিন্তাধারাটিকে রূপাভিব্যক্তি দান করেছেন এই কবিতায়।

মনীষী-অধ্যাপকের প্রাগুক্ত মন্তব্য থেকেই এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, একদিকে 'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা যেমন সুস্পষ্টভাবে মোড় ফিরেছিল, কাব্যে গতিবাদের তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছিল, তেমনি 'বলাকা'র অন্তর্ভুক্ত 'ছবি' কবিতাটিতে গতিতত্ত্ব পরম সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এতকাল কবি জীবিত এবং চলন্ত বস্তুর মধ্যেই গতিকে অনুভব করেছিলেন, কিন্তু 'ছবি'তে এসে স্থিরচিত্রের মধ্যেও গতিকে উপলব্ধি করায় তা একেবারে বিশ্বচেতনার সঙ্গে একীভূত হয়ে ওঠার অবকাশ পায়। যা কবির 'নয়নের মাঝখানে ঠাঁই' পেয়েছিল, তাই হয়ে উঠলো 'নীলিমায় নীল', যার ফলে কবি অনুভব করেন, 'আমার নিখিল/তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।'—বস্তুতঃ এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের কোন নতুন প্রাপ্তি নয়, তাঁর চেতনায় বিশ্বাত্মবোধ ছিল চিরভাস্বর—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মধ্য দিয়ে তার শুরু, এখানে তার স্পষ্টতম প্রকাশ।

'ছবি' কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই ঃ কবি কোন এক আত্মীয় গৃহে তাঁর পরলোকগতা পত্নীর একখানি স্থিরচিত্র দেখতে পেয়ে স্মৃতিরোমন্থনে ব্যাপৃত হয়েছেন। একযোগে তাঁরা সংসার যাত্রা পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন; বিশ্বছন্দের সঙ্গে সমতালে তাঁদের চলার পথ নব নব ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। পত্নীকে অবলম্বন করে কবির অনেক মধুর স্মৃতি তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেল করে তুলেছে। সেই মধুরিমার মধ্য দিয়েই কবির বিশ্ব তাঁর নিকট সুন্দর ও রসময় হয়ে ওঠে এবং স্বয়ং তিনিই তো মূর্তিমতী বাণীরূপে বিশ্বের আনন্দবার্তাকে কবির নিকট বয়ে এনেছিলেন। সেই তিনি ছিলেন কবির জীবনে কত সত্য; কিন্তু একদিন তাঁর চলা গেল চিরকালের মতো থেমে, তিনি চলে গেলেন চিত্রপটের আড়ালে, 'স্থিরতার চির অন্তঃপুরে।'

হয়তো পত্নীবিয়োগের পরবর্তী কালের অনুভূতিই এখানে কাব্যের প্রথম অংশে ধরা পড়েছে। কিন্তু বলাকার এই 'গতিরাগে'র যুগে এসে যখন কবি অনুভব করেন 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', স্থিরতার মধ্যেও যখন তিনি গতি-শক্তি অনুভব করেন, তখনই চিত্রার্পিতা পত্নীর মধ্যেও তিনি সচলতা লক্ষ্য করতে পারলেন। স্থিরতা সম্বন্ধেও তাঁর ধারণার পরিবর্তন ঘটলো। কবি অনুভব করলেন, তাঁর পত্নী কখনো রেখার বন্ধনে আবদ্ধ নেই। "প্রত্যক্ষ চেতনার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেও তিনি হৃদয়ের গভীর মগ্নচৈতন্যে অবস্থান করিয়া কবির সমস্ত ভাব, সৌন্দর্য উপভোগ ও কবিত্বশক্তির প্রেরণা জোগাইতেছেন। সুতরাং কবির পত্নী আর অচল ছবি মাত্র নন, তিনি এখন একটা বেগবতী শক্তি।"

এই ৬ নং 'ছবি' কবিতাটির সঙ্গে ৭ নং 'সাজাহান' কবিতাটির ভাবগত ঐক্য বর্তমান

থাকায় একটিকে অপরটির পরিপূরক রূপে গ্রহণ করা চলে।

এই প্রসঙ্গে 'ছবি' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিমতটি অতিশয় সহায়ক বিবেচিত হতে পারে। তিনি বলেন, "ছবি বলতে আমি কি বুঝি সেই কথাটাই খোলসা করে বলতে চাই। মোহের কুয়াশা, অভ্যাসের আবরণে সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে 'আছে' বলে অভ্যর্থনা করে নেবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি। সেই জন্য জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলুম।

ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোড় গলায় বলতে পারে— 'চেয়ে দেখ', তা হলেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেননা যা আছে তাই সৎ, যেখানেই সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি, সেখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।...

তেমনি স্পষ্ট করে যেখানেই আমরা বলতে পারি 'আছে', সেখানেই তার সঙ্গে কেবল আমার ব্যবহারের অগভীর মিল নয়, আত্মার গভীরতর মিল হয়।

আত্মার গভীরতম মিল হয়।...বিশ্বে যেখানেই তেমনি একান্তভাবে 'আছে' এই উপলব্ধি করি, সেখানে আমার সত্তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়। সত্যের ঐক্যকে সেখানে ব্যাপক করে জানি।"

॥ তিন ॥

কবি-কৃত বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক কবিতার প্রসঙ্গ ধরেই অনেক সময় আলোচনা করেছেন। কিন্তু গোটা কবিতাটিরই আবার গদ্যে ব্যাখ্যামূলক পুনর্লিখন করেছেন, এমন ঘটনা খুব বেশি নেই। আমাদের সৌভাগ্য 'ছবি' কথাটির গুরুত্ব বিবেচনাতেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ এটির একটি সহজবোধ্য রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। অতএব কবিতাটির এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর পরিচয় আর হতে পারে না বলেই ১৩২৯ বঙ্গাব্দে চৈত্রমাসে লিখিত 'শান্তিনিকেতন' থেকে অংশটি উদ্ধার করা হলো।

১। ঐ যে আকাশের নক্ষত্র ছায়াপথে একত্র নীড় রচনা করে রয়েছে, ঐ যে গ্রহ উপগ্রহ সূর্য চন্দ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো হাতে তীর্থ যাত্রায় চলেছে, তুমি কি তাদের মতো সত্য নও? আজ কি তুমি কেবল চিত্ররূপে রয়েছ?

২। জগতের যা-কিছু সবই চলার পথে রয়েছে। তুমি কি কেবল চির-চঞ্চলের মাঝখানে শান্ত নির্বিকার হয়ে থাকবে? জগৎ-যাত্রার পথে যে-সব পথিক বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে কি তোমার যোগ নেই? তুমি সকল পথিকের মাঝখানেই আছ, অথচ তাদের থেকে দূরে আছ, তারা চঞ্চলতায় গতি পেয়েছে, তুমি স্তব্ধতায় বদ্ধ।

এই যে ধরণীর ধূলি, এ অতি তুচ্ছ, কিন্তু এও ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল রূপে বাতাসে উড়ছে। এই ধূলিরও কত বিকার, কত পরিবর্তন, কত গতির লীলা। বৈশাখে ফুল ফোটে না, শুকিয়ে ঝরে যায়, যখন ধরণী বিধবার মতো তার আভরণ ত্যাগ করে, তখন সেই তপস্বিনীকে এই ধূলি গৈরিক বস্ত্র পরিয়ে দেয়। আবার যখন বসন্তের মিলনে উষা আসে, তখন সে

ধরণীর গায়ে পত্রলেখা এঁকে দেয়। এই যে তৃণ বিশ্বের পায়ের তলায় আছে, এরা অস্থির, এরাও অঙ্কুরিত বর্ধিত উজ্জ্বল হচ্ছে ও ম্লান হচ্ছে। এদের মধ্যে বিকাশ ও পরিবর্তন আছে বলেই এরা সত্য। তুমিই কেবল ছবি, বরাবর একভাবে স্তব্ধ বদ্ধ স্থির হয়ে আছ।

৩। আজ তুমি ছবিতে আবদ্ধ আছ বটে, কিন্তু তুমিও তো একদিন পথ চলতে। নিঃশ্বাসে তোমার বক্ষ দুলে উঠত। তোমার প্রাণ তোমার চলায়-ফেরায় সুখে-দুঃখে কত নূতন-নূতন ছন্দ রচনা করেছে। বিশ্বের ছন্দে প্রাণের ছন্দ তাল রক্ষা করে লীলায়িত হয়েছে। সে আজ কত দিনের কথা। তখন আমার নিজের জগৎ অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে যে জগৎ বিশেষভাবে আমারই, তাতে তুমি কত গভীর রূপে সত্য ছিলে। এই জগতের সুন্দর জিনিস যা-কিছু আমি ভালোবেসেছি তার মধ্যে তোমার নিজের নামটি তুমি যেন লিখে দিয়েছিলে, সুন্দর প্রিয় সামগ্রীকে তুমিই তোমার ভালোবাসা দিয়ে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিলে। তুমি নিখিলকে রসময় করে তুলেছিলে—তোমার মাধুর্যের তুলিতে বিশ্ব সুন্দর মধুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আনন্দময় বার্তাকে তুমি মূর্তিমতী বাণীরূপে আমার কাছে বহন করে এনেছিল।

৪। আমরা দুজনে একসঙ্গে যাত্রা করে চলেছিলাম। হঠাৎ অনন্ত রাত্রি অর্থাৎ মৃত্যু তোমাকে অন্তরালে নিয়ে গেল। আমি চলতে লাগলাম, তুমি নিশ্চল হয়ে গেলে। দিন ও রাত্রি আমার সুখ-দুঃখ বহন করে নিয়ে চলল, আমার চলা আর থামল না। আকাশে সাগরে আলো অন্ধকারের জোয়ার-ভাঁটার পালা চলেছে। আমি পথ দিয়ে যাত্রা করেছি, সেই পথের দুধারে ফুলের দল চলেছে—কদম-শিউলি-নাগকেশর-করবী, নানা ঋতুতে এদের উৎসবের যাত্রা। আমার দুরন্ত জীবন নির্ঝর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছুটেছে, অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস হতে হতেই তারা প্রাণের পথ কেটে দিচ্ছে। তাই মৃত্যুই কিঙ্কিণী বাজিয়ে জীবনকে শব্দিত করছে, নানাদিকে প্রসারিত ও প্রবাহিত করে দিচ্ছে। আমি জানি না, পরক্ষণে কি ঘটবে, তথাপি অজানা তার বাঁশি বাজিয়ে আমাকে দূর থেকে দূরে ডেকে চলেছে আমাকে ঘর ছাড়া করে নিয়ে চলেছে। আমি প্রতিদিনের চলাকে ভালবাসি বলেই জীবনকে ভালোবাসি, অজানার সুর শুনে চলা আমার ভালো লাগে। তুমি আমার সঙ্গে চলেছিলে, হঠাৎ এক সময়ে একধারে পথ থেকে নেমে গেলে। আমরা ক্রমাগত চলেছি,—আর তুমি হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়ালে, সেইখানেই স্তম্ভিত হয়ে ছবি হয়ে রইলে।

৫। হঠাৎ আমার মনে হলো, এ কী প্রলাপ বকছি! তুমি কি কেবল ছবি? না, না, তুমি তো শুধু ছবি নও! কে বলে তুমি কেবল রেখার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে রয়েছো? তোমার মধ্যে যে সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশিত হয়েছিল ও মূর্তি গ্রহণ করেছিল, তা যদি এখনো না থাকত তবে এই নদীর আনন্দ-বেগ থাকত না। তোমার আনন্দ যে বাণীকে বহন করে এনেছিল তা তো থামে নি। বিশ্বের যে অন্তরের বার্তাকে তুমি এনেছিলে, তা চিরকাল ধরে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। তা যদি না হতো, তবে মেঘের এই স্বর্ণচিহ্ন থাকত না। তোমার চিক্কণ কেশের যে ছায়া, তা বিশ্বের নানা রূপের মধ্যে রয়েছে। তা যদি বিশ্ব থেকে মিলিয়ে যেত তবে সৃষ্টির আনন্দের মধ্যেই ক্ষতি ঘটত, সেই সঙ্গে মাধবী বনের মর্মরায়মান ছায়া লুপ্ত হয়ে স্বপ্নপ্রায় হয়ে যেত।

তুমি আমার সামনে নেই, কিন্তু জীবনের মূলে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আছ, তুমি আর পৃথক হয়ে থাকলে না। তোমাকে আমি যে ভুলেছিলাম, সে ভুল বাইরের। তুমি আমার

জীবনের চৈতন্যলোক থেকে মগ্নচৈতন্যের জীবনে চলে গেছ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আমার অন্তরের গভীর দেশে গেছ। আকাশের তারা রাত্রিকে বেষ্টন করে আছে, আমরা কত সময়ই তাদের কথা সচেতনভাবে ভাবি না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার চলার মধ্যে তাদের দিকে চেয়ে না দেখলেও তাদের সঙ্গীতে ও আনন্দে আমাদের মন অলক্ষ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। তেমনি পথে চল্‌তে চল্‌তে ভাবছি যে ফুলকে ভুলেছি, কারণ সচেতন ভাবে তাকে দেখছি না। কিন্তু আমার যাত্রাপথে সেই ফুল প্রাণের নিঃশ্বাস-বায়ুকে সুমধুর করছে, ভুলের শূন্যতাকে পূর্ণ করছে। আমি ভুলি বটে, তবুও ভুলি না।

আমি তোমাকে বিশেষভাবে মানসচক্ষে দেখছি না বলে যে ভুলে রয়েছি তা নয়। বিস্মৃতির কেন্দ্রস্থলে বসে তুমি আমার রক্তেতে দোল দিয়েছ। তুমি চোখের বাইরে নেই, ভিতরে সঞ্চিত হয়ে আছ। সেই জন্যই আজকের বসুন্ধরার শ্যামলতার মধ্যে তোমার শ্যামলতা, আকাশের নীলিমার মধ্যে তোমার নীলিমা দেখছি। তুমি যে আনন্দ দিয়েছ, বিশ্বের আনন্দের মধ্যে তা মিলিয়ে আছে।

আমি যখন গান গাই, তখন কেউ জানে না যে তোমার সুর তার ভিতরে ধ্বনিত হয়ে উঠছে। তুমি কবির বাইরে ছিলে, কিন্তু অন্তরের যে-কবি সঙ্গীত-কাব্য রচনা করছে, তার প্রেরণা রূপে তুমি আজ মর্মস্থলে রয়েছ—তুমি আজ কবিচিত্ত-বিহারিণী, তুমি কবির অন্তরে কবি হয়ে রইলে, আর বাইবের নিখিলে ব্যাপ্ত হয়ে থাকলে। অতএব তুমি শুধু ছবি মাত্র নও।

তোমাকে একদিন সকালে, অর্থাৎ সচেতন অবস্থায় লাভ করেছিলুম, তারপরে রাত্রি এলো (মৃত্যুরূপে), তুমি অন্তরালে চলে গেলে। রাত্রিতে তোমাকে হারিয়ে ফেলে, রজনীর অন্ধকারের (অর্থাৎ মগ্নচৈতন্যে ও সুপ্তচৈতন্যে) গভীরভাবে তোমাকে আবার ফিরে পেলাম।

—কবি-কৃত কবিতাটির এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কবিতার বিষয়বস্তুটি যেমন সরল ভাষায় বিবৃত হয়েছে, তেমনি রূপকাদি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও কবিতার ভাবার্থকে স্পষ্টীকৃত করেছে। কবিতা রচনাকালীন কবির অনুভূতি এতে ব্যাখ্যাত হওয়াতে এর সহজবোধ্যতা বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

॥ চার ॥

সার-সংক্ষেপ ও বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' ('তুমি কি কেবল ছবি') কবিতাটির বিষয়বস্তু তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বে কবি তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর একটি স্থির চিত্রের দিকে তাকিয়ে তারই প্রেক্ষাপটে বিশ্বের সর্বত্র গতিময় পৃথিবীর চঞ্চলতাকে উপলব্ধি করছেন। দ্বিতীয় পর্বে কবি দুঃখ করে বলছেন যে এই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী স্থির মূর্তিতে চিত্রার্পিতা হলেও একসময় তিনিই কবির জীবনে গতি সঞ্চার করেছিলেন; কিন্তু আজ সবই চলছে, শুধু তিনিই (তাঁর স্ত্রী) গতি হারিয়ে ফেলেছেন। তৃতীয় পর্বে কবির ভুল ভাঙলো; তাঁর মনে হলো, তিনি ভুল ভাবছেন—কারণ তাঁর স্ত্রী তো নিশ্চল হয়ে যান নি। তিনি এখনো কবির মনে গতি সঞ্চার করে যাচ্ছেন। তিনি নয়ন-সম্মুখে না থেকে কবির নয়নের মাঝখানে আশ্রয় নেওয়াতে কবির

দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ঘটে গেছে এবং তারই ফলে আজ তিনি শ্যামলে শ্যামল, নীলিমায় নীল—কবির নিখিল বিশ্ব তাঁর মধ্যেই অন্তরের মিল খুঁজে পেয়েছে। কাজেই কবি-পত্নী শুধুমাত্র ছবিই নয়—একটি জীবন্ত চেতনা।

নিম্নে তিন পর্বের বিষয়বস্তু যথাক্রমে বিবৃত হলো—

১। তুমি কি শুধু পটে আঁকা ছবি? আকাশের বুকে নীহারিকা, গ্রহ-তারা-রবি প্রভৃতি যারা সর্বক্ষণ ছুটে চলছে, তুমি কি তাদের মতো সত্য নও? চিরচঞ্চলতার মাঝখানে তুমিই শুধু শান্ত হয়ে আছ, সকলের মধ্যে থেকেও সবার চেয়ে দূরে স্থিরতার মধ্যে রয়ে গেছ। এই ধূলিও বায়ুভরে দিকে দিকে ধাইছে, বৈশাখে সে ধরণীকে বিধবার বেশে সাজিয়ে দিচ্ছে আবার বসন্তে তার দেহে পত্রলেখা এঁকে দেয়—এই তুচ্ছ ধূলিও সত্য। বিশ্বের পায়ের তলায় লীন যে তৃণ, তা-ও অস্থির বলে সত্য, তুমি স্থির বলেই ছবি হয়ে গেলে।

২। কিন্তু একদিন তুমি আমার পাশেই চলেছিলে। কতকাল হলো, বিশ্বতালের সঙ্গে তাল রেখে তোমার প্রাণ নাচে-গানে কত নব নব ছন্দ রচনা করেছে। আমার জীবনে, আমার ভুবনে তুমি কত সত্য ছিলে। রূপের তুলিকা ধরে রসের মূর্তিতে তুমিই তো আমার চক্ষে নিখিল বিশ্বকে রূপায়িত করেছিলে। বিশ্বের মূর্তিমতী বাণীরূপে আমার জীবন প্রভাতে তোমারি আবির্ভাব ঘটেছিল।—এইভাবে একসঙ্গে পথ চলতে চলতে একদিন তুমি মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে গেলে—তারপর থেকে আমি কত দুঃখ-সুখ, জোয়ার-ভাঁটা, আকাশ-পাথার পেরিয়ে একলা চলেছি। পথের দু'ধারে নীরবে চলছে ফুলের দল, মরণের কিঙ্কিণী বাজিয়ে জীবন-নির্ঝর চলছে সহস্র ধারায় অজানার ডাকে পথের প্রেমে মেতে দূর থেকে দূরে চলেছি। কিন্তু তুমি পথ থেকে যেখানে নেমেছিলে, সেখানেই থেমে রইলে। এই তৃণ, ধূলি, শশী-রবি-তারা সবার আড়ালে তুমিই শুধু ছবি হয়ে রয়ে গেলে।

৩। ভুল বলছেন কবি—না, না, তুমি শুধু ছবি নও। কে বলে, তুমি শুধু রেখার বন্ধনে নিস্তব্ধ ক্রন্দনে স্থির হয়ে রয়েছ? যদি এই আনন্দ থেমে যেতো, তবে নদী তার তরঙ্গবেগ হারাতো, মেঘ তার সোনার লিখন মুছে ফেলতো। বিশ্ব থেকে তোমার মসৃণ কেশের ছায়া যদি মিলিয়ে যেতো, তবে একদিন চঞ্চল পবনে লীলায়িত মাধবী বনের মর্মর মুখর ছায়া স্বপ্নের মতো মিথ্যে হতো। তোমায় কি ভুলে গিয়েছিলাম? তুমি যে জীবনের মূলে বাসা নিয়েছো, তাই এই ভুল। অন্য মনে পথ চলতে গিয়ে কি আমরা ফুল তারাকে ভুলে যাইনে? তবু তো ওরা প্রাণের নিঃশ্বাস-বায়ুকে সুমধুর করে তোলে, ভুলের শূন্যতার মধ্যে সুর ভরে দেয়। ভুলে থাকাই তো আর ভোলা নয়, বিস্মৃতির মর্মে বসে যে আমার রক্তে তুমি দোলা দিচ্ছ। তুমি আমার নয়ন সম্মুখে নেই, নয়নের মাঝখানে ঠাঁই নিয়েছো, আজ তাই তুমি শ্যামলে শ্যামল, নীলিমায় নীল। আমার নিখিল বিশ্ব তোমার মধ্যেই অন্তরের মিল খুঁজে পেয়েছে। আমি জানি নে, কেউ জানে না যে তোমার সুর আমার গানে বাজে। কবির অন্তরে তুমি কবি, তুমি শুধু ছবিমাত্র নও। কোন্ জীবন-প্রভাতে তোমাকে পেয়েছিলাম। তারপর মৃত্যু-রজনীতে তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি। তারপর থেকে অন্ধকারের মধ্যে, আমার অগোচরে তোমাকেই লাভ করেছি—কাজেই তুমি শুধু ছবি নও।

॥ পাঁচ ॥

শব্দার্থ ও টীকা

॥ স্তবক ১ ॥

ছবি—চিত্রপট, আলেখ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক আত্মীয়গৃহে পরলোকগতা স্ত্রীর একখানা আলোকচিত্র অথবা তৈলচিত্র-দর্শনে কবিতাটি রচনা করেন। তাই, যেমন কবিতার নাম **'ছবি'**, তেমনি আবার যে-স্ত্রী এক সময় জীবিতাবস্থায় কবির সঙ্গে সঙ্গে চলতেন, এক্ষণে মৃত্যুর পর তিনি এই 'ছবি'র রেখাঙ্কনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছেন বলে 'ছবি'টিই যেন তাঁর প্রতীকরূপে বর্তমান—তাঁকে লক্ষ্য করেই কবি তাঁর মনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন—এই কারণেও কবিতার **'ছবি'** নামটিও সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে। **পটে লিখা**—চিত্রে অঙ্কিত। **তুমি কি....পটে লিখা**—চিত্রে পত্নীর প্রতিকৃতি দেখতে পেয়ে কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে, তাঁর স্ত্রী কি শুধুই ছবি মাত্র? তার অধিক কোন সত্তা কি তার নেই? **নীহারিকা**—সুদূর আকাশের নক্ষত্র পুঞ্জ। **"জ্যোতিষ্ক বিশেষ, যাহাদের দেখিলে জ্যোতির্ময় মেঘের টুকরার মত মনে হয়। ইহারা তারকাদের মতই দূরে থাকে। বর্তমানে কয়েক কোটি নীহারিকার অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। ইহাদের সাধারণতঃ কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—**

(১) গ্রহকল্প—ইহাদের চাকার মত দেখিতে, জ্যোতিষীদের ধারণা ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বহু সংখ্যক তারকা আছে।

(২) ছায়াপথ—ইহারা ছায়াপথের অন্তর্গত এবং অতি সূক্ষ্ম গ্যাসীয় কণার দ্বারা গঠিত, উহাদের অন্তর্গত তারকার আলোকে উহাদের জ্যোতির্ময় দেখায়। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট আকার নাই।

(৩) ছায়াপথের বাহিরের—ইহাদের বিশ্বদীপও বলা হয়, অনুমান হয় যে ইহারা আমাদের ছায়াপথের অনুরূপই অন্য তারকা রাজ্য। ইহাদের আকার ঘূর্ণমান চামার মত, তাহা হইতে ইহারা আবর্তনশীল বলিয়া মনে হয়।" **সুদূর নীহারিকা**—নীহারিকাপুঞ্জ শত শত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে; কোন কোনটি এত দূরে যে আজো তাদের আলোক এসে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে নি। **যারা করে.. ..আকাশের নীড়**—মহাবিশ্বের কোলে বাসা বেঁধে যারা ভিড় জমিয়েছে। এখানে যারা বলতে শুধু লক্ষ কোটি নীহারিকাকেই বোঝায় নি, পরে উল্লেখিত গ্রহ-তারা-রবি প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও এরই অন্তর্ভুক্ত। আকাশ বলতে এখানে মহাবিশ্বের অসীম শূন্যতাকেই বোঝানো হয়েছে। নৈশ আকাশের দিকে তাকালে গায়ে গায়ে লাগানো নক্ষত্র এবং নীহারিকাপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত নক্ষত্ররাজিকে অনেক সময় পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না বলেই ভীড়ের কথা বলা হয়েছে। **আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী**—অন্ধকার রজনীতে যারা আলো হাতে নিয়ে পথের নিশানা খুঁজছে। এখানে পরবর্তী পংক্তির গ্রহ-তারা-রবিকেই **'ঐ যারা'** শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হচ্ছে। মহাবিশ্বের ঐ সমস্ত গ্রহ-তারা-রবি হয় নিজেদের আলোকে অথবা অপরের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ করে চলেছে বলেই আমরাও আলোর সন্ধান পাচ্ছি। আমাদের সূর্য যখন

পথ চলছে, তখন দিবাভাগ—অপর সকল জ্যোতিষ্কও তখন আকাশে অবস্থান করলেও সূর্যের আলোতে চাপা পড়ছে। আবার সূর্য যখন পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে বতর্মান থাকে, তখনই অপর সমস্ত জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ গ্রহ-তারা তাদের আলোর সহায়তায় আমাদের চোখে ধরা পড়ে। লক্ষণীয় যে, এদের সকলকেই **'যাত্রী'** বলা হয়েছে—শব্দটির ব্যবহার অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এর দ্বারা তাদের চলতাধর্ম বা গতিশক্তিকেই বোঝানো হচ্ছে। **গ্রহ**—সূর্য বা অপর কোন নক্ষত্রের চতুর্দিকে আবর্তনকারী জ্যোতিষ্ককে গ্রহ বলা হয়। আমাদের পরিচিত এই সূর্যের মোট দশটি গ্রহের এ তাবৎ সন্ধান পাওয়া যায়। দূরত্ব অনুযায়ী এদের নাম যথাক্রমে—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ও হার্শেল; এ ছাড়াও রয়েছে অগণিত গ্রহাণু। **তারা**—নক্ষত্র। এরাও এক একটি সূর্য। **তুমি কি তাদের মত সত্য নও**—ছবির প্রতি তাকিয়ে মৃতা পত্নীর প্রতি কবির জিজ্ঞাসা—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র বা নীহারিকাপুঞ্জ যেমন সত্য, চিত্রার্পিতা তাঁর পত্নী তেমনি সত্য কি না। অর্থাৎ এ বিষয়ে কবির মনে সংশয় জেগেছে। এখানে 'সত্য' কথাটির তাৎপর্য বুঝে নেওয়া দরকার। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ **'বিদ্যামানতা'**, **'অস্তিত্ব'**, অর্থাৎ জীবনের লক্ষণযুক্ত। পূর্বোক্ত জ্যোতিষ্কগুলিকে সত্য বলা হয়েছে এই অর্থে যে এরা **'যাত্রী'**, এদের গতি আছে এবং গতিই জীবনের লক্ষণ। একালের বিজ্ঞানও পরিবর্তন-শীলতাকেই জীবনের ধর্ম বলে স্বীকার করে। কিন্তু কবি-পত্নী আজ চিত্রপটে রেখার বন্ধনে আবদ্ধ, গতিহীন, তাই সংশয়। **চিরচঞ্চলের মাঝে**—চলমান জগতের মধ্যে; 'জগৎ' শব্দের অর্থই 'গমনশীল'—বস্তুতঃ এই চলতা ধর্মের জন্যই পৃথিবী আজও জীবন্ত। **কেন তুমি শান্ত হয়ে রও**—ছবি বা চিত্রপটের রেখায় সীমায়িত স্ত্রীর প্রতিকৃতি অচল, অনড়,—তাই শান্ত। **পথহীন**—ছবিতে সীমাবদ্ধ বলেই পথহীন। **সকলের মাঝে....দূরে**—এই বিশ্বভুবনের সকলের মধ্যে তুমিও একজন, কিন্তু অপর সকলে চঞ্চল, শুধু তুমিই নিশ্চল, তাই সকলের মধ্যে থেকেও তুমি তাদের থেকে দূরে রয়েছো। **স্থিরতার চির অন্তঃপুরে**—নিঃস্তব্ধতার মাঝখানে রেখায় বন্দী।

॥ স্তবক ২ ॥

ধূসর অঞ্চল তুলি—ধূলায় চারদিক ধূসরিত হয়ে যায় বলেই কবি-কল্পনায় তা ধুলার আঁচল হয়েছে। **বৈশাখে...খুলি**—চৈত্র-বৈশাখের খরতাপে ধরণীর রিক্ততা বুঝানোর জন্যই বিধবার উপমা গ্রহণ করা হয়েছে। **তপস্বিনী...গৈরিকে**—ধরণী যেন তপস্বিনীর ব্রত অবলম্বন করে গেরুয়া বসন ধারণ করেছে। কবির প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বাংলার যে অঞ্চলে অবস্থিত তথাকার মাটির রং, ধূলির রং লালচে। বৈশাখের বাতাসে ধূলি উড়ে সব কিছু গেরুয়া রঙে রঞ্জিত করে দেয়। **বৈশাখে....গৈরিকে**—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—বৈশাখে ফুল ফোটে না, শুকিয়ে ঝরে যায়, যখন ধরণী বিধবার মতো তার আভরণ ত্যাগ করে, তখন সেই তপস্বিনীকে এই ধূলি গৈরিক বস্ত্র পরিয়ে দেয়। **পত্রলেখা**—পাতার ছাপ। **অঙ্গে....লিখে**—বৈশাখের ঝড়ো বাতাসে ধরণীর দেহে সর্বত্র গাছের পাতা ছড়িয়ে পড়ে, কবি তাকেই কল্পনা করেছেন যে ধরণী দেহ পত্রলেখায় সজ্জিত হয়েছে। **বিশ্বের চরণতলে লীন**—পৃথিবীর জবজন্তু সর্বক্ষণ তৃণগুলি মাড়িয়ে চলে। **এরা যে অস্থির**—এই ধূলি বা তৃণ, এদের মধ্যে পরিবর্তন বা সচলতা আছে এবং এই কারণেই এরা সত্য।

॥ স্তবক ৩ ॥

এই পথে—সংসারযাত্রার পথে। **বক্ষ....নিঃশ্বাসে**—তখন তোমাতেও জীবনের সর্বলক্ষণ বর্তমান ছিল। **বিশ্বতালে রেখে তাল**—বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে। **আমার ভুবনে কত সত্য ছিলে**—স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিণী; কাজেই ব্যক্তিগতভাবে তিনি কবির জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িয়ে ছিলেন। **মোর চক্ষে....রসের মূরতি**—কবি অনুভব করছেন, তাঁর জীবনের সমস্ত কর্ম-কৃতির পশ্চাতে তাঁর স্ত্রীর প্রেরণা ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাঁর ভাষায়—**"এই জগতের সুন্দর জিনিস যা কিছু আমি ভালোবেসেছি তার মধ্যে তোমার নিজের নামটি তুমি যেন লিখে দিয়েছিলে, সুন্দর প্রিয় সামগ্রীকে তুমিই তোমার ভালোবাসা দিয়ে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিলে। তুমি নিখিলকে রসময় করে তুলেছিলে। তোমার মাধুর্যের তুলিতে বিশ্ব সুন্দর মধুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল।" এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী**—কবি পত্নীর মধ্যে দিয়েই কবি যেন বিশ্ববাণীকে লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পৃথিবীর আনন্দময় বার্তাকে তিনিই মূর্তিমতী বাণীরূপে কবির কাছে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

॥ স্তবক ৪ ॥

রজনীর আড়ালেতে—মৃত্যুরূপ অন্ধকারের মধ্যে। **তুমি গেলে থামি**—অর্থাৎ কবি পত্নীর মৃত্যু হলো। **কত দুঃখ...সম্মুখে**—নানা প্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে আমাকে একলাই পথ করে যেতে হয়েছে। **চলেছে জোয়ার....পাথারে**—পৃথিবীর বুকে দীর্ঘকালের অবসরে কত উত্থান-পতন, কত ঘটনাই তো ঘটে গেল। **পথের দুধারে...বরণে বরণে**—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—**"আমি পথ দিয়ে যাত্রা করেছি, সেই পথের দুধারে ফুলের দল চলেছে—কদম্ব-শিউলি-নাগকেশর-করবী, নানা ঋতুতে এদের উৎসবের যাত্রা।" সহস্র ধারায়...কিঙ্কিণী**—মর্ত্যযাত্রা নির্বাহ করতে শতসহস্র ধারায় জীবন নদীর স্রোত বয়ে যায়, প্রতি মুহূর্তে থাকে মরণের শঙ্কা, তাকে তুচ্ছ করেই এগিয়ে যেতে হয়। **অজানার সুরে**—অজ্ঞাত জগতের আকর্ষণে। **মেতেছি পথের প্রেমে—"আজ জানি না কাল কী হবে, পরক্ষণে কি ঘটবে—তথাপি অজানা তার বাঁশি বাজিয়ে আমাকে দূর থেকে দূরে ডেকে ডেকে চলেছে, আমাকে ঘরছাড়া করে নিয়ে চলেছে।"** এখানে **'পথের প্রেম'** কথাটা কাব্যগতভাবে ব্যবহৃত হলেও কবি বাস্তবজীবনেও কিছু পথের প্রেমে মজেছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘকালের জীবনেতিহাসে ভ্রমণের ইতিহাসও কম দীর্ঘ নয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে এবং বঙ্গদেশের সঙ্গেই একাধিক বার। **তুমি পথ...থেমে**—কবিপত্নীর কথা বলা হচ্ছে,—কবির সঙ্গে জীবনযাত্রা পথের সঙ্গিনী ছিলেন তিনি, কিন্তু একসময় মৃত্যু-কবলিত হবার ফলে তাঁর চলা থেমে গেল—এখন তিনি ছবির ফ্রেমে বন্দী। এই চলিষ্ণু জগতে, বিশ্বচরাচরে একমাত্র তিনিই যেন স্থিরচিত্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন।

॥ স্তবক ৫ ॥

কী প্রলাপ কহে কবি—'তুমি শুধু ছবি'—কবির এই উক্তিটিকেই এখন কবি '**প্রলাপ**' বা '**ভুল বকা**' বলে অভিহিত করেছেন। বিশ্ব সংসারের সব কিছুই চলছে, সবই জীবন্ত আর কবি-পত্নী মৃত বলেই শুধু ছবির সীমায় আবদ্ধ হয়ে আছেন বলে কবি এতকাল ভেবে এসেছিলেন; তাই এতকালের পোষিত এই মনোভাবকে কবিতার প্রথম অংশে বর্ণনা করে এইবার কবি তাঁর সদ্যোপ্রসৃত গতিতত্ত্ব দ্বারা পরিবর্তিত মনোভাবকে প্রকাশ করতে গিয়েই তাঁর প্রথম বক্তব্যের বিরোধিতা করছেন। **মরি মরি...লিখন**—কবি এক্ষণে অনুভব করছেন, যে কবি-প্রিয়া শুধু ছবি হয়ে রেখা বন্ধনে আটকা পড়ে রয়েছেন, এ কথা সত্য নয়। কবির মনের মধ্যে এখনো তিনি সমান ভাবেই প্রেরণা সঞ্চার করে যাচ্ছেন বলেই কবি এখনো জগৎ থেকে আনন্দ আহরণ করে তাকে রূপে-রসে কাব্যে প্রকাশ করতে পারছেন। তাঁর ভাষায়—"**তোমার মধ্যে যে সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশিত হয়েছিল ও মূর্তি গ্রহণ করেছিল, তা যদি এখনো না থাকত, তবে এই নদীর আনন্দবেগ থাকত না। তোমার আনন্দ যে-বাণীকে বহন করে এনেছিল তা তো থামে নি। বিশ্বের যে অন্তরের বার্তাকে তুমি এনেছিলে, তা চিরকাল ধরে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। তা যদি না হতো, তবে মেঘের এই স্বর্ণচিহ্ন থাকত না।**" **চিকুর**—কেশরাশি। **লীলায়িত**—ক্রীড়াচ্ছলে দোদুল্যমান। **তোমার চিকন...স্বপনের**—এটিতে এবং এই স্তবকের অন্যত্র কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে সমস্ত চিত্র উপস্থাপিত করেছেন, তাতে কবির বিশেষ সৌন্দর্যপ্রীতি ও প্রেমানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, কবি-প্রিয়ার প্রেরণাই তার এই বিশেষ অনুভূতির জন্ম দান করেছে। কবির জীবনে তার প্রেরণা এখনো সক্রিয়, তাই কবির পক্ষে এ সমস্ত রচনা সম্ভবপর হয়েছে। যদি কবি-প্রিয়া সত্যি সত্যি ছবির মতই নিশ্চল হয়ে থাকতেন, তবে প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলাও তার দৃষ্টিতে অনুপস্থিত থাকত—কবির বক্তব্যের একটি তাৎপর্য। **তুমি যে নিয়েছো...ভুল**—কবি-প্রিয়া দৈহিক রূপ নিয়ে কবির দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থান করছেন না, তিনি কবির মর্মমূলে আশ্রয় নিয়েছেন। চোখের সামনে নেই বলেই হয়তো ভুলে গেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু মনের মধ্যে তিনি স্থায়ী আসন নিয়ে অবস্থান করছেন। কবির নিজের ব্যাখ্যা ঃ "**তোমাকে আমি যে ভুল ভেবেছিলুম, সে ভুল বাইরে। তুমি আমার জীবনের চৈতন্যলোক থেকে মগ্নচৈতন্যের জীবনে চলে গেছ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আমার অন্তরের গভীর দেশে গেছ।**" **অন্য মনে পথ চলি...ভরি দেয় সুর**—পথ চলতে গেলে, যারা আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী, তাদের কথা আমাদের জাগ্রত চেতনায় বর্তমান না থাকলেও মগ্ন চেতনায় তা থেকেই যায়। অন্ধকার রজনীতে পথ চলতে সহায় হয় তারার মিটমিটে আলো, সেই তারার কথা আমাদের মনেই আসে না অথচ তার ক্ষীণ দ্যুতিটিই আমাদের চোখের দৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় বলে আমরা পথ চলতে পারি। পথের ধারের বনফুল আমাদের নজরে আসে না, অথচ তাদের সৌরভ আমাদের প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে মিশে যায় বলেই আমরা ক্লান্ত না হয়েও চলতে পারি। এদের অস্তিত্বকে আমাদের মগ্নচৈতন্যে কখনো অস্বীকার করতে পারে না। **ভুলে থাকা.....ভোলা**—বাইরে থেকে যাকে মনে হয় '**ভুলে থাকা**',

আসলে তা তো '**ভোলা**' নয়, কারণ তা যে অন্তরে সদা সক্রিয়। **বিস্মৃতির মর্মে...দোলা**—আমার জাগ্রত চেতনায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে তোমার অস্তিত্ব না থাকলেও তুমি আমার অবচেতন মনকে অধিকার করে আমার রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছো, আমার মনে প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছো; আমি ভুলে গেলেও আমার মনের মধ্যে তোমার অস্তিত্ব তো মিথ্যে নয়। **নয়ন সম্মুখে....ঠাঁই**—রূপময় দেহ নিয়ে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে নেই, আজ রূপাতীত হয়ে আমার দৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছো। তাই আজ বাইরের জগতে যা দেখছি, সব তোমার মধ্যে দিয়েই। **শ্যামলে...নীল**—এই পৃথিবীর শ্যামলতায় তোমারি নীলিমাকে প্রত্যক্ষ করছি। আমার নিখিল বিশ্ব আজ তোমার মধ্য দিয়েই আপনাকে প্রকাশ করছে। কারণ তুমি আমার দৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছো। **নাহি জানি...গানে**—একটি কথা যেমন কেউ জানে না, তেমনি আমিও জানি না যে, আমার গানের মধ্য দিয়ে তোমারই সব ধ্বনিত হয়। অর্থাৎ আমি আমার অজ্ঞাতেই তোমার প্রেরণা-বশে তোমার দ্বারা চালিত হচ্ছি। **তোমারে পেয়েছি...লভি**—জীবনে তোমাকে পেয়েছিলাম, তোমার মৃত্যুতে তোমাকে হারালাম, **"রজনীর অন্ধকারের (অর্থাৎ মগ্নচৈতন্যে ও সুপ্ত চৈতন্যের) মধ্যেই গভীরভাবে তোমাকে আবার ফিরে পেলাম।"**

॥ ছয় ॥

● **ব্যাখ্যা**

(এক)

তুমি কি তাদের মতো সত্য নও'—

আলোচ্য পংক্তিটি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের অনুর্ভুক্ত ৬ নং কবিতা 'ছবি' (তুমি কি কেবল ছবি) নামক কবিতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। কবি তাঁর কোন এক আত্মীয়ের গৃহে তাঁর পরলোকগতা পত্নীর একটি আলেখ্য দেখতে পেয়ে তাঁর উদ্দেশ্যেই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। অতএব এখানে 'তুমি' বলতে কবি এখানে তাঁর পরলোকগতা পত্নীকেই বোঝাচ্ছেন।

কবি চিত্রার্পিতা পত্নীকে দেখে ভেবেছিলেন যে রেখার বন্ধনে আবদ্ধ তাঁর পত্নী এখন শুধু ছবিই মাত্র, সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল মহাকাশের গ্রহ-তারা-রবি-শশী আর অগণিত নীহারিকাপুঞ্জ, যেগুলি নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হয়ে চলছে, কোনটিই স্থির নয়। এখানে কবি 'তাদের' বলতে এই নীহারিকা এবং গ্রহ-তারা-রবি প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদের কথাই বলেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে যাদের মধ্যে প্রাণ আছে, তাদেরই জীবিত বলে মনে করা হলেও কবি এখানে চলিষ্ণুতাকেই জীবন্ত তথা সত্য বলে মনে করেছেন। সেই বিচারে তিনি দেখেছেন যে আকাশস্থ নীহারিকা এবং গ্রহ-তারা-রবি প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও অন্ধকারের যাত্রীর মতো আলো হাতে চলছে। ওরা চঞ্চল, ওদের মধ্যে চলিষ্ণুতা আছে, তাই কবির দৃষ্টিতে ওরা সত্য।

কবিপত্নী যদিও একসময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারেই সত্য ছিলেন, এক্ষণে দৈহিক মৃত্যুর পর আর তাঁর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তবে চিত্রে তাঁর একটি প্রতিকৃতি রয়েছে, যাকে দেখে কবির মনে তাঁর স্মৃতির উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু এই ছবি তো রেখার বন্ধনে আবদ্ধ, এর তো কোন গতি নেই, চঞ্চলতা নেই—তা কবির দৃষ্টিতে চিত্রার্পিতা তাঁর পত্নী

এক্ষণে ছবিমাত্র, গ্রহ-নক্ষত্র-আদি জ্যোতিষ্কের মতো সত্য নয়।

(দুই)

'এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি—
তুমি স্থির, তুমি ছবি।"

'বলাকা'র ৬ নং কবিতা 'ছবি' ('তুমি কি কেবল ছবি') কবিতায় কবি এই উক্তিটি করেছেন। কবি তাঁর পরলোকগতা পত্নীকে রেখার বন্ধনে আবদ্ধ ছবিতে দেখতে পেয়ে এই মন্তব্য করেছেন। তাঁর মনে হলো, চিত্রাঙ্কিত তাঁর পত্নীর মধ্যে চঞ্চলতার কোন প্রকাশ ঘটে না বলে তিনি আর সত্য নন। তাঁর তুলনায় অতি তুচ্ছ যে ধূলি এবং তৃণ, এরাও বরং সত্য। এখানে 'এরা' বলতে এই ধূলি এবং তৃণকেই বোঝানো হয়েছে।

কবি বলছেন, তৃণ এবং ধূলি অস্থির বলেই সত্য। সাধারণভাবে ধূলি নির্জীব বস্তুরূপে পরিচিত হলেও যেহেতু এগুলি এক জায়গায় পড়ে থাকে না, ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গিয়ে সেই ধূলি বৈশাখে বিধবার আভরণ খুলে তপস্বিনী ধরণীকে গেরুয়া রঙে সাজিয়ে দেয়, আবার বসন্তের মিলন উষায় তার অঙ্গে পত্রলেখা এঁকে দেয়; কাজেই ধূলিও চঞ্চল অস্থির, তাই সত্য। অত তুচ্ছ যে তৃণ, বিশ্বের চরণতলে যা লীন হয়ে যায়, তারও জীবন আছে, হ্রাসবৃদ্ধি আছে,—এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে এদের অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'তুমি' বলতে কবি এখানে তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর কথা বলছেন। তিনি এক সময় সশরীরে বর্তমান থেকে কবির সঙ্গে জীবন-যাত্রার পথে চলেছিলেন। মৃত্যুতে তাঁর দেহগত অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে। একখানি পটে তাঁর চিত্র অঙ্কিত আছে, যা কতকগুলি রেখাদ্বারা সীমায়িত। এখন তিনি শুধু এই ছবিরূপেই বর্তমান, 'ছবি' বলেই তার মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই, তাই তা স্থির।

(তিন)

'সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।'

রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যের ৬ নং 'ছবি' ('তুমি কি কেবল ছবি') কবিতায় কবি তাঁর পর লোকগতা পত্নীর একটি ছবি দেখে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করছেন। একদিন ছিল, যখন কবি পত্নী রক্তমাংসের দেহে বর্তমান থেকে কবির সঙ্গে একযোগে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতেন। তখন তিনিই ছিলেন কবির সমস্ত কর্মে প্রেরণাদাত্রী। এ বিশ্ব নিখিলে, কবির সমস্ত সৃষ্টিকে রূপের তুলিকা ধরে রসের মূর্তিতে তিনিই তো লিখেছেন।—এখানে সেই সব বিগত দিনগুলিকে কবি 'সে-প্রভাতে' অর্থাৎ জীবন-প্রভাতে বলে উল্লেখ করেছেন।

'ছবি' কবিতায় সর্বত্র 'তুমি' বলতে কবি তাঁর পরলোকগতা পত্নীর কথা বলেছেন। কবি-পত্নী একসময় কবির সঙ্গে একযোগে সংসার-যাত্রায় বের হয়েছিলেন, তারপর হঠাৎ তিনি পথের ধারে থেমে গেলেন, কবি চলতেই থাকেন। একদিন কোন এক আত্মীয়গৃহে পত্নীর একখানা আলেখ্য-দর্শনে কবি তাকে উদ্দেশ্য করে পূর্বাস্মৃতি রোমন্থন করছেন।

কবির জীবনে কবি-পত্নী কীভাবে জড়িয়ে রয়েছেন, এ কথা কবি নিজে এভাবে ব্যাখ্যা

করেছেন—"এই জগতের সুন্দর জিনিস যা-কিছু আমি ভালোবেসেছি তার মধ্যে তোমার নিজের নামটি তুমি যেন লিখে দিয়েছিলে, সুন্দর প্রিয় সামগ্রীকে তুমিই তোমার ভালোবাসা দিয়ে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিলে। তুমি নিখিলকে রসময় করে তুলেছিলে—তোমার মাধুর্যের তুলিতে বিশ্ব সুন্দর মধুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আনন্দময় বার্তাকে তুমি মূর্তিমতী বাণীরূপে আমার কাছে বহন করে এনেছিলে।"

(চার)

"মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।"

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন এক আত্মীয়ের গৃহে তাঁর পরলোকগতা পত্নীর প্রতিকৃতি—দর্শনে স্মৃতি রোমন্থনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথমে মনে হয়েছিল, স্ত্রীর দৈহিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত সত্তা অন্তর্হিত হয়েছে; বাস্তবে তাঁর কোন অস্তিত্ব, শুধু মাত্রই একটি ছবি। এমন কি নির্জীব গ্রহ তারা রবিও চঞ্চল বলেই সত্য, কিন্তু রেখার বন্ধনে সীমায়িত পত্নী ছবির অতিরিক্ত আর কিছু নয়।—কিন্তু কবির এই প্রাথমিক উপলব্ধিটুকু শেষ পর্যন্ত কবির নিকটই যেন প্রলাপোক্তি বলে মনে হলো। তিনি ভাবলেন—বাইরের জগতে তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই বলে কি তাঁর স্ত্রী তাঁর মনোলোক থেকেও নির্বাসিত হয়েছেন? কিন্তু তা তো নয়। পত্নী-প্রণয় কবি-প্রাণে যে প্রেমানুভূতি সৃষ্টি করেছে, তাই তো এখনো পর্যন্ত কবির নিকট বিশ্বভুবনকে আনন্দময় করে রেখেছে। তাঁর এই সময়ের অনুভূতিকে তিনি নিজের ভাষায় এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"তুমি তো শুধু ছবি নও। কে বলে তুমি রেখার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে রয়েছো? তোমার মধ্যে যে সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশিত হয়েছিল ও মূর্তি গ্রহণ করেছিল, তা যদি এখনো না থাকতো, তবে এই নদীর আনন্দবেগ থাকতো না। তোমার আনন্দ যে বাণীকে বহন করে এনেছিল তা তো থামে নি। বিশ্বের যে অন্তরের বার্তাকে তুমি এনেছিলে, তা চিরকাল ধরে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। তা যদি না হতো, তবে মেঘের এই স্বর্ণচিহ্ন থাকত না।"

(পাঁচ)

"ভুলে থাকা নয় সেতো ভোলা,
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ
যে দোলা।"—

কবি তাঁর পরলোকগতা পত্নীর ছবি এক আত্মীয়ের গৃহে দেখার পর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের এই ৬ নং 'ছবি' নামক কবিতাটি রচনা করেন। তাতে প্রথমেই তাঁকে এই চলমান বিশ্বজগতের প্রেক্ষাপটে নিশ্চল স্থির মনে করে শুধু রেখার বন্ধনে আবদ্ধ ছবি বলেই মনে করেছিলেন।

যেখানে যা-কিছুর মধ্যে চঞ্চলতা আছে, শুধু তাই সত্য। এই নিরিখে কবি-পত্নীকে আর সত্য বস্তু বলে ভাবা যায় না।—কিন্তু পরক্ষণেই কবির মনে হলো, তিনি বিচার-বিভ্রাট করে বসে আছেন বলেই উক্তি দিয়েছেন—'তুমি শুধু ছবি'। সত্য বটে। কবি পত্নী আজ আর মানব দেহ নিয়ে সশরীরে দাঁড়িয়ে নেই, কিন্তু কবি জীবনের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টার পশ্চাতে সর্বক্ষণ তিনি প্রেরণা দান করে যাচ্ছেন, তা তো মিথ্যা নয়। কবি পত্নী কবির মনে যে প্রেমানুভূতি সঞ্চার করেছিলেন, তারি ফলে আজো পৃথিবী তাঁর নিকট রূপে-রসে ভরপুর।—তবে কি কবি তাঁকে ভুলে গিয়েছিলেন? তা হতে পারে, কিন্তু সে ভুলে যাওয়া তো, আসলে কোন ভুলে যাওয়া নয়; কারণ কবি পত্নী আজ বাইরের জগৎ থেকে সরে গিয়ে একেবারে কবির বিস্মৃতির মর্মমূলে বসে তাঁর রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছেন। যা ছিল এতকাল রূপের মধ্যে আবদ্ধ, তা রূপাতীত হয়ে আজ রক্তের অণুতে অণুতে বাসা বেঁধেছে। —তাই কবি তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলছেন যে এই ভুলে থাকাটা আসলে ভোলা নয়। আমরা অন্যমনে পথ চলতে গিয়ে পথের পাশের বনফুল কিংবা অন্ধকার রজনীতে আকাশের তারাকে ভুলে যাই! কিন্তু ফুলের সৌরভ কখনো আমাদের ভুলতে দেয় না কিংবা আকাশের তারাও আমদের দৃষ্টি থেকে তার আলো সরিয়ে নেয় না—ভুলের শূন্যতাকে সুর দিয়ে পূরণ করে দেয়। বিগত-প্রাণা তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিও তেমনি তাঁকে সহস্র পাকে বেষ্টন করে রেখেছে, ভোলবার অবকাশ কোথায়?—কাজেই এই উক্তির মধ্যে আসলে কোন স্ববিরোধিতাও নেই।

(ছয়)

'তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে
তারপর হারায়েছি রাতে।
তারপর অন্ধকার অগোচরে তোমারেই লভি।'

কবির পরলোকগতা পত্নী আজ রেখার বন্ধনে চিত্রপটে আবদ্ধ, তার মধ্যে জীবনের কোন স্পন্দন, কোন চঞ্চলতা নেই। তাই প্রথমে কবির মনে হয়েছিল, বিশ্বের অপর সকল চঞ্চল বস্তুর মতো সত্য আর নন তিনি, একান্তই 'ছবি' মাত্র। পরেই তাঁর মনে হলো, তিনি ভুল বিচার করছেন। যিনি বাস্তবে দেহীরূপে বর্তমান না থাকলেও মনের ভিতরে ঠাঁই নিয়ে এখনো সমভাবেই তাঁর মনে প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছেন, তার অস্তিত্ব তো অস্বীকার করা যায় না। জীবন-প্রভাতে তাঁকে পেয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে একযোগে পথ চলতে শুরু করেছিলেন। তারপর এক দুর্যোগের রজনীতে তাঁর পথ চলা থেমে গেলো, কবি একলাই চলতে লাগলেন। হয়তো চলার পথে সচেতন মনে তাঁর কথা স্থান পায় নি, কিন্তু তাঁর নিজেরই অগোচরে তাঁর অবচেতন মনের অন্ধকারে তিনি অবস্থান করে বরাবর কবির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন; কবি এইভাবেই তাঁর সঙ্গলাভ করেছেন। কবির নিজের ভাষায় এর ব্যাখ্যা :

"তোমাকে একদিন সকালে, অর্থাৎ সচেতন অবস্থায় লাভ করেছিলুম, তারপরে রাত্রি এলো (মৃত্যুরূপে) তুমি অন্তরালে চলে গেলে। রাত্রিতে তোমাকে হারিয়ে ফেলে, রজনীর অন্ধকারের (অর্থাৎ মগ্নচৈতন্যে ও সুপ্তচৈতন্যে) গভীরভাবে তোমাকে আবার ফিরে পেলাম।"

॥ সাত ॥

॥ এক ॥

৬ নং কবিতা 'ছবি' ('তুমি কি কেবলি ছবি') ঃ সার-সংক্ষেপ

আকাশের বুকে সুদূরে যেসব নীহারিকা ভিড় করে আছে কিংবা আঁধারের যাত্রী গ্রহ-তারা-রবি-যারা আলো হাতে ছুটে চলছে, তুমি কি তাদের মতো সত্য নও, শুধুই ছবি মাত্র। চারদিকে সমস্ত চঞ্চলতার মধ্যে থেকেও তুমি কেন পথিকের সঙ্গ না নিয়ে স্থির হয়ে রয়েছো। ঐ যে তুচ্ছ ধূলি, সেও তো বৈশাখে ধরণীর অঞ্চল গেরুয়ায় রাঙিয়ে দেয়; আবার বসন্তের উষায় তার অঙ্গে পত্রলেখা এঁকে দেয়; বিশ্বের পদতলে লীন যে তৃণ, এরাও তো সব সত্য, শুধু তুমিই ছবি।

একদিন তুমিও আমার পাশে পাশে চলেছিলে। বিশ্বতালে তাল রেখে তোমার প্রাণও তো গানে-নাচে কত ছন্দ রচনা করেছে। আমার জীবনে তুমি কত সত্য ছিলে—তোমার দৃষ্টি দিয়েই আমি নিখিল বিশ্বের রসমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছি, আমার জীবনে তুমিই ছিলে বিশ্বের মূর্তিমতী বাণী—একসঙ্গে পথ চলতে গিয়ে তুমি এক আঁধার রজনীতে থেমে গেলে, আমি একাকী সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেছি; বহু বাধা বিপত্তি, জোয়ার-ভাঁটার মধ্য দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছে। অজানার আহ্বানে দূর থেকে দূরে শুধু এগিয়ে গেছি, আমি পথের প্রেমে মাতিলেও তুমি যেখানে পথে নেমেছিলে, সেখানেই থেমে রইলে। গ্রহ-তারা ধূলি আর তৃণের আড়ালে তুমি শুধু ছবি।

না, না ভুল বকছি, তুমি শুধু ছবি হতে পারো না; যদি তাই হতো তবে নদী তার তরঙ্গবেগ হারিয়ে ফেলতো, মেঘ তার সোনার লিখন মুছে ফেলতো, তোমার চিকুরের ছায়াটুকু মিলিয়ে গেলে মাধবী বনের লীলায়িত মর্মর মুখর ছায়াও স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াতো, তুমি যে জীবনের মূলে আশ্রয় নিয়েছো, তোমায় কি ভুলতে পারি। পথ চলতে গিয়ে বনফুলকে তুলে যাই, আকাশের তারার কথা ভুলে যাই কিন্তু তবু তারা প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ুকে সুমধুর করে দেয়, ভুলের শূন্যতাকে সুর দিয়ে ভরে দেয়। কাজেই এই ভুলে থাকাটা আসলে ভোলা নয়। তুমি নয়ন-সম্মুখে না থেকে নয়নের মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছো, তাই বসুন্ধরার শ্যামলতায় তোমার শ্যামলতাই প্রত্যক্ষ করি, আকাশের নীলিমায় দেখি তোমারি নীলিমা।—আমি জানিনে, অপর কেউই জানে না যে আমার গানে তোমারি সুর বাজে, কবির অন্তরস্থিত কবিটি তো তুমিই। তোমাকে এক চেতনার প্রভাতে পেয়েছিলাম, তারপর মৃত্যুর অন্ধকারে তোমাকে হারিয়ে ফেললাম, এখন আবার অবচেতন মনে তোমাকেই ফিরে পেয়েছি, অতএব তুমি শুধু ছবি নও।

॥ দুই ॥

৬ নং কবিতা 'ছবি' (তুমি কি কেবল ছবি) ঃ রসগ্রাহী আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববিজয়ী 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্তির পর কিছুদিনের জন্য য়ুরোপ-পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি 'বলাকা'র কবিতাগুলি রচনা করেন। এর পটভূমিকায় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা অবশ্য স্মরণ করতে হয়। এক, প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক 'সবুজ পত্র' নামক সাময়িক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ, যাতে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ না হলেও রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপবাসীদের মনোজগতে বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটা অভিঘাত লক্ষ্য করেছিলেন। এই দুটি ঘটনা যুগপৎ রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় একটা পরিবর্তিত জীবনবোধের সৃষ্টি করেছিল। তারি প্রত্যক্ষ ফলোদয় 'বলাকা' কাব্য।

'বলাকা' কাব্যটিকে সকলেই গতিরাগের কাব্য-রূপেই অভিহিত করে থাকেন। এর প্রতিটি কবিতার মধ্যেই শুধু চলার বাণী, এগিয়ে চলার আহ্বান ধ্বনিত হয়। দৃশ্যতঃ তাদের মধ্যে দুটি কবিতাকে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। একটি আলোচ্য 'ছবি' কবিতাটি, অপরটি এরই সমধর্মী 'শাজাহান' নামক কবিতাটি। কিন্তু বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আপাতদৃষ্টিত 'ছবি' এবং 'শাজাহান' উভয়ই স্থির বস্তু হলেও এরাও গতি-সৃষ্টির সহায়ক, অতএব এদের ব্যতিক্রম-রূপে চিহ্নিত করা নিষ্প্রয়োজন। বিষয়টি ড. নীহাররঞ্জন রায়ের বিশ্লেষণে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন ঃ "যাহাই হউক, এই গতিতত্ত্ব কবিচিত্তকে অধিকার করিল এবং ক্রমশঃ কবিকে মুগ্ধ করিয়া অন্তরে এক নূতন অনাস্বাদিত পূর্ব রহস্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিল। কবিচিত্তে যখন কোনও তত্ত্ব অথবা সত্য অনুভূতির স্তরে আসিয়া পৌঁছায় তখন তাহা কোনও নির্দিষ্ট রূপের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তত্ত্ব কবির মায়াকাঠির স্পর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপবস্তু হইয়া উঠে। 'বলাকা'য় এই গতিতত্ত্বই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, কখনও আপাতদৃষ্ট জড় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া (যেমন, 'ছবি' অথবা 'তাজমহল' কবিতায়), কখনও চঞ্চল গতিময় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া (যেমন, 'চঞ্চলা' অর্থাৎ 'বলাকা' কবিতায়)।"

'ছবি' (৬নং) কবিতা হতেই 'বলাকা'র মূল সুরটির সূত্রপাত। একটি ছবির রূপবস্তুকে আশ্রয় করে কবি গতিতত্ত্বের চিন্তাতন্তুটিকে উপভোগ করেছেন। এই গতিতত্ত্বের সভ্যতা-সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ নেই; সত্যে তিনি আগেই পৌঁছেছেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি যে চিন্তাধারা অবলম্বন করে লাভ করেছেন, সেই চিন্তাধারাটিকে রূপাভিব্যক্তি দান করেছেন এই কবিতায়।

অতএব 'ছবি' কবিতায় কবি যে গতিসত্যকে অস্বীকার করেন নি, পরন্তু একটা জড়বস্তুর মধ্যেও গতিশক্তির উৎস খুঁজে পেয়েছেন। সেদিক থেকে বরং তিনি গতিতত্ত্বের সীমা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন বলেই মনে করা চলে।—নিম্নে কাহিনী-বিশ্লেষণ-ক্রমে এই সত্যটি অনুধাবন করা যেতে পারে।

'ছবি' কবিতায় কবির বক্তব্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, কবি তাঁর পরলোকগতা পত্নীর প্রতিকৃতি দেখে তাকে নেহাৎ-ই একটি 'ছবি' বলে অনুভব করেছেন। পক্ষান্তরে গ্রহ-তারা রবি ও নীহারিকা-মণ্ডলী এবং ধূলি ও তৃণের মতো তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে চঞ্চলতা আছে বলে তাদের সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে, কবি পূর্ব স্মৃতি রোমন্থন করে বলছেন যে জীবন-প্রভাতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একযোগেই তিনি সংসার-পথে বের হয়েছিলেন, তারপর এক দুর্যোগের রাতে তাঁর স্ত্রীর পথ-চলা থেমে গেল, কবি একলাই দীর্ঘকাল পথ চলছেন। কবির জীবন-যাত্রায় তাঁর স্ত্রীর প্রেম ও প্রেরণাই যে তাঁকে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাও তিনি স্বীকার করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে, কবির মনে হলো, তিনি ভুল করছেন। তাঁর স্ত্রী তো শুধু রেখার বন্ধনে আবদ্ধ ছবি মাত্র হতে পারেন না। কারণ, তাই যদি হতো তবে তাঁর স্ত্রীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি রূপ-রসময় বিশ্বজগৎ থেকে যে আনন্দ আহরণ করেছিলেন তা তো আর এখন পেতেন না। বস্তুতঃ যিনি এতকাল রূপের জগতে দেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তিনি দেহাতীত হয়ে কবির মনোজগতে অরূপ-রূপে বিরাজ করে তাঁর চালনা শক্তি দ্বারা কবিকে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন। অতএব তিনি কখনও শুধু একটি ছবি-রূপে গণ্য হতে পারেন না।

'ছবি' কবিতাটি 'বলাকা'র অন্যান্য কবিতা থেকে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা পৃথক বলে মনে হলেও সবগুলি কবিতার মধ্যেই যে ভাবগত ঐক্য বর্তমান আছে, তা পূর্ববর্তী বিশ্লেষণেই ধরা পড়েছে। কবি-পত্নীর প্রতিকৃতি তাঁর স্মৃতির বাহন, কিন্তু স্মৃতি তো দুর্মর, তার তো মৃত্যু নেই। কবির জীবনের সঙ্গে দেহধারিণী কবি-পত্নী আর যুক্ত না থাকলেও তাঁর স্মৃতি তাঁকে পূর্বের মতোই প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। 'বলাকা' কাব্যে অনুরূপ আর একটি কবিতা 'শাজাহান' বা 'তাজমহল' ('এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান')। এটিও 'ছবি'র মতোই একটি জড় বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত অথচ এর মধ্যেও গতি সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই উভয় কবিতাতেই কবির বক্তব্য—মৃত্যু মানুষকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে না বলেই আমরা মৃতের উদ্দেশ্য বলি—'ভুলি নাই, ভুলি নাই।' এ বিষয়ে রসজ্ঞ সমালোচকের বিশ্লেষণ—"মানুষমাত্রেই স্মরণের আবরণে মরণকে যত্নে ঢাকিয়া রাখিতে চাহে, অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়।...প্রিয় জনের জীবন ও মৃত্যুর স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিয়া মানুষ বলিতে চায় 'ভুলি নাই, ভুলি নাই,' এ কথা যেমন সত্য, জীবনকে মানুষ ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, এ কথাও তেমনি সত্য, এই দুই এ ত সত্যকার কোনও বিরোধ নাই।"

ভাবের দিক থেকে তত্ত্ববিচারের দিক থেকে 'ছবি' কবিতাটি যেমন রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যুত্তম সৃষ্টির নিদর্শন-রূপে গৃহীত হয়, কাব্যশিল্পের দিক থেকেও কিন্তু কবিতাটি তেমনি একটি উৎকৃষ্ট কবিতা রূপে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য। কবিতার স্তবক গঠনে, মুক্তবন্ধ ছন্দে ভাবের প্রবহ-মানতায়, মিল ও বিবিধ অলঙ্কার প্রয়োগে এবং সর্বোপরি চিত্র ও ধ্বনি-সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কবি এই কবিতায় অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। অতি সাধারণ ধূলির বর্ণনায়—

'বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীতে সাজায় গৈরিকে,
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন উষায়—'

কিংবা হারিয়ে যাওয়া পত্নীর অস্তিত্ব বোঝাতে গিয়ে সেই অপূর্ব উক্তি :

'নয়ন-সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।'

কবিতাটির সার্বিক বিচারে ড. নিহাররঞ্জন রায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন : 'যে শব্দচয়ন-নৈপুণ্য, ভাব-গাম্ভীর্য, ছন্দসজ্জা এবং কল্পনার প্রসার এই কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়, 'বলাকা'র প্রায় সব কবিতাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় কবিতাগুলির সচেতন শক্তিসম্পদ। এস শক্তি কতকটা আসিয়াছে ইহাদের নূতন ছন্দ-গরিমা হইতে, কতকটা চিন্তার গভীরতা ও ভাবের গাম্ভীর্য আশ্রয় করিয়া, এবং কিছুটা সংস্কৃত শব্দ-সম্পদের সুনির্বাচিত প্রয়োগের ফলে।"

॥ তিন ॥

৬ নং কবিতা 'ছবি' (তুমি কি কেবলি ছবি) : জীবন দর্শন

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে, তবে এর অনেক কবিতার রচনাই শেষ হয়েছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দের মধ্যে। এই রচনাকালটি বিশেষ তাৎপর্যময় নানা কারণেই। কারণ এর পূর্বে রবীন্দ্র-জীবনে এবং বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছিল, যার প্রভাব আলোচ্য গ্রন্থে দুর্নিরীক্ষ্য নয়।—একে একে ঘটনাগুলি বিবৃত করা যাচ্ছে।—

'বলাকা' কাব্য-রচনার পূর্বে কবি দীর্ঘকাল য়ুরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। এই পরিভ্রমণকালে তিনি তথাকার তৎকালিক জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই জীবনবোধে তিনি যেমন মহৎ মানবিকতাবোধের পরিচয় লাভ করেছিলেন, তেমনি তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতও লক্ষ্য করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, কাব্যটি রচনার অব্যবহিত পূর্বেই কবি নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসাহিত্যের ধারার সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করার সুযোগ পেলেন। তৃতীয়ত, 'বলাকা' কাব্যটির রচনার সমকালেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল। তারি ফলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় একাল থেকে একটা নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এই ধারাটির পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিম্নোক্তক্রমে : "চতুর্থ পর্ব আরম্ভ হইয়াছে 'বলাকা' হইতে। এ যুগে আবার বিশ্বকবির অনভূতির মধ্যে আসিয়াছে, বিশ্বেশ্বর তো আছেনই, আর কবির ব্যক্তিসত্তা ইহাদের সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্ব-প্রকৃতি-মানব-ভগবান ও কবির ব্যক্তিসত্তা—এই তিনের ঘাত-প্রতিঘাত, পরস্পরের সম্বন্ধ তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃত স্বরূপ, কবির অনুভূতি ও বোধকে গভীর ও প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে। এই সৃষ্টির গতিও প্রকৃতি সৃষ্টির সহিত ভগবানের সম্বন্ধ, এই সৃষ্টিধারার মধ্যে মানবের স্থান, কবির ব্যক্তিসত্তার স্থান, মানবের প্রকৃত স্বরূপ, তাহার গত জন্ম, ইহকাল ও পরকাল ব্যাপিয়া সৃষ্টি ও ভগবানের সহিত সম্বন্ধ, কবির ব্যক্তিগত জীবনের গতি, তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বিগত দিনের রূপ-রস সম্ভোগের স্মৃতি ও তাহার বৈশিষ্ট্য,

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-পথের দুই ধারের নানা দৃশ্য ও পরিস্থিতির রূপ ও রসের স্মৃতি-পর্যালোচনা, মৃত্যুর স্বরূপ ও তাহার পটভূমিকায় কবির জীবন পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির বিচিত্র অনুভূতি, চিন্তা, ভাব, কল্পনা কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে, এ যুগের রচনায়।" অনেকেই মনে করেন, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বার্গসঁর গতিবাদের তত্ত্ব। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ যে 'Theory of Perpetual Change' তথা উদ্দেশ্যহীন গতিধর্মের তত্ত্ব প্রচার করেছেন, হয়তো বা রবীন্দ্রনাথ তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতেও পারেন, কিন্তু তা হলেও কিংবা না হলেও কার্যতঃ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হতো না। কারণ, আবাল্য ঔপনিষদিক ভাবনায় নিমজ্জিত রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে 'চরৈবেতি' মন্ত্রে দীক্ষা নিলেও তারও পূর্ব থেকে, হয়তো বা জন্মসূত্রেই গতির প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কিশোর বয়সে রচিত তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' তো প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভীক্ষরা জাত। এখানেই তাঁর প্রাণ নির্ঝর-ধারার মতো ভূধর থেকে ভূধরে, শিখর থেকে শিখরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জগৎ মাতিয়ে দিয়ে মহাসাগরের দিকে ছুটে চলেছে। তাঁর এই যাত্রা কিন্তু বের্গসঁর মতো নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়—এখানে কবি মহাপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত হবার আহ্বান শুনতে পেয়েছেন; যদি বা তিনি ফরাসী দর্শনবিদ্ দ্বারা প্রভাবিত হয়েও থাকেন, তবু বাল্যেই তাঁকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

অতএব 'বলাকা' কাব্যে আমরা পাচ্ছি বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত জীবনে উত্তরণ প্রচেষ্টা: গতিপ্রেরণার লক্ষ্যতো এটিই। 'বলাকা'র বিভিন্ন সচল বস্তুর মধ্যে তিনি এই গতিধর্ম যেমন লক্ষ্য করেছিলেন, নিশ্চল বস্তুতেও তাঁর দার্শনিক কবি প্রাণ, একই সত্যে উপনীত হয়েছিল। তাই জড় 'ছবি' এবং 'তাজমহল'-এর মতো সীমার বন্ধনে আবদ্ধ বস্তুর মধ্যেও কবি বিশ্বজীবনের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করেছিলেন।—তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই, 'বলাকা'র বাইরেও অপর বহু কাব্যে কবি তাঁর জীবনদর্শনের যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, তাকে 'গতিধর্ম' নাম দেওয়া না গেলেও তাতে যে মুক্তজীবনের প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, তার সঙ্গে 'ছবি' কবিতার ভাববস্তুরও আশ্চর্য সার্ধম্য রয়েছে।

সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত কবিধর্ম। তাঁর বহু কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে তিনি মহাজীবনের প্রতি সীমাবদ্ধ জীবনের আকর্ষণের কথা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের নানাবিধ অভিব্যক্তি থাকাই সম্ভব, কিন্তু অপর কোন ভাবই বুঝি এত সুস্পষ্টভাবে কখনো উচ্চারিত হয় নি। সীমা আর অসীম, ভাব আর রূপ—এদের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্যোতনায় যে অখণ্ড বিশ্বচেতন'র সৃষ্টি, তারি তো প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে।

'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ',

কিংবা, 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,'

প্রভৃতি কবিতায় কার্যতঃ কবি একই মনোভাবকে ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর জীবন-দর্শনে 'ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা' চিরকাল একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 'ছবি' কবিতাতেও তো অনুরূপ কবি-মনোভাবেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করি। রেখার বন্ধনে আবদ্ধ ছবির মধ্যে কবি-পত্নীর স্মৃতি কি নিজেকে সীমায়িত রাখতে পারে? বন্ধন মুক্তি এখানেও ঘটেনি? নয়ন-সম্মুখ থেকে যে রূপময় দেহ অপসৃত হলো তা রূপাতীত হয়ে যখন দৃষ্টিকে আশ্রয় করে, তখনই তো বিশ্বের শ্যামলিমা আর আকাশের নীলিমায়

তা একাত্ম হয়ে যায়। অন্যত্রও কবি এই কথাই বলেছেন—যে রূপকে দহন করা হলো 'বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।' অতএব, চিত্রপটে অঙ্কিত কবি-পত্নীর আলেখ্যে চেতনা সঞ্চার করে কবি তাঁর স্বভাবধর্মেরই পরিচয় দিয়েছেন এবং এটি নিশ্চিতভাবেই তাঁর জীবন-দর্শনের অনুগামী। 'বলাকা'র ৬ নং কবিতা 'ছবি'তে কবি একটি ছবিতে যে জীবন-সত্তা আরোপ করেছেন, তা তাঁর জীবন-দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

॥ চার ॥

'ছবি' কবিতায় গতিবাদ

১৩২৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর থেকে এটি 'গতিবাদে'র কাব্য রূপে চিহ্নিত হয়ে আসছে। একালে সমালোচক মনে করেন যে, কাব্যটি রচনার পূর্বে কবি যখন য়ুরোপে পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তখন তৎকালীন য়ুরোপীয়দের জীবনযাত্রায় যেমন দ্রুতগতি লক্ষ্য করেছিলেন, তেমনি সমকালীন ফরাসী দার্শনিক আঁরি বের্গসঁর 'গতিবাদ' (Theory of Perpetual Change) দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারই ফলে তাঁর 'বলাকা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় গতির কথা এসে গেছে।—এই সমালোচনায় আংশিক সত্যতা থাকলেও একে পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না; কারণ, এর পূর্বেও রবীন্দ্রসাহিত্যে এই গতির পরিচয় আমরা পেয়েছি। বস্তুতঃ যাঁর জীবন-দর্শনেই রয়েছে চলার কথা, 'ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা', তাঁর কাব্যে তথা যে-কোন কবিতাতেই তো এ ধরনের গতির কথা প্রত্যাশিত। কাজেই এর পশ্চাতে পাশ্চাত্যের প্রেরণার কথাটাকে আরোপিত বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেন : "আমাদের রক্তের মধ্যে গতির অতি পুরাতন তাগিদ রয়েছে। তাই আমার মধ্যে সদাই এই গতির জন্য ব্যাকুলতা।...আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক। আমরা জন্মান্তরবাদী। এদেশে এই গতির ইঙ্গিত সর্বত্র।...আমি যখন অতি শিশু ছিলাম তখন থেকেই আমি গতির জন্য পাগল। পরে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় হয়তো সেই ভিতরের ডাকটি আর কিছু শক্তি লাভ করেছে কিন্তু আসলে এই আগে চলবার ব্যাকুলতাটি আমার জন্মগত জিনিস।" এ ছাড়াও এ বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রয়েছে। বের্গসঁ গতিকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। এর আর কোন লক্ষ্য নেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ এমন অপরিণামী নয় বলেই ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা চলে, তাঁর গতি একটা লক্ষ্য স্থির করে তার দিকে এগিয়ে চলে। অতএব আমরা অনায়াসে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ কোন একটা ছকে বা ফর্মুলায় বাঁধা গতিবাদ নয় যে, তা শুধু চলমান বস্তুতেই থাকবে, রবীন্দ্রনাথ জড় বস্তুর মধ্যেও তাই গতিধর্ম আবিষ্কার করে নিতে সমর্থ হয়েছেন।

'বলাকা'র বিভিন্ন কবিতার বিশ্লেষণে তাদের মধ্যে গতিধর্মের স্বাভাবিক বিকাশ পাওয়া গেলেও সমালোচকগণ ৬ নং 'ছবি' এবং ৭ নং 'শাজাহান' ('তাজমহল') কবিতা দুটিকে এর বাইরে রাখতে চান; কারণ, সহজ বিচার-বুদ্ধিতে কবিতা দুটির মূল বিষয় যে দুটি জড়বস্তু, তাদের মধ্যে গতিধর্মের অস্তিত্ব সহজে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো সাধারণের বোধ-বুদ্ধি নিয়ে এই কাব্য রচনা করেন নি। "যে কবি বহুদিন আগেই ইন্দ্রিয়ানুভূতির আনন্দস্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার বোধ ও বুদ্ধি ক্ষুরের ধারের

মত শাণিত এবং চিন্তার আনন্দস্তরে যাঁহার চিত্ত জাগ্রত তিনি শুধু চিন্তার তত্ত্বজাল উপভোগ করেন তাহাই নয়, চিন্তা উদ্ভূত সত্যটিকেও রূপায়িত করিয়া রসবস্তুতে পরিণত করিয়া তাহাকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করেন। এই রূপরসাশ্রিত সত্যই কাব্য হইয়া দেখা দেয়।"

'ছবি' কবিতায় আমরা কবি-ভাবনার এই গতিসত্যের অপূর্ব রূপায়ণ লক্ষ্য করি। কবির অনুভূত সত্য একটা ছবির কাঠামোয় বন্দী প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে এখানে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে পারঙ্গম অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে 'ছবি' কবিতাটিতেই সর্বপ্রথম 'বলাকা'র মূল সুরটি ধরা পড়েছে। চলিষ্ণু পৃথিবীর জঙ্গম বস্তুর মধ্যে গতি তো থাকবেই, একজন অন্ধও হয়তো সেই চলৎশক্তিকে অনুভব করতে পারে। কিন্তু যে শক্তির বাইরে কোন প্রকাশ নেই, যা নিজেকে সর্বক্ষণ আড়ালে রেখেও অপর বস্তুতে গতিদান করে যাচ্ছে, তাকে আবিষ্কার করতে পারার মধ্যেই তো আনন্দ। কবি প্রথমে মনে করেছিলেন চিত্রার্পিত কবি-পত্নী বুঝি তাঁর জীবনে আর নেই। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবিষ্কার করলেন যে, তিনি ভুল করেছেন—স্ত্রী তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে উধাও হলেও তাঁর দৃষ্টির ভিতরে এসে অবস্থান করায় তাঁর দৃষ্ট জগতের সর্বত্রই তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। অন্তরের প্রেরণা শক্তিরূপে তিনিই কবিকে চালাচ্ছেন। তাঁরই দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন বলে পৃথিবী আজো কবির নিকট রূপে-রসে পূর্ণ হয়ে আছে। অতএব 'ছবি' কবিতাও গতিবাদের কবিতারূপে গণ্য হবার স্পর্ধা রাখে।

॥ ঘ ॥

শাজাহান

(৭ সংখ্যক কবিতা)

॥ এক ॥

রচনাকাল ও নামকরণ

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৩২১ সালের ১৫ই কার্তিক। রবীন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, কিন্তু ভিন্ন আকারে এটি কবি রচনা করেন ১৪ই কার্তিক, কিন্তু পরিবর্তিত পাঠই শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়। বলাকা কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং বেশির ভাগ কবিতারই শীর্ষনাম ছিল। মাত্র ২টি কবিতা—৩-সংখ্যক এবং ৪১ সংখ্যক কবিতা দুটির কোন শিরোনাম ছিল না। তার মধ্যে 'বলাকা'র প্রথম তিনটি সংস্করণে কবি প্রথম আটটি কবিতায় শিরোনাম ব্যবহার করেছেন এবং তখন ৩ সংখ্যক কবিতাও শীর্ষনাম যুক্ত হয়ে হয়েছে 'আহ্বান'। বলাকার পরবর্তী সংস্করণ থেকে সব শীর্ষনামই বর্জিত হয়েছে।

বর্তমানে আলোচ্য ৭ সংখ্যক কবিতাটি 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের সময় এর নাম ছিল 'তাজমহল' কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কবি এর নাম দেন শা-জাহান। চতুর্থ সংস্করণে অবশ্য সব নামই বর্জিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে জানিয়েছেন যে, এই কবিতার কোন স্তবক বিভাগ নেই। তিনি বলেছেন, "বলাকা-তে কতকগুলো কবিতা আছে যাতে আমার পক্ষে Stanza ভাগ করা সম্ভব হয় নি। অন্তরের কথা একেবারে একস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, মাঝখানে হয়তো একবার মাত্র একটু দম নিয়েছি। এটা সেই শ্রেণীর।"

কিন্তু বিশ্বভারতীর প্রকাশনায় যে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ আমরা হাতে পেয়েছি তাতে কবিতাটি স্তবকবিহীন নয়, সুস্পষ্ট পাঁচটি স্তবকে এই কবিতা ভাগ করা আছে।

'ছবি' কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গেই 'শাজাহান' কবিতার মূল ভাব কিছুটা বলা হয়েছে। কিন্তু কবিতার ভাবই তো সবটা নয়। তার আরেকটা দিক আছে। সে কবিতার রূপ। রূপ পেলেই ভাব কবিতা হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। 'ছিন্নপত্রাবলী'র ২৩ সংখ্যক চিঠিতে কবি লিখছেন, মানুষ আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী করে তোলার আশায় 'মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চিরস্মরণগৃহ নির্মাণ করে।' এভাবে যদি মানুষ প্রতিটি ব্যক্তির মৃত্যুকে চিরস্থায়ী করে রাখার আশায় পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করত, তাহলে জন্ম-মৃত্যুর জোয়ার-ভাঁটায় চিরশ্যামল এই পৃথিবী একটি বৃহৎ গোরস্থানে পরিণত হতো। 'পাষাণের চিরস্মরণগৃহ' রচনার অর্থহীনতা বিষয়ে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ভুক্ত 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে কবি-বন্ধুকে লেখা উত্তর প্রত্যুত্তর পত্র-প্রবন্ধে এভাবে কবি লিখেছিলেন : 'প্রেমের উন্মুক্ত সদাব্রতই

প্রেমিকের স্মরণচিহ্ন, পাষাণভক্তি মধ্যে নিহিত শোকের কঙ্কাল নহে।' 'ছিন্নপত্রাবলী'তে বা 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রসঙ্গে লেখায় কবির মনে অনুভূত একটি অভিজ্ঞতা নোটের আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই নোট ছিল শুধু নিজের জন্য; 'শাজাহান' কবিতায় এই ভাব রূপের স্পর্ধা পেয়ে একটি বিশেষ চিত্রকল্পের হাত ধরে সকলের জন্য কবিতার রাজ্যে পৌঁছলো : 'সমাধিমন্দির/এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;/ধরার ধুলায় থাকি/স্মরণের আবরণে মরণের যত্নে রাখে ঢাকি/জীবনেরে কে রাখিতে পারে?/আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে'। 'পাষাণের চিরস্মরণগৃহ' বা 'পাষাণ ভিত্তির মধ্যে নিহিত শোকের কঙ্কাল' বলার সময় বক্তব্যই ছিল প্রধান। কিন্তু 'স্মরণের আবরণে' মরণেরে যত্নে ঢেকে রাখায় চিত্রকল্পটিতে বক্তব্য ম্লান হয়ে ভাবের সৌন্দর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আকাশের তারায় তারায় পৃথিবীর মৃত মানুষরাই দীপ্তি দেয় এমন বিশ্বাস থেকে দেশ-বিদেশে অনেক পুরাণ কথা রচিত হয়েছে। জীবনকে কেউ ধরে রাখতে পারে না, আকাশের প্রতি তারা মৃত্যুর হাতছানিতে তাকে ডাকছে। কবিতার এসব পঙ্‌ক্তিতে এই পৌরাণিক অনুষঙ্গও এসে যায়। অনুষঙ্গে অনেক নীরব স্মৃতি গুণগুণিয়ে ওঠে। কবির কাজই তো স্মৃতি জাগানো, নিকট থেকে মনকে বহুদূরে নিয়ে যাওয়া, আর সব মিলিয়ে ভাবকে রূপ দেওয়া। শোককে চিরস্থায়ী করে রাখায় মানুষের একটা গর্ব প্রকাশ পায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই গর্ব টেকে না, প্রিয়তমের মৃত্যু যতই দাবি করুক—মনে রেখো, তবুও মনে রাখা সম্ভব হয় না, আমরা প্রিয়জনকে ভুলে যাই। ভুলি বলেই আমরা বাঁচতে পারি। নইলে স্মৃতি সর্বস্বতায় স্থবির প্রেমে জীবনের পথ চলা আমাদের সম্ভব হতো না। এসব কথা গদ্যভঙ্গিতে 'শেষ সপ্তক' বইটির আঠারো সংখ্যক কবিতায় কবি এ ভাষায় লিখেছিলেন : 'আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান/আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও।/আমাদের অতি তীব্র বেদনাও/বহন করে না স্থায়ী সত্যকে—/সান্ত্বনা নেই এমন কথায়;/এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহংকারে।' এ ভাষায় রূপ নেই বলে তা গদ্য। কিন্তু 'শাজাহান' কবিতায় রূপ আছে বলেই তা কবিতা। 'শাজাহান'ও একদিন তাঁর প্রিয়তমা মমতাজের মৃত্যুশোকের গর্বে স্ফীত হয়ে ভেবেছিলেন তিনি এই শোককে অমর করে রাখবেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেননা জীবন শোকের চেয়ে বড়ো।

পূর্বোক্ত 'উত্তর প্রত্যুত্তর' পত্র প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন :

'আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। অনুরাগ বদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে, অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে। প্রকৃতির বৈরাগ্য দেখো, সে সকলকেই ভালোবাসে বলিয়া কাহারও জন্য শোক করে না। তাহার এই চারিটা চন্দ্র সূর্য গুঁড়া হইয়া গেলেও তাহার মুখ অন্ধকার হয় না।'

বৈরাগ্য অনুরাগের অভাব নয়, বৃহৎ অনুরাগ, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সংকীর্ণ অনুরাগ নয়, সকলেব জন্য অনুরাগ। বিচিত্র প্রবন্ধের 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' রচনা দুটিতে এই ভাবেরই প্রকাশ দেখেছি। 'শাজাহান' ও বৃহৎ অনুরাগের বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত। তিনি চিরকালের মানবপথিক। তাই তাঁর প্রিয়তমার মৃত্যুশোককে অমর করে রাখার জন্য উদ্যম, সব চেষ্টা, সব আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর সৃষ্টি তাজমহলকে ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে স্রষ্টা শাজাহান চলে গেছেন। কবির 'রাজপথের কথা' গল্পে রাজপথ বলছে, 'আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবকাশ আছে। শোক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে, কত

যায়।' এ গল্পে পথ যা বলছে, 'শাজাহান' কবিতায় পথিক শাজাহানেরও শেষ পর্যন্ত মনের কথা একই। পথে কতো অজস্র পথিকের পদচিহ্ন আঁকা হয়। কিন্তু সব পদচিহ্ন সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি মুছে দেয়। 'রাজপথের কথা'য় রাজপথ বলছে, কিন্তু তার মধ্যেই—

'তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের পুণ্যরূপের মধ্যে হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।'

এই গল্পের ত্রিশ বছর পরে 'শাজাহান' কবিতায় একই চিত্রকল্প এসেছে—কোনো কোনো মহাজনের অমর বীজ ও অঙ্কুরোদগমের চিত্রকল্প। শাজাহান এমনই এক মহাজন। তাই তাঁর উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন : 'তব চিত্তর হতে বায়ু ভরে/ কখন সহসা/উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।/তুমি চলে গেছ দূরে;/সেই বীজ অমর অঙ্কুরে/উঠেছে অম্বর পানে/কহিছে গম্ভীর গানে/যতদূর চাই। নাই নাই সে পথিক নাই। পথিক শাজাহানের জীবনের মালা থেকে খসে পড়া বেদনার অমর ভাববীজটি অঙ্কুরিত হয়ে তাজমহলরূপে পথপার্শ্বে শোভা পাচ্ছে, কিন্তু পথিক শাজাহান আজ চলে গেছেন দূরে বহুদূরে বেদনাজয়ী প্রসন্ন চিত্তে, প্রেমের উন্মুক্ত সদাব্রত পালন করতে করতে এই অনন্ত পথ চলা। এই বন্ধনহীন নিরাসক্ত নির্লিপ্ত নির্মোহ প্রেমের উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথ ক্লান্তিহীন। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য অমিতকে এই প্রেমের কথাই লিখেছিল :

"মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যের করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।"

এই ব্রতই হচ্ছে 'প্রেমের উন্মুক্ত সদাব্রত।' এই ব্রতই পালন করেছেন পথিক শাজাহান।

ভাব কিভাবে রূপের রাজ্যে ছাড়পত্র পেয়েছে, তা 'শাজাহান' কবিতা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি এবং পরে আরও দেখবো। এখানে কাজ করেছে কবির দৃষ্টি থেকে উৎসারিত কল্পনা। একে ইংরেজিতে বলে 'Visual Imagination'. তার সঙ্গে আবার মিশেছে শ্রব্যকল্পনা (Auditory Imagination). এই শ্রব্যকল্পনা থেকেই একজন কবি জীবন ও জগৎকে ঘিরে তাঁর সাড়া দেওয়ার অনন্য ধরনটির একটি শব্দার্থময় কথাশরীর রচনা করেন। সেখানে শব্দের ধ্বনির সঙ্গে তাঁর অর্থের যোগ ঘটে। অর্থ বা ভাবের প্রতি অবিচলিত মনোযোগই যথাযথ শব্দ পরম্পরা নিয়ে আসে। এই শব্দ পরম্পরার গূঢ় রহস্যবোধই কবিকে বুঝিয়ে দেয় নিছক ধ্বনিরূপে রসাক্ষিপ্ত স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পারস্পরিক সম্পর্ক। ব্যঞ্জন আর তারই ফাঁকে ফাঁকে প্রাণচঞ্চল স্বরধ্বনিগুলির যথাযথ পারস্পর্যের ফলেই কবিতার ভাব ঠিকঠাক কানের ভেতর দিয়ে মর্মে গিয়ে বাজে। এসবই শ্রব্যকল্পনার গুণে সম্ভব হয়।

এই শ্রব্যকল্পনার সূক্ষ্ম কারুকার্য 'শাজাহান' কবিতায় আমরা সন্ধান করতে পারি। এ কবিতার আরম্ভটি চিত্রকল্পরিক্ত ও শুধুমাত্র বক্তব্যনিষ্ঠ হয়েও শব্দের ধ্বনিগুণে ভাবটি আমাদের শ্রুতিতে ধরা দেয় :

"একথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শাজাহান
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।"

যাঁকে 'ভারত-ঈশ্বর শাজাহান' বলে যুক্তব্যঞ্জন ও দীর্ঘস্বরবহুল শব্দাড়ম্বরপূর্ণ সম্বোধন জানানো হয়েছে, পরমুহূর্তেই বলা হচ্ছে যে তাঁর জীবন, যৌবন, ধন, মান কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এরা ক্ষণিক, ক্ষয়িষ্ণু ও দ্রুত বিলীয়মান। ক্ষয়িষ্ণুতার ভাবটিই সেই শব্দাড়ম্বরপূর্ণ সম্বোধনের বৈপরীত্যে জীবন, যৌবন, ধন, মান এই চারটি ছোটো ছোটো হলন্ত শব্দের দ্রুত উচ্চারণে আমাদের শ্রুতির সীমায় এসে ধরা দিল। এই চারটি শব্দের প্রথম দুটির তুলনায় শেষের দুটি আরও ছোটো।

"হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা/
যেন শূন্য দিগন্তের/ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা/
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক/
শুধু থাক/
এক বিন্দু নয়নের জল/
কালের কপোলতলে/শুভ্র সমুজ্জ্বল/
এ তাজমহল।"

এই উদ্ধৃতির যথাক্রমে দশ, আট, দশ, চার, দশ আট, ছয় ও ছয় মাত্রার দীর্ঘ ও হ্রস্ব পর্বের বন্ধুরতার তালে তালে ভাবের উত্থান পতন শুনতে পাচ্ছি। 'যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা' এই পঙ্ক্তির স্বরান্ত শব্দ ও যুক্তব্যঞ্জনবহুল ধ্বনিপুঞ্জের পরেই 'যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক/শুধু থাক' এই পঙ্ক্তির ছোটো ছোটো শব্দের উচ্চারণে আর সর্বোপরি 'যাক ও থাক' এই দুটি হলন্ত শব্দের আঘাতে যাদুকরের ইন্দ্রজালের মতো দ্রুত বিলীয়মান রামধনুর বর্ণচ্ছটার ক্ষণিকতা ভাবলোক থেকে শ্রুতিলোকে অবলীলায় নেমে এসেছে।

'শাজাহান' কবিতায় প্রকৃতিতে বসন্তের আবির্ভাব ও বিদায়কে শ্রব্যকল্পনার গুণে শ্রুতিগোচর করে তোলা হয়েছে। প্রকৃতির যৌবন বসন্তের মতো শাজাহানের জীবন, যৌবন, ধন, মানও বিলীন হয়ে গেছে। 'দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণ' অংশে প্রকৃতিতে এই ঋতু আবর্তনের সত্যটি শুধু চিত্রের সীমায় থাকে নি : 'দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে/তব কুঞ্জবনে/বসন্তের মাধবী মঞ্জরী/সেইক্ষণে দেয় ভরি/মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল।' এখানে 'ঞ্জ'র অনুপ্রাসের পরেই 'ঞ্জ'র অনুপ্রাস শুনি। 'ঞ্জ'-র 'ঞ' ও 'জ' দুটিই ঘোষ ধ্বনি, আর 'ঞ্চ'-র 'চ' অঘোষধ্বনি। ঘোষধ্বনি থেকে অঘোষধ্বনিতে দ্রুত অবতরণের মধ্যেও জীবন-যৌবনের ক্ষয়িষ্ণুতার ভাবটি ধ্বনিত হয়েছে। প্রেমের গুঞ্জরণ অর্থে 'মন্ত্র গুঞ্জরণ', যৌবন অর্থে 'দক্ষিণ', জীবন অর্থে 'কুঞ্জবন', প্রেম অর্থে 'মালঞ্চ' ও 'মাধবী মঞ্জরী'র বসন্ত শেষে হারিয়ে যাওয়ার ভাবটি শুধুমাত্র অঘোষ ধ্বনিসমাবেশেই বেজে উঠেছে। এখানে শব্দ চিত্র ও শব্দধ্বনি পরস্পরের সহযোগী হয়েছে। যা কিছু বিনাশশীল ও নিয়তচঞ্চল তারই দ্যোতক 'মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল'-এর 'ঞ্চ'-র পাশেই 'ল'-র তরল আঘাতে চলিষ্ণুতার ভাবটিই কানে বাজে। এ শুধু অনুপ্রাস নয়, অনুভাবও বটে। পড়ার পরেও অনেকক্ষণ এ অনুপ্রাস কথা বলতে থাকে। তাই এ অনুভাব। 'বিদায় গোধূলি আসে/ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্ন দল' এই পঙ্ক্তির পর্ব দুটির প্রথম শব্দ দুটি 'বিদায়' আর 'ধূলায়'-এর দীর্ঘস্বরের করুণ গম্ভীর মধ্যমিলের বিলম্বিত উচ্চারণে বসন্তশেষে অজস্র ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ার করুণ সুর শুনতে পাচ্ছি। এসব শ্রব্যকল্পনার উৎসারে শুধুই শব্দের ধ্বনি আর অর্থের সাহিত্য অর্থাৎ মিলন বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়

হয়। মনে রাখতে হবে, সাহিত্য শব্দটির বুৎপত্তিতে অর্থ সহিতত্ব অর্থাৎ মিলন, এখানে শব্দের ধ্বনির সঙ্গে শব্দের অর্থের সাহিত্য ঘটেছে।

কবিতাটির বিস্তৃত পঙ্‌ক্তিভিত্তিক পাঠ-এ অগ্রসর হওয়ার আগে আমরা এ কবিতায় কালিদাসের কাব্য থেকে উড়ে-এসে-পড়া কয়েকটি বীজ থেকে কিভাবে চিত্রকল্প অঙ্কুরিত হয়েছে, এ বিষয়ে আলোচনা করে নিতে পারি। কালিদাস রবীন্দ্রনাথের আবাল্য প্রিয় কবি। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার মূল সত্তার গভীর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কালিদাসের কয়েকটি শ্লোক রবীন্দ্রমনের গভীরস্তরে প্রোথিত। তিনিও নিজেও যেসব সময় এ বিষয়ে সচেতন, তা-ও বলা যায় না। অধীত জগৎ কবির অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সক্রিয় হয়ে উঠেছে বারবার। 'ছবি' কবিতার ভাষায় তিনি কালিদাসকে অনায়াসে সম্বোধন করে বলতে পারতেন—

"ভুলে থাকা নয়, সে তো ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।"

'শাজাহান' কবিতার আরম্ভে দেখি, প্রিয়তমা মমতাজের মৃত্যুতে শাজাহান শোক বিকাশ। জীবনের এপার থেকে মৃত্যুর ওপারে শাজাহানের বিরহবার্তা নিয়ে চলেছে মেঘদূতের মতো তাঁর সৃষ্ট তাজমহল। তাজমহলকে 'নবমেঘদূত' বলার সঙ্গে সঙ্গে মেঘদূতের একটি শ্লোক আড়ালে আবডালে আভাসিত হয়েছে এ কবিতায়। তখন মৃত্যুলোকে লীনা মমতাজ সম্পর্কে শাজাহানকে সম্বোধন করে কবি বলেন ঃ

"যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে।"

কালিদাসের যক্ষও মেঘকে তার বিরহ শয্যালীনা বেদনায় কৃশা বিরহিনী প্রিয়া সম্পর্কে বলেছে ঃ

"আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষন্নৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।"

[৯৫ নং শ্লোক]

আসন্ন সূর্যোদয়ের রক্তচ্ছটায় রাত্রিশেষের অবশিষ্ট ম্লান চন্দ্রকলার মতো বিরহিনী যক্ষপ্রিয়া বিরহশয্যার একপাশে শায়িতা। মৃত্যুলোকে লীনা মমতাজের সঙ্গে চন্দ্রকলার উপমা 'শাজাহান' কবিতায় প্রত্যক্ষ নেই। শুধু বলা হয়েছে প্রভাতের তরুণার্করাগের সঙ্গে এই বিরহিনী মিশে আছে। তবুও বলতে ইচ্ছা করে, এমন কল্পনার সময়েও মেঘদূতের এই শ্লোকটি কবির বিস্মৃতির মর্মে রক্তে দোলা দিয়ে গেছে।

এ কবিতার অন্য কয়টি পঙ্‌ক্তিতে দিল্লীর ঐশ্বর্যের ক্ষয়িষ্ণুতার ভাবটি প্রকাশের সময় বিস্মৃতির মর্ম ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক রূপে রঘুবংশের দুটি শ্লোক আশ্চর্যভাবে। কালিদাসের এই মহাকাব্যে যখন অযোধ্যা এক পরিত্যক্তা নারীর রূপে এসেছে এবং অযোধ্যার পতিত দশার জন্য কুশকে দায়ী করছে, তখন সেই নারী মহারাজ কুশকে বলছে ঃ

"বিশীর্ণতল্পাট্টশতো নিবেশঃ পর্য্যস্ত শালঃ প্রভুনা বিনা মে।
বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্য্যং দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্॥"

[১৬/১০]

অযোধ্যায় শত শত অট্টালিকা জীর্ণ ও প্রাচীর ভগ্ন। অট্টালিকা ও প্রাচীরগুলিকে দিনাবসানের ঝড়ো হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন মেঘের মতো দেখাচ্ছে। 'শাজাহান' কবিতায় প্রায় একইভাবে কবি বলছেন ঃ

"রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারাগরক্তসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন।"

অস্ত সূর্যের রক্তরাগের মতো বজ্রতুল্য সুকঠিন রাজশক্তি বিলীন হয়ে যাক্, তাতে ক্ষতি নেই। সম্রাট শুধু তাঁর বেদনাকে অমর করার আকাঙ্ক্ষায় তাজমহল সৃষ্টি করেছিলেন। কালিদাসের অযোধ্যার বর্ণনায় দিনান্তের অস্তনিমগ্ন সূর্য, মত্ত বাতাসে ছিন্নভিন্ন মেঘ, ভগ্ন, প্রাচীর, জীর্ণ অট্টালিকায় এককালের ঐশ্বর্যের করুণ পরিণামে এক বেদনার আবহ ঘনিয়ে উঠেছে। 'শাজাহান' কবিতায়ও একই আবহ, উপকরণও কালিদাসের মতো দিনান্তবেলার। রঘুবংশের ঠিক পরের শ্লোকটিতেই শুনি ঃ

"নিশাসু ভাস্বৎ-কলনূপুরাণাং যঃ সঞ্চরোহভূদতিসারিকলাম্।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষভিঃ স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ॥"

[১৬/১২]

একদিন অযোধ্যায় অভিসারিকাদের কলমুখর উজ্জ্বল নূপুরধ্বনি শোনা যেতো। আজ কি না সেখানেই আমিষলোলুপ উল্কামুখ শৃগালের দল বিকট ধ্বনি তুলতে তুলতে রাজপথে ছুটছে। কালিদাসের অযোধ্যায় বা রবীন্দ্রনাথের দিল্লীতে একদিন ছিল সম্রাটের বিপুল বৈভব আর অনন্ত ঐশ্বর্য। কিন্তু আজ সব অতীতের স্মৃতিমাত্র। রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার দিল্লীর ধ্বনি সমৃদ্ধ জগৎ আজ কিভাবে বিলীন হয়েছে, তার স্মৃতিকরুণ আভাস দিতে বসে বলছেন ঃ

"বন্দীরা গাহে না গান;
যমুনাকল্লোল-সাথে নহবত মিলায় না তান;
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
মরে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।"

একদিন অযোধ্যায় অভিসারিকাদের আর দিল্লীতে পুরসুন্দরীদের নূপুরনিক্কণ শোনা যেত। কিন্তু আজ অযোধ্যায় উল্কামুখ আমিষলোলুপ শৃগালদলের বিকট শব্দ, আর দিল্লীতে ঝিল্লীস্বন। এভাবে দিল্লীর নীরবতাকে শৃগালের বিকট শব্দের পরিবর্তে ঝিল্লী ধ্বনি শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও কাব্যসম্মত করে তুলেছেন। ঝিল্লীস্বনে একটা উদাস নির্বেদের যবনিকা নেমে এসেছে অতীত দিনের সমস্ত ধ্বনির ঐশ্বর্যের ওপর। সেই ঝিল্লীর শব্দ যেন মহামৌনের ভাষ্য রচনা করছে।

কালিদাসের অযোধ্যার বর্ণনার ত্রিমাত্রিক দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ সমন্বিত ভাস্কর্যগুণের প্রতি

রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হলেন না। তাই তিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর স্বকীয় রোমাণ্টিক সংগীত গুণ। তিনি দিল্লীর বর্ণনায় বস্তু থেকে বস্তুত্ব নিষ্কাশন করে তাকে ভাবময় করে তুললেন। কালিদাস তাঁর অযোধ্যার বর্ণনায় বস্তুকে বস্তুর সীমায়ই রেখেছেন, ভাবময় করেন নি। এ কথা সত্য, তাঁর এই বস্তুক বর্ণনায় নির্বস্তুক ভাবের গূঢ় ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে আছে, যেমন এই ষোড়শ সর্গের চতুর্দশ শ্লোক নারীরূপিণী অযোধ্যাকে বলতে শুনি ঃ একদিন গৃহস্থদের গৃহপালিত ময়ূর ছিল। আজ সেসব ময়ূরের পালক দাবানল 'স্ফুলিঙ্গে দগ্ধঃ প্রাপ্তা দবোল্কাহত শেষ বর্হাঃ ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্।' এই রূঢ় শ্লোকটি একটি আধুনিক কবিতার মতো শোনাচ্ছে। ভেবে দেখতে হবে, কালিদাস ন্যূনতম পরিধিতে ব্যঞ্জনাময় বৃহত্তম ও মহত্তম আবেদন এখানে পাঠকচিত্তে সঞ্চার করেছেন। সর্বব্যাপী ক্ষয়ক্ষতির পটভূমিতে সুন্দরের অপচয়—এই ভাবটিকে ময়ূরের অগ্নিদগ্ধ পালকের সীমায়ই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ময়ূরের এ দশায় কালজীর্ণ সুন্দরের বেদনা চিরদিনের জন্য করুণাও হয়ে রইল। কালিদাসকে ক্লাসিক কবি বলার সময়ও তার রোমাণ্টিক স্বভাবের কথা ভুললে চলবে না। দগ্ধপালক ময়ূরের বর্ণনায় কালজীর্ণ সুন্দরের অপচয়ের ভাবটি যিনি আমাদের মনে জাগিয়ে তোলেন, তিনি কি রোমাণ্টিক কবি নন? আর রবীন্দ্রনাথ তো ঝিল্লীস্বন শুনিয়ে শ্রুতির অগমতীরে এক মহামৌনে পরম নৈঃশেষে নিয়ে গেলেন। এ সবই সম্ভব হয়েছে এই রোমাণ্টিক কবি শ্রেষ্ঠের কল্পনার বৈভবে।

'শাজাহান' কবিতায় কালিদাস প্রসঙ্গের শেষে একটি কথা বলা উচিত। আমরা এ কবিতার বিশেষ বিশেষ চিত্রকল্পকে রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারে কালিদাসের কাছ থেকে উৎসারিত বলার সময়ও সম্পূর্ণ সচেতন যে এমনটি সব ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। তাতেও ক্ষতি নেই। কেননা রবীন্দ্র-কবিতাকে আরেকজন মহান কবির কাব্যের পটভূমিতে স্থাপন করে বরং পাঠক হিসাবে আমাদের দৃষ্টি বিস্তার লাভ করবে। এই দৃষ্টির বিস্তার রবীন্দ্র-কবিতা আরও গভীরভাবে অনুধ্যানের সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস করি।

এবারে প্রতিটি পঙক্তি ধরে ধরে কবিতা পাঠ ও আলোচনা। কিন্তু এরই মধ্যে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। তাই যথাসম্ভব পুনরুক্তি বাদ দিয়ে কবিতা পাঠে অগ্রসর হওয়া যাক। প্রারম্ভিক দুটি চরণের আলোচনা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে আগেই করা হয়েছে। এই বক্তব্যনিষ্ঠ চিত্রকল্পরিক্ত আরম্ভটির গদ্য রূপ করলে দেখি, তা আর কবিতা থাকছে না। ভারত-ঈশ্বর শাজাহান এ কথা তুমি জানিতে, কালস্রোতে জীবন যৌবন ধন মান ভেসে যায়—এভাবে গদ্যে সাজালে কোনও শব্দ বাদও পড়ে না, জুড়তেও হয় না। তা সত্ত্বেও এ যে কবিতা থাকে না, তার কারণ গদ্যে শব্দগুলির বিন্যাস বদলে যায়। কবিতাকে কোলরিজ বলেছিলেন সর্বোত্তম বিন্যাসে সর্বোত্তম শব্দ পরম্পরা। এই সদুক্তির সার্থকতা বোঝা যায় 'শাজাহান' কবিতার এই আরম্ভের গদ্য রূপান্তরে। শাজাহান তাঁর জীবন-যৌবন ধনমান ক্ষণস্থায়ী জেনে মমতাজের মৃত্যুতে তাঁর বেদনাকে শুধু অমর করে রাখতে চেয়েছিলেন সৃষ্টি তাজমহলে। তিনি জানতেন অস্তসূর্যের রক্তাভার মতো বজ্রসুকঠিন রাজশক্তি বিলীন হয়ে যাক তো যাক্, প্রিয়তমার মৃত্যুতে তাঁর দীর্ঘশ্বাস চিরকাল উচ্ছ্বসিত হয়ে আকাশকে করুণ করে তুলুক। এই আশায় তিনি তাজমহল গড়েছিলেন। ভেবেছিলেন তাজমহলে তাঁর দীর্ঘশ্বাস নিত্য উচ্ছ্বসিত হবে। হীরা মুক্তামাণিক্যের যে-অতুল ঐশ্বর্য ছিল, তা জাদুকরের কুহকের মতো বা দিগন্তে রামধনুর বর্ণচ্ছটার মতো বিলীন হয়ে যায় তো যাক। তাঁর আশা ছিল, তাঁর মর্মব্যথার সমব্যথী মহাকালের কপোলে একবিন্দু অশ্রুর মতো টলমল করবে

শুভ্র সমুজ্জ্বল এই তাজমহল। তিনি জানতেন না, মহাকাল কারও ব্যথায় অশ্রুপাত করে না। কবিতার শেষদিকে এই ভাবনা যে রূপ পাবে, তার একটা পূর্বাভাস এখানে রয়ে গেছে। মহাকালের গাল বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল যখন গড়িয়ে পড়ে যাবে, তখন কোথাও এই বেদনার চিহ্নমাত্র থাকবে না। বেদনাকে অমর করে রাখার গৌরব শেষ পর্যন্ত বাঁক নিল। এই বাঁক অপ্রত্যাশিত ছিল না যদি মনে রাখি এক বিন্দু নয়নের জলের মতো তাজমহলের এই অমোঘ চিত্রকল্পটির কথা।

দ্বিতীয় স্তবকে জীবন ও প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তনমান রূপপরম্পরা উন্মোচিত হয়েছে। ভুবনের ঘাটে ঘাটে জীবনের খরস্রোতে ভেসে চলা, এক হাটে বোঝা নেওয়া, আর অন্য হাটে শূন্য করে দেওয়া—এই নদী-ঘাট-হাট-বাটে কেনাবেচার লৌকিক চিত্রকল্পে কবিতার মূল ভাবটি পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে। আরম্ভের কালস্রোতে ভেসে যাওয়ার কল্পনার মধ্যেই এসব কল্পনার সম্ভাবনা নিহিত। খরস্রোতের রূপকল্পনার পরেই প্রকৃতিতে ঋতু পর্যায়ের দ্রুত পরিবর্তনমান ছবির পর ছবি এসেছে। শুধু বসন্ত আর হেমন্তের আভাসই এখানে পাই। অন্য ঋতুগুলির উল্লেখ মাত্র নেই। আগেই বলেছি প্রকৃতির বসন্ত আর জীবনের যৌবন ও প্রেম দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণ অংশে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দক্ষিণে যৌবন, কুঞ্জবনে জীবন, মন্ত্রগুঞ্জরণে প্রেমের গুঞ্জন, মালঞ্চ ও মাধবীমঞ্জরীতে প্রেমের ব্যঞ্জনা আছে। বসন্ত যৌবনের ঋতু, প্রেমের ঋতু। দক্ষিণের ফুরফুরে বাতাসে মাধবী মঞ্জরীভরা মালঞ্চের অঞ্চল চঞ্চল হয়ে ওঠে। যে মুহূর্তে সেই চঞ্চল আঁচল ফুলে ফুলে ভরে ওঠে, সেই মুহূর্তেই ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ার করুণ সুর শোনা যায় বসন্তের বিদায় গোধূলিতে। এমন যে পুষ্পিত সুন্দর বসন্ত, তাকেও বিদায় নিতে হয়, যেমন হারিয়ে যায় জীবনে যৌবন ও প্রেম। বসন্ত থেকে তিনটি ঋতু ডিঙিয়ে কবির কল্পনা হেমন্তের শিশিররাত্রে ফোঁটা কুন্দমুলে সাজানো অশ্রুভরা আনন্দের সাজির রূপে চলে এলো। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির পুষ্পার্ঘে যে চলচ্ছবি দেখতে পেলাম, তার কোথাও স্থায়িত্বের স্বাক্ষর নেই। ফুল যেমন ফোটে, আবার তেমনি ঝরেও পড়ে। এমনই চলেছে জীবনেও। জীবনের সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়। এখানে এই মুহূর্তে পাওয়া, পর মুহূর্তেই হারানো। এই জীবনের ধর্ম।

সম্রাট প্রকৃতির জীবনের এই নির্মম সত্যটি জানতেন। তাই তিনি শঙ্কিত হৃদয়ে সৌন্দর্যের সম্মোহিনী শক্তিতে ভুলিয়ে সময়ের হৃদয়-হরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি সর্বহর সময়কে বশ মানাবেন এই আশায় মমতাজের মৃত্যুকে তাজমহলের অপরূপ সাজে সাজিয়েছিলেন। মৃত্যু রূপহীন। কেননা মৃত্যুর অচিন লোকে সব চিহ্ন হারিয়ে যায়, তার রূপহীনতায় সব রূপ লুপ্ত হয়। মমতাজের এমন রূপহীন মরণকে তাজমহলের মৃত্যুহীন অপরূপ সৌন্দর্যে শাজাহান চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছেন। রূপময় তাজমহল সৃষ্টি করে তিনি রূপহীন মৃত্যুকে বরণ করেছেন। করেও মৃত্যুতেই বিলাপের না। এ সত্য শাজাহান জানতেন বলেই তাঁর বেদনাশুদ্ধ হৃদয়ের অশান্ত ক্রন্দনকে তাজমহলের কঠিন পাষাণ বন্ধনে চিরকালের নীরবতার জালে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাঁর কান্না তাজমহলে নীরব হয়ে থাকুক এ আশা তাঁর ছিল। জ্যোৎস্নারাত্রে নিরালা ঘরে যে নামে তিনি প্রেয়সীকে ডাকতেন, যে-নাম শুধু তাঁদেরই জানা ছিল, যে-নাম প্রেমে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হতো, সেই নামের ডাক তিনি অনন্ত মহাকালের কানে এই তাজমহলে রেখে গেলেন। প্রেমের করুণ কোমলতা তাজমহলের প্রশান্ত প্রস্তরে

সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে ফুটে উঠেছে।—'প্রেমের করুণ কোমলতা ফুটিল তা'—এখানে 'কোমলতা' একটি শব্দের সঙ্গে 'ফুটিল তা' দুটি শব্দের অন্ত্যমিল 'ল' ও 'তা' দুটিতেই। এই অন্ত্যানুপ্রাস অপ্রত্যাশিতের চমক সত্ত্বেও এমন সাবলীল যে এই মিল ফুরোনোর পরও তার অফুরান রেশ বাজতে থাকে। এই অন্ত্যানুপ্রাসের কারুকার্য 'ফুটিল' ও 'তা' র মাঝখানকার নিভৃত ফাঁকটুকুতে। তারপরই শাজাহানকে সম্রাট কবি বলে সম্বোধন। এই কবির কাব্য এক নব মেঘদূত এবং তা এই তাজমহল। মেঘদূত উড়ে চলেছে রামগিরি থেকে অকালপুরীর পথে নদনদী নগর জনপদের ব্যবধান অতিক্রম ধরে বিরহী যক্ষের বার্তা নিয়ে যক্ষপ্রিয়ার উদ্দেশ্যে। তাজমহলও উড়ে চলেছে জীবনের এপার থেকে মৃত্যুর ওপারে মমতাজের উদ্দেশ্যে শাজাহানের এই বার্তা নিয়ে—'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।' সেখানে যে সূর্য এখনও, ওঠেনি, সেই সূর্যের রক্তাভাসের মধ্যে মমতাজ মিশে আছেন মৃত্যুর ওপারে। কবিতার এই 'প্রভাতের তারুণ-আভাসে' কি এমন ইঙ্গিত আছে যে জীবনপান্থ শাজাহানের সঙ্গে তাঁর অনন্তপথযাত্রায় মমতাজের পুর্নমিলন হবে? আবার এমন ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে জীবনের বাঁধা গণ্ডি পেরিয়ে মমতাজ আজ সৌন্দর্যের অগম তীরে পৌঁছেছেন। সেই অগম তীরে মানুষের ভাষা পৌঁছায় না। সেখানে আমাদের দৃষ্টি পৌঁছোয় না। তাই কাঙাল নয়ন সেখান থেকে ফিরে ফিরে আসে। সেই অগম লোককে মৃত্যুলোক ধরে নিলে ভাষা ও দৃষ্টির অতীত কথাগুলির অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তা কি এখানে কবি বলেছেন? মনে হয় এখানে এমন ইঙ্গিত আছে, যা কিছু গভীর সৌন্দর্য তার আভাস যেখানে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, সেখানে মমতাজ আছেন। তিনি সৌন্দর্যের আদি প্রতিমা। সেই আদিপ্রতিমার আভাস মেলে উষার তরুণার্ক রাগে, 'ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে', 'পূর্ণিমার দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে।' উষায় সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায় যেখানে যা কিছু অস্পষ্ট অবস্থা রহস্যমেদুব, সেখানেই মমতাজ মিশে আছেন। চামেলি আর জ্যোৎস্না একাকার হয়ে যায়। চামেলির রঙ জ্যোৎস্নায় পৃথক রূপে চোখে পড়ে না। প্রকৃতির মায়াবী সৌন্দর্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মমতাজের উদ্দেশ্যে তাজমহল শাজাহানের 'ভুলি নাই' বার্তা নিয়ে চলেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিভৃত অন্তঃপুর আমাদের কল্পনাকে জাগায়, কিন্তু কখনই সেখানে আমরা সশরীরে পৌঁছাতে পারি না, সেখানে কল্পনাকেই দূত করে পাঠানো যায়, যেমন পাঠিয়েছেন যক্ষ মেঘকে অথবা শাজাহান তাজমহলকে। সৌন্দর্যদূত তাজমহল কালের প্রহরী এড়িয়ে নীরব বার্তা নিয়ে চলেছে সৌন্দর্যের সেই অগমতীরে। কাল সেই সৌন্দর্যদূত তাজমহলকে এতোটুকু জীর্ণ করতে পারে নি।

মহারাজ শাজাহানের চিহ্নমাত্র আজ কোথাও নেই। তাঁর রাজ্য আজ স্বপ্নের মতো বিলীন। তাঁর যে সৈন্যদলের গর্বোদ্ধত পদক্ষেপে পৃথিবী কাঁপতো, তাদের স্মৃতি শুধু আজ বাতাসে দিল্লীর পথের ধূলির ওপর উড়ে যায়। সম্রাটের বন্দনা গাইতো যে বন্দীদল, তারা আজ নেই। যমুনার কল্লোলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে নহবত বাজতো, তা আজ নীরব। প্রাসাদের কোণে কোণে একদিন বেগমমণ্ডলীর নূপুর নিক্কণ শোনা যেত, আজ তা শোনা যায় না। নূপুরনিক্কণের পরিবর্তে আজ রাত্রির আকাশ শুধু ঝিল্লীঝঙ্কৃত হচ্ছে। ঝিল্লীস্বনে দিক থেকে দিগন্তে উদাস নির্বেদের ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন বৈভব যেখানে স্মৃতিমাত্র, তার সঙ্গে এই ঝিল্লীধ্বনির এক নিবিড় যোগ। ঝিল্লীধ্বনিতে মন শুধু হু হু করে ওঠে। একদিনকার

ঐশ্বর্য আজ কী শূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছে! এই অনুভূতিতেই হৃদয় শুধু খা খা করতে থাকে। রাজ্যের ভাঙা ও গড়া, জীবনের উত্থান ও মরণের পতন সব তুচ্ছ করে শ্রান্তিক্লান্তিহীন অমলিন চিরভাস্বর এই তাজমহল বিরহীর এই বার্তা নিয়ে চলেছে—'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

তারপরই কবিতা বাঁক নিল। না, 'ভুলি নাই'—এ কথা সত্য নয়। কে বলে স্মৃতির খাঁচায় সব স্মৃতি তিনি বন্দী, করে রেখেছেন? অতীতের মৃত্যুর চির অন্ধকার তাঁর হৃদয় বেঁধে রেখেছে! এ কি হতে পারে? এভাবে কি স্মৃতিকে খাঁচায় পুষে রাখা যায়? বেদনার অন্ধকার হৃদয়ে বেঁধে রাখা যায়? সমাধি মন্দির পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ধূলির ওপর রচিত হয়েও চিরকাল স্থির হয়ে রইল একস্থানে। স্মরণের আবরণে মরণকে যত্নে ঢেকে রেখেছে! তাজমহল সেই স্মৃতির আবরণ। তাতে ঢাকা পড়েছে মমতাজের মৃত্যু। জীবনকে কে কবে মৃত্যুর মধ্যে স্থবির করে রাখতে পেরেছে? একি আদৌ সম্ভব? জীবনকে আকাশের প্রতি তারা ডাকছে। আমরা 'আগে বলেছি, দেশে বিদেশে এমন বিশ্বাস থেকে অনেক পৌরাণিক গল্প রচিত হয়েছে যে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা আকাশের তারা হয়ে জ্বলতে থাকে। এই পৌরাণিক অনুষঙ্গ এখানে থাকতে পারেন—'জীবনের কে রাখিতে পারে?/আকাশের প্রতি তারা—ডাকিছে তাহারে'। শাজাহানকে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা'র কথা বলেছিলেন। এই মানবাত্মাকে কোনও গণ্ডীতে বাঁধার উপায় নেই। এমনকি সেই আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলই সীমা ভেঙে ভেঙে। মৃত্যু পেরিয়ে আত্মার যাত্রা চলছে অব্যাহত। রাত্রির আকাশে তারায় তারায় মৃত্যুর রূপ। আবার মৃত্যু শেষে প্রভাতের আলোয় জীবনের দীপ্ত রূপ। তাই জীবন চলেছে পূর্ব দিগন্তের আলোর দিকে। মৃত্যুর তারকাখচিত নৈশ অন্ধকার এক সাময়িক পর্যায়মাত্র। তাই চিরকালের জীবনের প্রতিনিধি মানবাত্মার প্রতিভূ স্মৃতির গ্রন্থি ছিন্ন করে বন্ধনবিহীন হয়ে বিশ্ব পথে চলেছেন। কোনো মহারাজা তাঁকে কোনোদিন ধরতে পারে নি, সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বীর বন্ধনে তিনি বাঁধা পড়েন নি। এই পৃথিবী জীবনের ভোজে এক মৃৎপাত্র মাত্র ছিল। ভোজ শেষে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মতো তিনি পৃথিবীকে ফেলে চলে গেছেন। তাঁর কীর্তি তাজমহলের চেয়ে তিনি মহৎ। তাই তাঁর জীবনের রথ কীর্তিতে পশ্চাতে ফেলে বারবার এগিয়ে যায়। সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা বড়। চিরপথিক শাজাহানের অস্তিত্ব আজ কোথাও নেই। শুধু তাঁর চিহ্ন, তাঁর সৃষ্টি পড়ে আছে। মমতাজের প্রতি প্রেম তাঁকে স্থবির করতে পারে নি। এই প্রেম তাঁকে পথ চলায় প্রেরণা দিয়েছে। যে-প্রেম বিলাসের সম্ভাষণ জানায়, পথের মধ্যে সিংহাসন পাতে, তাঁকে পথ চলতে দেয় না. বিলাসে মত্ত করে, তাকে তিনি পথের ধুলোয় ফিরিয়ে দিয়েছেন, এই বন্ধনে জড়ানোর প্রেমকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। এই চিরপথিক মানব প্রতিনিধি শাজাহানের জীবনের মাল্য থেকে খসে পড়া একটি বীজ উড়ে এসে পড়েছিল ধূলির ওপর। তাঁর প্রেমের সেই বেদনার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে তাজমহলের রূপ নিয়ে আকাশে মাথা তুলে যা বলছে তা কবিতার শেষ কয় পঙ্‌ক্তিতে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রয়েছে। তাজমহল বলছে যে স্মৃতিভারে পড়ে আছে। কিন্তু সে স্মৃতিকে আত্মসাৎ করা বিস্মৃতির বৈরাগ্যমন্ত্রে বা বৃহৎ অনুরাগের মন্ত্রে দীক্ষিত চিরপথিক ক্ষুদ্র অনুরাগের বন্ধন ছিন্ন করে পথে চলেছেন। সে পথে রাত্রির লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ঝরে পড়ার গানে প্রসন্ন প্রভাত আসন্ন হয়ে ওঠে। তারা

ঝরা আকাশের পূর্বদিগন্তে প্রভাত এসে দেখা দেয়। বিরহিনী প্রিয়া প্রভাতের অরুণ আভাসে মিশে আছেন, শাজাহানের জীবনের উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ উচ্চারিত হচ্ছে 'নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে', তাঁর রথ চলেছে 'রাত্রির আহ্বানে/নক্ষত্রের পানে। প্রভাতের সিংহ দ্বার-পানে'।—কবিতার এই তিনটি অংশে রাত্রি শেষে প্রভাতের চিত্রকল্প দেখি। তিমির বিদারী আলোর উদার অভ্যুদয়ের এই রূপকল্পনায় মৃত্যুর অন্ধকার পেরিয়ে মানবাত্মার অব্যাহত যাত্রার প্রতি ইঙ্গিত আছে। তাজমহল স্মৃতির বোঝায় ন্যুব্জদেহ। তাই সে স্থির হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তাজমহলের স্রষ্টা শাজাহান ভারমুক্ত। তাই তিনি চিরপথিক।

॥ দুই ॥

কবিতার আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ নিজে অধ্যাপনাকালে বলাকার কবিতাগুলির যে আলোচনা করেছেন তখনকার দিনের ছাত্র এবং এখনকার দিনের কিছু কৃতী পুরুষ তা সংগ্রহ করে রেখেছেন। স্বয়ং কবিকৃত আলোচনার চেয়ে ভাল আলোচনা আর কিছুই হতে পারে না, তাই কবির নিজের সেই আলোচনাই এখানে উদ্ধার করা হল।

গতিই জগতের মূল সত্য। এই গতি আছে বলেই কোথাও কোনো মলিনতা জানতে পারে না। জমলেই তখন মৃত্যু এসে সব ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দিয়ে যায়। মৃত্যু ছাড়া জগতের শুদ্ধি থাকে না। কাজেই মৃত্যু অপরিহার্য। অথচ মৃত্যুই সব বিচ্ছেদ ও বেদনার মূলে। শাজাহানের সেই মৃত্যুবেদনার প্রকাশ এই তাজমহল। এই অপূর্ব রচনার দ্বারা তিনি মনের এই ঘোষণাটি রেখে যেতে চান—ভুলি নাই, ভুলি নাই। মৃত্যুর বাধা সত্ত্বেও ভুলি নাই, এই কথাটি যেন চিরদিন থেকে যায়। এই স্মৃতিবেদনার মূলে প্রেম রয়েছে বলেই তার গৌরব। প্রেমের সেই গৌরবেই তাজমহল ধন্য। শাজাহানের সাম্রাজ্যও এই গৌরব দাবি করতে পারে না। শাজাহানের প্রেম বেদনাই তাজমহলকে সত্য করে তুলেছে, নইলে তাজমহল তো একটা বহুমূল্য পাষাণ স্তূপ মাত্র, তা তার মধ্যে যত রচনা কৌশলই থাক না কেন।

আসলে রবীন্দ্রনাথ নিজের করা ব্যাখ্যার সাহায্যে কবিতাটি তাঁরই মত করে বিচার করলে বলা যায়, শাজাহান জানতেন যে জীবন যৌবন ধনমান সবই মিথ্যে, কালের স্রোতে সবই ভেসে যায়। অথচ তিনি এও জানতেন যে, অন্তরের প্রেমটিই সত্য, তাই প্রেম-বেদনাও সত্য। সেই অন্তর-বেদনাকেই তিনি চিরন্তন করে রাখতে চাইলেন। শক্তিকে উপেক্ষা করে প্রেমকেই কালজয়ী করতে চাইলেন। শক্তিকে যদি চিরস্থায়ী করে রাখতে চাইতেন তবে তারও বহুক্ষেত্র ও উপায় ছিল। কিন্তু শক্তির চেয়ে প্রেমকেই চিরন্তন ও মহনীয় বলে জেনেছিলেন। তাঁর রাজশক্তিকে সাধারণ লোক যতই সুদৃঢ় মনে করুক না কেন, তিনি জানতেন তার চেয়ে অলীক ও অনিত্য জিনিস আর কিছু নেই। তাই তাঁর মনের আন্তরিক কামনা এই ছিল যে, এই রাজশক্তি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রেম-বেদনার এই দীর্ঘশ্বাসটি যেন অনন্তকাল মূর্তিমান হয়ে থাকে। কারণ মণিমাণিক্য বৈভব যাদুকরের মায়ার মত—তার জন্য কোন মমতা শাজাহানের ছিল না, অনন্তকাল ধরে একবিন্দু অশ্রুর দীপ্তি নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাক তাজমহল, এই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা।

অবিচ্ছিন্ন কালে জীবনের গতির সঙ্গে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-ভালবাসার একটা স্পষ্ট বিরোধ আছে। প্রেম চায় প্রিয়জনের কাছে বদ্ধ হয়ে থাকতে, কিন্তু জীবনের স্রোত সে অবকাশ দেয় না কোমল অনুভূতিগুলিকে। জীবনের খরস্রোতে আমরা এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে এগিয়ে যাই, এক ঘাটের সঞ্চিত সম্পদ শূন্য করে দিই অন্য ঘাটে এসে। মিলনের সঙ্গেই তাই আছে বিদায়। বসন্ত যে মুহূর্তে সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে সাজিয়ে তোলে নিজেকে, সেই মুহূর্তেই আসে তার যাবার লগ্ন। কিন্তু প্রকৃতি তাতে ক্ষুব্ধ নয়, শীতের হিমেল স্পর্শ নিয়ে অবারিত আবেগে সে আবার মন্দ্রিত করে হেমন্তের ডালি। প্রকৃতির দৃষ্টান্ত যতই দেওয়া হোক আসলে তা রূপক মাত্র—মানুষের হৃদয়ই এখানে কবির প্রকৃত লক্ষ্য। হৃদয় যখন এক বেদনায় কাতর তখনই তাকে নতুন করে তৈরি হতে হয় নতুনতর মিলনের জন্য।

এই নিত্য বিচ্ছেদ ও মিলনের খেলায় কিছুই যখন স্থায়ী নয়, তখন শাজাহান চেয়েছিলেন এক বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে যদি মহাকালের হৃদয় হরণ করা যায়, অর্থাৎ তাঁর তাজমহলকে কিছু স্থায়িত্ব দেওয়া যায়। কারণ, কালকে ফাঁকি দিয়ে টিকে থাকবার অধিকার কর্তৃত্বের নেই, শক্তির নেই, বৈভবের নেই—আছে সৌন্দর্যের। ইংরেজ কবি কীট্‌স্‌ তাই বলেছেন "A thing of beauty is a joy for ever." শাজাহান তাই অশান্ত ক্রন্দনে নিজের প্রেমকে প্রকাশিত না করে সৌন্দর্যের চির মৌন জাল দিয়ে সেই হৃদয় বেদনাকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। ফলে যে বেদনা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত, তা এখন ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বিশ্বগত হয়ে পড়েছে। পাথরের বুকে সে প্রেম অঙ্কিত হয়েও তার কোমলতা হারায় নি।

কবি 'মেঘদূত' কাব্যের সঙ্গে শাজাহানের এই তাজমহল রচনার তুলনা করেছেন। মর্ত্যলোক থেকে এই স্বর্গভ্রষ্ট বিরহী যথা একদিন মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিল স্বর্গে। কবির সেই মেঘদূত যেমন মন্দাক্রান্তা ছন্দে অগম্য অলকাপুরীর দিকে উড়ে যেতে পেরেছিল, তেমনি শাজাহানের অরূপ প্রেমও যেন সৌন্দর্যের ছন্দে অনন্তলোকের দিকে যাত্রা করেছে—সম্ভবতঃ এই কথাই কবি বলতে চান। বিরহী যক্ষের বিরহকে চিরদিনের মত অম্লান করে ধরে রেখেছে মেঘদূত কাব্য, শাজাহান যে তাঁর প্রিয়া মমতাজমহলকে ভোলেন নি, সেই বার্তা বুকে ধারণ করে রেখেছে সৌন্দর্যের অমর সৃষ্টি তাজমহল।

কবি মনে করেন, শাহাজাহান বিবেচকের কাজই করেছেন। একদিন ভারত-ঈশ্বর হলেও, কালক্রমে 'জীবন যৌবন ধনমান'—সবই হারিয়ে গেছে, শাজাহানের পরাক্রমী সিংহাসন আজ লুপ্ত; যে সৈন্যের পদভারে মেদিনী কম্পিত হতো একদিন, আজ দিল্লীর আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু তাদের স্মৃতি। কিন্তু নিজ হৃদয়ের প্রেমের যে মলিন বার্তাবহ শাজাহান সৃষ্টি করেছেন তার মৃত্যু নেই—সে আজও সেদিনের মতই ঘোষণা করে চলেছে অমর প্রেমিক শাজাহানের সেই বিরহ বার্তা—আজও তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি তাঁর প্রেমিকাকে।

এর পরেই কিন্তু কবির চিন্তার ক্রম পরিবর্তিত হয়েছে। কবি নিত্য ধাবমান মানবাত্মার কথা স্মরণ করেছেন—যে আত্মা মরণের সিংহদ্বার পার হয়ে হয়ে অবিরত চলে মহাজীবনের পথ পরিক্রমায়। এই মানবত্ব কোন বন্ধনেই আবদ্ধ থাকে না, কারণ যে-কোন দুর্বলতায় আটকে পড়লে তার যাত্রা হয় বিঘ্নিত। তাই যে বিশাল মানবাত্মার একটি খণ্ডিত অংশমাত্র শাজাহান, সেই শাজাহান যেখানে মানব জীবনের প্রতিনিধি সেখানে তাঁর পরিচয় সম্রাট শাজাহানের চেয়েও মহত্তর। সম্রাট শাজাহান তাঁর প্রেমিকাকে বিস্মৃত হতে পারেন নি, তাই

নিজের অতুল বৈভব দিয়ে তিনি বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছেন প্রেমিকার প্রতি তাঁর অবিস্মরণীয় প্রেমের ঐশ্বর্য। কিন্তু যে শাজাহান মানুষ তিনি কখনো এই স্মৃতির ভারে মৃত্যুর পরও তাঁর অমলিন আত্মাকে ভারবদ্ধ করে রাখতে পারেন না। তাই শাজাহানের এই স্পর্ধিত উক্তি কবির মিথ্যা বলে মনে হয়, তিনি বলেন,

"সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রয়ে চিরস্থির;
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণের যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনের কে রাখিতে পারে?"

তাই শাজাহান যেখানে বন্ধনমুক্ত মানব সেখানে জীবনের উৎসব শেষে মৃত্যু নামক ক্ষণচ্ছেদে এক জন্মের পরিচয়কে মৃৎপাত্রের মত খুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি চলে যান বিস্মৃতির আশীর্বাদ নিয়ে নিজের যাত্রাপথে। দেহের পর দেহকে অতিক্রম করে আত্মা প্রমাণ করে সে দেহের চেয়ে মহত্তর, নিজের কীর্তিকে অতিক্রম করেই শাজাহান একথা প্রমাণ করেছেন যে তিনি তাঁর কীর্তির চেয়ে অনেক বড়।

এই চিন্তাটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনাতেও আত্মপ্রকাশ করেছে। পুরুষ-প্রকৃতির লীলায় করুণ এই বিশ্বজগতে আত্মা কোনদিনই দেহকে বেঁধে রাখতে পারে নি বলে তিনি দেখিয়েছেন। এখানে বার বার শুনতে হয় 'যেতে নাহি দিব' তবু শেষ পর্যন্ত সে বাধায় কোন কাজ হয় না—'কিন্তু হায়, যেতে দিতে হয়।' বিদায় অভিশাপ কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শত অনুরোধ, উপরোধ, অভিশাপেও দেবযানী কচকে ধরে রাখতে পারেন নি। নিত্য কাল লোকে লোকান্তরে সেই নিত্য পথিকের নিমন্ত্রণ—অতীতের চির-অস্ত-অন্ধকারে বদ্ধ হয়ে স্থান বিশেষে সে থাকতে পারে না। সেই জন্যেই কবি বলেছেন—

'মহারাজ, কোনো মহারাজ কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে;'

কবির বক্তব্যের আর একটি প্রসঙ্গ আছে। প্রেমের বিলাস শাজাহানকে ধরে রাখতে পারে নি বলেই তাজমহল মিথ্যা হয়ে গিয়েছে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। মহাজীবনের পথ পরিক্রমায় এক জীবনে যে জীবন-বীজ খসে পড়েছে সেও অমর। যেদিন প্রেমলীলা আর বিলাস ছেড়ে দীনহীন পথের ধূলা হতে পারে সেদিন সে জীবনের বীজকে ফুটিয়ে তুলবার অধিকার পায়। সেই নবোদগত জীবন তখন আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখে যে-পথিক এই বীজ ফেলেছিল আজ সে এখানে নেই। আসলে, সে যদি এক জীবনের মানুষ বা Individual হিসাবে স্মৃতিতে বদ্ধ থাকতো তবে তার বিরাটত্ব ক্ষুণ্ণ হতো, রূপের সীমা অতিক্রম করতে পারে বলেই সে বিরাট।

কবি মনে করেন শাজাহানের মানবাত্মার সেই বিরাট ব্যাপ্তির পরিচয় দিয়েছে। প্রিয়ার প্রেম তাঁর পথ রোধ করতে পারে নি, প্রতাপের আস্ফালন এবং বৈভবের অহঙ্কার তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি সমুদ্র-পর্বতও সেই মানবাত্মার রথ ছেড়ে দিয়েছে নক্ষত্রের গান গেয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে চলেছে প্রভাতের সিংহদ্বারের দিকে। মানুষের মধ্যে যে সত্তা অহংবোধ পীড়িত, সেই এখানে পড়ে থাকে যে অনন্ত পথের যাত্রী—ভারমুক্ত হয়ে সে ঠিক তার যাত্রাপথে ফিরে যায়।

'বলাকা' কাব্যের অন্তর্গত এই কবিতাটি কেন্দ্র করে সমালোচকদের অনেক বাদানুবাদ লক্ষ্য করা গিয়েছে। কবিতার কিছু কিছু অংশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি সাধ্য, সেই কারণেই সেই অংশগুলি নিয়ে বিতর্কও খুব বেশি। কবিতার সবকটি পর্যায়ই যে সহজবোধ্য, এ কথা সত্য নয়—কিন্তু সাধারণভাবে এর অর্থ অনুভব করা খুব কষ্টকর নয়। বলাকা কাব্যগ্রন্থের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিতা 'ছবি'-র সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্যও আছে। আবার পার্থক্যও আছে। বলা যেতে পারে 'ছবি' এর পরিপূরক বা complementary কবিতা, 'ছবি' কবিতায় দেখি, স্মৃতি জীবনের সঙ্গে মিলতে গিয়ে বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যায়; ভালই হয়, কারণ স্মৃতিগুলি সব সজীব থাকলে আমরা তার ভারে নিষ্পেষিত হতাম। খাদ্য যেমন দেহে প্রাণশক্তি উৎপাদন করে তেমনি জীবনের মধ্যে হাজার হাজার ঘটনা আছে—তারা একসঙ্গে সমীভূত হয়ে আমাদের প্রাণরস উৎপাদন করে। ঘটনাগুলি স্বতন্ত্রভাবে হারিয়ে গেলেও তারা প্রকৃতপক্ষে হারিয়ে যায় না—নামরূপ বা form ত্যাগ করে তারা মর্মে গিয়ে মেশে। এই সত্যকেই দুটি কবিতায় দুদিক থেকে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—"সত্য বিরাট বলেই তাঁর চিরন্তন গতিপথে অসংখ্য স্থানগত ও কালগত নব স্বরূপকে সে ত্যাগ করে অতিক্রম করে যাত্রা করে। কোন্ মধ্যবর্তী বস্তু (medium) তার পথরোধ করতে পারে? আর যেসব অতিক্রান্ত স্বরূপ বিস্মৃত হলেও ব্যর্থ নয়। ফলের মধ্যে ফুল বিস্মৃতরূপে বিরাজিত। নইলে সে চিরকালই ব্যর্থ থাকত। বিরাট যদি কোনো একটি বিশেষ বিগ্রহেই সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ হত তবে তার বিরাটত্বের কোনো অর্থই থাকত না।"

॥ তিন ॥

সার-সংক্ষেপ

(প্রথম স্তবক)

হে ভারত ঈশ্বর শাজাহান এ কথা তুমি ভাল করেই জানতে যে, যৌবন, ঐশ্বর্য প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী। তাই কেবল তোমার অন্তরের বেদনাই তুমি চিরস্থায়ী করে রাখতে চেয়েছিলে। সাম্রাজ্য মিলিয়ে থাক, তাতে তোমার কোন আক্ষেপ নেই, তোমার হৃদয়ের করুণ দীর্ঘশ্বাসকে তুমি নিত্য উচ্ছ্বসিত করতে চেয়েছো। এক ফোঁটা চোখের জলের প্রতিরূপ হিসাবেই তুমি গড়ে তুলতে চেয়েছো তোমার তাজমহল।

(দ্বিতীয় স্তবক)

কিন্তু জীবনের গতি এমনই তীব্র যে মানবিক অনুভূতির মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকলে তো তার চলে না। ফলচক্রে জীবন যে ভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে তাতে পেছনে ফিরে তাকাবার কোন অবকাশ নেই। মৃত্যুর ঘাটে ঘাটে জীবনতরী স্পর্শ করে এগিয়ে চলে। এক জীবনে প্রাচুর্য, স'পদ যেই তাকে পূর্ণ করে তোলে, তখনই সেই জীবন থেকে বিদায়ের মানও এগিয়ে আসে। তুলনা করা যায় প্রকৃতির ঋতুচক্রের সঙ্গে। বসন্ত যখন মালঞ্চ ভরে তোলে তার পুষ্পিত সৌন্দর্যে, তখনই এসে পড়ে হেমন্তের শীতল স্পর্শ। ফুল ঝরে যায়, প্রকৃতি রিক্ত হয়ে বসন্তকে বিদায় জানায়, বিরাট যে মানবত্ব সেও একেক জীবনের সঞ্চয় অক্লেশে ফেলে এইভাবে এগিয়ে চলে।

(তৃতীয় স্তবক)

সম্রাট শাজাহান এ কথা জানতেন বলেই কি একটি সৌন্দর্যের বস্তু সৃষ্টি করে নিজের প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন? একটি ক্ষণে মনে যে বিলাপ জাগে চিরকাল তাই নিয়ে ব্যথিত হওয়া যায় না, তাই শাজাহান নিজের অশান্ত ক্রন্দনকে পাথরের কঠিন বন্ধনে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন। নিজের প্রেমিকাকে নিভৃতে প্রেম নিবেদন করতেন তিনি যে ভাষায়, সেই ভাষায় তিনি অনন্ত কালের বস্তু করে তোলেন তার সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে। নিজের জিনিসকে সকলের করে তোলার জন্যই তিনি মর্মরশিল্পে তা প্রতীকায়িত করেছেন মেঘদূত কাব্যে যে বিরহ যক্ষের ছিল তা যেমন সার্বজনীন বিরহ হয়েছে, এখানেও তাজমহলের মাধ্যমে শাজাহানের বেদনা পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিকের সর্বকালের বিরহ-বেদনা হয়ে উঠেছে। মানবিক অনুভূতির কোন স্থান মহাজীবনের কাছে নেই, কিন্তু কৌশলে শাজাহান বন্দী হয়েছেন—কালের লাঞ্ছনা অবজ্ঞা করে তাঁর তাজমহল নিত্যকালের এক প্রেমিকের বিরহ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে যেন বলছে সম্রাট তাঁর প্রেমিকাকে বিস্মৃত হন নি।

(চতুর্থ স্তবক)

সম্রাট শাজাহানের চিন্তাই সত্য হয়েছে। আজ তাঁর রাজ্য এবং সিংহাসন স্বপ্নের মত অলীক মনে হয়। সে বিরাট সৈন্যদল পৃথিবী প্রকম্পিত করতো, দিল্লীর পথের ধূলায়, বাতাসে আছে শুধু তাদের স্মৃতি। সেই বন্দনাকারীদের গান, কল্লোলিত যমুনার সঙ্গে বাদশাহী নহবৎ, পুর সুন্দরীর নূপুরের ধ্বনি—কিছুই আজ নেই। কিন্তু শাজাহান সৌন্দর্যের দূত হিসাবে যে তাজমহল নির্মাণ করেছেন একদা, সেই তাজমহল আজো আছে। রাজ্যের ভাঙাগড়া, জীবনমৃত্যু তুচ্ছ করে, কালের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে সে শাজাহানের সেই বিরহবার্তা এখনও ঘোষণা করে বলছে সম্রাট তাঁর প্রিয়াকে এখনও ভোলেন নি।

(পঞ্চম স্তবক)

কিন্তু এ কথাই কি সত্য? শাজাহান কি আজও ভুলতে পারেন নি তাঁর প্রিয়াকে! কবি মনে করেন এ কথা সত্য হতে পারে না। সমাধি মন্দির এক জায়গাতেই স্থির হয়ে থাকে, কিন্তু মানবাত্মা তো মুক্ত—অতীতের চির অস্ত-অন্ধকারকে যদি সে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করতো তাহলে তো তার অন্তহীন চলাই বন্ধ হয়ে যেতো। প্রাণ এক জায়গায় বন্ধ থাকতে পারে না, এই তার প্রকৃতি। আকাশের উদার ক্ষেত্রে তার আহ্বান, নব অরুণোদয়ে তার নিত্য নবীনরূপে আবির্ভাব। স্মৃতিভার ছিন্ন করে মহাজীবন বন্ধনবিহীন পথে ছুটে যায়—মানবাত্মার এই অনন্ত যাত্রা কোন সম্রাট কোনদিন রুদ্ধ করতে পারেন নি। মানুষের যে মহান আত্মা কালের বাধা লঙ্ঘন করে অনন্ত যাত্রাপথে চলেছে তাকে আটকাবার ক্ষমতা কারো নেই। সমুদ্রস্তনিত পৃথিবী তাকে ধরতে পারে নি কোনদিন, পারবেও না। জীবনের উৎসব শেষে মৃৎপাত্রের মত তাকে ঠেলে ফেলে মানবাত্মা এগিয়ে যাবে। মানুষ এক জীবনে

যে কীর্তি গড়ে সেই কীর্তির চেয়ে মানবাত্মা অনেক মহৎ—তাই কীর্তি চিহ্নই পৃথিবীতে পড়ে থাকে, সে থাকে না।

শাজাহানের ক্ষেত্রে, তাঁর মানবাত্মার ক্ষেত্রে এরকম একটি অবরোধের ব্যাপার ঘটেছিল তাঁর প্রেমকে অবলম্বন করে। আত্মাকে রুদ্ধ করবার মত এক প্রেমের বন্ধনে তিনি বাঁধা পড়েছিলেন। সেই বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যই জীবনের মালা থেকে খসা একটি বীজ তিনি দান করেছিলেন অচল প্রেমকে। সেই বীজ স্মৃতিস্তম্ভ থেকে আকাশে উত্থিত হয়ে এ কথাই বলছে, এই স্মৃতি মন্দির যিনি নির্মাণ করেছিলেন তিনি এক অনন্ত যাত্রাপথের পথিকমাত্র আজ তিনি এই স্মৃতি স্তম্ভের মধ্যে কোনভাবেই প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই। রাজ্যের বৈভব তাঁকে আটকাতে পারে নি, প্রিয়া তাঁর পথ রোধ করতে পারে নি। সেই মানবাত্মার রথ সমুদ্র, পর্বত কারো বাধাই মানে না। রাত্রির আহ্বানে নক্ষত্রের গান গেয়ে সে প্রভাতের উদ্দেশ্যে চলেছে। তাই যদিও সকলে ভুল করে ভাবে শাজাহান এই স্মৃতি স্তম্ভে বদ্ধ হয় আছেন, আসলে 'সম্রাট' শাজাহান হয়ত সেখানে বদ্ধ হয়ে আছেন 'মানুষ' শাজাহান সেখানে নেই।

॥ চার ॥

শব্দার্থ ও টীকা

(প্রথম স্তবক)

শাজাহান—দিল্লীর মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র। এঁর রাজত্বকাল ১৬২৮ থেকে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ। অবশ্য ১৬২২ খ্রিস্টাব্দেই একবার তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু পরাজিত হন। পত্নী মমতাজমহলের মৃত্যুর পর তার সমাধির ওপর তিনি যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন তার নামই তাজমহল। আজও তার সৌন্দর্য খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সমগ্র পৃথিবীতে। শাজাহানের ময়ূর সিংহাসনও ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। শেষ জীবনে তিনি পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হন। **কালস্রোতে......ধনমান**—সময় অতিবাহিত হলেই তার সঙ্গে সঙ্গে জীবন, যৌবন, ধনরত্ন, খ্যাতি সবই চলে যায় আস্তে আস্তে। **অন্তরবেদনা**—পত্নী মমতাজমহলের বিয়োগে শাজাহানের অন্তরের ব্যথা। **চিরন্তন হয়ে যাক**—এমন একটি স্মৃতি সৌধ তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যা চিরকাল লোকের কাছে অক্ষয় সৌন্দর্যের আধার হয়ে থাকবে। লোকে তা দেখবে এবং যে অন্তর-বেদনায় তিনি এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন সে কথা তাদের মনে পড়বে। **সম্রাটের**—শাজাহানের সে সম্রাট সত্তা তার। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার এই জন্য যে, কবি তাঁর সম্রাট সত্তা ও মানব সত্তাকে এ কবিতায় পৃথক করে দেখাতে চেয়েছেন। **সন্ধ্যারক্তরাগ**—সন্ধ্যাবেলায় সূর্য অস্ত যাবার সময় আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে। দৃশ্যটি অত্যন্ত সুন্দর হলেও অতি ক্ষণস্থায়ী। **ইন্দ্রধনু**—রামধনু। **কপোল**—গণ্ডদেশ। **একবিন্দু......এ তাজমহল**—চিত্রকল্পটি লক্ষ্য করবার মতো। মহাকালের কপোলে এক ফোঁটা অশ্রুর মতো চিরকালের জন্য সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে তাজমহল। কারণ মণি-মাণিক্যের ঘটা কবির মতে রিক্ত হস্ত যাদুকরের মায়া, কিন্তু তাজমহল সেরকম মায়া নয়, কারণ তার মূলে রয়েছে প্রেম। তাই কাল অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হবে না।

(দ্বিতীয় স্তবক)

কারো পানে....নাই যে সময়—কালস্রোতে আমরা অবিরত সামনে এগিয়ে চলি, পৃথিবীর এটাই নিয়ম। মানব-হৃদয়ে এতে ব্যথিত হতে পারে কিন্তু জীবনের এই গতিকে মানুষের হৃদয় অস্বীকার করতে পারে না। **ভুবনের ঘাটে ঘাটে**— পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন তা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও আভাসে বুঝতে পারা যায়। তিনি বলতে চান, মানুষ পৃথিবীতে এসে বার বার হৃদয়ের সম্পর্কে বাঁধা পড়ে বিভিন্ন সময়ে। তার চলমান জীবনে এগুলি নিশ্চয় ঘটে। কিন্তু কোন ঘাটেই জীবনের গতি স্তব্ধ হতে পারে না। এক কালে যখন মানুষ হৃদয়ের সম্পর্কে আটকা পড়ে অন্য কালে তখন সেই ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, এটাই জীবনের নিয়ম। **দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে**—দক্ষিণা বাতাস প্রবাহিত হয় বসন্তকালে, সেই বাতাসে প্রকৃতি প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। সেইজন্য দক্ষিণা বাতাসকে মন্ত্র বলা হয়েছে। **মালঞ্চের চঞ্চল অচঞ্চল**—বাতাস ভরে ওঠে মাধবী মঞ্জরীতে, সে কথাটিই বলা হয়েছে সুন্দরভাবে—যেন মালঞ্চের প্রাণচঞ্চল আঁচল ভরে ওঠে মাধবী ফুলে। **বিদায়গোধূলি**—গোধূলি অর্থে সন্ধ্যা কিন্তু বিদায় মানেই সন্ধ্যার বিষণ্ণতা, এই হিসাবে বিদায়গোধূলি শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। **ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল**—পুষ্পক্রীড়ার অবসান হয়, ফুলের পাপড়ি ছড়ানো থাকে ধুলায়। **শিশিররাত্রে**—শিশির পড়ে সে সব রাত্রে অর্থাৎ শীতের রাতে। এখানে শিশির বলতে বিষণ্ণতার অশ্রুও যেন নিহিত হয়ে আছে। **হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি**—হেমন্তের পূর্বেই কেটে যায় আনন্দিত শরতের দিন, তাই তার সাজি বা সম্ভারকে বলা হয়েছে অশ্রুপূর্ণ, কিন্তু তখনই প্রকৃতি সম্পদ-রিক্ত নয়—রিক্ততার দিন আসবে পরবর্তী ঋতুতে, অর্থাৎ শীতে, তাই এখনো তার সাজি আনন্দের। **দক্ষিণের মন্ত্র...আনন্দের সাজি**—প্রকৃতি রাজ্যেও যে অবিরত এই সংগ্রহ এবং বর্জনের প্রথা চলেছে—এক সময়ে তার সংগ্রহের কাল, অন্য সময় ইপ্সিত ডালি ধুলায় ফেলে কালের গতির সঙ্গে তার এগিয়ে চলা, এ কথাই এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—"**এটা হৃদয়কে লক্ষ্য করেই বলা। প্রকৃতি একটা রূপক মাত্র। হৃদয় যখন একটি বিদায়ের বেদনায় কাতর, তখনই আবার তাকে নতুন মিলনের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। বসন্ত হতে শরৎ-হেমন্ত, হেমন্ত হতে বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ক্রমাগতই চলেছে। দাঁড়বার সময় নেই, সঞ্চয়ের সময় নেই, স্থিরতা কই?**" **নাই যে সময়**—কোন মানবিক অনুভূতির দুর্বলতায় দাঁড়িয়ে পড়বার মত সময় নেই।

(তৃতীয় স্তবক)

চেয়েছিল করিবারে...সৌন্দর্যে ভুলায়ে—হৃদয়ের কোমল অনুভূতি যে চিরকাল ধরে রাখা যায় না এ কথা সম্রাট জানতেন। তাই সর্বদাই তাঁর চিত্তে ছিল শঙ্কা। নিষ্ঠুর কালের হৃদয়কে তাই তিনি ভোলাবার চেষ্টা করেছেন সৌন্দর্য দিয়ে, কারণ, কালের হৃদয় যদি কেউ জয় করতে পারে সে তো সৌন্দর্যই। তুলনীয়, ইংরেজ কবি Keats-এর অবিস্মরণীয় সেই পঙ্‌ক্তি **"A thing of beauty is a joy for ever."** প্রকৃত এক সৌন্দর্য সৃষ্টি যদি শাশ্বত

কালের আনন্দ হতে পারে তাহলে চলমান কালকে ভোলাতে পারে একমাত্র সৌন্দর্যই। **রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে**—কবি বলছিলেন সময় বা কালের কথা। তার মধ্যে হঠাৎ মরণ এবং মৃত্যুহীন সাজের প্রসঙ্গ যেন একটু আকস্মিক মনে হয়। কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, **'মরণই তো কাল। তার তো রূপ নেই।'** মরণ রূপহীন নিশ্চয়ই কারণ, মৃত্যু সব রঙ মুছে দেয়—সমস্ত বর্ণাঢ্যতার অবলুপ্তির নামই মৃত্যু। কবির বলবার কথা বোধ হয় এই রকম যে, তাজমহলের সাজ মৃত্যুর অতীত এবং সেই অপরূপ সজ্জা দিয়ে শাজাহান রূপহীন মরণকে বরণ করে নিয়েছেন অর্থাৎ তাকে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন। **চিরমৌনজাল দিয়ে....বন্ধনে**—যে কোন মানুষের ক্রন্দনের এবং দুঃখ ভোগের সীমা আছে। চিরকাল কান্নারও অবকাশ নেই, বিষাদেরও নয়। তাই শাজাহান একটি প্রস্তর নির্মিত স্মৃতিসৌধ এমনই সৌন্দর্যের আধার হিসাবে নির্মাণ করেছেন যাতে তাঁর সেই কান্নার শব্দ নেই, আছে মৌন ক্রন্দন—কিন্তু সে মৌন সৌন্দর্য চিরস্থায়ী বলে তাঁর অশান্ত কান্নাও চিরস্থায়িত্ব লাভ করল। **রেখে গেলে....অনন্তের কানে**—প্রেমের যে গোপন বাণী ছিল সম্রাটের একান্ত ব্যক্তিগত তা অন্য কারো পক্ষে শোনা সম্ভব ছিল না, কিন্তু এই সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে সেই ব্যক্তিগত প্রেম হয়ে গেল শাশ্বতকালের প্রেমের বাণী। **এই তব নব মেঘদূত**—মেঘদূত কাব্য মহাকবি কালিদাসের অমর সৃষ্টি প্রিয়ার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হয়ে কর্তব্যকাজে অবহেলা করার দরুণ যক্ষকে শাস্তি পেতে হয়েছিল—মর্ত্যলোকের রামগিরি পর্বতে নির্বাসন। তার প্রিয়া ছিল স্বর্গের অলকাপুরীতে। মর্ত্যলোক থেকে স্বর্গে যাওয়া যায় না, তাই বিরহী যক্ষ একদিন আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিল স্বর্গে তার প্রিয়ার কুশল সমাচার আনবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ সেই মেঘদূত কাব্যের সঙ্গে শাজাহানের তাজমহলের তুলনা করেছেন। কবি কালিদাসের মেঘদূত যেমন মন্দাক্রান্তা ছন্দে মানুষের অগম্য স্বর্গপুরীর দিকে যাত্রা করেছিল, তেমনি সম্রাট শাজাহানের অরূপ প্রেমের মূর্তিময় এই সুন্দর সৃষ্টিও সৌন্দর্যের অনন্তলোকের দিকে যাত্রা করেছে। **যেথা তার বিরহিনী প্রিয়া...লাবণ্য বিলাসে**—এক বিশেষ নায়িকার মৃত্যু ঘটেছে—কিন্তু, সে তার নির্বিশেষ স্মৃতিতে অমর হয়ে রয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য এবং বিরহ প্রকাশের মাঝে। শাজাহান তাঁর প্রিয়াকে হারিয়েছেন সত্য, তবু তাঁকে নির্বিশেষ সৌন্দর্যে পরিণত করেছেন বলেই পৃথিবীর শাশ্বত কিছু সৌন্দর্যের মধ্যেই তাঁর স্পর্শ অমলিন। প্রভাতের অরুণ রশ্মির সলজ্জ অবগুণ্ঠন মোচনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেই নারীর সংকোচ। পৃথিবীর দিগন্ত সন্ধ্যায় সে মৃদু বাতাসে মনোরম হয়ে ওঠে, কবির কল্পনায় তা ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ দীর্ঘশ্বাস এবং সেই দীর্ঘশ্বাস যেন সেই বিরহিনী নারীর বিষণ্ণ নিঃশ্বাসের সঙ্গে অভিন্ন। পূর্ণিমায় চামেলি ফুলের যে লাবণ্য কবির মতে তা অধরা এক আধারহীন বিমূত সৌন্দর্য মাত্র। সেই বিমূর্ত সৌন্দর্যে আসলে এক নারীর দেহবিমুক্ত সৌন্দর্যেরই প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু করুণ তা সেই দেহহীনার সৌন্দর্য ও বিরহের সম্পদেই পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা অন্যত্রও দেখা যায়, সেই কারণেই কবি বলেছেন—

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!"

ভাষার অতীত তীরে—যে তীরের কথা কবি বলেছেন তা সৌন্দর্যলোকের তীর, সেখানে

ভাষার ক্ষমতা নেই উপনীত হবার। **কাঙাল নয়ন**—সেই অরূপ লোকনিবাসী সৌন্দর্যকে দেখার ক্ষমতা চোখেরও নেই, চোখ তাই কাঙাল হয়েই থাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় **'ভিখারী'** এবং **'কাঙাল'** শব্দ দুটি যে তুচ্ছার্থক নয়, বরং অনেক গূঢ়ার্থবাচক—সে কথা তাঁর অজস্র সংগীত থেকেই জানা যায়। **তোমার সৌন্দর্যদূত....ভুলি নাই প্রিয়া**—এই তাৎপর্যপূর্ণ অংশটি কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে ঃ **"যথা যেমন আপন অগম্য অলকাপুরীতে সর্বত্রগামী মেঘকে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য লোকে সম্রাট সৌন্দর্যের দূতকেই পাঠালেন। সর্বলোকেই সৌন্দর্যের অব্যাহত প্রবেশ। 'ভুলি নাই, ভুলি নাই' এই বাণী নিয়ে প্রেমের এই দূত যাত্রা করল। কাল তাকে ঠেকাতে অক্ষম। তাই 'ভুলি নাই' এই বাক্যহীন বার্তা যুগ যুগ চলেছে। এই সৌন্দর্য কালের হৃদয় হরণ করে নিত্য-বার্তা হয়ে রইল।"**

(চতুর্থ স্তবক)

ধরণী করিত টলমল—শাজাহানের সৈন্যদলদের পদভারে ভারতবর্ষই কম্পিত হতে পারে, পৃথিবী নয়। কিন্তু আগে দিল্লীশ্বরকেই পৃথিবীর ঈশ্বর বলা হতো—**'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'** **বন্দী**—বন্দনাকারী। **নহবত**—শব্দটি এসেছে আরবী **'নওবৎ'** শব্দ থেকে; মূল অর্থ—ভারতবর্ষের ঐকতান বাদন পদ্ধতি। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা সানাই-এর সুরকেই নহবত বলে বুঝিয়ে থাকি এবং যে মঞ্চ থেকে সানাই বাজানো হয় তাকে বলি নহবত খানা। **নূপুরনিক্কণ**—নূপুরের ধ্বনি। **ঝিল্লীস্বনে**—ঝিঁঝিপোকার ডাক বা শব্দ। **তব পুরসুন্দরীর...নিশার গগন**—এখানে বর্ণনা কাব্যিক সৌন্দর্যে মনোরম হয়ে উঠেছে। শাজাহানেব প্রাসাদে তাঁর ভোগ্য যে সব পুরসুন্দরী বাস করতো তাদের নূপুরের ধ্বনিতে একসময় প্রাসাদ মুখর হয়ে থাকত। আজ সেই সব পুরসন্দরীরা কোথায় হারিয়ে গেছে, প্রাসাদও ভেঙে পড়েছে। আলোর যে রোশনাই একদিন চোখ ধাঁধিয়ে দিত, আজ তা আর নেই। অন্ধকার ভগ্ন-প্রাসাদের কোণে এখন শোনা যায় শুধু ঝিঁঝির ডাক। কবি কল্পনা করেছেন, সুন্দরীরা না থাকলেও তাদের সেই নূপুরের ধ্বনি নিশ্চিহ্ন হয় নি আজও অন্ধকার প্রাসাদের কোণে ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে মিশে যায় সেই নূপুরনিক্কণ, সন্ধ্যার আকাশকে অশ্রু-বিধুর করে তোলে। **তোমার দূত**—তোমার সৌন্দর্যের দূত।

(পঞ্চম স্তবক)

মিথ্যা কথা—এখানে কবিতায় একটি ধাক্কা বা jerk আছে। কারণ, শাজাহান তাঁর প্রিয়াকে ভোলেন নি, এই নিয়েই পূর্ব স্তবকে কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। এখন তিনি দেখাতে চান মৃত্যুর চেয়ে জীবন অনেক মূল্যবান। **অতীতের চির...হয়নি বাহির?**—কবে কোন অতীতে একটি মৃত্যু ঘটে গিয়েছে, জীবনবাদী মানুষ কি তা এখনও মনে রাখতে পারে? তার মুক্তি বিস্মৃতিতে, সুতরাং মৃত্যুর স্মৃতিতে সে বদ্ধ থাকতে পারে না। **সমাধি মন্দির**—এখানে তাজমহলকে বলা হয়েছে। **স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখা ঢাকি**—যাদের আমরা মনে করি স্মৃতিস্তম্ভ, সেগুলির কাজ মৃত্যুকে অনেক যত্নে স্মৃতির সুবাস দিয়ে ঢেকে রাখা। **জীবনেরে কে রাখিতে পারে?**—স্পষ্টই বোঝা যায়, কবি এখানে অন্তহীন জীবনের পথ-পরিক্রমার কথা বলতে চেয়েছেন। যুগে যুগে মানুষের জীবন এগিয়ে চলে। জীবনকে খণ্ডিত করার চেষ্টা করে মৃত্যু এবং মৃত্যুর স্মৃতি, কিন্তু কখনই জীবনকে তা রুদ্ধ করতে পারে

না—**জীবনকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা মৃত্যুর নেই। স্মরণের গ্রন্থি টুটে**—স্মৃতির বন্ধন গ্রন্থি ছিন্ন করে। **মহারাজ**—লক্ষ্য করতে হবে, এখানে শাজাহানকে উদেশ্য করে মহারাজ কথাটি বলা হয় নি। কিন্তু শাজাহান প্রসঙ্গে 'মহারাজ' শব্দটি আপাত দৃষ্টিতে সম্রাটকেই বোঝাতে পারে এবং সেই জন্যই অর্থবিভ্রাট ঘটা স্বাভাবিক। যে চলমান মানবজীবনকে কবি বর্ণনা করে চলেছেন সেই চলিষ্ণু মানবজীবনকেই কবি সম্বোধন করেছেন এখানে মহারাজ হিসাবে। **মহারাজ...তোমারে ধরিতে**—মানবজীবনের যে অপার মহিমা তা বোঝাবার জন্য তাকে মহারাজ সম্বোধন করে এখানে বলা হয়েছে, শাজাহানের রাজ্য তুচ্ছ, অন্য যে কোন মহত্তর রাজ্যও মানবজীবনকে কোনদিন ধরে রাখতে পারে নি **সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী**—একদিন সমুদ্রই চেয়েছিল চতুর্দিক, তা থেকে ধীরে ধীরে স্থলভাগ মাথা তুলেছে, সমুদ্রের জলেই সে উর্বরতা ও সজীবত্র লাভ করেছে। তাই সমুদ্রের স্তন্য পান করে পৃথিবীর জন্ম—এ কথা বলা হয়েছে। এমন যে পৃথিবী সেও মানবজীবনকে ধরে রাখতে পারে না। **জীবন-উৎসব শেষে**—একটি দেহে জীবনের যে উৎসব সমাপন হয়। এরপর আত্মা ভিন্ন দেহ আশ্রয় করে এগিয়ে চলবে অবিচ্ছিন্ন গতিতে। **যে প্রেম সম্মুখপানে...জীবনের মাল্য হতে খসা**—সমগ্র কবিতার মধ্যে এই অংশটি যে দুর্বোধ্য, সে কথা স্বয়ং কবি বলেছিলেন সমালোচক প্রমথনাথ বিশীকে। তিনি অবশ্য এর একটি ব্যাখ্যাও করেছিলেন, সেই ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হল ঃ "**বেগমমণ্ডলী পরিবৃত বাদশার যে প্রেম, কালিদাস হংসপদিকার মুখ থেকে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে প্রেম চল্‌তি পথের। ধুলোর উপরে তার খেলাঘর। মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিল বলেই বিরহের একটি সজীব বীজ সেই খেলাঘরের ধূলির উপরে পড়ে ধূলি হয়ে যায় নি ক্লান্তিপ্রবণ বিলাসের ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তার ভিতরকার অমরতা ক্ষণকালের পরমা স্মৃতিকে বহন করে রয়ে গেল। যে বেদনাকে সেই স্মৃতি ঘোষণা করেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তার আর একটি ঘোষণা আছে ঃ তার বাণী হচ্ছে এই যে, সেই শাজাহানও নেই সেই মমতাজও নেই, কেবল তাদের যাত্রাপথের এক অংশের ধূলির উপরে জীবনের ক্রন্দনধ্বনি বহন করে রয়ে গেছে তাজমহল।**" **তুমি চলে গেছ**—এখানেও শাজাহানের মধ্যে যে মানবাত্মা আছে তাকে বলা হয়েছে। **অম্বর-পানে**—আকাশের দিকে। **স্মৃতিভারে আমি...সে এখানে নাই**—কবিতার শেষে এই দুটি সর্বনাশ—'আমি' এবং 'সে' বেশ গভীরভাবে লক্ষ্য করবার মত। এখানে 'আমি' বলতে কবি তাজমহলকে বোঝান নি, মানুষের মধ্যে যে ক্ষুদ্র অহং আছে তাকেই কবি বুঝিয়েছেন এর দ্বারা। অন্যত্র, রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'ছোটো আমি'। পার্থিব পদার্থকে নিজের বলে আকঁড়ে ধরে যে বদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতে চায় সেই হল এখানে 'আমি'। কিন্তু মানুষের মধ্যে যা নিত্য, যে অনন্ত পথযাত্রী—যে কখনো কোন বন্ধনেই বাঁধা পড়ে না সেই নিত্যমানবাত্মাকে কবি বলতে চেয়েছেন 'সে'। রবীন্দ্রনাথ একেই অন্যত্র বলেছেন 'বড়ো আমি'। অর্থাৎ, এখানে কবির বক্তব্য এইরকম যে '**আমার বিরহ**', '**আমার স্মৃতি**', '**আমার তাজমহল**' ইত্যাদি বলে যে এখানে বদ্ধ তারই প্রতীক ওই গোরস্থান যেখানে স্মৃতির ভারে সে আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু নিত্যকালের যে মানব তার পরিচয় ওই একটি স্মৃতিস্তম্ভে নয়, এমনকি শাজাহান নামধারী এক সম্রাটের পরিচয়েও নয়—সে মুক্ত, কোন বন্ধনেই সে আবদ্ধ থাকার নয়।

॥ পাঁচ ॥

● **ব্যাখ্যা**

(এক)

"শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক সম্রাটের ছিল এ সাধনা॥"

—কার অন্তরের বেদনা তাঁর বেদনার কারণ কি? তাঁকে সম্রাট বলার কোন তাৎপর্য আছে কি? বেদনা চিরন্তন করে রাখার জন্য তিনি কি করে ছিলেন?

এখানে বিরহীপ্রেমিক সম্রাট শাজাহানের অন্তর-বেদনার কথাই বলা হয়েছে।

শাজাহানের বেদনার কারণ তাঁর বেগম মমতাজমহলের অকাল বিয়োগ। প্রেমিক হিসাবে মুঘল সম্রাট শাজাহানের খ্যাতি ছিল। প্রিয় বেগম মমতাজমহলের বেদনায় তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয়।

শাজাহান মুঘল সম্রাট ছিলেন, সুতরাং সম্রাট বলা চলে অনায়াসেই, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে সম্রাট বলার আর একটি তাৎপর্য থাকতে পারে—তাঁর প্রতিপত্তি ও বৈভবকে স্মরণ করা। অন্তরের বেদনা সব মানুষের মধ্যেই কম বেশি প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। কিন্তু যিনি সম্রাট তিনি তাঁর বৈভবের সৌজন্যে একদিনের দুঃখ চিরন্তন করে রাখতে অভিলাষী হতে পারেন। সেইজন্যই বোধ হয় এখানে 'সম্রাট' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্রাট শাজাহান তাঁর অন্তরের বিরহ বেদনা চিরন্তন করে রাখার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করে একটি স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। যমুনা নদীর তীরে আগ্রার সেই স্মৃতি-সৌধটির নাম তাজমহল।

(দুই)

"তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"

—কবি কার সঞ্চয়ের কথা বলেছেন? এই সঞ্চয় কি? দিনান্তে নিশান্তে কথার অর্থ; কি? কবির এই উক্তি কি প্রকৃতির সম্বন্ধে সত্য?

কবি এখানে হৃদয়কেই সম্বোধন করে তার সঞ্চয়ের কথা বলেছেন। তবে এই হৃদয় কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, সাধারণভাবে মানবহৃদয় সম্বন্ধেই কবির এই উক্তি।

কবি মনে করেন জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানবের নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা। এই যাত্রাপথে মানুষ এক এক জন্মে হৃদয়ের এক এক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় গৃহীত হৃদয়ের সেইসব কোমল সম্পর্কের স্মৃতিকেই কবি হৃদয়ের সঞ্চয় বলতে চেয়েছেন।

দিনান্তে নিশান্তে কথা দুটিকে খুব সাধারণ অর্থে নিলে এর অর্থবোধ হবে না। এক জন্মের শেষে হয় দিনান্ত এবং পুনরায় নতুন রূপে আগমনের সময় ঘটে নিশান্ত। সারাদিন মানুষ সঞ্চয় করে দিনের আলোকিত সুখ-স্মৃতি এবং নিশার অন্তে মানুষের সঞ্চয় দুঃখের স্মৃতি। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে মানব-হৃদয়ের সুখ ও দুঃখের স্মৃতির কথাই কবি এখানে আভাসিত করেছেন।

কবির এই উক্তি অখণ্ড মানবহৃদয় সম্বন্ধেই করা হয়েছে। অনন্ত পথের যাত্রী বলেই কোন স্মৃতিতে বদ্ধ হয়ে পড়বার সময় তার নেই। কিন্তু একথা যে প্রকৃতির সম্বন্ধেও সত্য, কবি পূর্ববর্তী কয়েকটি পংক্তিতেই সেকথা বুঝিয়ে বলেছেন। প্রকৃতিতে যখন বসন্ত আসে তখন দক্ষিণা বাতাসের মন্ত্রে পৃথিবী সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সবুজ অঞ্চল তখন পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এই পূর্ণতার সঞ্চয় নিয়েই প্রকৃতি স্থির হয়ে বসে থাকে না। শীতের দিনে যখন পাতা ঝরাবার বেলা আসে তখন জীর্ণ পাতার মতই সে তার যাবতীয় সম্পদ ত্যাগ করে এগিয়ে চলে। হেমন্তের শিশির ভেজা রাতে নতুন করে সে ফুটিয়ে তোলে কুন্দফুলের রাশি। যখন ছেড়ে যাবার সময় হবে তখন সেই 'অশ্রুভরা আনন্দের সাজি' ফেলেই সে চলে যাবে। অর্থাৎ প্রকৃতিও অনন্তকালে ধাবমান—সঞ্চয় করতে তার যেমন আগ্রহ, সঞ্চয়কে বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করে যেতেও সে তেমনি নিরসঙ্কুচিত।

(তিন)

'সময়ের হৃদয়হরণ' কথাটির অর্থ কী? কেমন করে শাজাহান সময়ের হৃদয়হরণ করতে চেয়েছিলেন? তাজমহলকে কবি 'নবমেঘদূত' বলেছেন কেন?

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সময় অনন্ত পথযাত্রী, তাই মানুষের বেদনার্ত মুহূর্তকে সে কখনই বুকে ধারণ করে রাখে না। মানুষ অনন্তকালের বিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশে অনেক দুঃখ-বেদনার সম্মুখীন হয়। সেই বিচ্ছিন্ন সময়ে তার প্রাবল্য যতই বেশি হোক, অনন্ত সময় তার মধ্যে সেই বেদনার্ত স্মৃতির চিহ্নমাত্র রাখে না। অর্থাৎ অন্যান্য মানুষ যেমন সেই বিশেষ একটি মানুষের বেদনার কথা ভুলে যায়, বিশেষ মানুষও কালক্রমে তার কথা বিস্মৃত হয়। কিন্তু শাজাহান একটি বিশেষ কৌশলে সেই অনন্ত পক্ষের যাত্রী সময়কে ভুলিয়ে তার হৃদয় সম্মোহিত করে নিজের বেদনা চিরস্থায়ী করে রাখার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। একেই কবি বলেছেন 'সময়ের হৃদয় হরণ।'

সময়ের হৃদয় সম্মোহিত করা যায় কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, কারণ সৌন্দর্যে সম্মোহিত হয় না এমন কেউ নেই। তাই শাজাহান এমন অপরূপ এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন যা সময়কেও স্তব্ধ করে দিতে পারে। তাঁর এই সৃষ্টিই তাজমহল। বেদনা যখন শাজাহানের ব্যক্তিগত ছিল তখন তা হয়ত বিস্মৃতিতে হারিয়ে যেতে পারত, কিন্তু শাজাহান যখন সেই বেদনার স্মৃতিসৌধকে বিশ্বের এক অপরূপ সৌন্দর্যে পরিণত করলেন তখন তা আর তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা থাকল না। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে তা অভিন্ন হয়ে উঠল। প্রভাতের অরুণ আভা, সন্ধ্যার ক্লান্ত সৌন্দর্য, পূর্ণিমায় চামেলির সুবাসিত সৌন্দর্য—সকলের সঙ্গেই যেন তা এক হয়ে উঠল। এই ভাবেই শাজাহান সময়ের অনন্ত যাত্রাপথে নিজের বেদনাকে সংযুক্ত করেছেন।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে শাজাহানেব তাজমহলকে নব মেঘদূত বলা যায়। পৃথিবীতে নির্বাসিত যক্ষের পক্ষে স্বর্গে সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে প্রবেশের কোন উপায় ছিল না, তাই তিনি মেঘকে বেছে নিয়েছিলেন দূত হিসাবে—কারণ মেঘ স্বর্গ—সে অলকাপুরীতে তাঁর প্রিয়ার কাছে প্রবেশ করতে পারবে। মানুষ সৌন্দর্য জগতে প্রবেশ করতে পারে না বলেই সে এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চায়

না সৌন্দর্যের জগতে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারবে। মেঘদূত কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য যদি এই হয় তাহলে শাজাহানের তাজমহলকেও বলতে হয় নবমেঘদূত, কারণ ব্যক্তিবিশেষে হিসাবে শাজাহানের পক্ষে সৌন্দর্যের অমরলোকে স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না। নশ্বর মানুষ তার জীবৎকাল ফুরোলেই নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু শাজাহান যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তার প্রবেশাধিকার ঘটেছে সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে। সেখানে ব্যক্তি পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে তা চিরকালীন সৌন্দর্যের বিভায় অমর হয়ে থাকবে।

(চার)

শাজাহানের বৈভব স্পর্ধিত রাজপ্রাসাদের বর্তমান অবস্থার যে কাব্যিক বর্ণনা কবি করেছেন তার পরিচয় দাও।

প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের বৈভব এবং প্রতাপও যে একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়, শাজাহান একথা জানতেন। সে কথা বলেই কবি এই কবিতা শুরু করেছিলেন। কবিতার চতুর্থ স্তবকে কবি দেখিয়েছেন শাজাহানের সেই আশঙ্কা সত্য হয়েছে। একদিন সম্রাট শাজাহানের যে প্রতিপত্তিই থাক, আজ আর তার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু সেই রাজকীয় দিনগুলি কবির কল্পনায় ভেসে উঠেছে এবং আজকের ধ্বংসস্তূপের পটভূমিতে সেই কবিকল্পনা এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে অভিসিক্ত হয়ে উঠেছে।

কবি বলেছেন, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। শাজাহানের বিশাল সাম্রাজ্য আজ নেই। কোন এক রাত্রের স্বপ্নের মত তাঁর সিংহাসনও মিলিয়ে গিয়েছে, একদিন সম্রাটের অযুত সৈন্যদল ছিল, তাদের পদভারে পৃথিবী কেঁপে উঠতো। আজ সেই প্রতাপ স্মৃতিমাত্র, তাদের স্মৃতি তাদের চরণ-চিহ্নের মতোই দিল্লীর পথের ধূলিতে পরিণত হয়েছে বায়ুর প্রবাহ সেই ধূলি ওড়ায়, স্পর্শকাতর মনে স্মৃতির সুরভিও ওড়ে। একদিন বন্দনাকারীদের গান শুনে সম্রাটের ঘুম ভাঙত—আজ সম্রাটও নেই, সেই বন্দীর দলও নেই। তাজমহলের পাশ দিয়ে কল্লোল তুলে বয়ে যেত যমুনা, সেই কল্লোল ধ্বনির সঙ্গে মিশে যেত সানাই-এর উদ্দীপ্ত সুর। আজ যমুনা অনেক সরে গিয়েছে, সেই কল্লোল ধ্বনি আর শোনা যায় না—সানাই-এর সুর একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

শাজাহানের প্রাসাদে যেসব ভোগ্যা রমণীরা থাকতেন, সেইসব সুন্দরীদের নূপুরের ধ্বনিতে প্রাসাদ মুখর হয়ে থাকতো। আজ সুন্দরীরা নেই, সেই প্রাসাদ আছে বটে কিন্তু সেও আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত। আজ যদি কেউ সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় রাত্রিবেলা সে শুধু শুনতে পাবে ঝিঁঝির রব—রাতের নিস্তব্ধ আকাশ সরব করে রেখেছে তারাই কবি কিন্তু মনে করেন। পুরসুন্দরীদের নূপুরের নিক্কণ একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি, সেই নূপুরনিক্কণ প্রাসাদের কোণে এখনও প্রাণহীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এবং আজকের ঝিঁঝিরবের সঙ্গে তা মিশে গিয়েছে। সেইজন্যই ঝিল্লিরবে লুকিয়ে রয়েছে একটা বিষণ্ণতা যা রাতের আকাশে ছড়িয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই বিষণ্ণতা এবং সেই নূপুরনিক্কণের আভাস কবির কল্পনামাত্র এবং সেই কল্পনা সুন্দর কাব্যিক উৎকর্ষ লাভ করেছে।

(পাঁচ)

"মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনদিন পারে নাই তোমারে ধরিতে;"

—মহারাজ কে? মহারাজ্য বলতে কার কথা বলেছেন কবি? কবির উক্তির তাৎপর্য নিরূপণ কর এবং কবিতার এই স্তবকে সমজাতীয় কোনও উক্তি প্রকাশিত হয়ে থাকলে তার উল্লেখ কর।

কবিতাটি সম্রাট শাজাহান এবং তাঁর অমর কীর্তি তাজমহলকে স্মরণ করে রচিত, সুতরাং মনে হতে পারে শাজাহানকে উদ্দেশ্য করেই কবি 'মহারাজ' কথাটি বলেছেন। কিন্তু শাজাহানকে লক্ষ্য করে কবি একথা বলেন নি, বলেছেন মানবাত্মাকে লক্ষ্য করে।

মহারাজ্য বলতে কবি শাজাহানের সাম্রাজ্য বোঝান নি, তিনি বলতে চান পৃথিবীর কোন বিশাল বৈভব অথবা দুঃখ-প্রেম-ভালবাসার মত হৃদয়কে বন্ধন করবার ঐশ্বর্যময় মহারাজ্য।

কবি এই কবিতার পূর্ববর্তী স্তবকদ্বয়ে বলেছিলেন কাল নিরবধি এবং ব্যক্তিগত মানুষের সুখ-দুঃখ মনে রাখবার সময় তার নেই। তাই এই কালকে জয় করবার জন্য তাজমহলের মত একটি সৌন্দর্য শাজাহান সৃষ্টি করেছিলেন। এই সৃষ্টি সময়ের হৃদয় হরণ করে অমব হয়ে আছে এবং ঘোষণা করেছে, সম্রাট শাজাহান তাঁর প্রিয়াকে আজও ভুলতে পারেন নি। এরপরই কবির মনে হয়েছে, একথা মিথ্যা। জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যে মানবাত্মা এগিয়ে চলে এক অন্তহীন যাত্রায়, সে কখনো কোন এক জন্মের কোন স্মৃতির বন্ধনে বাঁধা থাকতে পারে না। মানবাত্মা চিরমুক্ত, সমস্ত বন্ধনের সে অতীত। সমাধিমন্দির চিরকালই এক জায়গায় থেকে যায়, স্মৃতির আবরণ মৃত্যুর কথা চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়। কিন্তু জীবন তো এভাবে বদ্ধ থাকতে পারে না—সহস্র স্মৃতিকে অতিক্রম করে সে এগিয়ে চলে। তাই শাজাহানের মধ্যে যে অনন্ত-কালের মানবাত্মা বিরাজিত সে কখনো বদ্ধ হয়ে নেই এখানে। কোন মহারাজ্যই সেই মানবাত্মাকে বেঁধে রাখতে পারে না, এটাই কবির বক্তব্য।

সমজাতীয় উক্তি রবীন্দ্রনাথ এই স্তবকে অনেকবার করেছেন। একবার বলেছেন—

"সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধুলায় নাকি
স্মরণের আবরণে মরণের যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।"

এই স্তবকের আর একটি পংক্তিতে কবি ঠিক এই একই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন. সে পংক্তিটি এখন বিখ্যাত হয়ে আছে—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'। এই স্তবকের এবং এই কবিতার শেষ পংক্তি দুটিও এই একই বক্তব্যের প্রকাশক বলে আমরা মনে করি সেখানে কবি বলেছেন—

"তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

॥ ছয় ॥

শাজাহান : বক্তব্য বিশ্লেষণ

কবিদের অনুভূতির জগৎ বিবর্তনশীল, সুতরাং একই কবিতার প্রথম ও শেষ পর্যায়ে কবিভাবনার পার্থক্য রচিত হতে পারে। কবির এক ধরনের চিন্তা কবিতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নমুখী হওয়ার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আছে, রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যেও আছে। রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় যেতে না দেবার জন্য মানবী স্নেহ এবং প্রকৃতির স্নেহের বিবিধ দৃষ্টান্তে কবিতা শুরু করলেও, যেতে যেতে যে দিতে হয়—এই বক্তব্যে কবিতা সমাপ্ত করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'ভাদ্রের দিনে ভাবনা' কবিতায় নিজের লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত জীবনের ব্যথা দিয়ে কবিতা শুরু করে শেষে এক গর্বিত অহঙ্কারে কবিতা শেষ করেছেন। এই কবিতাতেও কবির ভাবনার সেইরকম এক গতি-পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি।

কবি বলাকার ৭-সংখ্যক তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে বলতে চেয়েছেন, শাজাহান তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমকে সৌন্দর্যের স্তরে উন্নীত করেছিলেন তাকে চিরস্থায়ী করবার জন্য। নিরবচ্ছিন্ন কাল চলেছে এক অন্তহীন পরিক্রমায়, সেখানে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য খুব বেশি নয়। নিরবধি কালের বুকে মানবের যে যাত্রা, সেখানে বিভিন্ন জন্মে মানুষ হৃদয়ের সম্পর্ক অনেক পাতায় এবং তাকে আবার সেই জন্মেই ফেলে রেখে পথ পরিক্রমায় যোগ দেয়। অনন্ত-কালের হৃদয় হরণ করবার মত যদি কিছু থাকে তবে তা সৌন্দর্য। ইংরেজ কবিও বলেছেন, 'A Thing of Beauty is a joy forever.' মানুষ নিজে তার ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে, আশা এবং আশাহীনতাকে চিরকালের সামগ্রী করে তুলতে পারে না, কিন্তু সৌন্দর্য চিরকালের সামগ্রী হয়েই থাকে। সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে মানুষের প্রবেশাধিকার নেই, কিন্তু শিল্পিত সৃষ্টি সেখানে অনায়াসেই স্থান করে নিতে পারে। শাজাহান তাই নির্মাণ করেছেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যকীর্তি—তা জন্ম হল। তাজমহল কালের হৃদয় হরণ করে অমর হয়ে আছে। সেই কারণেই অমর হয়ে আছে শাজাহানের প্রেম। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের কানে কানে যে প্রণয় সম্ভাষণ করতেন সম্রাট, তা ছিল ব্যক্তিগত মমতাজমহলের বিরহে যে বিলাপ তিনি করেছিলেন সেই বিষণ্ণ বিলাপও ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু সৌন্দর্যের স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করে শাজাহান একদিকে যেমন তাকে ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, অন্যদিকে তাকে সার্বজনীন বিরহের অমর স্মৃতিতে পরিণত করেছেন। আজ পৃথিবীর ও প্রকৃতির অন্যান্য সৌন্দর্যের মতই তাজমহল চিরদীপ্তিময় এবং চির-অমলিন। সেই তাজমহল যে বাণী বহন করবে অনন্ত-কাল ধরে তা শাজাহান নামক এক প্রেমিক পুরুষের অব্যক্ত উক্তি। শাজাহান যে তাঁর প্রিয়াকে বিস্মৃত হন নি, এই বাণীই শব্দবিহীন ভাষাতে তাজমহল যুগ যুগ ধরে জানিয়ে দেবে—এই আশ্বাস কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতার ওই দুটি স্তবকে।

অকস্মাৎ দেখি পঞ্চম স্তবকের প্রথমেই কবি তাঁর ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। কবি যেন শাজাহানকে সম্বোধন করে বলেছেন, তাঁর এই সান্ত্বনা যদি থাকে যে তাজমহলের

অঘোষিত বাণীতে তাঁর প্রেম অমর হয়ে আছে তবে সে সান্ত্বনা মিথ্যা। শাজাহান তাঁর প্রিয়াকে এখনও বিস্মৃত হন নি একথা কখনোই সত্য হতে পারে না। কবির এ কথার তাৎপর্য বুঝতে গেলে অবশ্য এর নিহিত অর্থ আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

কবি যে শাজাহানকে মিথ্যা ভাষণের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন সে শাজাহান ইতিহাসের বিখ্যাত মুঘল সম্রাট শাজাহান নন। প্রত্যেক মানুষই এক অখণ্ড মানবাত্মার অংশবিশেষ। এই অখণ্ড মানবাত্মা অনন্তকাল ধরে যাত্রা করে। বিভিন্ন জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন পরিচয় সে লাভ করে, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হৃদয়ের এই সঞ্চয় তার কাছে থাকে ততদিনই যতদিন সেই জন্মের পরিচয় সে ধারণ করে রাখে। এরপর এই সঞ্চয় সে নিষ্ঠুরের মত ত্যাগ করে যোগ দেয় তার অনন্ত সেই যাত্রাপথে। কোন জীবনের কোন বিশেষ স্মৃতিতে বদ্ধ হয়ে থাকলে তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি হয়, তার মুক্ত আত্মার ভার সৃষ্টি করা হয়—মানবাত্মা সেই বাধা সরিয়ে ফেলে সবলে, মুক্তি লাভ করে আবারিত বেগে। শাজাহান যতক্ষণ পর্যন্ত পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট হিসেবে, একটি বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ততক্ষণ তিনি প্রেম ও বিরহের মত মানব সম্পর্কে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু যখন তিনি মুক্ত মানবাত্মা—শাজাহান নামের নির্মোক যখন তিনি ত্যাগ করে গিয়েছেন কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, তখন আর গত জন্মের স্মৃতি মনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর পার্থক্যও এইখানে বলে কবি মনে করেন। মানুষ স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করে কোন বিশেষ বিচ্ছেদ, বিশেষ বিরহ এবং বিশেষ মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য। সেই স্মৃতিসৌধের ধর্মই এক জায়গায় বদ্ধ থাকা, এবং তা—

'ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণের যত্নে রাখে ঢাকি।'

কিন্তু জীবনকে কেউ কোনদিন একজায়গায় বদ্ধ করে রাখতে পারে না। জীবনের ধর্মই হল অকারণ অবারণ চলা। অনন্ত আকাশে তার আহ্বান, নক্ষত্রের আলোয় তার পথ পরিক্রমা। জন্ম-জন্মান্তরের আলোকিত দ্বার পেরিয়ে সে বন্ধনবিহীনভাবে এগিয়ে চলে—

"স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।"

সুতরাং শাজাহানের রাজ্যপাট তো তুচ্ছ, পৃথিবীর বিশালতম বৈভব এবং পরমতম হৃদয়ের বন্ধনেও সে কখনো বাঁধা পড়তে পাবে না। সেইজন্যই কবি মনে করেছেন, শাজাহান তাঁর নির্মিত তাজমহলের মাধ্যমে যদি একথা ঘোষণা করতে চেয়ে থাকেন যে তাঁর প্রিয়াকে তিনি বিস্মৃত হন নি তাহলে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। শাজাহানের পরিচয় ত্যাগ করে তাঁর মানবাত্মা এখন যে মুক্তপথের পথিক সেখান থেকে কাউকে মনে রাখা সম্ভব নয়।

॥ সাত ॥

শাজাহান ঃ প্রেমভাবনা

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৭-সংখ্যক কবিতাটির নাম প্রথমে ছিল শাজাহান। পরে হয়েছিল তাজমহল, তারও পরে অবশ্য শুধু সংখ্যা দিয়েই এর পরিচয় নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু শাজাহান এবং তাজমহল একথা মনে রাখলে যাঁরা প্রেমের যথোচিত মর্যাদা এই কবিতায় খুঁজে পান নি তাঁদের ক্ষোভের কারণ বোঝা যায়। শাজাহান এবং তাজমহল যে সূত্রে আমাদের মনে অমর হয়ে রয়েছে তার সঙ্গে বিষণ্ণ প্রেমের মধুর বিরহের এক অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে। তাজমহল সম্পর্কিত কবিতায় প্রেমের সর্বোচ্চ আসনই আমরা আশা করে থাকি। কিন্তু এই কবিতার প্রধান আলোচ্য প্রেম নয়, মরণের স্মরণিকাও নয়—মহৎ জীবন ও তার আবারিত চলাই এর প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। তবু প্রেমের প্রসঙ্গ এখানে বার বার এসেছে এইটুকুই ছিল সান্ত্বনা। কিন্তু পঞ্চম স্তবকের উপান্তে প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রকৃতি বিচারে কবি যখন অবতীর্ণ হয়েছেন তখন তাকে খুব বড় একটা আসন কবি দিতে পারেন নি, সম্ভবত সেটাই অনেকের কাছে ক্ষোভের কারণ হয়েছে। এ বিষয়ে মন্তব্য করার আগে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি সঠিকভাবে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার।

প্রেমের প্রতি কবির কোন বিদ্বেষ নেই, কিন্তু জীবন তাঁর কাছে প্রেমের চেয়ে অনেক বড়। এই কবিতায় তিনি যে জীবনের জয়গান গেয়েছেন তাকে বলা যায় মহাজীবন—পৃথিবীর এক জন্মে ধৃত একটি জীবন নয়. মানুষের ব্যক্তি-পরিচয়ে গড়ে ওঠা জীবন নয়, এক অখণ্ড অন্তহীন জীবন। এই জীবন ব্যক্তি-পরিচয়ে আপাত বিভক্ত হয়েও যেমন অখণ্ড, তেমনি ধাবমান অনন্তকাল জুড়ে এর ব্যাপ্তি। এই জীবনের ধর্মই অন্তহীন চলা, তাই এর স্বভাবধর্ম, এবং তাতেই এর মুক্তি। জীবন যখন এক বিশেষ জন্ম-পরিচয়ে সীমিত থাকে তখন অনেক হৃদয়ের সম্পর্কে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এই সব সম্পর্কের মধ্যে মহত্তম বা তীব্রতম নিশ্চয়ই প্রেম। কিন্তু জীবন এর চেয়ে অনেক বড় বলেই হৃদয়ের এই মহত্তম বন্ধনকেও সে অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারে। বস্তুত, সেটাই তার প্রকৃতি। এক জন্মের খণ্ডিত পরিসরে হৃদয়ের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই জন্ম থেকে জন্মান্তরে যাত্রার সময় তার কোন কিছুই জীবন গ্রহণ করে না। সে যে মুক্ত পথের পথিক সেখানে স্মৃতির বন্ধন অথবা পথের সঞ্চয়ের বোঝা কেবল ভারবৃদ্ধি করে। তাই জীবন একদিকে যেমন সঞ্চয় করে, অন্যদিকে তেমন বর্জন করে। এই মানসিকতা নিয়েই কবি শাজাহানের প্রেমের তাৎপর্য ও মহত্ত্ব বিচার করতে চেয়েছেন এবং তার গুরুত্বও বিশ্লেষণ করেছেন।

জীবনের পক্ষে প্রেমকে সহায়ক মনে করতে পারেন নি কবি, অন্তত মমতাজমহলের মত নারীর প্রেম, যেখানে জীবনকে বন্ধনে জড়িয়ে ফেলার আয়োজন অত্যন্ত বেশি। প্রেমিকার আত্ম-অহংকার, বিলাস বৈভব—সবকিছুই জীবনের নিত্য ধাবমান গতিকে রোধ করার চেষ্টা করে। তাই প্রেমকে কবি মনে করেন জড়, গতিহীন, জীবনের পরিপন্থী। এই প্রেম নিজেও চলতে জানে না এবং অপরকেও চলতে সাহায্য করে না। জীবন অনন্ত পথের পথিক বলেই পথ তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। পথ চলার প্রতীক, অথচ মমতাজমহলের প্রেম এই

পথের ওপরেই নিজের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য সিংহাসন বিছিয়ে বসেছিল, বিলাসী সম্ভাষণে জীবনের গতি রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। জীবন তাই এই প্রেমকে ক্ষমা করে নি তাকে সে ধুলির ওপরে ধুলির সমান জ্ঞান করেই ফিরিয়ে দিয়েছে।

এই পর্যন্ত প্রেম সম্বন্ধে, অন্তত মমতাজমহলের প্রেম সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় কোন উক্তি রবীন্দ্রনাথ করেন নি। কিন্তু এই প্রেম সম্ভোগে নিঃশেষ নয়, বিরহে মহান বলেই তিনি এ সম্বন্ধে পুনর্বার চিন্তা করেছেন এবং বলেছেন—

"তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।"

প্রেমের প্রতিবন্ধকতা জীবনের সঙ্গে, এ কথাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য জীবনের বীজ সেখানে থাকতে পারে। এটির মধ্যে এমন এক তত্ত্ব আছে যা স্বয়ং কবির কাছেও দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। তিনি নিজে একে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা বলা হল।—"মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিল বলেই বিরহের একটি সজীব বীজ সেই খেলাঘরের ধূলির উপরে পড়ে ধূলি হয়ে যায় নি, ক্লান্তি প্রাণ বিলাসের ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তার ভিতরকার অমরতা ক্ষণকালের পরমা স্মৃতিকে বহন করে রয়ে গেল। যে বেদনাকে সেই স্মৃতি ঘোষণা করেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তার আর একটি ঘোষণা আছে; তার বাণী হচ্ছে এই যে, সেই শাজাহানও নেই সেই মমতাজও নেই, কেবল তাদের যাত্রাপথের এক অংশের ধূলির উপরে জীবনের ক্রন্দন ধ্বনি বহন করে বয়ে গেছে তাজমহল।"

কবির এই বাণীতে প্রেম সম্পর্কে যে ধারণার পরিচয় আছে তাকে আমরা অশ্রদ্ধেয় মনে করতে পাবি না। বিলাসী প্রেম, যা শুধু নিজের বৈভব দেখাতে চায় এবং সম্ভোগে যা সম্পূর্ণ, তাকে কবি জীবনের পরিপন্থী মনে করে হীন আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু যে প্রেম বিরহে অসম্পূর্ণ তার মধ্যে প্রাণধর্ম লুক্কায়িত আছে, প্রণের সেই বীজ তার মধ্যে আছে বলেই ব্যক্তিগত প্রেমিক-প্রেমিকার পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে সে এক মহৎ বেদনার বাণী বহন করতে পারে। সুতরাং প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় কেবলই মর্যাদাহীন বলে ঘোষণা করেছেন এ কথা সত্য নয়—প্রেমের মহনীয়তার দিকটিও তিনি একই সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

॥ আট ॥

শাজাহান ঃ কবিতার মর্মবস্তু

বলাকার ৭-সংখ্যক কবিতাটির মূল উপলক্ষ্য বিরহী শাজাহানের বিরহ-স্মৃতির চিরকালীন সৌন্দর্য সৃষ্টি তাজমহল। কবিতার প্রথমে আছে শাজাহানের প্রশস্তি। প্রেমিক হৃদয়ের পরিচয়, অতঃপর নিরবধিকাল এবং মানবজীবনের সম্পর্ক, সৌন্দর্য ও নিত্য ধাবমান কালের সম্পর্ক। শেষে তিনি শাজাহানের পরিচয় দিতে চেয়েছেন অখণ্ড মানবাত্মা হিসাবে এবং সেই প্রেক্ষিতে তাঁর শিল্পকীর্তি তাজমহলের তাৎপর্য বিচার করতে চেয়েছেন। কবিতাটি মোট পাঁচটি স্তবকে বিভক্ত, যদিও কবি মনে করেন এর ভাবগত কোন বিভাগ নেই।

ভারত-ঈশ্বর শাজাহানকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন, শাজাহান একথা ভালভাবেই জানতেন যে জীবন-যৌবন এবং রাজকীয় ঐশ্বর্য অত্যন্ত অনিত্য চিরকাল তা থাকবে না। কিন্তু প্রিয়া মমতাজমহলের বিরহে তাঁর যে বেদনা সেই বেদনা স্থায়ী হোক, এই ছিল তাঁর কামনা। যেন সেইজন্যেই তিনি কালের বুকে একটি অশ্রুবিন্দুর মতই শুচিশুভ্র এক প্রস্তরসৌধ নির্মাণ করেছেন।

মানব হৃদয়ের সত্য এই যে, কোন হৃদয়ের সম্পর্কই সে চিরকাল বুকে ধরে রাখতে পারে না। কোন কোন সময় হৃদয়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়, হৃদয়ের ধন জড়ো করে নিজের কাছে—আবার মুক্ত পথের ডাক এলে সেই সঞ্চয় তুচ্ছ করে তাকে এগিয়ে যেতেই হয়। এটাই মানুষের সত্য এবং জীবনের সত্য, কারণ চলমানতাই জীবন। শুধু তাই নয়, এই অবিচ্ছিন্ন গতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রেও চলেছে সদাসর্বদা। বসন্ত আসে প্রকৃতির মালঞ্চ ভরিয়ে দিতে, দক্ষিণা বাতাসের দাক্ষিণ্য পেয়ে প্রকৃতি পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু শীতের হাওয়ায় লাগে কাঁপন, প্রকৃতি তার সঞ্চয় উজাড় করে দিয়ে রিক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবেই চলে তার সঞ্চয় এবং সঞ্চয়-বর্জনের পালা। আসলে অবিচ্ছিন্ন মানবাত্মার মত প্রকৃতিও অবিশ্রান্ত চলেছে—ফিরে তাকাবার সময় কারো নেই, স্মৃতির বন্ধন মানুষ এবং প্রকৃতি কেউই সত্য করতে পারে না।

নিরবধি কাল কোন স্মৃতিকেই মূল্য দেয় না, অথচ শাজাহান তাঁর তীব্র মর্মবেদনা কালের বুকে অঙ্কিত করে রাখতে চেয়েছিলেন। একাজ করবার জন্য তাঁকে এক কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। একমাত্র সৌন্দর্যের স্মৃতিই কালের বুকে অঙ্কিত থাকতে পারে, কারণ কালও অনন্ত, সৌন্দর্যও চিরকালের বস্তু। ব্যক্তিগত বিলাপের অবকাশ চিরকাল থাকে না, যে প্রিয়-সম্বোধন শাজাহান করতেন তাও সমান তীব্রতায় স্মরণ হয় না দীর্ঘকাল পরে। সেইজন্যই অপরূপ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে এক সার্বজনীনত্বে তিনি ভূষিত করেছেন তাকে, তাঁর অশান্ত ক্রন্দন তাঁর মধ্যে মৌন হয়ে আছে, তাঁর প্রিয়-সম্বোধন এখন অনন্ত কালের সামগ্রী, পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে তাজমহল এখন অভিন্ন।

এই প্রসঙ্গে কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের সঙ্গে তাজমহলের তুলনা করেছেন। বিরহী যথা সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে যেতে পারে নি, তাই মেঘকে সে দূত করে পাঠিয়েছিল সেখানে। শাজাহানকে ও নিজে কালের বুকে অমর হয়ে থাকতে পারবেন না বুঝে তাঁর সৃষ্টিকে অমর করে রেখেছেন। তাঁর এই অমর সৃষ্টিই শাশ্বত কাল ঘোষণা করবে যে শাজাহান নামক এক সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত প্রেমিক, প্রিয়া মমতাজমহলের বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি আজও অস্থির তাঁকে তিনি আজও ভুলতে পারেন নি। শাজাহানের প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্যদল কবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তঁর বৈভব আজ বিস্মৃতির গর্ভে, তাঁর বিলাসের প্রাসাদ আজ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। অথচ তাঁর প্রেমিক সত্তা আজও অমর হয়ে আছে তাঁর সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

এর পরই কবিতার শেষ স্তবকে কবি অকস্মাৎ তাঁর কবিতার সুর পরিবর্তন করেছেন। প্রথম চারটি স্তবকে মোটামুটিভাবে এই কথাই বোঝা যায় যে শাজাহান নামধারী সম্রাট তাঁর সমস্ত বৈভবসহ কালের বুকে বিস্মৃত হয়ে থাকেন কিন্তু বেঁচে থাকবে তাঁর অমর সৃষ্টি তাজমহল। অর্থাৎ মানুষের কীর্তি থেকে যায় অমর হয়ে, মানুষ থাকে না। এই বক্তব্য

তিনি আগেও প্রকাশ করেছেন তাঁর সোনার তরী কাব্যে, যেখানে তিনি বলেছেন—

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী,
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

কবি সেখানেও বলতে চেয়েছেন, মানুষ হিসাবে কবি অমর হয়ে থাকেন না, থাকে তাঁর কাব্য। কিন্তু এই কবিতায় সেই কথা বলেও অকস্মাৎ তিনি বলেছেন—

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,' বলেছেন—

"সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনের কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।"

অর্থাৎ এই স্তবকে কবি বলতে চেয়েছেন তাজমহলের চেয়ে শাজাহান অনেক বড়, মানুষ তার কীর্তির চেয়ে অনেক বড়। এই সুর পরিবর্তনের নিহিত কারণ একটাই আছে, সেটি বুঝতে পারলে কবিতাটির মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা থাকবে না। কবি মানুষ বলতে এখানে ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়ে ধৃত কোন মানুষ বোঝাতে চান নি—তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এক অখণ্ড মানবাত্মা, সে যুগে যুগে জন্মে জন্মে বিভিন্ন পরিচয় নিয়ে পথ পরিক্রমা করে এবং এই পথ চলা তার অনন্ত। এক জন্মে যে শাজাহান পরিচয় গ্রহণ করেছিল, সেও অবশ্য সেই মানবাত্মারই একটি অখণ্ড প্রকাশ। শাজাহান নামে যখন সে পরিচিত ছিল তখন সে হৃদয়ের সম্পর্ক পাতিয়েছিল মমতাজমহলের সঙ্গে। মমতাজের মরণ-বিচ্ছেদকে স্মরণ করবার জন্য সে তাজমহল নামে একটি স্মৃতিসৌধ রচনা করেছিল। সেই স্মৃতিসৌধ একই জায়গায় একটি করুণ অপমৃত্যুকে স্মরণ করবার জন্য বদ্ধ হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু যে অনন্ত মানবাত্মা একবার ধরা দিয়েছিল শাজাহান নামে সেই মানবাত্মা মুক্ত পথের পথিক, সে সেখানে বদ্ধ হয়ে নেই। তাই কবি বলেছেন—

"তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

'আমি' বলতে কবি বুঝিয়েছেন তাজমহলকে এবং 'সে' বলতে বুঝিয়েছেন শাজাহান নামে একবার যে চিহ্নিত হয়েছিল সেই মানবাত্মাকে। এইভাবে ব্যাখ্যা করলেই কবিতাটির মর্মার্থ পরিস্ফুট হয়।

॥ নয় ॥

শাজহান ঃ রসগ্রাহী আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 'তাজমহল' নামে, পরে কবি এটির নাম দেন 'শাজাহান'। কবিতাটির মর্মকথা জানা থাকলে কবির নামকরণ বিষয়ে এই অস্বস্তিও

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবিতার প্রথমাংশে শাজাহান অপেক্ষা তাজমহলের গুরুত্ব অনেক বেশি। কবি তাঁর পূর্ববর্তী পর্যায়ের কিছু কবিতাতেও এমন কথা বলেছেন। মানুষ কালের বুকে অমর হয়ে থাকতে পারে না, অমর হয়ে থাকে তার সৃষ্টি। কারণ সৃষ্টি সৌন্দর্যসমন্বিত এবং সৌন্দর্যই থাকতে পারে চিরস্থায়ী হয়ে। এ কথা ইংরেজ কবিও বলেছেন—'A thing of beauty is a joy forever.' কিন্তু কবিতার পরবর্তী স্তরে কবি তাজমহলকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেন নি, তিনি মত পরিবর্তন করে বলেছেন, শাজাহান তাজমহলের চেয়ে মহত্তর। কিন্তু এই শাজাহান ইতিহাসের খাঁচায় বন্দী শাজাহান নন, তিনি অনন্ত জীবনেরও মানবত্বের প্রতীক। কবিতার বক্তব্যের এই মহোত্তরণ কবিতাটিকে রবীন্দ্র-কাব্যধারাতেও এক অনন্য স্থানের অধিকারী করেছে।

প্রকাশভঙ্গির বিচারেও কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বিশিষ্ট কবিতা হিসাবে গৃহীত হতে পারে। অনিবার্য শব্দচয়ন, অব্যর্থ ইঙ্গিতধর্মিতা বিশিষ্ট চিত্রকল্প এবং ব্যঞ্জনাময় কবিভাষার এই কবিতা বাংলা কাব্যসংসারে এক উজ্জ্বল সম্পদ বললে অত্যুক্তি হয় না। স্তবক অনুযায়ী কবিতাটির এই সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

প্রথম স্তবকে উপমা ও উৎপ্রেক্ষা বেশ কয়েকটি আছে, তার মধ্যে অনন্য নিশ্চয়ই অন্তিম পংক্তি কটি, সেগুলি এখনও পর্যন্ত তাজমহল সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হয়ে আছে নিঃসন্দেহে। ধাবমান অনন্ত কালপ্রবাহের শরীরী রূপ যদি কল্পনা করা যায় তবে তার কপোলে শুভ্র মুক্তার মত একটি করুণ অশ্রুবিন্দুই তাজমহলের শ্রেষ্ঠ উপমা, যাকে চিত্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করতেও রসিক পাঠকের দ্বিধা থাকে না। পংক্তিকটি এই রকম—

"এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

দ্বিতীয় স্তবকে কবি একটি তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন, কিন্তু বর্ণনার চারুত্বে এবং রোমাণ্টিক সৌন্দর্যে তা তত্ত্বকথা, শুষ্কতাকে অনায়াসে অতিক্রম করে গিয়েছে। অনন্ত পথযাত্রী মানবাত্মা জন্ম-জন্মান্তরে বার বার নূতন সাজে সজ্জিত হয়—কিন্তু গ্রহণ করে, সঞ্চয় করে এবং তারপর বিনা দ্বিধায় সেই সঞ্চয় উজাড় করে চলে যায়। এ সত্য কবির অনুভবের জগতে জন্ম নিয়েছে, অথচ প্রকৃতির খেলা এবং খেলা ভাঙার খেলা দেখিয়ে তাকে তিনি বস্তুগত সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। এই অংশের প্রকাশভঙ্গির কিছু নমুনা দেওয়া যায়—

"দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।"

তৃতীয় স্তবক কবিত্ব ও তত্ত্বের মিলিত নির্যাস। এখানে আছে বিরোধাভাসের সুনিপুণ ব্যঞ্জনা, যখন কবি বলেন—

"করিলে বরণ
রূপহীন মরণের মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে?"

এখানে আছে তত্ত্ব যেখানে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন শাজাহানের তাজমহল সৃষ্টিকে। মেঘদূতের নায়ক বিরহী যক্ষের উপায় ছিল না সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে নিজে যাবার, তাই সে মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিল সেখানে। শাজাহানেরও নিজের বিরহ চিরকালীন করে রাখার কোন সুযোগ ছিল না, তাই তিনি তাজমহলের মত একটি সৌন্দর্য নির্মাণ করে অনন্ত কালের হৃদয়হরণ করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাখ্যা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের—মেঘদূত সম্পর্কেও, শাজাহানের তাজমহল সম্পর্কেও। কিন্তু তত্ত্বকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে পরিবেষণের জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োজন, সেই ক্ষমতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এখানে রেখেছেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

বিশ্বের অন্যান্য সৌন্দর্যের সঙ্গে তাজমহলের সৌন্দর্য—শাজাহানের প্রণয় এবং বিরহ সে এক হয়ে মিশে রয়েছে, এই রোমান্টিক বক্তব্য যে প্রকাশভঙ্গী লাভ করেছে তা অনায়াসে প্রথমশ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি বলে পরিগণিত হবে। কবি লিখেছেন—

"তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে—"

চতুর্থ স্তবক একটি রোমান্টিক কল্পচারিতার নির্ভুল দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি কবিতায বলেছিলেন—

"আজ যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়,
যাহা দেখিছ না তারি ভীড়।"

চোখের আলোয় চোখের গভীরে দেখা সেই দৃশ্য কবির কাছে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে বলেই তিনি এতো সহজে বলতে পারেন, শাজাহানের ভগ্ন প্রাসাদে ঝিল্লিস্বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিগত দিনের রমণীয় পুবসুন্দরীদের কান্না—

"তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।"

পঞ্চম স্তবকে কবির তত্ত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, কবি যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন, ব্যাখ্যা ছাড়া তার অর্থ বোধ হওয়া কঠিন, যেমন—

"মহারাজা,—কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমাকে ধরিতে,"

এখানে মহারাজ যে সম্রাট শাজাহান নন, অনন্ত মানবাত্মা—সে কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। কিংবা কবি যখন বলেন—

"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

তখন দুটি সর্বনাম নিয়ে বিভ্রান্তি জাগতে পারে। এই বিভ্রান্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছয় 'যে প্রেম সম্মুখ পানে..' ইত্যাদি অংশে। যে প্রেম জীবনকে কেবলই বেঁধে রাখে বলে হীন

মনে হয় কবির কাছে, সেই প্রেমজনিত বিরহ জীবনের মাল্য হতে খসা একটি বীজের সঙ্গে কেমন করে অভিন্ন হতে পারে এবং—

"সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বর পানে,"

এমন ঘটনাই বা কেমন করে সম্ভব হয় এ চিন্তা যুক্তিবাদী পাঠকের মনে নিশ্চয়ই উদিত হতে পারে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সে ব্যাখ্যা পাই, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীকে যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন, তার শেষের অভিমতটি এখানে প্রণিধানযোগ্য ঃ "আমি জানি শাজাহানের এই অংশটি দুর্বোধ। তাই এক সময়ে এটাকে বর্জন করেছিলুম। তারপরে ভাবলুম, কে বোঝে কে না বোঝে-সে কথার বিচার আমি করতে যাব কেন—তোমাদের মতো অধ্যাপকদের আক্কেল দাঁতের চর্বা পদার্থ না রেখে গেলে ছাত্রমহলীদের ধাঁধা লাগাবে কী উপায়ে?"

॥ ৬ ॥

চঞ্চলা

(৮ সংখ্যক কবিতা)

॥ এক ॥

রচনাকাল ও নামকরণ

রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদ প্রবাসকালে এই কবিতাটি রচনা করেন এবং ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সবুজপত্র' নামক সাময়িক পত্রে এটি 'চঞ্চলা' নামে প্রকাশিত হয়। এক সময় 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ৮ সংখ্যক কবিতা রূপেও এটি পরিচিত ছিল। আবার কবিতায় প্রথম পংক্তি অনুযায়ী এর 'হে বিরাট নদী' নামটিও অপ্রচলিত নয়।—'বলাকা' পর্বে রবীন্দ্রনাথ গতিতত্ব দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হওয়াতে 'গতি'র প্রতীক রূপে তিনি এখানে 'নদী'কেই গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর এক ডায়েরিতে বলেছেন--"জলের দিকে চেয়ে অনেক সময় ভাবি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি বিশুদ্ধ গতিভাবেই আনতে চাই তবে নদীর কাছ থেকে সেটাকে পাওয়া যায়। জীবজন্তু তরুলতার মধ্যে যে চলাফেরা তাতে খানিকটা গতি খানিকটা বিশ্রাম, একটা অংশের গতি আর একটা অংশের নিশ্চলতা, কিন্তু নদীর আগা-গোড়াই একসঙ্গে চলেছে—সেইজন্য যেন আমাদের সচেতন মনের সঙ্গে ওর একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।" বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকিয়ে কবির বিস্ময়ের সীমা নেই—সর্বত্রই গতির অবাধ লীলা। এই গতিময় বস্তুবিশ্বকে তাই এক সময় তাঁর একটা বিরাট নদী বলে মনে হলো! রবীন্দ্রসাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টাকে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : "কবির মনে এই ভাবোদ্রেক হইল—যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক বিপুল সৃজনী শক্তির স্রোত বহিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহারই ঘূর্ণাবর্তে কত শত সৌরমণ্ডল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্বুদের মতো শেষ হইয়া যাইতেছে। ঐ মহাব্যোমের বিরাট সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে কত শত আলোকের ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিয়া আবার নিঃশেষে বিলীন হইয়া যাইতেছে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। ইহাকেই কবি বিরাট নদীরূপে অনুভব করিয়াছেন।"

'বলাকা'র ৮ সংখ্যক কবিতা অর্থাৎ 'চঞ্চলা'র সমগ্র দৃষ্টিকে এক নদীর জলপ্রবাহরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই 'চঞ্চলা' কবিতার আলোচনা বার্গসঁর গতিতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা শেষ পরিচ্ছেদে আবার করবো। তবে আপাতত শুধুমাত্র এই কবিতাটি ঘিরে রবীন্দ্রকল্পনার উৎসার আমরা দেখে নিতে চাই। যেহেতু সৃষ্টিকে নদীরূপে কল্পনা করা হয়েছে, সেজন্যই নদী-সম্পৃক্ত ফেনা, স্রোত ও বুদ্‌বুদের কল্পনাও প্রথম স্তবকে এসে গেল। কবি বললেন বস্তু হচ্ছে সেই প্রবাহের ফেনা, সূর্য-চন্দ্র-তারা বুদ্‌বুদ, আর বর্ণ হচ্ছে স্রোত। আলোকের বিচ্ছুরিত তীব্রচ্ছটায় বর্ণস্রোত বয়ে চলছে। সপ্তবর্ণচ্ছটা আর এই সপ্তবর্ণের দুটি বর্ণের আলোক তরঙ্গের মাঝখানকার আরো অজস্র বর্ণের আভাস—সব মিলিয়ে এই

মহাসৃষ্টিতে এক অপরূপ বর্ণালি। সেই বর্ণালি সৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন, অবিরল, চঞ্চল স্রোতে প্রতিফলিত হয়ে বহুবর্ণ ও বহুরেখ দেখাচ্ছে। সেই আলোকরেখাগুলিও আবার তরল। তাহলে দেখছি, এ কবিতার প্রথম স্তবকে নদীর আনুষঙ্গিক ফেনা, বুদ্‌বুদ ও স্রোতের কল্পনা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতরূপে উপস্থিত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে সৃষ্টিকে বৈরাগিণী ও অভিসারিকারূপে কবি দেখছেন। এ স্তবকের শেষদিকে আবার এসেছে ঋতুচক্রের আবর্তনের চিত্রপরম্পরা। এই তিন চিত্রকল্প নিয়ে দ্বিতীয় স্তবক সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। সমগ্র সৃষ্টি তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বৈরাগিণীর মতো, উদাস বাউলের মতো রাগিণী বাজাতে বাজাতে চলছে। বৃহৎ অনুরাগকেই রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য বলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সেই বৃহৎ অনুরাগ আছে, তাই ক্ষুদ্র অনুরাগের বন্ধনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজেকে জড়ায় না, দুই-একটা চন্দ্র সূর্য গুঁড়ো হয়ে গেলেও এবং হাজার হাজার নক্ষত্রের মৃত্যু হলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্বিকার থাকে। আর এই জন্যই কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৈরাগিণীরূপ কল্পনা করেছেন।

তার আরেকটি রূপ অভিসারিকা। বিশ্ব অভিসারিকার মতো চলছে। এই অভিসারে এক অফুরান পথ তাকে পেরোতে হবে, তার গতি অনির্বার। তাই এই অভিসারিকার বক্ষোহারে ঘনঘন দোলা লাগছে চলার বেগে ঘনঘন নিঃশ্বসিত বক্ষের চলাঞ্চলে। তার বুকে দুলছে যে-হার, সে-হারে নক্ষত্রের মনির পুঁতি গাঁথা। সে মণির পুঁতিগুলি বার বার ঝরে ঝরে পড়ছে। কেন না নক্ষত্র জগতেও তো জন্ম মৃত্যু আছে। মৃত্যুব মধ্যে হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রগুলি যেন সেই হার থেকে ঝরে পড়া মনির পুঁতি। নতুন নতুন নক্ষত্র জন্মাচ্ছে। এই অভিসারিকার পথ চলা চলছে, অন্ধকারে ঝরে এলোচুল উড়ছে, সে-চুল ঝড়ো বাতাসে তার কানে বিদ্যুতের দুল দুলছে। সমস্ত কল্পনাটাই যেন বৈষ্ণব পদাবলীর এক তিমিরাভিসারের কল্পনা।

তারপর এই স্তবকের তৃতীয় কল্পনা—ঋতু চক্রের আবর্তনের কল্পনা। এখানে কবি দেখতে পাচ্ছেন এই সমগ্র সৃষ্টি যেন এক নর্তকীর মতে চলছে, তার হাতে ঋতুর থালা, ঋতুতে ঋতুতে তার থালা থেকে জুঁই, চাঁপা, বকুল, পারুল ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ঋতু আবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একেক-সময়ে একেক জাতের ফুল ফুটেছে, রঙে গন্ধে ছড়িয়ে পড়ছে, আবার ঝরে পড়ছে। এই ফুল ফোটা ও ঝরে পড়া এ শুধু পৃথিবীরই ব্যাপার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে এই প্রথম কবি এ কবিতায় পৃথিবীমুখী হলেন। তারপর যা কিছু বললেন, সবই পার্থিব। ফুল ফোটা আর ঝরে পড়াকে নর্তকীর হাতের ঋতুর থালা থেকে নৃত্যের তালে তালে ফুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার সঙ্গে কবি মিলিয়ে দিয়েছেন। ঋতুচক্রের এই কল্পনাব পরে দ্বিতীয় স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ত পরিবর্তনশীল রূপ বিষয়ে আরও কিছু কথা সোজাসুজি ভাষায় তিনি বললেন এবং সেখানে একই রকম শব্দ বন্ধ বা ক্রিয়াপদের পুনরুক্তি—"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও/উদ্দাম উধাও;/ফিরে নাহি চাও,/যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।" ঐ যে সৃষ্টিকে তিনি বৈরাগিণী বলেছিলেন, তার সঙ্গে সংগতি রেখে অন্তিম পঙ্‌ক্তিতে উচ্চারিত হল 'পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।' পাথেয়র প্রতি কোনো মমতা নেই, শুধু পথ চলাতেই আনন্দ, এই তো বৈরাগীর স্বভাব। এই স্বভাবই তাবৎ সৃষ্টির স্বভাব। কেন না কোনো কিছু কুড়িয়ে রাখায়, কোনো কিছু সঞ্চয় করায় তার আগ্রহ নেই। এই বিবর্তনশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কতবার কতরূপে, কত জ্যোতিঃপুঞ্জে শোভা পেয়েছে, কিন্তু কোনো রূপকেই তার অনড় করে রাখায় আগ্রহ নেই,

যা সে পেয়েছে, তাই দু'হাতে ফেলে ফেলে চলায় তার পরম উৎসাহ। কোনও পিছুটান তার চঞ্চল যাত্রাকে মুহূর্তের জন্যও মন্থর করতে পারে নি। বাধাবন্ধহারা উদ্দাম তার গতি। এই স্তবকের শেষ কয় পঙ্‌ক্তিতে কবি যে সত্য প্রত্যক্ষ ভাষায় বলেছেন, সেই সত্যই এই স্তবকের বৈরাগিণী, অভিসারিকা আর ঋতুচক্রের আবর্তনের চিত্রকল্পে পরোক্ষ ভাষায় ও ভঙ্গিতে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়ময় হয়ে উঠেছে স্তবকের গোড়ার দিকে।

বিশ্বের চঞ্চল চরণস্পর্শে ধূলি অমলিন হয়ে ওঠে, মৃত্যুর ধূলি পলকে প্রাণের আলোতে ঝলসে ওঠে—এই সব কল্পনায় কবিতার তৃতীয় স্তবক উন্মোচিত হয়েছে। মুহূর্তের জন্য বিশ্ব গতি হারালে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বত উচ্ছিত হয়ে উঠবে সমস্ত কিছু পঙ্গু মূক, স্কন্ধকাটা অর্থাৎ কবন্ধ, বধির, অন্ধ হয়ে উঠবে। রুদ্ধগতি বিশ্বের সকল মৌলকণা স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বইটিতে 'পরমাণুলোক' বিষয়ে আলোচনায় এই বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের বুঝিয়েছেন। হাঁ-ধর্মী ও না-ধর্মী বৈদ্যুতের বিপরীতের প্রতি আকর্ষণই পরমাণুলোকে এক নিত্যগতির কারণ। এই আকর্ষণ একবার থেমে গেলে অণুর চেয়েও অণীয়ান্ পরমাণু সঞ্চয়ের অচল বিকারে স্তব্ধ হয়ে পড়বে। সেখানে সৃষ্টি নিজের ভারে নিজেকে আচ্ছন্ন করে প্রলয় ঘটাবে। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার ভাষায় তখন "বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে/কলুয়ের বেদনার শূলে।" এখানে কবির বিজ্ঞান ও পুরাণভাবনা একই সঙ্গে মিশেছে। শূল থাকে শূলপানি মহাদেবের। এই মহাদেব বা মহেশ্বর প্রলয়ের দেবতা। নিজের ভাবে সৃষ্টি নিজে যখন আচ্ছন্ন অনুতম পরমাণু যখন নিজের ভাবে সঞ্চয়েব অচল বিকারে স্তব্ধ, তখন সমগ্র সৃষ্টি প্রলয়ের মধ্যে লীন হয়ে থাকে। আমাদের পুরাণের এই ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে দিলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান থেকে আহৃত তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে এবং সেখানে বললেন এমন অবস্থা যদি কখনও হয় তাহলে কলুষের বেদনার শূলে আকাশেব মর্ম্মমূল বিদ্ধ হবে।

চতুর্থ স্তবকে অপেক্ষাকৃত ছোট এখানে মূলত নটী ও অপ্সরীর দুটি চিত্রকল্প দেখছি। বিশ্বনর্তকী তার নৃত্য মন্দাকিনীতে মৃত্যুস্নানে বিশ্বকে শুচি, পবিত্র করে তুলছে। মৃত্যু আছে বলেই পুরোনো জীর্ণ কখনও জঞ্জালের মতো পথ আঁকড়ে থাকে না, বরং বিদায় নেয়—মৃত্যুর মধ্যে হারিয়ে যায়। ভাগ্যিস মৃত্যু আছে! এই মৃত্যুর কথা জীবনপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় অজস্রবার শুনেছি। সেই রবীন্দ্রনাথই বিশ্বনর্তকীর নৃত্যকে মন্দাকিনীরূপে কল্পনা করলেন। মন্দাকিনীর কল্পনাটিও আমাদের পুরাণের অন্তর্ভুক্ত, কেননা পুরাণ মতে গঙ্গা ত্রিপথগা—আকাশে বা অন্তরিক্ষে মন্দাকিনী, পৃথিবীতে ভাগীরথী, বা জাহ্নবী আর পাতালে ভোগবতী। মৃত্যুস্নান সেরে বিশ্ব যখন শুচি পবিত্র হয়ে ওঠে, তখন আকাশ নীলে নীল দেখায়। মন্দাকিনীর জল বারে বারে পড়ায় আকাশ এমন সুনীল হয়ে ওঠে। আর সেই জল মৃত্যুর পবিত্র জল।

পঞ্চম স্তবকে সৃষ্টিকে আবার ভুবনমেখলা নর্তকীরূপে কবি দেখলেন। অপ্সরীর নৃত্যচঞ্চল চরণপতনের ছন্দ ও ধ্বনি কবিকে উতলা করে তুলছে। কবি তাঁর নাড়ীতে নাড়ীতে চঞ্চল চরণপতন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, কবির বক্ষ সেই রণনে অনুরণিত হচ্ছে। তার পরের পঙ্‌ক্তিগুলি অপেক্ষাকৃত চিত্রকল্পরিক্ত। কিন্তু এখানেই আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তির মধ্যে পৃথিবীর জন্ম, ভূপৃষ্ঠের নবনব রূপ পরম্পরাকে ঘিরে সুদূর ধূসর অতীতকাল পর্যন্ত বিস্তৃত

এক বর্ণাঢ্য ছবির জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। এখানে কবি দেখতে পেলেন ভূমিজ্ঞানীদের অনুমিত সেই দুটি রূপ—অন্যটি জলের অন্তবিহীন বিস্তারে কল্লোলিত সমুদ্রময় পৃথিবীর রূপ, অন্যটি জলে স্থলে দ্বিধাবিভক্ত আজকের ভূপৃষ্ঠের রূপ। একবার যখন জল থেকে স্থল মাথা তুলল, তখন সেই স্থলভাগে একদিন পৃথিবীতে ছিল শুধুই অরণ্য। কবি যখন লেখেন "রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,/কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা"; তখন সমুদ্রময় ও অরণ্যময় পৃথিবীর দুই অতীতরূপ আমাদের মনশ্চক্ষুতে আমরা দেখতে পাই। তারপর এই স্তবকে তিনি যা লিখেছেন, তা অভিব্যক্তিবাদী বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কবি হলে ঠিক এই ভাষায়ই লিখতেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তিনি রূপ থেকে রূপান্তর পেরিয়ে, এক জীব থেকে অন্য জীবের অবস্থা অতিক্রম করে, যুগে যুগে চলে এসেছেন। জীবের অভিব্যক্তিতে কত প্রাণি পর্যায় এসেছে, আবার কত প্রাণী বিলীন হয়ে গেছে। এই সমস্তর মধ্য দিয়ে মহাসমুদ্রে ভাসমান আদিম এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী জটিল শরীর বিশিষ্ট মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রাণের রঙ্গমঞ্চে আগমনের এক দীর্ঘকালীন চলচ্ছবি কবি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন কয়েকটি সুমিত পঙ্ক্তির গণ্ডির মধ্যে। সেই পঙ্ক্তিগুলি ছন্দের "যুগে যুগে এসেছি চলিয়া/স্খলিয়া স্খলিয়া/চুপে চুপে/রূপ হতে রূপে/প্রাণ হতে প্রাণে।" জীব তাব অভিব্যক্তির চলার পথে, যা যুগে যুগে পেয়েছে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে রূপে স্বভাবে—তার কোনও কিছুই সঞ্চয় করে রাখায় তাঁর উৎসাহ নেই। পথের আনন্দ পাথেয় পথের দুধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অপচয়েই তার আনন্দ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে যে-সব দান প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ একদিন পেয়েছিল, যে-সব শারীরীক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল—সে সবের প্রতি মানুষের কোনও মমতা নেই। ওসব আজকের প্রয়োজনে মেটাচ্ছে না বলে এগুলির প্রতি মানুষ নির্মল।

কবিতার শেষ স্তবকে কবি তাবৎ সৃষ্টির ঢেউয়ে ঢেউয়ে সশব্দ, আবর্তগম্ভীর ও ফেনিল স্রোতে দেখছেন 'তরুণী কাঁপিছে থরথর'। সৃষ্টির স্রোতকে আবার সময়ের স্রোতও বলতে পারি। সেই স্রোতে ভাসমান থরথর কম্পমান এক নৌকোর মতো মনে হচ্ছে মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কবির নিজেকে। মানুষ সেই 'তরণী' কাঁপছে থরখর। তটের সঞ্চয়ে মানুষ নিরুৎসাহ। তীরের সঞ্চয় তীরে পড়ে থাকুক তো থাকুক। মানুষকে সে-সঞ্চয়েব মায়া মমতা কাটিয়ে ভাসমান নৌকোর মতোই এগিয়ে যেতে হবে, তাকে উতলা করে তুলছে সম্মুখের আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দেওয়াই তার একমাত্র কাজ, অভিব্যক্তিশীল জীব হিসেবে এ তার একমাত্র ধর্মপালন। পশ্চাতের কোলাহল অর্থাৎ অতীতের কর্ম কৃতি বাণী যতোই তাকে অতীত-লোকচারী করে তোলার চেষ্টা করুক না কেন, অজানা ভবিষ্যতের অতল আঁধারের দিকে নিরন্তর যাত্রাই মানুষের একমাত্র দায়। ক্রমে আঁধার কেটে যায়, আলো ফুটে ওঠে, ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়ে ওঠে। তখন অতল আঁধার পেরিয়ে অকূল আলোর প্লাবন। কুলহারা উচ্ছল আলো কূলভাঙা জলস্রোতের মতো সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যা ছিল মূর্তিহীন ভবিষ্যৎ, তা তখন বর্তমানে মূর্ত হয়ে ওঠে।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে ভূ-পৃষ্ঠের এই ক্ষুদ্রতনু মানুষ পর্যন্ত সকলকে আদি অন্তহীন অবিরল, উচ্ছল, আবর্তসঙ্কুল, সফেন ও সশব্দ এক নদীর রূপে কবি রবীন্দ্রনাথ এ কবিতায় ভেবেছেন। আর এ কবিতায় যা কিছু শব্দ, শব্দ বন্ধ, চিত্রকল্প ও চিত্রকল্পানু আছে—সবই

ঐ মূল নদীর চিত্রকল্পের আনুষঙ্গিক। প্রতিটি শব্দ অমোঘ অব্যর্থ অবিকল্প। যা যা আছে সকলই সমগ্রের সঙ্গে এক অবিশ্লেষ্য যোগ-রহস্যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে বিধৃত। এখানেই 'চঞ্চলা' কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব।

॥ দুই ॥

কবিতার আলোচনা

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করবার পর পশ্চিম বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁর এই ভ্রমণ এবং তদুপলক্ষ্যে পাশ্চাত্যবাসীদের জীবন-যাত্রার গতি ও সংক্ষোভ লক্ষ্য করার ফলেই হয়তো তিনি সাময়িকভাবে মনের মধ্যে অপরিসীম গতির প্রেরণা অনুভব করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই গতির প্রেরণা তাঁর মনে বরাবরই সক্রিয় ছিল। তাঁর নিজের ভাষায়—"আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক। আমরা জন্মান্তরবাদী এদেশে এই গতির ইঙ্গিতই সর্বত্র।...আমার রক্তে সেই গতির ডাক আছে।"—যা হোক্, ঐ সাময়িক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের যে কবিতা কয়টি রচনা করেন, তাদের মধ্যে যেন গতিতত্ত্বের মাহাত্ম্য-বর্ণনাই কবির মুখ্য বিষয়। আবার ঐ সমস্ত কবিতার মধ্যে দুটি কবিতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা চলে সেখানে গতিতত্ত্ব সর্বোচ্চ সুসম্বন্ধ কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করেছে—তাদের একটি কবিতা আলোচ্য 'চঞ্চলা'।

'চঞ্চলা' ('হে বিরাট নদী') কবিতার দুটি অংশ—প্রথম অংশে কবি দেখিয়েছেন, এই বস্তুবিশ্ব যেন নদীরূপে চলার নেশায় মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে, তারি রূপ-রূপান্তর এবং দ্বিতীয় অংশে—এই নদী-ভাবনা কবি হৃদয়কে কতখানি অধিকার করেছে, তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটির মুলভাব ঃ বিরাট নদীর অদৃশ্য নিঃশব্দ চলে অবিচ্ছিন্ন অবিরল ছুটে চলেছে; কবির কল্পনা-দৃষ্টির সম্মুখে তার যতটুকু দেখা যাচ্ছে তার আদিও নেই, অন্তও নেই। ভৌগোলিক তথ্যের কোন মূল্য নেই এই সৃষ্টির সম্মুখে এই অবিরত চলার কায়াহীন বেগে সমস্ত বিরাট শূন্য স্পন্দিত শিহরিত হয়ে ওঠে। ভৈরবী বৈরাগিনী সেই রুদ্ররূপ, তার প্রেম সর্বনাশা, সে তাই ঘর ছাড়া। উন্মত্ত তার অভিসার, কিছুই সে সঞ্চয় করে না, শোক ভয় কিছুই তার নেই, পথের আনন্দবেগে অবাধে সে পাথেয় ক্ষয় করে চলে; প্রতি মুহূর্তে সে নতুন, পবিত্র, তার চরণ স্পর্শে মৃত্যুও প্রাণ হয়ে ওঠে, তার রূপ নটীর, চঞ্চল অপ্সরীর। তার নৃত্য মন্দাকিনী প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবনকে নতুন ও পবিত্র করে তুলছে। নদী সম্বন্ধে চিন্তা ও কল্পনা যখন অনুভূতির এই স্তরে এসে পৌঁছল তখন কবির ব্যক্তিগত জীবনও এক মুহূর্তে গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল, অনুভূতি তখন উপায় ও উপলক্ষকে ছাড়িয়ে কবির চিত্তমূল ধরে টান দিল। নদীর অবিচ্ছিন্ন অবিরাম রুদ্রগতি নিজের চিত্তে সংক্রমিত হল, কবি বলে উঠলেন—

> "ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা....
> ....কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা।"

নদীস্রোতকে উপলক্ষ্য করে কবির মনে পড়ছে নিজের জীবন-স্রোতের কথা। তিনিও তো প্রতিদিন চলে আসছেন রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে, যা কিছু পেয়েছেন, তাই

ক্ষয় করে এসেছেন দান হতে দানে, গান হতে গানে। তারপর একদিন তিনি অরূপের নিস্তব্ধ গহনে, একের নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যানে নিজেকে নিমগ্ন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ আবার পুরাতন—

"সেই স্রোত হয়েছে মুখর
ধরণী কাঁপিছে থরথর।..."

"চঞ্চলা'য় দেখিলাম নদীর চলমান রুদ্ররূপ দেখিয়া কবির চিত্রস্রোতও চঞ্চল এবং মুখর হইয়া উঠিল।"

(ড. নীহার রঞ্জন রায়)

রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ-বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়শঃ ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন যে গতিবাদ ছিল তাঁর রক্তে এবং ফরাসী দার্শনিক তথা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সাহচর্যে আসবার পূর্ব থেকেই তাঁর সাহিত্যে এর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া তত্ত্বগত দিক থেকেও বের্গসঁর মতবাদের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব যা 'আলোচ্য কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে, তা উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের এই স্বাতন্ত্র্যটুকু নিম্নোক্তক্রমে নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ঃ "জড়বাদী বের্গসঁর সহিত রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও চিন্তার একটা মিল থাকিলেও মৌলিক অমিল আছে অনেকখানি। বের্গসঁ দেখিয়াছেন, কেবল একটা অফুরন্ত গতির বেগ, একটা নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের স্রোত। সৃষ্টির এই নিরন্তর পরিবর্তন [illegible] Becoming একটা প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক ধারা মাত্র। কিন্তু মিস্টীক ও লীলাতত্ত্বরসিক রবীন্দ্রনাথ এই গতির একটা উদ্দেশ্য ও পরিণাম দেখিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন গতি সত্যের একটা রূপ মাত্র, কিন্তু তাহাই চরম রূপ নয়।...এই ভাঙ্গা-গড়া, জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে মানব চলিয়াছে, সে এই বিশ্বলীলার অংশ রূপে, ঐ লীলার কাণ্ডারীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার সহচর রূপে, জীবনের সার্থকতা পাইতে চায়।"

এই বস্তুবিশ্বে নিরন্তর গতি লক্ষ্য করে কবি তাকে একটি নদী রূপে কল্পনা করেছেন। কিন্তু নদীর কল্পনায় বিশ্বপ্রবাহের সমগ্রতার আভাসই পাওয়া যেতে পারে, পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ নদী তো আদি ও অন্তযুক্ত, কিন্তু কাল বিশ্বপ্রবাহের আদি-অন্ত কিছুই নেই। তারপর কবি বিশ্বপ্রবাহের আসক্তিহীনতা ও ঘরছাড়া ভাবটি বুঝানোর জন্য তাকে ভৈরবী ও বৈরাগিনী রূপে কল্পনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, অতীতের ঘর ছাড়া ভাব এবং বর্তমানের আসক্তিহীনতাই প্রকাশিত হয়েছে, আবার বিশ্বে নতুন প্রাণের স্থান করে দেবার জন্য এই বিশ্বপ্রবাহই নটী ও চঞ্চলা অপ্সরীরূপে গতি প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।— কবিতার প্রথমাংশে কবির দৃষ্টি এইভাবে বিশ্বের গতিপ্রবাহে সুস্থিত ছিল। তারপরই কবি নিজের অন্তরের প্রতি দৃক্‌পাত করে দেখলেন যে সেখানে এক অলৌকিক প্রেরণার বশে বিশ্বচাঞ্চল্যের পদধ্বনি নিজের মর্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। কবির রক্তে আজ সমুদ্রের ঢেউ অরণ্যের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছে, নাড়ীতে নাড়ীতে তিনি সেই চঞ্চলের পদধ্বনি শুনতে পান।

এই কবিতায় তথা সমগ্র কাব্যে কবি যে নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তার প্রকাশের জন্য যথোপযুক্ত আয়োজনও তাঁকে করতে হয়েছিল। এই বাধাহীন গতিশক্তিকে প্রকাশের

জন্য তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে—প্রবহমান মুক্তবন্ধ ছন্দ, তা চলে অবাধ গতিতে ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। যে প্রচণ্ড গতিশক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করছে, তা যে ফুড়ফুরে হাওয়ার মতো নয়, সেটা প্রকাশ করবার জন্যই তিনি ব্যবহার করেছেন সর্বংসহ সংস্কৃত শব্দসম্পদ। এতে শব্দ-চয়ন নৈপুণ্য, ভাবগাম্ভীর্য, ছন্দ-সজ্জা এবং কল্পনার প্রসার সর্ববিধ গুণ যুক্ত হওয়াতে রবীন্দ্র-কাব্যে 'চঞ্চলা' কবিতাটি একটি বিশেষ কবিতারই মর্যাদা লাভ করেছে।

॥ তিন ॥

সার-সংক্ষেপ

(স্তবক ১)

বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তার জল অবিচ্ছিন্ন অবিরল ধারায় নিরবধি কাল ধরে বয়ে চলছে। তার রুদ্র কায়াহীন বেগে শূন্য স্পন্দনে শিহরিত হয়। বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে বস্তুফেনা পুঞ্জীভূত হয়ে জেগে ওঠে; বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে আকাশ কেঁদে ওঠে। ধাবমান অন্ধকার থেকে আলোকের তীব্রচ্ছটা বর্ণস্রোতে বিচ্ছুরিত হয়। বুদ্বুদের মতো যত সূর্যচন্দ্র তারা স্তরে স্তরে ঘূর্ণচক্রে ঘুরে মরে।

(স্তবক ২)

হে ভৈরবী বৈরাগিণী, শব্দহীন স্বরে যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে, সেই চলাই তো তোমার রাগিণী, অন্তহীন দূর কি নিরন্তর তোমাকে সাড়া দেয়? তার সর্বনাশা প্রেমে তুমি নিত্য ঘরছাড়া। সেই উন্মত্ত অভিসারে তোমার বক্ষোহারে ঘন ঘন দোলা লাগে, আর এমনি নক্ষত্রের মণি ছড়ায়; শূন্যকে অন্ধকার করে দিয়ে তোমার ঝোড়া চুল উড়তে থাকে। তাতে বিদ্যুতের দুল দুলে ওঠে, তোমার আকুল অঞ্চল কম্পিত তৃণে, আর বিপিনে বিপিনে চঞ্চল পল্লব পুঞ্জেও গড়িয়ে পড়ে। তোমার ঋতুর ফালি থেকে বারবার জুঁই চাঁপা বকুল পারুল পথে পথে ঝরে পড়ে। তুমি শুধু উদ্দাম বেগে উধাও হয়ে ছুটে চলো, ফিরে আর তাকাও না, তোমার যা' কিছু সব দুই হাতে শুধু ফেলে যাও। কিছুই কুড়িয়ে নাও না, সঞ্চয় করো না; তোমার কোন শোক নেই, ভয় নেই—পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয়কে তুমি ক্ষয় করে দাও।

(স্তবক ৩)

যে মুহূর্তে তুমি পূর্ণ, সেই মুহূর্তে তোমার আর কিছুই থাকে না, তুমি তাই সর্বদাই পবিত্র। তোমার চরণস্পর্শে বিশ্ব ধূলি প্রতি পলকে মলিনতা ভুলে যায়—মৃত্যুও ঝলকে ঝলকে প্রাণ হয়ে ওঠে। যদি তুমি মুহূর্তের জন্যও ক্লান্তি ভরে থমকে দাঁড়াও, তখনি চমকি উঠে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠবে; পঙ্গু, মূক, কবন্ধ, বধির, অন্ধ, স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা—সমস্ত কিছুকে ঠেকিয়ে দিয়ে পথে দাঁড়াবে; অনুতম পরমাণুও আপনার ভারে কলুষের বেদনার শূলে সঞ্চয়ের অচল বিকারে আকাশের মর্মমূলে বিদ্ধ হবে। ওগো নটী,

চঞ্চল অপ্সরী, আলক্ষ্য সুন্দরী, তোমার নৃত্য মন্দকিনী নিত্য ঝরে ঝরে মৃত্যুস্থানে বিশ্বের জীবনকে শুচিশুদ্ধ করে তুলেছে এবং নিঃশেষে নিখিল গগনকে নির্মল নীলে বিকশিত করে তুলছে।

(স্তবক ৪)

অলক্ষিত চরণে অকারণ আবারণ চলা আর ঝংকার মুখরা এই ভুবনমেঘলা নদী কবিকে আজ উতলা করে তুলেছে। তাঁর নাড়ীতে নাড়ীতে তিনি চঞ্চলের পদধ্বনি শুনতে পান, তাঁর বক্ষ অনুরণিত হয়। কেউ জানে না যে তাঁর রক্তে আজ সমুদ্রের ঢেউ নাচে, অরণ্যের ব্যাকুলতা কেঁপে কেঁপে ওঠে। আজ তাঁর সেই কথা মনে পড়ে—যুগে যুগে তিনি স্খলিত হয়ে চুপে চুপে রূপ থেকে রূপে, প্রাণ থেকে প্রাণে চলে এসেছেন। নিশীথে প্রভাতে, যা কিছু হাতে পেয়েছেন সবই দানে আর গানে ক্ষয় করে দিয়ে এসেছেন।

(স্তবক ৫)

সেই স্রোত এবার মুখর হয়েছে, তরণী থরথর কাঁপছে। কবি তীরে যা সঞ্চয় করেছিলেন তা তীরেই পড়ে থাক, তিনি যেন আর ফিরে না তাকান। সম্মুখের বাণী তাঁকে পশ্চাতের কোলাহল থেকে মহাস্রোতে টেনে নিয়ে যাক্ অতল আঁধারে, অকূল আলোতে

॥ চার ॥

শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী

প্রথম স্তবক

হে বিরাট নদী—কবি নদীর রূপের দ্বারা বস্তু বিশ্বের গতিপ্রবাহকেই বোঝাতে চাইছেন। **চলে নিরবধি**—অনন্ত কালের প্রবাহই এখানে কবির অভিপ্রেত। **কায়াহীন বেগে**—নদী কায়াহীন নয়, কিন্তু কালপ্রবাহের কোন্ রূপ নেই, কাজেই কবির অভিপ্রেত যে নদী নয় কাল চৈতন্য, তা' এখানে স্পষ্টই বোঝা যায়, অবশ্য নদী প্রতিমুহূর্তেই রূপ থেকে রূপান্তর লাভ করেছে বলে তার নির্দিষ্ট কোন কায়া নেই—এ কথাও বলা চলে। **বস্তুহীন প্রবাহের....উঠে জেগে**—নদীর ধর্ম প্রবহমানতা, সে নিরন্তর বয়েই চলেছে, ফলে সে কখনো কোন নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করতে পারছে না। কিন্তু যে মুহূর্তে সে কখনো কোথাও সেই মুহূর্তে সেখানে ফেনা রূপে বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। অসীম ফলপ্রবাহও তেমনি নিরন্তর বেগে ধাবমান; যেখানেই থামছে, সেখানেই বস্তুবিশ্বের সৃষ্টি। ফরাসী মনীষী বের্গসঁর ধারণাও তাই—গতিপ্রবাহ যদি কোন কারণে প্রতিহত হয় তবই বস্তুপুঞ্জও জড়ো হয়ে ওঠে। **ক্রন্দসী**—আকাশ। **আলোকের....অন্ধকাব হ'তে**—গতিশীল অন্ধকারের গর্ভ থেকেই জাত হয় বর্ণময় আলোকের তীব্র দীপ্তি। **ঘূর্ণাচক্রে...বুদ্বুদের মতো**—গতিময় বিশ্বের আবর্তনে যেখানেই বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেই বুদ্বুদের মতো দেখা দিয়েছে সূর্য, চন্দ্র, তারা আদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী।

দ্বিতীয় স্তবক

হে ভৈরবী ওগো বৈরাগিনী—কবি এই বিশ্বপ্রবাহকে প্রথমে নদী বলেছেন, তারপরে বলেছেন ভৈরবী ও বৈরাগিনী, ভৈরবীও বৈরাগিনী আখ্যা দ্বারা এর নিরুদ্দিষ্ট ঘর ছাড়া এবং আসক্তিহীনতার ভাবটি প্রকাশ করেছেন। এই তিনটি শব্দে, ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্তমানের তিনটি অবস্থাকে সূচনা করে; ভবিষ্যৎ নিরুদ্দিষ্ট অতীতে ঘর ছাড়া হয়েছে, এবং বর্তমানের কোন আসক্তি এই ভৈরবী ও বৈরাগিনীর নেই। **উন্মত্ত সে-অভিসারে...বিদ্যুতের দুল**—অজানার আহ্বানে নিরন্তর ধাবমান যে নদী রূপ কালপ্রবাহ, যাকে কবি এখানে ভৈরবী ও বৈরাগিনী রূপে অভিহিত করেছেন তার অবিরাম চলাকে 'অভিসার-যাত্রা', তার বক্ষোহারে মণির দীপ্তি কিংবা কানে বিদ্যুতের দুলের কল্পনায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়,—কারণ নায়িকাতো বৈরাগিনী ভৈরবী তার তো এ সমস্ত ব্যাপারে আকর্ষণ থাকবার কথা নয়। **বিপিন**—অরণ্য, কানন। **পথের আনন্দ...করো ক্ষয়**—গতি প্রবাহে যখনি বাধার সৃষ্টি হয়, তখনি সে বস্তু পুঞ্জের সৃষ্টি হয়, তাকে পাথেয় করে কিন্তু গতি এগিয়ে চলে না, সঞ্চয় তার পড়েই থাকে। তুলনীয় 'শাজাহান' (৭নং) কবিতার—

"জীবন উৎসব শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ।
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তির তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে তুমি হেথা নাই।'

(তৃতীয় স্তবক)

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি....নাই—গতি যদি কখনো পূর্ণতা লাভ করে অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করে, তখন সে শূন্যমাত্র—তার বিকারে জাত বস্তুজগৎ প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়; অতএব পবিত্র নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে—এটি কিন্তু গতিধর্ম নয়, তার অবর্তমানতামাত্র। গতি পবিত্র অপাপবিদ্ধ। **যদি তুমি মুহূর্তের তরে...বেদনার শূলে**—মুহূর্তের জন্যও যদি গতি স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে বস্তু বিশ্ব বস্তু পিণ্ডের ভারে অচল পড়ে থাকবে, বিশ্বপ্রকৃতি অশুভ শক্তির প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে। **"গতি যাহার ধর্ম সে যদি কোনো মুহূর্তে স্বধর্মচ্যুত হয়, তবে সে বস্তুবিশ্বের দ্বারা অবরুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে, গতির পটভূমিতেই এখানে বস্তুর আবির্ভাব, সেই গতি যদি অন্তর্হিত হয়, তবে বস্তু আপন অসামঞ্জস্য দ্বারা বিশ্বের শান্তি নষ্ট করে।"** (প্রমথনাথ বিশী)। **নটী**—নদী চঞ্চল গতিতে যেন নাচের তালে তালে চলেছে, তাই তাকে 'নটী' রূপে সম্বোধন করা হয়েছে। **অপ্সরী**—স্বর্গবাসিনী অপ্সরাদেরও নৃত্যনৈপুণ্যের খ্যাতি আছে। অধিকন্তু জলের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক রয়েছে, জল থেকেই

এদের উদ্ভব। তাই নদীকে অপ্সরী বলা হয়েছে। **নৃত্যমন্দাকিনী**—গঙ্গার নামান্তর মন্দাকিনী। এই বিশেষ নদীটির নাম উল্লেখের ভিতর দিয়ে কবির মনে গঙ্গার বিবিধ রূপের কথা জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। একদিকে গঙ্গা যেমন হিমালয় থেকে উদ্ভূত হয়ে বিস্তৃত পথ অতিক্রম করে, পথের দু'ধারে জনপদ অরণ্য সৃজন করে সমুদ্র মুখে এসেও এক ব-দ্বীপময় জনপদ সৃষ্টি করে তুলেছেন, অন্যদিকে তার পবিত্র বারিস্পর্শে এবং দূষিত বস্তুর পরিবহনে জনপদবাসীর মনের ও দেহের আবিলতাও দূরীভূত হচ্ছে .এইভাবেই নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য নতুন জীবন সৃষ্টি করে চলেছে। কবি কল্পনায় নদীর এই দ্বৈত-ভূমিকাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

(চতুর্থ স্তবক)

ওরে কবি—রবীন্দ্রনাথ এবার নিজেকে সম্বোধন করছেন। বাইবের জগতে তিনি যে প্রচণ্ড গতিকে এতক্ষণ নিরীক্ষণ করেছেন, এখানে সেই গতিবেগ তাঁর অন্তরেও সঞ্চারিত হয়েছে এবং কবিতার পরবর্তী অংশে তারই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। **ভুবনমেখলা**—নদীর বিশেষণ, কারণ নদী পৃথিবীকে কটিবন্ধের মতো বেষ্টন করে আছে। **অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা**—গতিকে কখনো চোখে দেখা যায় না, তাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। কবি নদীর মধ্যে বস্তুবিশ্বের এই গতিপ্রবাহকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং তা তাঁর অন্তরেও অনুরূপে গতিবেগ সৃষ্টি করে। **নাড়ীতে নাড়ীতে...পদধ্বনি**—বস্তুবিশ্বের যে গতিপ্রবাহ কবি নদীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, তা যেন তাঁর রক্তের অণুতে পরমাণুতে অণুরণন সৃষ্টি করে চলছে। **রক্তে তোর...ব্যাকুলতা**—কবির কাব্যে যে সমুদ্র, অরণ্য আদি প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি অত্যধিক প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তার কারণ, তিনি অন্তরের মধ্যে ওদের গতিকে অনুভব করতে পেরেছেন, গতির মধ্য দিয়েই প্রকৃতি তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। **মনে আজি পড়ে...প্রাণ হতে প্রাণে**—বস্তুবিশ্বের গতি-শক্তিকে দেখেই কবির মনে হয়েছে—"**সেই চলার বেগে প্রাণ যেন করুণা ধারার মতন যুগে যুগে রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া চলিয়া আসিতেছে—জন্মজন্মান্তরের রূপ ঘুচাইয়া ঘুচাইয়া এবং ইহজন্মের ও আবাল্যের রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়া প্রাণের যাত্রা।**"

(পঞ্চম স্তবক)

তরণী কাঁপিছে থরথর—বিশ্ব প্রকৃতির যে গতিশক্তি কবি আপনার অন্তরে অনুভব করেছিলেন, এবার সেই গতি কবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, তাঁর জীবন-তরীও এবার গতিস্রোতে ভাসতে শুরু করেছে। **তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে**—জীবনের সঞ্চয়কে সঙ্গে রাখলে তা এমন বস্তুভারে পুঞ্জীভূত হবে যে আর পথ চলা সম্ভব হবে না, গতিহীন হয়ে জীবন-পথের পথিককে বসে পড়তে হয়, তাই নদীর চলার মধ্য দিয়ে কবি সমস্ত সঞ্চয়কে উপেক্ষা করে শুধুই এগিয়ে চলার বাণী শুনতে পেয়েছেন।—এই সত্য অনুভূতি বহু পূর্বেই কবি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর 'সোনার তরী' কবিতায়—সেখানে কবির আগ্রহে মহাকাল এসে তরী বোঝাই করে কবির সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে গেলো, কিন্তু কবির আর ঠাঁই হলো না—'**শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি।**' একই মূল সত্যের বিপরীত দৃশ্যটি

এখানে দেখা গেলো। আবার অনুরূপ অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে পূর্ববর্তী **'শাজাহান'** কবিতায় যেখানে শাজাহানের অমর সৃষ্টি 'তাজমহল'কে পিছনে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন এবং এই প্রসঙ্গে **'তাজমহলে'র** কাতরোক্তি—

'স্মৃতিভারে আমি পড়ে অছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

অতল আঁধারে...অতল আলোতে—"কবি ক্রমাগত অতল আঁধারের ভিতর দিয়া অকুল আলোকে যাত্রা করিতে বলিতেছেন। জীবনের ধর্মই হইতেছে অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ এবং প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে যাতায়াত"।

॥ পাঁচ ॥

● ব্যাখ্যা

(এক)

"হে বিরাট নদী...চলে নিরবধি"

—এর ফলে বিশ্বপ্রকৃতিতে কবি যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন, তার একটা চিত্রাত্মক বর্ণনা দাও।

কবি গতিশক্তিকে নদীরূপে গ্রহণ করে তার অবিচ্ছিন্ন অবিরল ধারায় নিরবধি কাল প্রবাহিত হবার ফলেই যে বিশ্বপ্রকৃতির তাবৎ বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন কতকগুলি চিত্ররূপেব মধ্য দিয়ে। কবি কল্পনা করেছেন, যেন তার ভয়াল ভীষণ কায়াহীন বেগ শূন্য লোককে স্পন্দনে শিহরিত করে তোলে, বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা জেগে ওঠে এবং বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে আকাশ কেঁদে ওঠে। ঐ ধাবমান অন্ধকার থেকে আলোকের তীব্রচ্ছটা বর্ণস্রোতে বিচ্ছুরিত হয়, এবং স্তরে স্তরে বুদ্বুদের মতো যতো সূর্য চন্দ্র তারা ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে।

(দুই)

'হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী' বলে ৮নং 'চঞ্চলা' কবিতায় কবি কাকে সম্বোধন করেছেন? তার রূপ ও প্রকৃতির যে পরিচয় দিয়েছেন কবি, তা বর্ণনা কর এবং তার মধ্যে যদি কোন অসঙ্গতি লক্ষ্য করে থাকো, তার পরিচয় দাও।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি মূলতঃ গতিবাদের কাব্য, বিশেষতঃ এর অন্তর্ভূক্ত 'চঞ্চলা' কবিতাটিতে গতিসত্যকেই প্রথমে নদী, পরে ভৈরবী ও বৈরাগিণী রূপে বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য অংশে 'ভৈরবী' এবং 'বৈরাগিণী' বলতে বিশ্বপ্রবাহকেই বুঝিয়েছেন। 'ভৈরবী' বলতে উগ্রতা এবং 'বৈরাগিণী' বলতে শান্ত ভাব বুঝালেও উভয়ের মধ্যে একটা বড় ঐক্য এই যে—সংসার বিষয়ে উভয়েই সমান উদাসীন, আসক্তিহীন, কোন সঞ্চয়ের জন্যই তাদের কোন আকুলতা থাকে না—পথের সঞ্চয়কে অনায়াসে তারা উপেক্ষা করতে পারে। কবি বিশ্বপ্রবাহের মধ্যেও উগ্রতা ও শান্ত ভাব, সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা এবং তাদের প্রতি সমভাবেই উপেক্ষার ভাব লক্ষ্য করেছেন বলেই প্রতিটি তুলনায় এদের টেনে এনেছেন। তিনি

দেখিয়েছেন—সেই ভৈরবী বৈরাগিণী নিঃশব্দে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছেন, যেন অন্তহীন দূর নিরন্তর তাদের প্রাণে সাড়া জাগায়, তাই সেই সর্বনাশা প্রেমের টানে সে নিত্য ঘরছাড়া। সেই উন্মত্ত অভিসারে তার বক্ষোহারে ঘন ঘন দোলা লাগায় আর অমনি নক্ষত্রের মণি ছড়িয়ে পড়ে, শূন্যালোককে অন্ধকার করে দিয়ে তার ঝোড়ো চুল আকাশে ওড়ে আর অমনি বিদ্যুতের দুলে দুলে ওঠে, আর আকুল অঞ্চল বিপিনে বিপিনে চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে কম্পিত তৃণে গড়িয়ে পড়ে। পথে পথে তার ঋতুর থালি থেকে বারবার জুঁই চাঁপা বকুল পারুল সব ফুল ঝরে পড়ে।

সেই ভৈরবী বৈরাগিণী শুধু উধাও হয়ে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলছে; কখনো সে আবার ফিরে তাকায় না, তার যা কিছু আছে, সব দুই হাতে শুধু ফেলে ছড়িয়ে যায়; কিছুই সে কুড়িয়ে নেয় না, কিছুই সে সঞ্চয় করে না, তার কোন শোক নেই কোন ভয় নেই, পথের আনন্দ বেগে অনায়াসে সে পাথেয়কে ক্ষয় করে দেয়।

উদাসীনা ভৈরবী বৈরাগিণীর চরিত্রটি যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত হলেও আর 'অভিসারিকা বেশ', 'বক্ষোহার' এবং 'কর্ণদুল'-এর কল্পনাটি তার উদাসীনা চরিত্রটির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়।

(তিন)

"যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।"

'বলাকা'র '৮ নং' কবিতা 'চঞ্চলা' ('হে বিরাট নদী') থেকে এই পংক্তি কয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। কবি এখানে চিরচঞ্চলা নদীকে লক্ষ্য করে উক্তিটি করেছেন। প্রবাহমানতা, নিরবধি কাল অবিরল ধারায় প্রবাহিত হওয়াই এর ধর্ম। যদি কখনো নদীর এই চিরন্তন গতি সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়, কোন একটা বিশেষ স্থানে এটা দাঁড়িয়ে পড়ে এবং আর এগোতে না পারে, তবে পশ্চাতের সমস্ত কবিরাশি পুঞ্জীভূত হয়ে এখানে পর্বতকার বস্তুরূপে পরিণত হবে—সে হবে এক সৃষ্টি-বিধ্বংসী ব্যাপার।

অনন্ত কাল প্রবাহ যে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে চলেছে, সেই বিশ্ব প্রবাহকেই কবি এখানে নদীর রূপে প্রকাশ করেছেন। নির্গুণ কাল-প্রবাহকে ধারণায় আনা কষ্টকর এবং সেই অবাস্তব চঞ্চলতা থেকে কীভাবে বস্তুবিশ্বের উদ্ভব ঘটে, দার্শনিকরাও তার সদুত্তর দিতে পারেন না। তাই এই ব্যাপারটাকে উপলব্ধিগোচর করবার জন্যেই তাঁরা পরিচিত জগৎ থেকে কোন উপমা গ্রহণ করে থাকেন। এখানেও কবি তাই নদীর উপমাটি গ্রহণ করেছেন। "নদীর চঞ্চল স্রোত চলিয়া যাইবার সময়ে যে পলিমাটি পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া যায়, এই অবাস্তব গতি বিশ্ব হইতে বস্তুর উদ্ভবও অনেকটা সেই ধরনের। আমাদের বস্তুস্পর্শী কল্পনা, এই বস্তু বিশ্বটাকেই মুখ্য এবং একমাত্র বলিয়া গ্রহণ করে, আর আসল বিশ্বটা আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া ফাঁকি দিয়া যায়।...অনভিজ্ঞের কাছে স্রোতের অপেক্ষা ফেনপুঞ্জ সত্যতর কারণ

তাহা প্রত্যক্ষতর।"—আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও চলতা বা পরিবর্তনশীল তাকে প্রাণের ধর্ম বলা হয়, জড়তাই মৃত্যু।

(চার)

> **"রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,**
> **কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা।"**

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৮ নং 'চঞ্চলা' (হে বিরাট নদী') নামক কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্তর পুরুষকে লক্ষ্য করে এই উক্তিটি করেছেন। বহির্বিশ্বের সর্বত্র কবি যে গতিশক্তির লীলা দেখতে পেয়েছেন, তা সহজেই তাঁর নিজের মনেও সংক্রমিতত হওয়াতে কবি নিজের অন্তরে জাগ্রত প্রবুদ্ধ অন্তর পুরুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এতকাল তিনি কাব্যে প্রকৃতিজগতের যে লীলা যে গতিচাঞ্চল্যকে প্রতিফলিত করে তুলেছেন, তারুণ্যের প্রথম প্রভাতে তিনি নিজেকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার যে প্রেরণা অনুভব করেছিলেন, তার মূলে রয়েছে প্রকৃতির গতি-সংক্রমণ, সমুদ্রের ঢেউ-এ যে গতি কিংবা অরণ্যের ব্যাকুলতায় যার আভাস পাওয়া যায়, তাই তো কবির রক্তে সঞ্চারিত হবার ফলে কবি চিরকাল তাঁর কাব্যে গতিশক্তির জয়গান করে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিটি স্মরণীয় ঃ "আমাদের রক্তের মধ্যে গতির অতি পুবাতন তাগিদ রয়েছে। তাই আমার মধ্যে সদাই এই গতির জন্য ব্যাকুলতা।...আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক।...'নির্ঝরের স্বপ্ন- ভঙ্গে আমার জীবন-নির্ঝরের প্রধান কথাই হোলো—'আমি যাব আমি যাব'।—সেই নির্ঝরই পরে বলাকাতে নদী হয়ে দেখা গিয়েছে।"

॥ ছয় ॥

দীর্ঘ আলোচনা

॥ এক ॥

'বলাকা' কাব্যের ৮ নং কবিতা তথা 'চঞ্চলা' ('হে বিরাট নদী') কবিতাটির মর্মকথা

অনন্ত কালপ্রবাহ তথা বিশ্ব প্রবাহকে রবীন্দ্রনাথ একটি নদীর রূপ দ্বারা আলোচ্য কবিতায় প্রকাশ করেছেন, নদীর গতিপ্রবাহকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, বোঝা যায় তাতে ভেসে যাওয়া গতিময় ফেনপুঞ্জ দেখে; তেমনি বিশ্বপ্রবাহও যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে, তা আমরা বুঝতে পারি, যখনই তার গতি মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ফলে গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-পর্বত-আদি বস্তুপুঞ্জ গড়ে ওঠে, তাদের দেখেই। অন্ধকার কালস্রোত থেকে বিচ্ছুরিত তীব্র আলোকচ্ছটা নক্ষত্ররূপ ধারণ করেছে, আবার স্রোতেব ঘূর্ণাবর্তে বুদ্ধদের মতো সৃষ্টি হচ্ছে সূর্য চন্দ্র তারা। এইভাবে এক অজানার আহ্বানে রূপ থেকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে অনন্ত গতিপ্রবাহ।

এই গতিপ্রবাহকে, এই নদীকে কবি ভৈরবী বৈরাগিণী বলে সম্বোধন করে বলেছেন যে তার অভিসার-যাত্রার বেগে তার বক্ষোহার ছিন্ন হয়ে নক্ষত্ররূপ মণিতে আকাশে ছড়িয়ে

পড়ছে, তার ঝড়ো এলো চুলে আকাশ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তার কর্ণাভরণ শূন্যকে চমকিত করেছে। নৃত্যপরায়ণা অভিসারিকার চঞ্চল অচঞ্চল বনে-উপবনে, বৃক্ষ-লতা-পল্লবে লুটিয়ে পড়ছে, তার ঋতুর থালা থেকে জুঁই-চাঁপা-বকুল-পারুল চলার পথে ছড়িয়ে পড়ছে। দুঃখ শোক-ভয়হীন সে উদ্দাম গতিতে ছুটে যাচ্ছে। ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে তার পথ, কিন্তু সে সর্বদাই নিষ্কলুষ। কোন আবর্জনা বস্তু স্তূপ কখনো তার পথে থাকতে পারে না।

এই নটীর গতি মুহূর্তের জন্যও যদি স্তব্ধ হয়, তবে বিশ্ব বস্তুর পর্বতে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে। পুঞ্জীভূত অচল স্থিতিতে নতুন সৃষ্টি সম্ভাবনা লোপ পাবে। নবরূপে বিকশিত হয়ে উঠবার আশা আর থাকবে না। এই নৃত্যপরায়ণার নৃত্যস্রোতে ধ্বংস-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শুচিস্নাত হয়ে বিশ্ব নতুন প্রাণ ও রূপ লাভ করবে।

এই অলক্ষিত চরণের অকারণ আবরণ চলা কবির প্রাণেও গতি সঞ্চার করেছে এবং তাঁর মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। এই বিশ্বপ্রবাহের মধ্যেই কবিও তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কতো জন্ম-জন্মান্তর, রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই গতির সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ। তিনি তাঁর নাড়ীতে নাড়ীতে, রক্তের মধ্যে এই গতিকে অনুভব করছেন। এর প্রেরণায় তিনি ধন-মান-খ্যাতি-আদি সমস্ত সঞ্চয়কে নিঃশেষে দানে আর গানে ক্ষয় করে দিতে পেরেছেন।

॥ দুই ॥

৮ নং কবিতা 'চঞ্চলা' 'বলাকা' কাব্যের মূলভাবের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতি সম্পন্ন, আলোচনা কর।

'বলাকা' কাব্য সম্বন্ধে একটি অতি সাধারণ মন্তব্য এই যে, এটি 'গতি-রাগের কাব্য'। কথাটি একটু বিশ্লেষণ করা দরকার।—কাব্যটি রচনার কিছুকাল পূর্বেই কবি 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করে বস্তুতঃ বিশ্ব-স্বীকৃতি অর্জন করেন। এরপরই একবার পাশ্চাত্ত্য পরিভ্রমণে বের হন। এই পরিভ্রমণ কালে তিনি পশ্চিম য়ুরোপের সমকালীন মানসিকতা, প্রগতি-সুলভ মনোভাব এবং তাদের সংক্ষোভের সঙ্গে পরিচিত হন। সম্ভবতঃ এই সমস্ত ঘটনা তাঁর মনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরপরই দেশে ফিরে এসে তিনি 'বলাকা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতা রচনা করেন। এই সমস্ত কবিতার ভাব-বস্তু-বিশ্লেষণে দেখা যায়, এদের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের সংঘাত-জনিত মানসিকতা, যৌবনের উদ্বোধন এবং গতিবাদই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমোক্ত দুটি বিষয়ের সঙ্গেও কিন্তু 'গতি' তথা এগিয়ে চল্বার একটা বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় থেকেই যায়। এই সমস্ত কারণে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থকেই এক কথায় 'গতিবাদে'র কাব্য নামে অভিহিত করা হয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বলেন ঃ 'বলাকা' গতিরাগের কাব্য। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এক অফুরন্ত গতিবেগ, এই গতিবেগই অচল পাষাণের মধ্যে, আপাত-দৃষ্টিতে যাহা স্থানু, জড়, নিশ্চল তাহার মধ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তোলে....যাহাকে আমরা স্থানু, জড় অথবা স্থিতিশীল বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম; জগতের মধ্যেই জড় বিধৃত, জগৎ হইতে জড় পৃথক নয়; এবং আমরা যাহাকে

পরিবর্তন বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহা জড় হইতে জড়ে পরিণতি নয়, নিরন্তর গতিচক্রাবর্তের এক-একটি মুহূর্ত মাত্র।"—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 'বলাকা'. কাব্যগ্রন্থেই এই গতি মাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও বিশেষভাবে দুটি কবিতায় 'বলাকা' এবং 'চঞ্চলা'য় এই গতিসত্যই সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে।

'বলাকা' কবিতাটির নামেই কবি সমগ্র কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করেছেন, কারণ ঐ কবিতাটতেই সমগ্র কাব্যের মূলসুরটি ধ্বনিত হয়েছে। কবি স্বয়ং বলেন ঃ "বলাকার পাখা নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং 'বলাকা'র বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে।" সমগ্র বলাকা কবিতাটির মধ্যেই যেমন চলতা শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক অনুরূপ ভাব প্রকাশ পেয়েছে 'চঞ্চলা' কবিতার মধ্যেও। এখানেও কবিতার নামকরণের মধ্যে চিরচঞ্চলতার রূপটি স্বতঃপ্রকাশ। এছাড়া কবিতার যাবতীয় চিত্রকল্প এবং উপমা-রূপক-আদির মধ্যেও কবি শুধু গতিময় বস্তুরূপের চিত্রই অঙ্কন করেন।

কবিতায় কবি বিশ্বপ্রবাহকে চিরচঞ্চলা নদীরূপে দেখেছেন। নদীর গতি দেখা যায় না, কিন্তু যখনই কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই যে ফেন-পুঞ্জের সৃষ্টি হয়, তার গতি দেখেই নদীর গতি অনুভব করা চলে। তেমনি অবিশ্রান্ত-গতি-কাল-প্রবাহও বাধাপ্রাপ্ত হয়েই যেন সূর্যচন্দ্র-আদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী কিংবা সমুদ্র-পর্বত-আদি-বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে এগুলিও নিত্য নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কবি কালপ্রবাহ তথা নদীকে অতঃপর ভৈরবী ও বৈরাগিনী-রূপে কল্পনা করেছেন। গতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কবির এই কল্পনাকে পবিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে। ভৈরবী বৈরাগিনীর জীবন একান্ত নিরাসক্ত—- পিছনের দিকে তার কোন টান থাকে না শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। জীবনের সঞ্চয় কিছুই সে সঙ্গে নিয়ে চলে না। অতএব নদীর ধর্ম বা গতিধর্মের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গেছে। এরপর তিনি তাকে নটী ও অপ্সরা বলে অভিহিত করেছেন। এই উপমাটিও অতিকায় সঙ্গত এবং সার্থক। কারণ নটীতো নর্তনশীলা, নৃত্যপরায়ণা, সে তো কখনো স্থির থাকে না, চিরচঞ্চলা সে; সর্বক্ষণই সে নেচে চলেছে, কাজেই স্থিরতার ধর্ম তাতে নেই। অপ্সরীও নৃত্যপটীয়সী—নৃত্যের সাহায্যেই সে দেবতাদের মনোরঞ্জন করে থাকে। এ ছাড়া অপ্সরার সঙ্গে জলের নিত্য সম্পর্ক, জল থেকেই তার উদ্ভব—কাজেই নদীর সঙ্গে তার তুলনাও অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কবিতাটির শেষ দিকে কবি উল্লেখ করেছেন যে ভুবনমেখলা নদীই কবির চিত্তকে আকুল করে তুলেছে। নদীর বেগ কবির চিত্তেও সঞ্চারিত হয়েছে। তিনিও তাই, তার সমস্ত জীবনের সঞ্চয়কে দানে আর গানে বিলিয়ে দিয়ে মহাজীবনের ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে চলেছেন— পিছনের টানে আর আটকে পড়ছেন না। অতএব সমস্ত কবিতাটির মধ্যেই কবি শুধু গতির মাহাত্ম্য, গতির প্রেরণার কথাই বলেছেন বলে সমগ্র 'বলাকা' কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে এর পরিপূর্ণ সঙ্গতি বজায় রয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা চলে যে, শুধু 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গেই নয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-সাধনার সঙ্গেও এই কবিতার মূল ভাবের, গতিবাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে ফরাসী দার্শনিক আঁরি বের্গসঁ দ্বারা প্রবাহিত হয়েই তিনি গতিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত; কারণ আমাদের প্রাচীন উপনিষদ ও বৌদ্ধশাস্ত্রেও

গতিবাদের জয় ঘোষিত হয়েছে। ঐত্যরয় আরণ্যকের 'চরৈবেতি' শ্লোকটি তো গতিবাদের কল্যাণে এখন সর্বজন পরিচিত। কিন্তু এ সমস্ত দ্বারা প্রবাহিত হবার পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ যে স্বীয় প্রাণে গতির প্রেরণা অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর প্রথম জীবনের বহু রচনাতেই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "আমাদের রক্তের মধ্যে গতির অতি পুরাতন তাগিদ রয়েছে। তাই আমার মধ্যে সদাই এই গতির জন্য ব্যাকুলতা।...আমরা বাল্যকাল হতেই গতির উপাসক।...আমার রক্তে সেই গতির ডাক আছে।...আমি যখন অতি শিশু ছিলাম তখন থেকেই আমি গতির জন্য পাগল। পরে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় হয়তো সেই ভিতরের ডাকটি আর কিছু শক্তি লাভ করেছে কিন্তু আসলে এই আগে চলবার ব্যাকুলতাটি আমার জন্মগত জিনিস।" রবীন্দ্রনাথ এরপর 'প্রভাতসঙ্গীত', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'স্রোত', 'দুঃসময়' প্রভৃতি কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি আহরণ করে এবং 'নৈবেদ্য', 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর' প্রভৃতি গ্রন্থে যে চিরন্তন চলার তাগিদের কথা বলেছেন, তার উল্লেখ করে নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

অতএব শুধু যে 'চঞ্চলা' কবিতাটিই 'বলাকা' কাব্যের মূলভাবটি বজায় রেখেছে, তা নয়—রবীন্দ্রনাথের জীবন-ব্যাপী সাধনা, যা তাঁর সমস্ত কাব্য নাটকে রূপায়িত হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গেও বলাকার গতিতত্ত্বের সামঞ্জস্য বিহিত হয়েছে।

॥ তিন ॥

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৮ নং 'চঞ্চলা' কবিতায় কবি যে বিশ্বপ্রবাহকে 'নদী', 'ভৈরবী বৈরাগিণী' বা 'নটী অপ্সরা'-র রূপে পরিবেশন করেছেন, তা কতদূর সঙ্গত ও সার্থক হয়েছে, বিচার কর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে গতিবাদ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "এই আগে চলবার ব্যাকুলতাটি আমার জন্মগত জিনিস।" ফলতঃ এই কারণেই তাঁর জীবনের প্রথম পর্বেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় তিনি 'নির্ঝর' তথা নদীধারার রূপকে তাঁর মনের গতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বের সর্বত্র। পরবর্তীকালের বহু রচনার মধ্যেও এই গতিবাদের কথা, এগিয়ে চলার বাণী বারবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। গতি একটা শক্তি, চোখ দিয়ে তাকে দেখা যায় না, তাকে প্রত্যক্ষগোচর করতে হলে কোন একটা বস্তুর বা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় তাই বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করেছেন, যাদের সাহায্য গতিতত্ত্বটিকে বাস্তবে রূপায়িত করা চলে। বলাই বাহুল্য, তাঁকে এই উদ্দেশ্যে এমন সমস্ত বস্তুকেই নির্বাচন করতে হয়েছে, যাকে সাধারণভাবে আমরা গতিশীল বলে মনে করে থাকি।

প্রাকৃতিক শক্তিরূপে এককভাবে নদীই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর জীবন-প্রত্যুষে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় তাঁর প্রাণ নদীরূপেই আপনাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে মহাসাগরে মিলিত হতে চেয়েছে। এ বিষয়ে নদী সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবটিও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন তিনি তাঁর এক ডায়েরিতে, যেখানে লিখছেন ঃ "জলের দিকে চেয়ে অনেক সময় ভাবি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি বিশুদ্ধ গতিভাবেই মনে আনতে চাই তবে নদীর কাছ থেকে সেটাকে

পাওয়া যায়। জীবজন্তু তরুলতার মধ্যে যে চলাফেরা তাতে খানিকটা গতি, খানিকটা বিশ্রাম, একটা অংশের গতি আর একটা অংশের নিশ্চলতা, কিন্তু নদী আগাগোড়ায় একসঙ্গে চলছে—সেইজন্যে যেন আমাদের সচেতন মনের সঙ্গে ওর একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।...নদীটা যেন একটা সুবৃহৎ প্রাণ-পদার্থের মতো; একটা প্রবল উদ্যম বহু দূর থেকে সগর্ব কলস্বরে অবহেলে চলে আসছে।"

অতএব রবীন্দ্রনাথ নদীকেই গতির প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন বলে আলোচ্য কবিতায় 'চঞ্চলা' নামকরণও প্রধানতঃ এই নদীর কথাই বলেছেন। বিশ্বপ্রবাহে বাধা সৃষ্টির ফলে যেমন সূর্য-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র বুদ্বুদের মতো আবির্ভূত হয়, নদীর উপমায় তিনি তাকেই মূর্ত করে তুলেছেন এই উক্তিটিতে—

'বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে।'

স্বভাব-চঞ্চলা নদীর সঙ্গে কবি সাধর্ম্য খুঁজে পেয়েছেন ভৈরবী বৈরাগিণীর। গতিও যেন এই ভৈরবী বৈরাগিণী, অনন্ত পথের যাত্রী—তার চলার পথের দুই ধারা জন্ম আর মৃত্যু, সৃষ্টি আর ধ্বংস কিন্তু সে উদাসিনীর সে দিকে কোন দৃক্‌পাত নেই। সে যে অনন্ত পথে অভিসারে যাত্রা করেছে, তাতে তার বক্ষে হার ছিন্ন হয়ে নক্ষত্রমণিতে পরিণত হয়েছে—তার আলুলায়িত কেশদামে আকাশ সমাচ্ছন্ন। সেই অভিসারিকার নৃত্যের বেগে পৃথিবীর বুকে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সেই ভৈরবী বৈরাগিণী শুধু উদ্দামবেগে ছুটে চলে—গতিই শুধু সত্য।

এরপর কবি কালপ্রবাহ তথা নদীকে নটী চঞ্চলা অপ্সরীরূপে অভিহিত করেছেন। নৃত্যপরায়ণতা তথা সদাচলমানতাই উভয়ের ধর্ম বলে নদী এবং কালপ্রবাহ উভয়ের সঙ্গেই এটি উপমিত হবার যোগ্য। সদা সঞ্চলতা মানেই তো গতি। একালের বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করেন যে পরিবর্তনশীলতা তথা গতিই প্রাণেব ধর্ম। কাজেই নটী অপ্সরী তাদের নৃত্যের মাধ্যমে বিশ্বে নতুন প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে চলেছে, কবির এই উক্তিটিকে শুধু কাব্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না—

'তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য বারি বারি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষে নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল, গগনে।'

"নটীর নৃত্যের ছন্দে মৃত্যু জীবন হইয়া উঠিতেছে, সৃজন প্রলয়ের চিহ্নশূন্য নির্মল আকাশে নিখিল বিশ্ব বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।"

বিশ্বের গতিপ্রবাহকে বোঝাতে গিয়ে কবি এই যে নদী, ভৈরবী বৈরাগিণী বা নটী অপ্সরীর রূপকে গ্রহণ করেছেন, এদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গতির ক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। যে গতি শক্তিমাত্র, দৃষ্টি দ্বারা যাকে গ্রহণ করা যায় না, কবি তাকে শরীরী রূপ দান করে, বিমূর্ত ভাবকল্পনাকে রূপারোপে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে উপস্থাপিত করায় গতিতত্ত্ব আর পণ্ডিত জনের বোধ-বুদ্ধির সীমায় আবদ্ধ রইলো না, কবির কৃপায় তা সাধারণ মানুষের নিকটও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলো। অতএব অরূপকে রূপে নিয়ে আসার যে চেষ্টা কবি করেছেন তার সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হয়; এটি সঙ্গতিসম্পন্নও বটে।

॥ চ ॥

বলাকা

(৩৬ সংখ্যক কবিতা)

॥ এক ॥

রচনাকাল ও নামকরণ

কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্রে'র কার্তিক ১৩২২ সংখ্যায়। রচনাকাল এবং রচনার উপলক্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কাশ্মীরে শ্রীনগরে কার্তিকের নির্মল আকাশ। পদ্মার মত ঝিলম নদী আমার পায়ের তলায়। সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে ঝিলমের জলে অন্ধকার নেমে আসছে। বোটের ছাদে বসে আছি। নদীর স্রোত কালো হয়ে গেছে, ওপারে জমাট অন্ধকার, চারিদিক নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। এমন সময় বুনো হাঁসের দল হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। পদ্মায় থাকতে এক এক সময় হঠাৎ শুনতে পেতাম হাঁসের দল চলেছে। তাদের পাখার ঝাপটে আকাশের বুকে অট্টহাস্যের মত চমক্ লাগিয়ে দিত।" সঠিক কোন্ দিন কবির জীবনে এই ঘটনা ঘটেছিল, বলাকার কলরব শুনে কোন্ সন্ধ্যায় তিনি পুলকিত ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন তা জানা যায় না। তাঁর ডায়েরিতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই, তাঁর পাণ্ডুলিপিতেও রচনার কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া নেই। অর্থাৎ এই কবিতা রচনার তারিখ আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না। কবির কবিতা রচনার একটি খসড়া-খাতা আছে, তাতে এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী রচনাটির লেখার স্থান ও কাল দেওয়া আছে। সেটি একটি বিখ্যাত গান 'আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও।' স্থান কাশ্মীরের মার্তণ্ড এবং কাল ৯ই কার্তিক। ৩৬-সংখ্যক কবিতার পরের কবিতাটি লেখা হয়েছিল কলকাতায় ২৩শে কার্তিক। কবি-জীবনী থেকে জানা যায়, সে বৎসর তিনি ১৯শে কার্তিকের আগেই কলকাতায় ফেরেন। সুতরাং অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্তিকের পর তিন দশেকের মধ্যে বলাকার এই নাম কবিতাটি লেখা হয়েছিল।

সাময়িক পত্রে প্রকাশের সময় কবিতাটির নামকরণ করা হয় 'বলাকা'। নামকরণ সম্বন্ধে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই, কারণ কবিতা রচনার উপলক্ষ জানার পর আমরা একথা বুঝেছি যে বলাকা বা হাঁসের দলের সম্মিলিত ওই ডানা-ঝাট পটানিই কবিকে এই কবিতা রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আবার সেই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে, বলাকার চঞ্চল পথ-সঞ্চালনের মধ্যে এমন কোন গূঢ় তত্ত্ব কবি পেয়েছেন যার জন্য সমগ্র কাব্যটিরই নামকরণ করেছেন তিনি বলাকা। সুতরাং এটি এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৩৬-সংখ্যক কবিতার নাম 'বলাকা'। রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রথম বা শেষ কবিতার নামে গোটা বইটির নাম দিয়েছেন, কখনো সেই নামে সংকলনে আদৌ কোনও কবিতা থাকে না, আবার কখনো বা বইয়ের মাঝখান থেকে কোনও কবিতার নামে সংকলনটি চিহ্নিত করেছেন, যেমন 'বলাকা'য় বা 'মহুয়া'য়। নাম যাতে ব্যাখ্যা ধর্মী না হয়ে বিশেষ কাব্যটির ভাবলোকের ইশারা ইঙ্গিত দিতে থাকে, সেই দিকে কবির চিরকালই উৎসাহ ছিল।

'বলাকা'য় মোট পঁয়তাল্লিশটি কবিতা। তার মধ্য থেকে ছত্রিশ সংখ্যক কবিতার নামে কাব্যগ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। এরকম নামকরণ রবীন্দ্রকাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ নেই। যেহেতু এই কাব্যের একটি মূল ভাবনা গতি আর সে-গতির একটি রূপ কবি দেখতে পেয়েছেন পাখির উড়ে চলায়, সেইজন্য বোধ হয় তাঁর মনে হয়েছে এই মূলভাব ও মূল চিত্রকল্প এই কবিতায় আছে বলেই এর 'বলাকা' নাম সমগ্র কাব্যগ্রন্থের পরিচয়বহ হতে পারে। আর এই কারণেই এই নামকরণ।

পাখির উড়ে চলা অর্থাৎ ডানা মেলে দেওয়া পাখি, তার দিক থেকে দিগন্তের উদ্দেশ্যে যাত্রায় পক্ষ বিধূনন বা সোজা বাংলায় পাখা ঝাপটানো, তার উড়ে চলায় পুরোনো নীড় ছাড়ার নির্মল উল্লাস, সাময়িক বাসস্থান—সে পদ্মার চরই হোক্ অথবা কাশ্মীরের ঝিলমই হোক্—তার বদলে নতুন বাসস্থানের সন্ধান—এই সমস্ত কিছু থেকে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত এক গূঢ় সত্য এ কবিতায় কবির কাছে ধরা দিয়েছে। পদ্মাতীরে যখন তিনি দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, তখন তিনি দেখেছেন দূর হিমালয় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসে পদ্মায়, আবার পদ্মার চর ছেড়ে নতুন দিগন্ত সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়ে। ঝিলমতীরে কাশ্মীরের শ্রীনগরে বেড়াতে গিয়ে এক সন্ধ্যার নিস্তব্ধ প্রহরে ঐ একই দৃশ্য ও শব্দের পুনরাবৃত্তিতে তাঁর কল্পনা জেগে উঠেছে। সে কল্পনা সৃষ্টির এক অন্তর্গূঢ় সত্য অনাবৃত করলো।

বলাকা এক জাতের হাঁস, ঝাঁকে ঝাঁকে আষাঢ়ের কালো মেঘের গা ঘেঁষে এই সাদা পাখির আকাশে মালা গেঁথে উড়ে চলা কালিদাস দেখেছিলেন মেঘদূতে ঃ

'গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্ন নমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ পূর্বমেঘ॥'

[৯ নং শ্লোক]

কালিদাসের হংস বলাকারই স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করে উড়ে যাচ্ছে ঝিলমতীর থেকে, তারই শব্দ শুনতে পেলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণের এক সান্ধ্যক্ষণে।

কবিতায় প্রায় এসেই গেলাম। কিন্তু না, এভাবে আর আলোচনা নয়। কবিতার কয়েকটি শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও তাতে আশ্রিত চিত্রকল্পের চাবি হাতে নিয়ে এর ভাবের রুদ্ধ দুয়ার খোলা যাক্। প্রথম স্তবকের শব্দ 'ঝিলিমিলি', 'তারাফুল' 'সৃষ্ট যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে'—এই কয়টি হচ্ছে মূল শব্দ বা শব্দ বন্ধ যা চাবির মতো। দ্বিতীয় স্তবকের মূল চিত্রকল্প ও শব্দ—'শব্দের বিদ্যুৎছটা', 'আনন্দের অট্টহাস', বিস্ময়ের জাগরণের তরঙ্গিত রূপ, তৃতীয় স্তবকে 'স্তব্ধতার তপোভঙ্গ' চতুর্থ স্তবকে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হয়ে পর্বতের এবং তরুশ্রেণীর পাখা মেলে ওড়ার ইচ্ছা, সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ জেগে ওঠা—এর সঙ্গে যোগ প্রথম স্তবকের 'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে' বাক্যাংশকে ঘিরে কবিকল্পনার; পঞ্চম স্তবকে হংস-বলাকার স্তব্ধতায় ঢাকা খোলা, তৃণদলের মাটি ভেদ করে বেরিয়েই ডানা ঝাপটানো অর্থাৎ ঘাস গজানো, ভূমিগর্ভের অন্ধকারে বীজের অঙ্কুর মেলা; বীজগুলি বলাকার ঝাঁক, আর অঙ্কুর সেই বলাকার পাখা; সারি সারি পাহাড় ও বন উন্মুক্ত ডানায় উড়ে চলছে। নক্ষত্র ও পাখির মতো আলোর পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আকাশপথে মহা-অন্ধকারে উড়ছে—এগুলিই চাবির মতো আমরা হাতে পেয়ে যাই। নক্ষত্র পাখির পাখায় সে-অন্ধকারে আলোর জন্য ক্রন্দন যেন চমকে উঠছে। রাত্রির আকাশে তারা ঝরতে আমরা দেখি। [illegible]

জলও পুচ্ছ ঝরছে তা-ও আমাদের চোখে পড়ে। আবার প্রত্যুষে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আলোর সমুদ্রে তাদের আত্মাহুতিতে প্রসন্ন প্রভাত আসন্ন করে তোলে। আলোর মধ্যে ঝরা তারারা বিলীন হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে শেষবারের মতো ঝিলিক দেয়। 'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে' এই পঙ্‌ক্তিতে রাত্রি ও দিনের সেই সন্ধিক্ষণরাজিতে প্রাতঃ-সন্ধ্যার পুরো ছবিটা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। পঞ্চম স্তবকের এই শেষ পঙ্‌ক্তির অসাধারণ চিত্রকল্পটি 'ঝড়ের খেয়া'য় (৩৮-সংখ্যক কবিতা) অন্য প্রসঙ্গে আছে ঃ 'মরিতে ছুটিছে, শত শত/প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।' ওখানে কাণ্ডারীর আহ্বান কানে ও মর্মে নিয়ে আত্মোৎসর্গের পথে বেরিয়ে-আসা দাঁড়ীর দলকে কবির মনে হয়েছিল 'লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো'। কিন্তু 'ঝড়ের খেয়া' আপাতত থাক; চলে যাই ৩৬-সংখ্যক কবিতায়। পঞ্চম স্তবকের অন্তিম পঙ্‌ক্তির পর সারাটা ষষ্ঠ স্তবক স্বীকার করতেই হবে চিত্রকল্পহীন ও কবিতা হিসাবে তার বাকি পাঁচটি স্তবকের উৎকর্ষ হারিয়েছে। প্রকৃতি থেকে মানুষের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যে মুহূর্তে কবি বললেন 'শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে/অলক্ষিত পথে উড়ে চলে', তখনই কবিতা ঐ বাণী প্রধান হয়ে উঠেছে। বাণী এসে প্রাণের স্পর্শে লাভের অন্তরায় হলো ঃ

'শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।'

বাকি পাঁচ স্তবকে আমরা আমাদের প্রাণে এমনই কবির হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছি যে তাতে শেষ স্তবকে তা পাই নি বলে কোনও খেদ নেই।

চাবিকাঠিগুলির হদিশ নিলাম এবং তা দিয়ে চিত্রকল্পের দ্বারও কিছুটা উন্মুক্ত করা হলো; বিশেষভাবে পঞ্চম স্তবকের। এখন আবার চলে যাই কবিতার আরম্ভে। এ কবিতার আরম্ভেই সমগ্র প্রথম স্তবক জুড়ে আমরা সন্ধ্যার অনুভব করি। এ যেন আলংকারিকদের উদ্দীপন বিভাব, আর পরের স্তবকে যে হংসবলাকারা উড়ছে—এরা যেন আলংকারিকদের আলম্বন বিভাব। উদ্দীপন বিভাবে ভাবের উপযোগী উদ্দীপক পরিবেশের বর্ণনা থেকে, যেমন মেঘদূতে রামগিরির আকাশে ঘনঘটা এবং আলম্বন বিভাব কাব্যের পাত্রপাত্রীরা, যেমন মেঘদূতে যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়া। প্রথমে স্তবকের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাবে বলেই বুঝি এখানে নীরবতা নৈঃশব্দ এমন জমজমাট, এ যেন সৃষ্টি পূর্ব নৈঃশব্দ ও নীরন্ধ্র অন্ধকার। সেই নৈঃশব্দ থেকে, অন্ধকার থেকে হংসদল প্রথম স্তবকের উদ্দীপন বিভাব পেরিয়ে আলম্বন বিভাব হয়ে উড়তে আরম্ভ করে।

আমরা 'কাব্যালোক' নামে বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক প্রয়াত অবিস্মরণীয় অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্তের অনুসরণে এ কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'র 'ঝিলিমিলি' শব্দের আলোচনা করতে পারি। সন্ধ্যার সর্বব্যাপ্ত অন্ধকারে ঝিলমের স্রোতের অল্প অল্প আভা দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। তার এই সংগ্রামী দ্যুতির উপযোগী অমোঘ বিশ্লেষণ 'ঝিলিমিলি' এসে গেল ঝিলমের অনিবার্য অনুপ্রাসের আকর্ষণে। ঝলঝল, ঝলমল, ঝিলমিল, ঝিলিমিলি—এই শব্দ চারটির প্রথমটিতে যেমন চোখ-ধাঁধানো আলো, তা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতম হয়ে ওঠে 'ঝিলিমিলি'-তে। ঝলঝল থেকে ঝলমলে তালব্য ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঝ'র বদলে ওষ্ঠ্য পঞ্চম ও অনুনাসিক ধ্বনি 'ম' আসাতেই আলো তার দীপ্তি কিছুটা হারায়। কেন না ওষ্ঠ্যবর্ণে কোমলতা আসে। তারপর 'ঝিলমিল'

শব্দে সংস্কৃত স্বর 'ই' দুবার জুড়ে বসায় সেই জলস্রোতের 'প্রভা' আরও নিষ্প্রভ হয়। আর অবশেষে 'ঝিলিমিলি'তে সংবৃত স্বর 'ই' প্রতিটি ব্যঞ্জনের সঙ্গে মোট চারবার যুক্ত হওয়ায় আলো প্রায় অদৃশ্য বলেই উপমেয় ঝিলমের স্রোতের সঙ্গে ও উপমান তলোয়ারের সাদৃশ্য কবি অনুভব করলেন। উপমেয় ঝিলমের স্রোত যেমন অন্ধকারে ঢাকা, উপমান তলোয়ারও তেমনই খাপে ঢাকা। উপমেয়কে উপমানরূপে সংশয় হওয়ায় এবং সেই সংশয়বাচক 'যেন' থাকায় এ হয়েছে বাচ্যোৎ প্রেক্ষা অলংকার। এই উৎপ্রেক্ষণ সমস্ত কবিতার ভাবের সঙ্গে, সেই ভাব উন্মোচনে রূপপরম্পরার সঙ্গে এমনই অপরিহার্যযোগে আবদ্ধ যে এ এক উৎকৃষ্ট চিত্রকল্পও হয়ে উঠেছে। বাল্মীকি রামায়ণে (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ৩০/৩৬ রাজশেখর বসু কৃত বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ, ২৩২ দ্রঃ) নীল আকাশকে অসির মতো বর্ণ বলা হয়েছে (ব্যক্তং নভঃ শস্ত্রবিধৌতবর্ণং)। কালিদাসও শরতের আকাশকে তরবারির মতো নীল দেখেছেন (কুমারসম্ভব ৬/৩৬ 'অসি শ্যামস্')। এতো আমাদেরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়ে যে পাহাড়ি জায়গায় শরৎকালের মেঘমুক্ত নীল আকাশ তলোয়ারের মতো ঝকঝক করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ আকাশের কথায় তলোয়ার আনেন নি, এনেছেন পার্বত্য নদীস্রোতের কল্পনায়। এমন কল্পনা আমাদের কল্পনা-ঐতিহ্যের মধ্যেই আছে—এটুকু সত্যের প্রয়োজনে আমরা বাল্মীকি বা কালিদাসের বর্ণিকাভঙ্গ স্মরণ করছি। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই কবিতায় হেমন্তের ঝিলম নদীকে মনে হলো তরবারির মতো শাণিত, কিন্তু অন্ধকারের খাপে ঢাকা, বাইরে থেকে দেখা না গেলেও খাপের আড়াল থেকে তার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তারপর ঝিলমের প্রায় অদৃশ্য স্রোতের আভাস দানের পর কবি আমাদের দেখালেন আরেক দৃশ্য। এদিকে দিনে আলোয় ভাঁটা নামছে, অন্যদিকে রাত্রির অন্ধকারে জোয়ার উঠছে। আলোর ভাঁটা ও অন্ধকারের জোয়ারের এই একই সঙ্গে ভিন্ন দুই রূপ দেখার পরই আমরা ঝিলম তীরে দেখতে পাচ্ছি, অন্ধকারের জোয়ারে উচ্ছ্বসিত কালোজলের উঁচু উঁচু ঢেউয়ের মাথায় ফুল ভাসছে, সে ফুল অন্ধকারে জ্বলজ্বল করা আলোর ফুল—তারায় তারায় সে অজস্র ফুল ঢেউয়ের মাথায় দুলছে। আকাশে তারাফুল আর পৃথিবীতে পাহাড়ের জমাট ছায়ায় সারি সারি দেবদারু গাছের ছায়া পড়ে চারদিক আরও স্তব্ধ হয়ে আছে। সেই মুহূর্তে কবির মনে হচ্ছে, 'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে।' ঝিলমতটে যেন এক সৃষ্টিপূর্ব অন্ধকার। সে-অন্ধকার অপ্রকাশের বেদনার অন্ধকার। অপ্রকাশের অন্ধকার বিদীর্ণ করে সৃষ্টি প্রকাশের আলোয় জ্বলে উঠতে চায়। কিন্তু চাইলেই কি মুহূর্তের মধ্যে তা জ্বলতে পারে? তার জন্য কি স্বপ্ন চাই না? গভীর আকৃতি চাই না? প্রকাশের আকৃতিভরা স্বপ্ন নিজেকে আজ ঝিলমতটে মূর্ত করতে চায়। তাই কথা বলার জন্য তার ব্যাকুলতা! এ যেন স্বপ্নে অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জে কথা বলার চেষ্টা। আমাদের সত্তার গভীরতম তলদেশ থেকে যে প্রকাশের আকৃতি স্বপ্নে জাগে, তা থেকেও বোঝায় ধরা অবস্থায় আমরা কী সব অস্পষ্ট কথা বলে থাকি। কবিদেরও তো সৃষ্টির আগেকার অবস্থা এই রকমই। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার তমসাতীরে ভ্রাম্যমান সৃষ্টির আকৃতিতে চঞ্চল বাল্মীকির কথা স্মরণ করতে পারি। ঠিক এজাতীয় প্রকাশের আকুলতা অপ্রকাশের অন্ধকারে কবি সমগ্র নিসর্গের মধ্যে অনুভব করলেন, শুনতে পেলেন স্পষ্ট করে বলতে না পারার বেদনায় গুমরে-গুমরে ওঠা অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ। এ কবিতার এই প্রথম স্তবকটিকে বলতে পারি রবীন্দ্রসৃষ্টি এক সৃষ্টিসূক্ত, ঋগ্বেদের কবির পর ভারতবর্ষে এই আরেক আধুনিক কবি সৃষ্টিসূক্ত রচনা করলেন।

এ হেন নীরবতা, স্তব্ধতা ও অন্ধকার বিদীর্ণ করে শব্দ বিদ্যুতের ছটার মতো মহাকাশে ছুটে গেল দূর থেকে দূরে, বহু দূরে। এ শব্দ বলাকার পাখা ঝাপটানোর শব্দ, এ শব্দ আনন্দের অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো। শব্দকে যখন কবি বিদ্যুতের ছটা বলেছিলেন, তখন শব্দের মধ্যে আলোর আভাস ছিল। আবার এই আলো ছিল ঝিলমতটের তামা সমগ্র সৃষ্টিপূর্ব অন্ধকারজয়ী আলো। এই দৃষ্টি গ্রাহ্য আলোর সঙ্গে আবার তিনি মিলিয়ে দিলেন শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ। বিদ্যুৎ যখন জ্বলে, বজ্রধ্বনি তার একটু পরে শুনতে পাই। হংসবলাকার পক্ষ বিধূনিত শব্দের বিদ্যুৎছটা অন্ধকারে ঝিলিক দেওয়ার পরই শুনতে পেলাম রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসের মতো বজ্রধ্বনি। দৃশ্যে ও শব্দে মিলিয়ে একই উপমেয় পাখা ঝাপটানোর শব্দের দুধারে উপমানের যে সূক্ষ্মকার্য দেখি তাতে বিস্মিত না হয়ে পারি না। 'রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাস' অনিবার্যভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয় কালিদাসের মেঘদূতে :

'শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতং খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥'

[মেঘদূত, ৬১ নং শ্লোক]

[যে (কৈলাস) কুমুদশুভ্র উচ্চতা দ্বারা (উচ্চশৃঙ্গ দ্বারা) আকাশ ব্যাপ্ত করে প্রতিদিন সঞ্চয়ে পুঞ্জীভূত শিবের অট্টহাসের মতো রয়েছে।] শিবের অট্টহাস যেন দিনে দিনে সঞ্চিত ও স্তূপীকৃত—কালিদাসের ভাষায় 'রাশীভূতঃ', রবীন্দ্রনাথের বাংলায় 'রাশি রাশি'। শিবের অট্টহাস্য কৈলাস পর্বতশৃঙ্গে নীরব হয়ে আছে। কবিকুলগুরু বাল্মীকিও তাঁর রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একটি জলপ্রপাতের কথায় জলধারার অবিরল পতনধ্বনিকে বলেছিলেন পর্বতের অট্টহাস। বাল্মীকি ও কালিদাসের ভারতবর্ষের আধুনিক কালের কবি রবীন্দ্রনাথ হংসবলাকার পক্ষধ্বনিতে রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাস শুনতে পেলেন। সে অট্টহাস্যে দিগ্‌বিদিক্ বিদীর্ণ হচ্ছে; অন্ধকার ভেঙে খানখান হয়ে পড়ছে, সৃষ্টিপূর্ব নিদ্রা থেকে বিস্মিত জাগরণ তরঙ্গিত হয়ে চলছে আকাশে। সৃষ্টি যেন মহানৈঃশব্দ থেকে শব্দে জেগে উঠেছে, বিস্ময়বোধ করছে সবে আঁখি-মেলা দৃষ্টিতে এই অন্ধকারে। সব মিলিয়ে সেই বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। ভুললে চলবে না, 'তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে' এখানকার নামধাতুর অসমাপিকা রূপটির মূল নাম শব্দ 'তরঙ্গ'—এখানে ছবিটিই মনে আসে—জলের ওঠা ও পড়ার, এগোনোর ও পেছোনোর ছবি। আর 'ঢেউ' কথাটির মধ্যে আমরা ছবি দেখি না। শব্দগুলি ঐ ওঠাপড়ার শব্দ, তাদের পরস্পরকে আঘাতের শব্দ, খলখল ক্রুর, হাসির শব্দ, দুয় বেদনার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। তরঙ্গ ও ঢেউ—একই জিনিসের দুই প্রতিশব্দে সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধও এই কবিতাই আমাদের মনে জাগিয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকের শেষ পঙক্তিতে যাকে তিনি বলেছেন তরঙ্গ, তাকেই চতুর্থ স্তবকে এসে বললেন : 'এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'। এ পঙ্ক্তির কথা যথাস্থানে হবে। এখানে শুধু এইটুকুই বলি, এখানকার 'ঢেউ'তে আমরা ছবি দেখি না, শব্দ শুনি।

তৃতীয় স্তবকের আরম্ভেই বলাকার পক্ষধ্বনিকে কবি বললেন 'অপ্সর-রমণী'। 'অপ্'-এর অর্থ জল। অপ্সর-রমণীরা জলে সরে সরে যায়, জলকেলি করে, তাই তাদের অপ্সরা বলা হয়। এই পক্ষধ্বনিও ঝিলমের জল থেকে উঠছে। উড়াব আগে ঝাঁকে ঝাঁকে হংসবলাকা জলেই ছিল। অপ্ থেকে উঠে আসা পক্ষধ্বনিকে তাই অপ্সররমণী মনে হচ্ছে। অপ্সরাদের কাজ ছিল মুনিদের মতিভ্রম ঘটানো (মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ), তপোভঙ্গ করা। এই পৌরাণিক

অনুষঙ্গের পথে হেঁটে কবি চলে গেলেন স্তব্ধতার তপোভঙ্গ কল্পনায়। স্তব্ধতা যেন তপস্যায় নিমগ্ন ছিল। এবার সেই স্তব্ধতা ভেঙে গেল পঞ্চম স্তবকের গোড়ায় কবি বললেন, হংসবলাকা সে-রাত্রে স্তব্ধতার ঢাকা খুলে দিল। তৃতীয় স্তবকের স্তব্ধতার তপোভঙ্গে একটা ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল আবহ ছিল শব্দের ধ্বনি গাম্ভীর্যে। কিন্তু স্তব্ধতার ঢাকা খোলার কল্পনায় ধ্রুপদী গাম্ভীর্য তো নেইই, বরং এসেছে স্তব্ধতার মতো অসম শব্দের পাশে 'ঢাকা'র মতো দেশী শব্দ। এ এক গুরুচণ্ডালি—বলতে পারি মহৎ গুরুচণ্ডালি। 'ধ' এবং 'ঢ'-র মতো 'ত' ও 'ট' দুই বর্গের চতুর্থধ্বনি দুটিই মহাপ্রাণ ও ঘোষ। তাতে দুঃসহ ভার হয়ে চেপে থাকা ঢাকা স্তব্ধতার ওপর থেকে খোলার কল্পনার সহযোগী হয়েছে এইসব গুরুচণ্ডালিদুষ্ট মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনির গাম্ভীর্য। তাই শেষ বিচারে স্তব্ধতার তপোভঙ্গ কল্পনার মতো স্তব্ধতার ঢাকা খোলার কল্পনায়ও এক গাম্ভীর্য অনুভব না করে পারি না। একবার যখন স্তব্ধতার তপোভঙ্গ হলো, তখন তিমিরনিমজ্জিত পর্বতশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে সারি সারি দেওদারবন শিউরে উঠলো।

চতুর্থ স্তবকে এসে কবি ভাবছেন। হংসবলাকার পাখার বাণী পলকের জন্য পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ জাগিয়েছে। পাহাড় অচল, নিশ্চলতায় গতিহীন, সে-পাহাড়ও বেগের আবেগ অনুভব করছে, উড়ে চলার জন্য। কিভাবে উড়বে? বৈশাখের মেঘকে দুরন্ত বাতাস তার গর্জনে, ঝাপ্টায়, চলার আনন্দ বেগে যেমন দিক্ থেকে দিগন্তে ধাওয়ায়, তেমনই করে উড়ে চলছে ঝিলম তটের পর্বত। এ কল্পনায় পথাযুক্ত মৈনাকের পৌরাণিক অনুষঙ্গ থাকতে পারে। মেনকা পুত্র মৈনাকের পক্ষচ্ছেদ করেছিলেন ইন্দ্র। ছিন্নপক্ষ সেই পর্বত আজ সমুদ্র, নিমজ্জিত পর্বত হয়ে আছে। মৈনাক পর্বতের উড়ে চলাব পৌরাণিক কাহিনী মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে যায় 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' পড়ার সময়। মেঘ পর্বত—ওসব তো উর্ধ্বলোকেব, এবারে কবির দৃষ্টি যখন উর্ধ্বলোক থেকে অর্ধোলোে নেমে এলো, তখন তিনি তরুশ্রেণীকে দেখলেন মাটির বন্ধন ছিন্ন করে আকাশে ওড়ার জন্য উদ্যত। সারি সারি গাছ মাটির বন্ধন ছিন্ন করে উড়তে চায়, বলাকার শব্দ তরঙ্গ ধরে ধরে আকাশের কিনারা খুঁজতে চায়, এই অন্তহীন আকাশ আবার কোথায় এসে মাটি ছুঁয়েছে—তার হদিস নিতে চায়। এভাবে ঝিলমতটের এই সন্ধ্যা টুটে যায় সন্ধ্যায় বিদায় নেওয়ার সময় বেদনায় ঢেউ জেগে উঠছে। আগেও বলেছি, এ বেদনা অপ্রকাশ থেকে প্রকাশের জন্য আকাঙ্ক্ষার বেদনা। হংসবলাকার বিবাগী বা নিরাসক্ত পাখায় পাখায় সমগ্র নিখিল সৃষ্টির ব্যাকুল বাণী ধ্বনিত হচ্ছে; 'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে?'

পঞ্চম স্তবকের প্রারম্ভে পঙ্‌ক্তি যুগ্মের কথা আগেই বলেছি। হংসবলাকাদের দ্বারা স্তব্ধতার ঢাকা খোলার পরই তিনি শুনতে পাচ্ছেন ওখানকার নিঃশব্দ পরিবেশের আকাশে জলে স্থলে সেই পাখার উদ্দাম চঞ্চল শব্দ। আগের স্তবকে তো তবুও আকাশের তলদেশে মাটিতে কবির কল্পনা নেমে আসছে। মৃত্তিকা ভেদ করে উদ্ভিদ জগতেও কল্পনা নামছে সেখানে যেখানে বীজের বলাকা অঙ্কুরের পাখা মেলছে। ওখানকার সারি সারি পাহাড় আর বনও ডানা মেলে উড়ছে। আবার কবির কল্পনা নভোলোকচারী হয়ে উঠলো। আমরা আরম্ভে এই অসাধারণ চিত্রকল্পের কথা বলেছি। নক্ষত্র আলোর পাখা মেলে যখন উড়ছে, তখন অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে চমকে উঠছে। অন্ধকার অপ্রকাশের বেদনা কাটিয়ে প্রকাশের আলো চাইছে।

সেই আলোই যেন নক্ষত্র বিহঙ্গের পাখার ঝিলিকে মুহূর্তের জন্য দেখা যাচ্ছে। উষার আলোর সমুদ্রে আত্মাহুতির জন্য চঞ্চল নক্ষত্র ধরে নিলে মনে করতে হয়, এ কবিতা সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়ে এখন উষার স্বর্ণদ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তা হতে পারে। তৃণদলের মাটির ওপরকার আকাশের ওপরে ডানা ঝাপটানো বা লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকার অঙ্কুরের পাখা মেলায় অর্থাৎ ঘাস গজানো ও ভূমিগর্ভের বীজের অঙ্কুর বেরোনো—এ সবই ভোরবেলায় হয়। কেন না সমাগত আলোর সঙ্গে এদের নবজীবনের সন্ধানে মাত্রার যোগ আছে। উষার আলোক সমুদ্রে রাত্রিশেষের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে পাখায় পাখায় আলোর ঝিলিক হিসাবে একে নিলে এ কবিতায় সময়ের একটা গতিও তলে তলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ধূমকেতুর জ্বলন্ত পুচ্ছ বা কোনও বিশেষ বিশেষ তারা খসে পড়ার সান্ধ্য ঘটনা হিসাবে নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনের ব্যাখ্যা করলে কবিতার সময় যে বয়ে চলেছে তা স্বীকৃতি পায় না। তাই ভোর বেলার দৃশ্য হিসাবেই এর ব্যাখ্যা বেশি মানায়।

তারপর শেষ স্তবক সম্পর্কে আমরা আরম্ভে বলেছি, অন্য স্তবকগুলির তুলনায় এ নিতান্ত নিষ্প্রভ। নিসর্গ থেকে মানব-ইতিহাসে তাঁর দৃষ্টি এখানে সরে এসেছে। মানবের কত বাণী দলে দলে অদেখা পথে উড়ে চলেছে সুদূর অতীত থেকে অব্যক্ত ভবিষ্যতের দিকে। তা তো যাচ্ছেই। বুদ্ধ, সক্রেটিস, লাওৎসের বাণী শুধু আজকের দিকেই কি শুধু পাখা উড়ে আসছে? অস্ফুট সুদূর ভবিষ্যতের দিকেও কি উড়ে চলছে না? কবি তাঁর নিজের অন্তরে এই ঝিলমতটে শুনতে পেলেন বাসা ছাড়া পাখি একমাত্র প্রাণের আবেগে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আবেষ্টনী ছেড়ে চলছে তো চলছেই। আর এদের পাখায় পাখায় সমগ্র নিখিলের, সমস্ত সৃষ্টির মর্মবাণী উচ্চারিত হচ্ছে 'হেথা নয়, অন্য কোথা/অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

আপাতত কবিতা ব্যাখ্যা পঙ্‌ক্তি ধরে ধরে শেষ হলো। 'চঞ্চলা' কবিতায় যেমন সমগ্র সৃষ্টিকে নদী রূপে কবির মনে হয়েছিল, এখানে তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে উদ্দাম চঞ্চল হংস বলাকা বলে তাঁর মনে হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিকে। কেন না সৃষ্টি তো কোথাও স্থির হয়ে নেই। সৃষ্টি নিত্য চঞ্চল গতিময়, তার নব নব অভিব্যক্তি সৃষ্টিশীল। বার্গসঁর সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির দার্শনিক ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে আবার শেষ পরিচ্ছেদে এই কবিতার প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবো।

॥ দুই ॥

কবিতার আলোচনা

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৩৬-সংখ্যক এই কবিতাটির বিশেষ উপযোগিতা আছে এই জন্য যে, এটি এই কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের যদি কোন বিশেষ তত্ত্ব থাকে তবে এই কবিতাটিতেই তা প্রকাশিত হয়েছে, বলাকা কাব্যগ্রন্থের এই বিশেষ তত্ত্ব যে গতিতত্ত্ব নামে পরিচিত, গ্রন্থটি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনায় আমরা তা লক্ষ্য করেছি। গতিতত্ত্বে উপলক্ষ্য হিসাবে কোন সূত্র এই কবিতায় চোখে পড়ে কিনা প্রাথমিক ভাবে সেটাই আলোচ্য।

এ বিষয়ে কবির বক্তব্য, "বলাকা বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের

স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না। কিন্তু বলাকার পাখা নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং 'বলাকা' বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। 'বলাকা' নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে বুনো হাঁসের দল যখন নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তার ছানা হয়েছে সংসার পাতা হয়েছে—এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধুতীরে আর একক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।"

কবি মনে করেন জীবাত্মাও এই সংসারে আসে অনাসক্ত রূপেই, এবং সে যায়ও সেই ভাবেই। বলাকার হংসশ্রেণীর সঙ্গে প্রকৃত জীবাত্মার মিল আছে, তাই মুক্তি সাধকদের বলে হংস বা পরমহংস। মানুষের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে এই যে গতি তাকেই বলাকা কাব্যগ্রন্থে কবি তুলে ধরেছেন। এই গতিতত্ত্বের সমর্থন বৈদিক সাহিত্যের মত প্রাচীন সৃষ্টিতেও আছে। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে—জল স্থির হলেই হয় বদ্ধ জল, চললেই হয় নদী ("চরন্তি যন্নদ্যস্তস্‌যুরাপঃ"); আবার সাধক কবীরও বলেন সেই একই কথা—

'বহতা পাণী নির্মলা
বন্ধ্যা গংধিলা হোয়।'

সঠিকভাবে বলতে গেলে বলাকা কাব্যগ্রন্থ বা এই বিশেষ কবিতা নয়, সাহিত্য সাধনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই গতির উপাসক। 'সন্ধ্যা-সংগীত' কাব্যগ্রন্থে সবাই চলে গেল কবির আক্ষেপ 'প্রভাত-সংগীতে' তাঁর উদাও আহ্বান—'বাহির হইয়া আয়'। মানসী কাব্যগ্রন্থের 'দুরন্ত আশা' কবিতায় তিনি বলেছেন—

'কোথাও যদি ছুটতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে।'

কল্পনা কাব্যগ্রন্থের 'দুঃসময়' কবিতায় শুনি—'এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।' শারদোৎসব, ডাকঘর প্রভৃতি নাটকে, অসংখ্য গানে এই গতির কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। বস্তুত আমরা দেখতে পাই, তিনি এই গতিতে বিশ্বাস করেন বলেই জীবনের কোনও অধ্যায়েই তিনি চরম শান্তি খুঁজে নিতে পারেন না—তিনি নিত্য পরিবর্তনশীল। তাঁব কবিতায় ও নাটকে তিনি আর একটি কথা বলেন, পুরুষ মাত্রই গতির এই টান অনুভব করে। কিন্তু প্রকৃতি নারীরূপে মানুষকে চায় বদ্ধ করতে। এও গতির পরিপূরক দিক বলে আমরা মনে করি। বলাকায় গতিতত্ত্ব একটি বিশেষ রূপ পেয়েছে, তার কারণ স্তব্ধ সন্ধ্যার পটভূমিতে আকস্মিকভাবে বলাকার পক্ষ সঞ্চালনকে উপলক্ষ্য করে কবি সমগ্র নিখিলের সদাচঞ্চল সচলতায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন।

কিন্তু কেবলমাত্র তাত্ত্বিক উপলব্ধিতে এই কবিতার মহত্ত্ব নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টিতেও কবিতাটি অসাধারণত্বের দাবী করতে পারে। কোনও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতার চিত্রকল্প রচনায় কিছু শ্লথ উদাসীনতা লক্ষ্য করেছেন। এই কবিতাটি তত দীর্ঘ নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু উপমা ও চিত্রকল্প রচনায় কবির অনায়াস সাফল্য আমাদের মুগ্ধ করে। এই রসসিদ্ধি সচেতন প্রয়াসের ফল বলে মানা যায় না, কোন আয়সের চিত্র ছাড়া এগুলি যেন স্বতঃস্ফূর্ত রসাভিব্যক্তি। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই এ কথা বোঝা যাবে।

কবিতাটির সূচনাতেই তিনি একটি প্রথা বিরুদ্ধ উপমা ব্যবহার করেছেন। খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের সঙ্গে নদীর তুলনা বাংলা কবিতা কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নি, প্রায় নিঃসন্দেহেই একথা বলা যায়। অথবা এই উৎপ্রেক্ষার অব্যর্থতা আমাদের মুগ্ধ করে। নদীর জলে সূর্যরশ্মি পড়লে তা বাঁকা তলোয়ায়ের মতোই ঝক ঝক করে, কিন্তু এখন সূর্যাস্ত—ঝিলমের স্রোত এখন আঁধারে মলিন। সুতরাং সেই ঝক-ঝকে তলোয়ার এখন কোষবদ্ধ।

নক্ষত্রকে এই কবিতায় আমরা দুটি উপমায় ব্যবহৃত হতে দেখি। দুটি ক্ষেত্রেই দুটি সার্থক চিত্রকল্প আমরা উপহার পেয়েছি। প্রথমটিতে নক্ষত্রকে কবি তুলনা করেছেন ফুলের সঙ্গে এবং ঝিলমের তীরে বসে দুটি অসামান্য পঙক্তি রচনা করেছেন এইভাবে—

"দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;"

এখানে দিনে রাতের বিস্তীর্ণ কাল, আকাশ ও ভূমির বিস্তীর্ণ স্থান সমস্ত এক পটভূমিকায় বিধৃত হয়ে রয়েছে। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যে নদী ঝিলম, সে যেন অনন্ত সময়েরই বহতা নদী। দিনে তার ভাঁটা, রাত্রে তার জোয়ার। হতে পারে কবি তাঁর কল্পনার মাধুর্য্য সন্ধান করেছেন এইভাবেই। রাত্রে যে জোয়ার এসেছে নদীতে সেই জোয়ারে ভেসে এসেছে তার ফুল, নদীতে যা চিক চিক করতে করতে ভেসে চলেছে। বলে দিতে হবে না বোধ হয় এই চিকচিকে তারা ফুল আসলে আকাশের নক্ষত্রের প্রতিফলন ঝিলমের জলে। নক্ষত্রের দ্বিতীয় চিত্রকল্পটি এসেছে এই ভাবে—

"ক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।"

এখানে নক্ষত্র পাখি এবং তার স্পন্দন অন্ধকারকে চমকিত করছে। অন্ধকার চমকিত হচ্ছে আলোর ক্রন্দনেও এবং সেই অর্থে নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন ও আলোর ক্রন্দন সমার্থক হয়ে ওঠে। সমার্থক হয়ে ওঠে বলেই নক্ষত্রকে জোনাকি বা আলোর পাখি কল্পনা করতে ইচ্ছা হয়। এই ধরনের চিত্রকল্প এবং উপমা এই কবিতাটিতে অনেক আছে এবং তারা কবিতা হিসাবে এর মূল্য বাড়িয়েছে এই কারণেই।

প্রসঙ্গত কবিতাটি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। কবিতায় কাব্যিক সৌন্দর্য পরিস্ফুটনের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই, কিন্তু নাট্য রীতির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কবিতায় অত্যন্ত দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের যে কটি কবিতায় তা পাওয়া গেছে এটি তার অন্যতম। বর্তমানে কবিতাটি যেভাবে মুদ্রিত হয়েছে তাতে এর দুটি স্তবকসজ্জা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি পাঁচ স্তবক সমন্বিত কবিতা এবং বিষয় বিশ্লেষণ করলে এর নাট্যিক রীতিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথম স্তবকটিতে কবি তাঁর উজ্জ্বল আবিষ্কারের একটি নিখুঁত পটভূমি নির্মাণ করেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে ঝিলম নদীর উপর। সামনের গিরিতটগুলি আবছা হয়ে এসেছে, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে সারি সারি দেবদারু গাছের শ্রেণী। সন্ধ্যার আকাশে ফুটে উঠল কয়েকটি তারা, কবি চোখ না তুলেও উপস্থিতি টের পান তাদের—ঝিলমের কালো জলে তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে উজ্জ্বলতায়।

দ্বিতীয় স্তবকে ঘটেছে এই কাহিনীর একমাত্র ঘটনা, এবং চমকিত ঘটনা। সন্ধ্যার

তপস্যামূর্তি ভঙ্গ করে, সান্ধ্য নির্জনতা ও নৈঃশব্দ চুরমার করে হঠাৎ এক ঝাঁক হাঁস ওপর দিয়ে উড়ে যাবার শব্দ ভেসে এসেছে। সেই 'শব্দের বিদ্যুৎছটা' সমস্ত আকাশকে মুখর করে যেন এক বিস্ময়ের জাগরণ তৈরি করেছে—দূর দূরান্তরে শোনা গেছে সেই পাখা সঞ্চালনেরে শব্দ। এই পাখার শব্দ স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করে পর্বতশ্রেণীকে শিহরিত করেছে, দেবদারু বনও শিহরিত হয়ে উঠেছে সেই শব্দে।

তৃতীয় স্তবকে আমরা পাই হংসবলাকার পক্ষ সঞ্চালনের নিসর্গ প্রতিক্রিয়া, সামনের যে পর্বতমালা ছিল তা অকস্মাৎ গতিচঞ্চল হয়ে বৈশাখের লক্ষ্যহীন উন্মত্ত মেঘ হতে চেয়েছে। দেবদারু বন মাটির বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে ওই শব্দের রেখা অনুসরণ করতে চেয়েছে আকাশের কোণে কোণে। হাঁসেদের পাখা যেন সকলকে বিবাগী করে দিয়ে বলেছে, অন্য কোথাও যেতে হবে, এখানে আর থাকা চলবে না।

চতুর্থ স্তবকে আমরা, সামনের পেক্ষাপটে গতি-চাঞ্চল্যের এই অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত বিশ্বে। কবি চোখে যাদের দেখতে পাচ্ছেন না তাদের মধ্যেও এই চাঞ্চল্য তিনি অনুভব করতে পারছেন। মাটির আকাশে যেমন তৃণ ডানা ঝাপটাচ্ছে, মাটির নীচে অঙ্কুরের পাখা নিয়ে লক্ষ লক্ষ বীজ বলাকার মতই ধাবিত হচ্ছে লক্ষ্যহীন পথে, সমগ্র বিশ্বই যেন গতিচঞ্চল হয়ে ছুটে চলেছে।

পঞ্চম স্তবকে মানুষের চিন্তা এবং আশা আকাঙ্ক্ষাকেও এই গতির অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন কবি। মানুষের চিন্তাও তার চিত্ত ছেড়ে এর কক্ষই অনন্তবিস্তারী হয়ে পড়েছে। নাটকের পাঁচটি অঙ্কের মত পাঁচটি স্তবক একে একে গতিতত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করে এর নাট্যধর্ম পরিস্ফুট করেছে।

॥ তিন ॥

সারসংক্ষেপ

(প্রথম স্তবক)

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝিলম নদীর বাঁকা স্রোতকে দেখে মনে হয় যেন খাপে ঢাকা একটি বাঁকা তলোয়ার। কালো জলে ওপরের আকাশের তারা প্রতিফলিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন জোয়ারের টানে জলের সঙ্গে ভেসে এসেছে তারাফুল। গিরিতট এখন অন্ধকার, তলায় সারি সারি দেবদারু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। কবির মনে হয়েছে, সৃষ্টি যেন কোন কথা বল্‌তে চায়—অব্যক্ত ধ্বনি যেন গুমরে উঠছে চারিদিকে, কিন্তু স্পষ্ট করে সেই ধ্বনির অর্থ বোঝা যাচ্ছে না।

(দ্বিতীয় স্তবক)

বিদ্যুৎছটা আলোরই হয়, কিন্তু পরম এক নৈঃশব্দের মধ্যে কবি ছিলেন বলে হঠাৎ এক শব্দ তরঙ্গ শুনতে পেয়ে তাকে সেই সন্ধ্যার আকাশে তাঁর শব্দের বিদ্যুৎ রেখা বলে মনে হয়েছে। কবি এই শব্দের উৎসরূপে দেখতে পেয়েছেন উড়ন্ত হাঁসের শ্রেণীকে। কবির মনে হয়েছে এদের পাখা যেন ঝড়ের আবেগে মত্ত হয়ে আছে, তাই রাশি রাশি আনন্দে আকাশ ভরে বিস্ময় জাগিয়ে তুলে তারা ছুটে গিয়েছে দূর থেকে দূরে।

(তৃতীয় স্তবক)

প্রকৃতি যে এতক্ষণ স্তব্ধতার তপস্যায় বসেছিল, সেই স্তব্ধ তপস্যা ভেঙে দিল যেন হাঁসের পাখায় জাগা শব্দের অপ্সরা মূর্তি। সেই শব্দের কুহকে ঝিলমের সন্নিহিত পর্বতশ্রেণী কেঁপে উঠল, সারি সারি যে সব দেবদারু গাছ এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারাও এই শুনে শিহরিত হয়ে উঠেছে যেন।

(চতুর্থ স্তবক)

নিশ্চল প্রকৃতির মধ্যে হংসবলাকার এই বেগ পলকের জন্য যেন এনে দিল একটা বেগের আবেগ। পর্বতশ্রেণী বৈশাখ মাসের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে চাইল, গাছগুলি যেন ওই শব্দের রেখা ধরে মাটির বন্ধন ত্যাগ করে পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইল। তারা আকাশের শেষ কোথায় খুঁজে বার করবে। বিবাগী পাখা এক অচেনা সুদূরের ব্যাকুলতা জাগিয়ে দেয় নিখিলের প্রাণে। তাই স্বপ্নময় সন্ধ্যায় বেদনার এক ঢেউ জাগে, যেন এক অদৃশ্য বাণী বলে এখানে থাকা চলবে না, অন্য কোথাও গিয়ে থামতে হবে।

(পঞ্চম স্তবক)

কেবল প্রকৃতির কাছেই যে হংসবলাকা স্তব্ধতার আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছে তাই নয়, কবির হৃদয়ের কল্পনার আবরণও যেন সে উন্মোচন করে দিয়েছে ওই একই সঙ্গে। কবি যেন জলে, স্থলে এবং শূন্যে পাখার ওই উদ্দাম শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। মাটির ওপর তৃণ দল যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে, কিন্তু তার আরো বৃহত্তর চাঞ্চল্য মাটির নীচে—সেখানে সকলের দৃষ্টির অলক্ষ্যে তৃণাঙ্কুর যেন বলাকার মতোই পাখা মেলে দিয়ে যাত্রা করেছে অজানার উদ্দেশ্যে। কবির দৃষ্টিতে এই পর্বতশ্রেণী, এই বন—সবই উন্মুক্ত ডানা মেলে দিয়ে দ্বীপ থেকে অজানা দীপান্তরের দিকে ছুটে চলেছে। নক্ষত্রেরও যেন পাখা আছে, এবং তার স্পন্দনে কেঁদে উঠছে আলো—তাতে অন্ধকার চমকিত হয়ে উঠছে।

(ষষ্ঠ স্তবক)

কবি কল্পনাকে আর একটু প্রসারিত করে এবার বুঝতে পেরেছেন বলাকার ওই কোলাহল আসলে যুগ যুগান্তর ধরে মানব বানীরই কলরব। বলাকাশ্রেণীর ওই অসংখ্য পাখির সঙ্গে মানুষের আত্মা বা তার নিগূঢ় ইচ্ছাও উড়ে চলে এক অলক্ষিত ও অনির্দেশ্য পথে। মানুষের অন্তরাত্মাও এক জায়গায় বদ্ধ থাকতে চায় না, অন্য কোন জায়গায় উত্তীর্ণ হতে চায়। আসলে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির অন্তরের কথা ওই গতি চাঞ্চল্য কোন নতুনতর আশ্রয়স্থলের সন্ধান।

॥ চার ॥

(শব্দার্থ ও টীকা)

সন্ধ্যারাগ—সন্ধ্যায় শেষ সূর্যরশ্মি দিগন্তে যে রক্তভার সৃষ্টি করে রাখে তাকেই বলা হয় সন্ধ্যারাগ। **ঝিলম**—সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ উত্তর ভারতের এক নদী। অবশ্য নদী না বলে একে উপনদী বলাই ভাল। পাঞ্জাবের সিন্ধুনদের যে পাঁচটি উপনদী আছে, ঝিলম তার অন্যতম। এর অপর এক নাম বিতস্তা। কাশ্মীর থেকে প্রবাহিত হয়ে এই নদী চন্দ্রভাগা নদীতে পড়েছে। যাযাবর রচিত 'ঝিলাম নদীর তীরে' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। **আঁধারে মলিন হল**—একটু আগেই সন্ধ্যারাগে এই নদী ঝিলমিল করছিল, কিন্তু এখন তার ওপর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। **যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার**—নদীকে সাধারণত সাপের সঙ্গেই তুলনা করা হয় উভয়ের বক্রগতির জন্য; এই তুলনাটি অভিনব। এই তুলনার কারণ সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন, তিনি ঝিলম নদীর যেখানে ছিলেন নদীটি সেখানে খুব বেঁকে গিয়েছিল। **দিনের ভাঁটার...জোয়ার**—নদীতে জলোচ্ছ্বাসকে বলে জোয়ার এবং জলধারার হ্রাসপ্রাপ্তিকে বলে ভাঁটা। দিনে নদীতে ভাঁটা পড়বে এবং রাত্রে আসবে জোয়াব, এমন কোন নিয়ম নেই। আসলে কবি বোধ হয় এখানে নদীর জোয়ার ভাঁটার কথা বলেন নি, বলেছেন অন্ধকাবের স্রোতের কথা। দিনে তার সাক্ষাৎ ছিল না, রাত্রে সে ছুটে এসেছে। **তারাফুল নিয়ে কালো জলে**—উপক্ষেয় এবং উপমান এখানে একাকার হয়ে গিয়েছে। আকাশে তারা ফুটেছে, সেই তারার প্রতিফলন কবি দেখছেন নদীর জলে, তাই মনে হচ্ছে নদীর জলে অন্ধকারেব জোয়ার যেন টেনে নিয়ে এসেছে তারাফুলগুলিকে, **গিরিতট**—সানুদেশ। **দেওদাব তরু**—দেবদারু গাছের বন। **স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে**—ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নিসর্গ প্রকৃতি এখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, একথা যেমন কবির মনে হয়েছে—সেই সঙ্গে একথাও তাঁর মনে হয়েছে যে, সৃষ্টির অন্তরের কোন কথা তারা স্বপ্নে বলতে চায়। **অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ**—অলংকারের ভাষায় একে বলে বিরোধাভাস, ধ্বনি কখনো অব্যক্ত হয় না, কিন্তু এই জাতীয় প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের অনেক আছে এবং তারা অমিত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে, যেমন—'শব্দবিহিন গানে', 'বন্ধনহীন গ্রন্থি', 'নীরব কলতানে' প্রভৃতি।

(দ্বিতীয় স্তবক)

শব্দের বিদ্যুৎছটা—শব্দের বিদ্যুৎ হতে পারে না, কারণ শব্দ এবং বিদ্যুৎ দুইই শক্তি বা Energy, বিজ্ঞানের মতে এক শক্তি থকে আর এক শক্তির রূপান্তর আছে কিন্তু দুটি সমান হতে পারে না। এখানে বিজ্ঞানের সত্য নয়, আলংকারিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খিদ্যুতের যেমন ঝলক থাকে শব্দের সে ঝলক থাকে না, কিন্তু অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে প্রথম শব্দের ঝংকার যেন কবির কাছে ঝংস্কৃত হয়ে উঠেছে ঠিক তেমনি ভাবে যেমন করে অন্ধকারে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। সেইজন্যই প্রায় অসম্ভব একটি সম্বন্ধ তিনি এখানে স্থাপন করেছেন। **দূরে দূরান্তরে**—দ্রুত ধাবমান পাখির ডানা থেকে এসেছে এই শব্দ? সুতরাং দূর থেকে দূরান্তরে তা মিলিয়ে গেছে। **হংসবলাকা**—বলাকা বলতে বোঝায়

আকাশে উড়ন্ত বকের শ্রেণী। সাধারণত দিবসের শেষে দলবদ্ধ হয়ে প্রায় একখানি মালার মত আকার গ্রহণ করে যে বকের দল আকাশে উড়ে যায়, তাকেই আমরা বলাকা বলি। কবি এখানে বকের পরিবর্তে হাঁসের ওই রকম একটি দলকে বুঝিয়েছেন বলে তাদের উল্লেখ করেছেন হংসবলাকা হিসাবে। **ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত**—তারা উড়ে চলে উন্মত্ত ঝড়ের মত, এই কথাই কবি বলতে চান। যে কোন কিছুর মধ্যে মাদকতা বা নেশা আছে তাকেই তিনি মদের সঙ্গে তুলনা করেন, বলাকা কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় বলেছেন, 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে'। এখানেও ঝঞ্ঝার মধ্যে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাবার নেশা আছে বলে ঝঞ্ঝাকে কবি মদের রূপকে গ্রহণ করেছেন। **আনন্দের অট্টহাস**—একথা বলতে কি বুঝিয়েছেন সে কথা কবির ভাষাতেই বলা যাক—"শান্তিসুপ্ত আকাশ চমকে জেগে উঠল। আকাশ বিস্মিত হল, স্তব্ধ আকাশ তরঙ্গিত হল।"

(তৃতীয় স্তবক)

[গ্রন্থে যাকে তৃতীয় স্তবক হিসাবে দেখানো হয়েছে, কবি তাঁর ব্যাখ্যায় তাকে স্বতন্ত্র স্তবক হিসাবে না ধরে দ্বিতীয় স্তবকেই শেষাংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের মনে হয় কবি ঠিকই করেছেন, তবু গ্রন্থে ব্যবহৃত স্তবক হিসাবে আমরা একে স্বতন্ত্র স্তবক ধরলাম।]

শব্দময়ী অপ্সর...তপোভঙ্গ করি—একটি সুন্দর চিত্রকল্পের প্রয়োগ আমরা এখানে দেখি। মুনি ঋষিদের দীর্ঘ তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য স্বর্গলোক থেকে পাঠানো হতো উর্বশী, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাদের। এখানে সন্ধ্যার স্তব্ধতাকেই মনে করা হয়েছে সেই মুনি এবং হংস বলাকার পাখার ধ্বনি যেন শব্দশরীরা অপ্সরাও যে এসেছে ওই স্তব্ধতার তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য। **তিমির মগন**—অন্ধকারে মগ্ন হয়ে থাকা। **উঠিল শিহরি...দেওদার বন**—হংস বলাকার পাখার শব্দে স্তব্ধতা শিহরিত হতে পারে, কিন্তু অন্য যেসব জিনিসের শিহরিত হবার কথা কবি বলেছেন তা বিশুদ্ধ পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কবির মনে হয়েছে অচল পাহাড়ের শ্রেণী যেন এই শব্দে শিহরিত হয়ে উঠেছে এবং দেবদারু বনেও জেগেছে সেই শিহরণ।

(চতুর্থ স্তবক)

পাখার বাণী—বলাকার পাখায় যে শব্দ হয় তার মধ্যে এক চিরকালের বাণী লুকিয়ে আছে বলে কবির মনে হয়েছে। এই চিরন্তন বাণীর মর্মকথা সম্বন্ধে কিছু অবশ্য কবি বলেন নি এখন, কিন্তু সেই বাণী অনুভব করে যে অচেতন প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে কথা তিনি বলেছেন। **পুলকিত নিশ্চলের**—জড় প্রকৃতি নিশ্চল, কিন্তু তাদের অন্তরেও বলাকার পক্ষ সঞ্চালন পুলকের সঞ্চার করেছে, এ কথা বলাই বোধ হয় কবির উদ্দেশ্য। **পর্বত চাহিল...নিরুদ্দেশ মেঘ**—মেঘ মুক্তপথা সঞ্চারী—সে ভেসে বেড়ায় উদার স্বাধীন আকাশে। কিন্তু এর মধ্যেও অত্যন্ত গতিশীল মেঘ দেখতে পাই কালবৈশাখীর সময়। বৈশাখ মাসের এই ঘন কালো মেঘ নিমেষে ঝড়ের রথে চড়ে ছুটে যায় আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। চঞ্চল গতিতে নিমেষে সে যে কোথায় চলে যায় তার আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। পর্বতের মধ্যে এত চাঞ্চল্য জেগেছে যে সে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে চেয়েছে।

তরু শ্রেণী—যে দেবদারু গাছের সারির কথা বলা হয়েছে নিশ্চয়ই তারা। **আকাশের খুঁজিতে কিনারা**—অর্থাৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে চায়। **এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে**—এই ঝিলমের তীরের শান্ত মৌন সন্ধ্যা পরম প্রশান্তি নিয়ে এক সুখস্বপ্নে মগ্ন হয়েছিল—সেই স্বপ্ন ভেঙে গেছে বলাকার পক্ষ সঞ্চালনে। **বেদনার ঢেউ উঠে জাগি**—বেদনা, অর্থ এখানে অশান্তি পরম শান্তির স্থৈর্য ভেঙে গিয়েছে, এখন তারা অশান্ত। বর্তমান স্থান এখন আর তাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, তারা সুদূর কোনও স্থানের জন্য এখন লালায়িত হয়ে উঠেছে। এই চাঞ্চল্য এবং বেদনা তাদের মনে সঞ্চারিত করেছে বলাকার দল। **নিখিল**—পৃথিবী, এখানে নিশ্চয়ই মিসর্গ প্রকৃতি। **'হেথা নয়... কোন্‌খানে'**—বলাকার পাখায় যে চিরন্তন বাণী শোনা যায় বলে কবি মনে করেন তা এই। ঠিক কোন্‌খানে যে যেতে হবে তার ঠিকানা জানা নেই কিন্তু যেতে হবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, এখানে আর থাকা চলবে না। কেউ কেউ বেদের 'চরৈবেতি' মন্ত্রের সঙ্গে এর আত্মিক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন।

(পঞ্চম স্তবক)

স্তব্ধতার ঢাকা—স্তব্ধতা দিয়ে বিশ্ব চরাচরে যে সত্যবাণীটি ঢাকা দেওয়া আছে, সেই বাণী কবি আজ শুনতে পেয়েছেন স্তব্ধতার সেই আবরণ সরে গিয়েছে বলে। হংস বলাকা তাদের পাখা নাড়ানোর শব্দে সেই স্তব্ধতাকে অপসারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ হংসবলাকা তাদের সশব্দ পক্ষ আন্দোলন দিয়ে যে স্তব্ধতার মধ্যে শব্দ চাঞ্চল্য সঞ্চার করেছে, এ কথা কবি আর বলছেন না—তিনি বলেছেন অচল প্রকৃতির মধ্যেও আসলে একটা গতিচঞ্চল রূপ আছে ভেতরে; ওপরের অচঞ্চলতা দিয়ে তা ঢাকা আছে। **নিঃশব্দের তলে**—আপাতত নৈঃশব্দের অন্তরালে। **মাটির আকাশ**—তৃণের সবটুকু যদি ধরা যায় তবে যেখানে সে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে, যেটা তার মুক্ত সঞ্চালন ক্ষেত্র, সেই মাটিকেই কবি মনে করেছেন তার আকাশ। **ঝাপটিছে ডানা**—কবির তাই মনে হচ্ছে, তৃণের পাতার যে বিস্তার তাই যেন তার ডানা এবং মাটির আকাশে তাই সে ঝাপটাচ্ছে। **মেলিতেছে...বীজের বলাকা**—মাটির ওপরে যার কাণ্ড ও পত্র, মাটির নীচে তাদের অজস্র অঙ্কুর মাটির গভীরে কোন নিরুদ্দেশে যাত্রা করেছে কেউ তা বলতে পারে না। কবির মনে হয়, আকাশে দলবেঁধে যেমন শুভ্র হংসবলাকা যাত্রা করে, মাটির নীচেও তেমনি লক্ষ লক্ষ বীজ শুভ্র অঙ্কুরের ডানা মেলে বলাকার মতই যাত্রা করেছে নিরুদ্দেশে। **এই বন...হইতে অজানায়**—সঠিকভাবে এই অংশ ব্যাখ্যা করা শক্ত, কারণ বিশ্বের সবকিছুকে কবি গতি চঞ্চল দেখেছেন, বাস্তব দৃষ্টিতে অবশ্যই তা দেখা যায় না। সুতরাং কবির নিজের ব্যাখ্যাই আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি।—এই হিমাচল শ্রেণীও অগ্নিময় পাখা মেলে আকাশে উড়ে রওয়ানা হয়েছে।...এই হিমালয় পৃথিবীর নীড় থেকে আপন অগ্নিপক্ষ বিস্তার করে আকাশে উড়ছে। এই পাহাড়ও চলবার পথে, একদিন ক্ষয় হতে হতে এই পাহাড় কোথায় যাবে তার ঠিকানা থাকবে না। এই বন মুক্ত পাখা মেলে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে, এক অজানা লোক থেকে অন্য অজানা লোকে ক্রমাগত চলেছে।" **নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে**—এই কবিতায় ঝিলমের জলে নক্ষত্রের পতিফলন দেখে কবি তাকে বলেছিলেন 'তারাফুল'—এখন নক্ষত্রকে বলেছেন পাখি। মনে

হয় জোনাকি। কারণ তার পাখার স্পন্দনে এবং আলোর ক্রন্দনে অন্ধকার চমকিত হয়ে উঠছে—এ কেবল জোনাকির অনুষঙ্গেই সত্য বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে কবি বলেন, "আকাশের নক্ষত্র দলের পাখার ঝাপটে যে আগুন জ্বলেছে তার বেদনায় অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আকাশকে বেদে ক্রন্দসী বা রোদসী বলে। আলোকে যেন মনে হয় ঘুম থেকে চমকে ওঠা শিশুর মত আকাশের রোদন ক্রন্দন।"

(ষষ্ঠ স্তবক)

শুধিলাম—অর্থ এখানে অবশ্যই অনুভব করলাম। **কত বাণী...সুদূর যুগান্তরে**—অচেতন প্রকৃতি থেকে এবার কবি চেতন আত্মা—মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও বিচিত্র ভাবনার জগতে এসে পৌঁছেছেন। জড়-প্রকৃতি যেমন আপাতজড়তা সত্ত্বেও সদাচঞ্চল, মানুষের চিন্তাও তেমনি অবিচ্ছিন্ন গতিতে ছুটে চলেছে বা উড়ে চলেছে বলাকার মত। সময়ের কোন বিচ্ছিন্নতা এখানে নেই। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জুড়ে এই যাত্রা। অতীতকে কবি বলেছেন অস্পষ্ট কারণ তার স্মৃতি আমাদের কাছে ঝাপসা হয়ে এসেছে। ভবিষ্যৎকে বলেছেন অস্ফুট, কারণ কোন্ সুদুরে কোন্ ভবিষ্যতে কবে তারা কী আকার ধারণ করবে তা কে জানে! **বাসা ছাড়া পাখি**—বাসা ছাড়া পাখি বললে সাধারণভাবে দেহের বাসা ছাড়া প্রাণ পাখি বলেই মনে হয়, কিন্তু এখানকার প্রয়োগ সে রকম নয়। কবি বলতে চান মানব চিত্তের তাহলে যেসব আশা আকাঙ্ক্ষার জন্ম সেই সব আশা আকাঙ্ক্ষা এবং মানবচিত্তের সুনিশ্চিত আশ্রয়ের কথা। সেই আশ্রয় ছেড়ে মানুষের ভাবনা উৎসাহে-অনুৎসাহে-উদ্দেশ্যে-নিরুদ্দেশে কবে থেকেই তো ছুটে চলেছে। **নিখিলের পাখার এ গান**—কবি যখন প্রথম শব্দ শোনেন নিস্তব্ধতার পটভূমিতে, তখন তা ছিল বলাকার পাখার শব্দ। কিন্তু কবিতা উত্তরোত্তর যত অগ্রসর হতে থাকে, এই শব্দের মাত্রা বা dimension-ও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমে কবি মনে করেন এই পাখার শব্দ শুনে তাঁর দৃশ্যমান পটভূমি অর্থাৎ পাহাড় এবং দেবদারু বৃক্ষশ্রেণী শিহরিত হয়ে উঠেছে, তারপর তাদের মধ্যেও গতি এবং চঞ্চলতা সঞ্চারিত হতে তিনি দেখেছেন। পটভূমি আরো বিস্তারিত হলে না দেখা বীজ, অঙ্কুর এবং নিখিলের সব কিছু গতির চঞ্চলতায় উদ্ভাসিত হয়েছে বলেই বলাকার শাখা এখন সমগ্র বিশ্বের পাখাতে পরিণত হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

॥ এক ॥

'বলাকা' ঃ সাধারণ আলোচনা

'বলাকা' কথার সঠিক অর্থ বোধ হয় বকের পংক্তি বা আকাশে উড়ন্ত বকের শ্রেণী। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এখানে উড়ন্ত আকাশে হাঁসের দলকেই বলাকা বলেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, সেটি এই রকম—"যদিও ঠিক শব্দার্থ ধরলে বকপংক্তিকেই বলাকা বলা ভাল, তবুও হংসপংক্তি অর্থেও ঐ বলাকা কথারই প্রয়োগ করতে হয়। হংসপংক্তির পৃথক নাম নেই। মেঘদূত যে আকাশচারী বলাকার কথা আছে তা বকপংক্তি কি হংসপংক্তির কথা মনে করে কালিদাস বলেছিলেন সে কথা এখন বলা কঠিন।"

বলাকা-র দেখা ঠিক এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পাননি, এক সন্ধ্যায় যখন ঝিলম নদীর তীরে বসেছিলেন—যখন সামনের গিরিতট এবং দেবদারু গাছের সারি অন্ধকারে ও মৌনতায় দাঁড়িয়ে আছে ছায়ার মতো, তখনই বলাকার পক্ষ-সঞ্চালনের শব্দে তিনি সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। অর্থাৎ চোখে তাদের দেখেন নি বটে, কিন্তু শ্রবণে তাদের অস্তিত্ব বিপুল ভাবেই পৌঁছেছে কবির কাছে এবং সমস্ত অন্তর দিয়ে তাদের অনুভব করেছেন কবি।

এই বলাকাকে উপলক্ষ্য করে এই কবি তারও নামকরণ কবি করেছিলেন বলাকা এবং সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিরও নাম দিয়েছিলেন বলাকা কাব্যগ্রন্থ।

সমগ্র কাব্যগ্রন্থের নামকরণে বলাকাকে নির্বাচন করা থেকেই বোঝা যায়, এই ঘটনাটিকে কবি খুব বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এরকমই যে হয়েছিল তার কারণ কবি এটিকে তাৎপর্যপূর্ণ ও রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। বুনো হাঁসরা এক জায়গায় বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয়—কিন্তু সমস্ত ত্যাগ করে একদিন তারা অনির্দ্দেশ্য পথে পাড়ি দেয়। কবির মনে হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতেই এই গতির লীলা চলছে এবং মানুষের চিন্তা ভাবনাও ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে। বলাকার গতির মধ্যে সর্বস্তরে এই গতির রূপকটি প্রতিফলিত করার চেষ্টাতেই কবি বলাকার কবিতাগুলি রচনা করেছেন এবং কাব্যের নামকরণর করেছেন বলাকা কাব্যগ্রন্থ।

॥ দুই ॥

'বলাকা' ঃ রচনার প্রেক্ষাপট

এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল শ্রীনগরে ঝিলম নদীর তীরে। শেষ সূর্যাস্তের রশ্মি পড়ে ঝিলমের স্রোত যখন ঝিলমিল করছিল তখনই কবিতা রচনার আরম্ভ, কিন্তু তারপরই সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছিল।

তারাফুল কোনও ফুল নয়। কবি আকাশের নক্ষত্রকে ফুল কল্পনা করেছেন এবং তাকেই তারা ফুল বলে উল্লেখ করেছেন এই কবিতায়। যেহেতু এটি ফুলের কোনও শ্রেণী নয়, অতএব বছরের কোন্ সময় ফোটে সে কথা বলাও অর্থহীন। নক্ষত্রকে কবি ফুল হিসাবে কল্পনা করেছেন এই কারণে যে, সন্ধ্যার আকাশে যে তারাগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের ছায়া পড়েছে নদীর জলে এবং আরও কল্পনা করেছেন, রাত্রির জোয়ার এসেছে নদীতে—সেই জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে তারাফুল। সুতরাং তারাফুল কখন ফোটে এ কথা যদি বলতেই হয় তবে বলতে হবে তারাফুল সন্ধ্যাবেলা থেকে ফুটতে থাকে আকাশে।

কবির সামনে ছিল পর্বতরাজির সানুদেশ এবং সারি সারি, দেবদারু গাছ—অবশ্য অন্ধকারে তাদের খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

এই অচেতন প্রকৃতি কেন কথা বলতে চায় বলে কবির মনে হয়েছিল তা স্পষ্ট করে বলা শক্ত, কবি অন্তত সে রকম কোন কারণ জানান নি। সন্ধ্যার নিস্তব্ধ মৌনকে তাঁর কেমন যেন মনে হয়েছিল অব্যক্ত ধ্বনির অসহায় গুমরে ওঠা যন্ত্রণা, মনে হয়েছিল সৃষ্টি যেন স্বপ্নিল ভঙ্গিমায় কোন কথা বলতে চায় অথচ তা সে বলতে পারছে না। এই স্তব্ধতা যেন তারই প্রতীক।

॥ তিন ॥

"শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।"

এখানে অপ্সররমণী বা অপ্সরা বলা হয়েছে 'শব্দময়ী' নামে এক কাল্পনিক সুন্দরীকে। শব্দময়ী নামে এক সুন্দরীকে কাল্পনিকভাবে গড়ে তোলা হয়েছে সন্ধ্যার মৌনের পটভূমিকায় একটি হংসবলাকার সম্মিলিত পাখার শব্দ শুনে। অর্থাৎ বলা যায়, ওই পাখার শব্দই অপ্সররমণী।

স্তব্ধতাকেও এখানে শরীরী কল্পনা করা হয়েছে অর্থাৎ personify করা হয়েছে। স্তব্ধতা যে ভেঙে গেল বলাকার পাখার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে, তাকেই বলা হয়েছে স্তব্ধতার তপস্যা ভঙ্গ হয়ে গেল।

এই প্রকাশভঙ্গির মধ্যে পৌরাণিক চিত্র তো খুঁজে পাওয়া যায়ই, সেই পৌরাণিক অনুষঙ্গ নির্মাণ করবার জন্যই কবি একটি সামান্য ঘটনাকে এই অসামান্য উপস্থাপনা দান করেছেন। পুরাণের কালে মুনি-ঋষিরা যখন তাদের একাগ্র ও নিষ্ঠ ধ্যানের দ্বারা দেবতাদের তুল্য ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা দেখাতেন, স্বর্গের দেবতারা স্বাভাবিক ভাবেই শঙ্কিত হয়ে পড়তেন। তাঁদের সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য দেবতারা একটি সাধাবণ অস্ত্র প্রয়োগ করতেন প্রায়ই—সেটি হল এক সুন্দরী অপ্সরীকে তপস্যা স্থলে পাঠিয়ে দেওয়া। প্রায়ই দেখা যেত মুনি ঋষিরা অপ্সরীদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে, তাদের সেই লাবণ্য আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের তপস্যা ভঙ্গ করতেন। সেই পৌরাণিক অনুষঙ্গ সৃষ্টি করবার জন্যই কবি স্তব্ধতাকে personify করে বলেছেন পক্ষ-সঞ্চালনরূপ শব্দময়ী স্তব্ধতার তপস্যা ভঙ্গ করে চলে গেল।

স্তব্ধতা ভাঙার গভীর প্রতিক্রিয়া কবির মনে ঘটলেও দৃশ্যমান পাহাড় এবং দেবদারু বনের শ্রেণীতে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে বেশি কথা কবি বলেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, আকস্মিকভাবে এই শব্দ শুনতে পেয়ে তিমিরমগ্ন পর্বতমালা যেন শিহরিত হয়ে উঠল এবং সেই সঙ্গে শিহরিত হয়ে উঠল সারি সারি দেবদারু গাছ।

॥ চার ॥

"পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি।"

বৈশাখ মাসের মেঘকে ঝড় দেয় দোলা। কালবৈশাখীর প্রচণ্ড তাণ্ডব যখন লাগে তখন ঘন কালো মেঘ তার তাড়া খেয়ে কোথায় কোন নিরুদ্দেশে যে ছুটে চলে যায় তার আর কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না। গতিচঞ্চল এই মেঘকেই বলা হয়েছে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

পর্বত যে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হয়েছে এমন কথা কবি বলেন নি, তিনি বলেছেন বলাকার উদ্দাম গতি দেখে পর্বতও উদ্দাম গতিতে ছুটে যেতে চাইল। কবি এ কথা কি করে জানলেন এবং এ ব্যাপারে আদৌ সম্ভব কিনা এ দুটি কথা এই প্রসঙ্গে চিন্তা করবার

আছে অবশ্য। কবি এই গতি তাদের অন্তরে অনুভব করেছেন বিশ্বের সাধারণ ধর্ম হিসাবে। কবির বক্তব্য, পর্বতের যেটুকু আমরা দেখি তার অধিকাংশ একদিন থাকে সমুদ্রের নীচে— একদিন হঠাৎ তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আবার কালের গতিতে একদিন সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং পর্বত বলেই তাকে অনড় অটল মনে করবার কোন কারণ নেই।

তরুশ্রেণীর পাখা বলতে কি বোঝান হয়েছে কবি সে কথা স্পষ্ট করে বলেন নি, কিন্তু অনুমান করা যায় তরুশাখার কথাই তিনি বুঝিয়েছেন, কারণ তাই আন্দোলিত হয় এবং গতি সঞ্চার করে।

পর্বত এবং তরুশ্রেণীর গতিশীল হওয়ার প্রেরণা এসেছে আকাশে উড়ন্ত এক ঝাঁক হাঁসের পাখা ঝাপটানোর শব্দ থেকে, কারণ এর আগে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় তারা পটে আঁকা ছবির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

॥ পাঁচ ॥

"আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে
স্তব্ধতার ঢাকা।"

স্তব্ধতার ঢাকা কবির কাছে খুলে দিয়েছে ঝিলম নদীর ওপর এক সন্ধ্যায় উড়ে যাওয়া হাঁসের ঝাঁক। নিখিলের বিশ্ব যে জড়তার আবরণ নিয়ে বসে আছে, তারই স্তব্ধতার ঢাকা খুলে দেওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে।

স্তব্ধতার ঢাকা খুলে দেওয়ার নিহিত অর্থ স্তব্ধতা যে আপাত আচ্ছাদন মাত্র, তার নীচে যে লুকিয়ে আছে চাঞ্চল্যের মহাসমারোহ—এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া। যে সন্ধ্যায় কবি ঝিলম নদীর তীরে বসেছিলেন সেই সন্ধ্যা ছিল পরিপূর্ণ শান্ত এবং স্তব্ধ। কোথাও কোন শব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই। সহসা সেই স্তব্ধতাকে আলোড়িত করে যখন বলাকার দল উড়ে যায় পক্ষ সঞ্চালন করে, কবির চোখে স্তব্ধতার আবরণও সরে যায়, কবি বুঝতে পারেন আপাতস্থির ও শব্দহীন প্রকৃতি আসলে অনেক অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ গোপন করে রেখেছে।

'মাটির আকাশ' এবং 'মাটির আঁধার নীচে' বাক্যাংশ দুটি খুব তাৎপর্য পূর্ণ। যে বলাকা আকাশে ঘুরে বেড়ায় তার চারণক্ষেত্র গগন। যে তৃণদল তার চারপাশে পায় মাটিকে সেই তৃণদলের পক্ষে মাটিই উপযুক্ত সঞ্চরণের ক্ষেত্র—সেই তার আকাশ। সেইজন্য তৃণদের চাঞ্চল্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে তারা তাদের মাটির আকাশে ডানা ঝাপটাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতির যে অংশ আছে মাটির নীচ। সেই অর্থেই যাদের যা বিচরণ ক্ষেত্র সেই বিবেচনায় বলা হয়েছে কারও আকাশ মাটির আকাশ, কারও বা মাটির অন্ধকার নিম্নভূমি।

মাটির অন্ধকার নীচই কাদের সঞ্চরণ ক্ষেত্র তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে কবি তৃণের অঙ্কুরের কথা বলেছেন। শুধু এর কথা তিনি উল্লেখ করেন নি, হংসবলাকার সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্যও দেখিয়ে দিয়েছেন। বলাকা একটি হংসশ্রেণীর মালাবিশেষ, তেমনি তৃণের যে অঙ্কুর তাও একটি নিরবচ্ছিন্ন রেখার মতো—তা থেকে অসংখ্য বীজ বার হয়েছে। সেই সব বীজ বিচিত্র গতিতে মাটির নীচে বিভিন্ন দিকে তাদের যাত্রা সূচিত করে। সুতরাং সেই লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা'র পক্ষে মাটির অন্ধকার নিম্নভূমিই আকাশ। বলাকা-য় যেমন অনেক হাঁস থাকে, এই অঙ্কুরে থাকে অনেক বীজ, বলাকার প্রত্যেকটি হাঁসের যেমন থাকে গতি, এই অঙ্কুরের

প্রতিটি বীজেরও তেমনি আছে গতি। সুতরাং 'লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা' কথাটির চিত্রকল্প আমাদের কাছে আর অস্পষ্ট থাকে না।

॥ ছয় ॥

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা অন্য কোন্‌খানে।"

হেথা বলতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনগরে ঝিলম নদীর সেই তীর নিশ্চয়ই বোঝান নি যেখানে এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল। জীবনের ধর্ম চাঞ্চল্য, এক জায়গায় সজীব কিছু দীর্ঘদিন স্থানুর মত পড়ে থাকতে পারে না। বুনো হাঁসেরা তাই বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে—আবার উড়ে যায় অনির্দেশ্য কোন ভূমির উদ্দেশ্যে। হেথা বলতে কবি বুঝিয়েছেন এই মুহূর্তে যেখানে আছি বা দীর্ঘদিন যেখানে পড়ে আছি সেই স্থান। অন্য কোথা বলতে যেকোন স্থান, কোন অনির্দেশ্য স্থান—কেবলমাত্র একটি পরিবর্তনের জন্যই যে স্থানের দরকার। তার কোন সুনির্দিষ্ট বিবরণ কবি দেন নি, তার ধারণাও যে কবির ছিল না তা বোঝা যায় কবিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর এই উক্তিতে—"হেথা নয় তো বুঝলাম; কিন্তু সেই 'আর কোনো খান' যে কোথায় তা কে জানে!"

এ কথা কেউ বলে নি, এটি কবির অনুভব। কবি একবার অনুভব করেছেন—"বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে" কবি অন্যবার অনুভব করেছেন, "ধ্বনিয়া উঠেছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে।" অর্থাৎ একবার নিখিলের প্রাণে এই ব্যাকুল বাণী বেজেছে এবং অন্যবার নিখিলের পাখা শূন্য এই বাণীতে ধ্বনিত হয়েছে।

এই বাক্যটি কবিতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ শুধু নয়, এই কবিতার কেন্দ্রীয় সত্য। বলাকার আচরণে কবি যে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তা নিহিত আছে ওই একটি কথার মধ্যে। চলাই জীবনের ধর্ম, কবি মনে করেন কেবল জীবনের নয়-জড়েরও তাই ধর্ম, কারণ জড়ের মধ্যেও যে প্রাণের লীলা রয়েছে এবং বৈদ্যুতিক শক্তির অতি চাঞ্চল্য আছে সে কথা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলাকার মধ্য দিয়ে একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'অকারণ অবারণ' চলাই জীবনের ধর্ম। কোথায় চলেছি সেকথা বড় নয় কিন্তু চলেছি, এটাই বড় কথা। সেই প্রেক্ষিতে বিচার করলে একথা বলতেই হবে যে, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্ খানে' এই কবিতার একেবারে সার কথা।

॥ সাত ॥

অতিরিক্ত আলোচনা

॥ এক ॥

'বলাকা' ঃ গতিতত্ত্ব

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট গতিতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তার বীজ এই ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। ঘটনা হিসাবে একটাই ঘটনা এই কবিতায় ঘটেছে এবং সাধারণের চোখে ঘটনাটিকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে

হবারও কথা নয়। কবি সন্ধ্যার নিস্তব্ধ পরিবেশে বসেছিলেন শ্রীনগরে ঝিলম নদীর তীরে। এই শান্ত সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে এক ঝাঁক বুনো হাঁস। তাদের সম্মিলিত পাখা নাড়ার শব্দ আকাশের এক প্রান্ত আলোড়িত করে মিলিয়ে গিয়েছে অন্য প্রান্তে। কবি বলাকা শ্রেণী দেখে এবং তাদের পাখার শব্দ শুনে চমকিত হয়েছেন এবং প্রাথমিকভাবে একটি চিন্তা জেগে উঠছে তাঁর মনে।

তিনি ভেবেছেন, এই যে বুনো হাঁসের দল একটি আশ্রয় সন্ধান করে, বাসা বানায়, ডিম পাড়ে, বাচ্চা বার হয়, তারপর আকস্মিক ভাবেই একদিন কিসের প্রলোভনে যেন তৈরি বাসা এবং বাচ্চাদের ত্যাগ করে ছুটে যায় অনির্দেশ্য লক্ষ্যহীন এক পথে। এই যে ক্ষণিক আসক্তির পরেই তীব্র অনাসক্তি, মায়ায় জড়িয়ে গিয়েও মায়ামুক্ত সচলতা, কবির মনে হয়েছে এটিই বিশ্বসংসারের নিয়ম এবং অবারণ চলার মধ্যেই বিশ্বচক্রের সত্য নিহিত আছে। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাতেই তাই কবি এই গতির প্রশস্তি রচনা করেছেন। প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযানে' তিনি স্থবিরতার দ্বারা বন্ধ না হয়ে নিশ্চিন্ত এগিয়ে চলাকেই বলিষ্ঠ জীবনের মূলমন্ত্র মনে করেছেন। ৩-সংখ্যক কবিতায় (আহ্বান) বলেছেন—

"আমরা চলি সমুখ-পানে,
কে আমাদের বাঁধবে?"

৬-সংখ্যক কবিতা 'ছবি' এবং ৭-সংখ্যক কবিতা 'শা-জাহানে'র বক্তব্যও অনেকটা এক ধরনের-সচলতাই জীবন এবং সচল জীবন স্থবির মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড়। ৮-সংখ্যক কবিতায় বিরাট নদীর অবিচ্ছিন্ন অবিরল জলধারা, ১৫-সংখ্যক কবিতা 'আমার গান'—যেখানে সচল গানগুলি 'আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে'। 'যাত্রা' কবিতায় কবি স্পষ্ট করে বলেছেন—

"যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।"

আসলে, শুধু 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ বলে নয়, রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই গতির পূজারী 'সন্ধ্যা-সংগীত' কাব্যগ্রন্থে তিনি দুঃখ করে বলেছেন—

"চলে গেল! আর কিছু নাহি গাহিবার!
চলে গেল! আর কিছু নাহি করিবার!"

'প্রভাত-সংগীত' কাব্যগ্রন্থে বলেছেন—

"আমি ঢালিব করুণা ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।"

'মানসী' কাব্যগ্রন্থে বলেছেন—

"কোথাও যদি ছুটিতে পাই

বাঁচিয়া যাই তবে
ভব্যতার গণ্ডী মাঝে
শান্তি নাহি মানি।"

গানে তিনি বলেছেন—

"ঘরের ঠিকানা হোলো না গো
মন করিতেছে যাই যাই...
কবে অকূলের খোলা হাওয়া
দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে।"

শেষ বয়সের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এই গতিশীলতায় পরিচয় দিয়েছেন বার বার, এবং সেই কারণেই, কেশে পাক ধরলেও তাঁকে বৃদ্ধ বলে আমাদের মনে হয় নি—তিনি ছিলেন চির নতুন।

আসলে ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ এই গতিতত্ত্বের প্রেরণা বিভিন্ন উপনিষদ ও পুরাণ থেকেও পেতে পারেন। তিনি বলেছেন, "বেদে সত্যের যে মহনীয় নাম 'ঋত' তাতো 'ঋ' ঋতু হতেই নিষ্পন্ন, 'ঋ' অর্থেই তো গতি।" ঋগ্বেদের আর একটি শ্লোক রবীন্দ্রনাথ তাঁর খুব ভাল লাগে বলে জানিয়েছেন, সেটি বাক্ বা বাণীর সূক্ত "অহমেব বাত ইব প্রবহামি আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বার।" অর্থাৎ বিশ্ব ভুবনে সর্বরূপ ও সৌন্দর্য রচনা করতে করতে আমি বায়ুর মত সদাই সামনে প্রবাহিত হয়ে চলেছি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই শ্লোকগুলি বলাকার গতিতত্ত্বের উৎস হিসাবে প্রায় অভিন্ন প্রয়াসে উচ্চারিত হয় ঃ

"পাপো নৃষদ্ বরো। জনঃ।
ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা।
চরৈবেতি চরৈবেতি।"

অর্থাৎ 'বসে থাকলে বরণীয় মানুষও তার মাহাত্ম্য হারায়। যে চলে দেবতাও তার সঙ্গে চলেন, সুতরাং চলো, চলো।' সেখানে আরো বলা হয়েছে—'চরতি চরতি ভগঃ' (অর্থাৎ যে চলে তার ভাগ্যও চলে), অথবা, 'কৃতং সংপদ্যতে চরণ।' (অর্থাৎ চলতে চলতেই সত্যযুগের আবির্ভাব ঘটে) কিম্বা এমন শ্লোকও এই সুপ্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—

"সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণম্ যো ন
তন্দ্রয়তে চরণ্। চরৈবেতি।"

অর্থাৎ কিনা, সূর্য সদা চঞ্চল বলেই তার আলোক সম্পদ সর্বদা অফুরন্ত, অতএব এগিয়ে চলো।

বলাকার হংসবাহিনীকে দেখে কেমন করে কবি গতিতত্ত্বে উপনীত হলেন তার ব্যাখ্যা আছে উপনিষদে। সেখানে আমাদের আত্মা যে ওই হংসের মত সুদূরের ডাক শুনতে পায় এবং মুক্ত আত্মা সেখানে যাত্রা করতে চায় একথা খুব স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে 'এষ গলু আত্মা হংসঃ' ('আমাদের আত্মাও তো হংস') 'হংসো লেলায়তে বহিঃ' ('এই হংস সর্বদা মুক্তাঞ্চলের দিকে ব্যাকুল হয়ে উড়ে যেতে চায়') 'হিরন্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ।' ('আত্মা বা সদা সচল পুরুষ একহংস সূর্যের মতো') 'অসঙ্গোইয়ং পুরুষঃ' ('আত্মা বা পুরুষের কোন সঙ্গী নেই')।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় যে গতিতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তার উল্লেখ ও এই তত্ত্বের উৎস এবং স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হল। বিস্ময়ের কথা এই যে, ৪৫টি কবিতার যে সংকলন গ্রন্থ বলাকা, তার ছত্রিশতম কবিতার বলাকার মাধ্যমে কবির গতিতত্ত্বের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

॥ দুই ॥

৩৬-সংখ্যক কবিতাটির মর্মকথা

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৩৬-সংখ্যক কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশকালে কবি তার নাম রেখেছিলেন 'বলাকা'। কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বলাকা বা হংসশ্রেণীই এই কবিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই একটি ঘটনাই সমগ্র কবিতায় সংঘটিত হয়েছে এবং তাকে আশ্রয় করেই রবীন্দ্রনাথ এক তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। কবিতা আরম্ভ হয়েছে এক সন্ধ্যায়। ঝিলম নদীর ধারে কবি বসে আছেন। একটু আগে সন্ধ্যারাগে ঝিলমের বাঁকা স্রোত ঝিলমিল করছিল, খানিক পরেই অন্ধকার নামল। খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের মত মলিন হয়ে এল নদী। নদীর কালো জলে দু'একটি ঝকঝকে তারার প্রতিফলন দেখেই বোঝা গেল আকাশে নক্ষত্রের উদয় হয়েছে। সামনের গিরিতট এখন অন্ধকার, সারি বাঁধা দেবদারু গাছ ও এখন অস্পষ্ট। এই ঝিম ধরে থাকা সৃষ্টি আবছা অন্ধকারে যেন কোন কথা বলার জন্য ছটফট করছে—এক অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ যেন অন্ধকারে গুমরে উঠছে, এই রকম কবির মনে হয়েছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সন্ধ্যার আকাশে যেন বিদ্যুতের মত খেলে গেল একটা শব্দ লহরী। আকাশেব এক প্রান্ত থেকে ছুটে গেল তা অন্যপ্রান্তে। বোঝা গেল আকাশ পথে উড়ে গিয়েছে এক ঝাঁক হাঁস বা বলাকা। এই সন্ধ্যার স্তব্ধতার মধ্যে ঝঞ্ঝার আবেগমাখা তাদের পাখা আকাশে যেন ছড়িয়ে দিল রাশি রাশি আনন্দ, আকাশে যেন তরঙ্গিত করে তুলল এক মহা বিস্ময়। কবির মনে হল ওই শব্দ যেন সুন্দরী অপ্সরার মতো অটল স্তব্ধতার ধ্যান ভঙ্গ করে চলে গেল। তাই এই শব্দে তিমিরলগ্ন গিরিশ্রেণী যেন শিহরিত, সারি সারি দেবদারু গাছের মধ্যেও লেগেছে সেই শিহরণ।

কবির দৃষ্টি এখন সামনে প্রসারিত। কবির মনে হয়েছে, তাঁর সামনের জড় প্রকৃতির মধ্যে যেন সঞ্চারিত হয়েছে উদ্দাম এক বেগের আবেগ। অচল পর্বত যেন মনে হল কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘের মতো উড়ে যেতে চায়, দেবদারু গাছের শ্রেণী যেন চায় শাখা মেলে উধাও হয়ে যেতে---মাটির বন্ধন এখন তারা অস্বীকার করতে চায়। বলাকার পাখা ঝাপটানোর শব্দ অনুসরণ করে তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে হারিয়ে যেতে চায়। বলাকার পাখা এই সন্ধ্যার স্তব্ধতার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে উড়ে প্রকৃতিকেও সুদূরের পিয়াসী করে তুলেছে, তাদের প্রাণে যেন এই বাণী বেজেছে—"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!"

কবির কল্পনায় এখন চোখে না দেখা সমগ্র বিশ্বজগতের চেহারাটাই ভেসে উঠছে। কারণ বলাকার পাখা স্তব্ধতায় ঢাকায় যে সত্য আবরিত হয়েছিল সেই ঢাকা সরিয়ে দিয়েছে। সমগ্র বিশ্বই যেন গতির পুলকে উন্মথিত, এই রকমই মনে হয়েছে কবির। যে ঘাস মাটির

ওপর প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে আছে, কবির মনে হয়েছে সেও যেন তার সামান্য পাতাগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে—মাটিই তার আকাশ, সেই আকাশে সে যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে। কেবল তাই নয়, তৃণদলের যে অঙ্কুর মাটির নীচে প্রবেশ করেছে অসংখ্য বীজ নিয়ে, কবির মনে হয় যেন এই বীজগুলিও আকাশে উড়ন্ত ওই বলাকারই মতো—তারা মাটির আঁধারে যে আর এক আকাশ সেই আকাশে নিজেদের ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এই পর্বত শ্রেণী যেন উন্মুক্ত ডানায় ভর করে ছুটে চলেছে, এই অরণ্য যেন দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছুটে চলেছে কোন্ অজানার আহ্বানে। নক্ষত্র যে পাখির মত স্পন্দন তুলছে অন্ধকারে, আলো যেন তার কান্না।

জড় প্রকৃতিই শুধু সচলতার আবেগে উদ্বেল তাই নয়, কবি স্পষ্ট বুঝতে পারেন, মানুষের চিত্তের অজস্র আশা-আকাঙ্ক্ষাও এই গতির উদ্বেলতায় স্পন্দিত। মানুষের চিত্তের যে গভীর আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, কামনা—তারা চিত্তের গহনে বাসা বেঁধে স্থাবর হয়ে অবস্থান করে না, তারাও উড়ে চলে অলক্ষিত পথে যুগ-যুগান্তর ধরে। কবি নিজের অন্তরের বাণীকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টায় বুঝতে পেরেছেন, তাঁর চিত্তের আশ্রয় ছেড়েও সেই আকাঙ্ক্ষার পাখি কখনো উৎসাহের আলোয় কখনো নৈরাশ্যের অন্ধকাবময় পথে যাত্রা করেছে। অর্থাৎ কেবল সামনের গিরিতট নয়, দেবদারু বৃক্ষশ্রেণী নয়, জড় প্রকৃতি সামগ্রিকভাবে এবং সেই সঙ্গে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যে বাণী—সকলেই এক গতির সচলতাই যে মানবজীবনের প্রাণশক্তি, এই চেতনা কবির মনে জাগিয়ে তুলেছে সেই সন্ধ্যায় হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙা বলাকার পক্ষ সঞ্চালন। সেই জন্যই এই কবিতায় বলাকার আকস্মিক আগমন একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

॥ তিন ॥

'বলাকা' (ছত্রিশ-সংখ্যক) কবিতার নাট্যধর্মিতা

কবিতায় নাট্যধর্ম বিশেষ প্রত্যাশিত নয়, এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। অবশ্য সেই সঙ্গে এও আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, কাব্যধর্ম ক্ষুণ্ণ না করে কবি যদি কবিতায় নাট্যিক আবেদন সৃষ্টি করতে পারেন তবে তার একটা সৌন্দর্যের মাত্রা বাড়ে এবং কবিতার ক্ষেত্রে তা উৎকর্যেরই কারণ হয়। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতাটি কাব্য-সৌন্দর্যসম্পন্ন একটি তাত্ত্বিক কবিতা হিসাবেই স্বীকৃত কিন্তু আমাদের মনে হয় কবি এর মধ্যে সচেতন বা অসচেতন ভাবে কিছু নাট্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। একটু আলোচনা করলেই সে কথা বোঝা যাবে।

পূর্ণাঙ্গ নাটকে সাধারণত পাঁচটি অঙ্ক থাকে, কবি এই কবিতাটিকেও পাঁচটি সুনিয়ন্ত্রিত স্তবকে বিভক্ত করেছেন। এখানে কবিতাটি যেভাবে প্রকাশিত তাতে তার ছয়টি স্তবক দেখা গেলেও অর্থ অনুযায়ী এর পাঁচটি স্তবক বিভাগই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়েও একে পাঁচ স্তবক সমন্বিত কবিতাই ধরে নিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ নাটকের অঙ্ক বিভাগগুলির একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে, সেই নাটকীয় ক্রম কবিতার স্তবকগুলিতেও রাখবার চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

প্রথম স্তবকটি নাটকীয় রীতিতেই বলা চলে সূচনা বা Exposition আমরা একটি আকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য রোমাঞ্চকর পরিবেশ তৈরি হতে দেখি এই স্তবকে। সন্ধ্যার রক্তরাগ একটু আগেও ছিল, এখন নেমে আসছে অন্ধকার। কবি ঝিলম নদীর তীরে বসে ঝকঝকে নদীর জল আর দেখতে পাচ্ছেন না, তার পরিবর্তে দেখতে পাচ্ছেন আকাশে ফোটা কিছু তারার প্রতিফলন নদীর জলে। সন্ধ্যার এই নিস্তব্ধ পরিবেশ একটা কিছু ঘটনা ঘটবার জন্য যেন আমাদের প্রতীক্ষা জাগিয়ে রাখে। কবি কৌতুহল আরো বৃদ্ধি করেছেন স্তবকের শেষ তিনটি পংক্তি ব্যবহার করে—

"মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।"

অতঃপর দ্বিতীয় স্তবকে সংঘটিত হয়েছে সেই চমকপ্রদ ঘটনাটি। সাধারণ ভাবে হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু ওই পরিবেশে এবং কবির বিশিষ্ট মানসিকতায় তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ধ্যাব নিস্তব্ধতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ভেসে এলো আকাশে উড়ন্ত বুনো হাঁসের দলের পাখা ঝাপটাবার শব্দ। সেই শব্দ কাছ থেকে ক্রমশঃ চলে গেল আকাশের বুক দিয়ে অনেক দূরে। সেই স্তব্ধ এবং বিমর্ষ পরিবেশ মুহূর্তে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল, আকাশে জেগে উঠল বিস্ময় এর আনন্দের তরঙ্গ। কবির মনে হয়েছে স্তব্ধতা যেন এতক্ষণ ধ্যান করছিল, এখন সেই ধ্যান ভেঙে দিয়ে গেল 'শব্দময়ী অপ্সররমণী'। তাতেই যেন শিহরিত সামনের তিমিরমগ্ন গিরিতট ও দেবদারু গাছের সারি।

তৃতীয় স্তবকেই ঘটেছে সেই বিস্ময়কর ঘটনা—নাটকে যাকে বলা হয় এবং নাটকের তৃতীয় অঙ্কেই যার সুনির্দিষ্ট অবস্থান, সেই climax এই কবিতায় তাকে বলা যেতে পারে কবির মানসিকতায় এক নাটকীয় পরিবর্তন যার ফলে কবিতাটি স্পষ্টত তত্ত্বমুখী হয়ে পড়েছে। কবি এই বলাকার পক্ষ-সঞ্চালনকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে মেনে নিতে পাবেন নি, তাঁর মনে হয়েছে এই শব্দময়ী উচ্ছ্বাসের পেছনে এক গভীর সত্যবাণী নিহিত আছে, সেই বাণীটি হল, "হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।"

বদ্ধতার মধ্যে মুক্তি নেই, বিশ্বচক্রও সে কথা বলে। সদা সচলতা এবং সদা সক্রিয়তা ও পরিবর্তনই যে জড় প্রকৃতির ধর্ম সে কথা কবি বুঝতে পেরেছেন বলাকার ওই অতিবান্দিত ধ্বনিবিস্তারের মধ্য দিয়ে। চোখের সামনে যে পর্বত মালা এবং বৃক্ষশ্রেণী অনড় স্তব্ধতায় অটল হয়েছিল, তাঁর মনে হয়েছে তাদের মধ্যে অকস্মাৎ যেন এক বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। পর্বত হতে চেয়েছে কালবৈশাখীর মেঘের মত বাধাবন্ধন হারা এবং বৃক্ষশ্রেণী যেন পাখা মেলে উড়ে যেতে চেয়েছে আকাশে।

চতুর্থ স্তবককে নাটকীয় ভাষায় বলা যায় গ্রন্থি বিস্তার। যে বেগের প্রমত্ততা কবি চোখের সামনে প্রকৃতির মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন—এই স্তবকে চোখের গভীরে ঘন অনুভূতি দিয়ে তাকে দেখেছেন প্রকৃতির অন্তঃপুরে। বলাকা যে আকাশে মুক্তি খোঁজে সেই আকাশকেই কবির একমাত্র আকাশ মনে হয় নি, মুক্তি যাতে পাওয়া যায় কবির কাছে তা-ই এখন আকাশ, তৃণদল তার ক্ষুদ্র কাণ্ড-পত্র নিয়ে যে মাটির ওপর সচল থাকার চেষ্টা করছে সেই মাটি-ই তার কাছে আকাশ। সেই তৃণদলের যে অঙ্কুর মানুষের চোখে পড়ে না তার

চিত্রও ভেসে উঠেছে কবির কল্পনার দৃষ্টিতে। মাটির নীচে তৃণাঙ্কুর লক্ষ লক্ষ বীজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করে। কবির মনে হয়েছে সেই অঙ্কুর আসলে আকাশের উড্ডীয়মান বলাকার মতই অজস্র বীজের সমষ্টি। মাটির নীচের অন্ধকারই তাদের আকাশ—সেই আকাশে তারা সতত ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। এই একই গতির ছন্দে উল্লসিত সমগ্র বিশ্ব এমনকি আকাশের অন্ধকারও ছন্দময়—নক্ষত্র যেন পাখি, তার পাখার স্পন্দনে আন্দোলিত হচ্ছে অন্ধকার।

পঞ্চম অঙ্কে যে Catastrophc নাটকে প্রত্যাশিত, এখানে পঞ্চম স্তবকে তার সাক্ষাৎ আমবা পাই জড় প্রকৃতি ও মানবচেতনার এক উজ্জ্বল সমাহারে। জড় প্রকৃতি যেমন ছন্দময়, মানবচেতনাও তাই। মানুষের নিভৃত চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার গোপন বাণী চিরকাল তার অন্তরের অন্দর মহলে বাঁধা থাকে না। সেই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তারা বেরিয়ে আসে বাইরে, সময়ের অনন্ত আকাশে তারা উড়ে চলে দলে দলে, ওই মুক্ত বলাকারই মতো; এর সমর্থনে কবি তাঁর নিজের চিন্তার কথা বলেছেন। কবি প্রৌঢ় বয়সে একথা অনুভব করেছেন যে, তাঁর নিজের চিন্তাও তাঁর অন্তরের নিভৃতলোকে কোনদিন স্থির হয়ে থাকে নি, তারা চির পরিবর্তনশীল। লক্ষ্যহীন, সুস্পষ্ট পরিণতিহীন চিন্তা তাঁর ভেসে বেড়িয়েছে চিরদিন ওই মুক্ত বিহঙ্গেরই মতো। কাজেই জড় প্রকৃতি, কল্পনায় উজ্জীবিত প্রকৃতি এবং চেতন লোকের এক সংবদ্ধ সামগ্রিকতা নিয়ে যেন নাটকের বিমোক্ষণের মত উদ্‌গত হয়েছে এই সত্যবাণী "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!"

॥ চার ॥

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতা অর্থাৎ এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি যে তত্ত্বগত মূল্যে এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা একথা সঙ্গত কারণেই স্বীকার করেছেন বিভিন্ন সমালোচক। কিন্তু তাত্ত্বিক মাহাত্ম্যই কবিতাটির একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় নয়, কাব্যিক সৌন্দর্যেও এটি অনবদ্য এক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর বক্তব্য এবং তত্ত্ববাণী এমন ধীরে ধীরে পাঁচটি স্তবকে উন্মীলিত করেছেন যে কবিতাটির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন নাট্য সৌন্দর্যেরও সন্ধান পেয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু এর কাব্যিক সৌন্দর্যের প্রধান দিক সংবদ্ধ ও প্রতীকধর্মী ভাষা এবং উপমা ও চিত্রকল্পের অসাধারণ ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ মূলত সংগীত রীতির কবি, অন্তত সংগীতরীতি তাঁর কাব্যে বৃহত্তর ভূমিকা লাভ করেছে। এই কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, সাংগীতিক ব্যঞ্জনা কেমন করে সহযোগিতা করতে পারে গাঢ় চিত্রকল্পের।

সন্ধ্যারাগে যে ঝিলমের স্রোত ঝিকমিক করছিল, অন্ধকার নেমে আসার পর তার স্পষ্ট সীমারেখা আছে কিন্তু ঔজ্জ্বল্য নেই, এ কথা বোঝাতে একটি অব্যর্থ উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—

"আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।"

প্রথম স্তবকটি নাটকীয় রীতিতেই বলা চলে সূচনা বা Exposition আমরা একটি আকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য রোমাঞ্চকর পরিবেশ তৈরি হতে দেখি এই স্তবকে। সন্ধ্যার রক্তরাগ একটু আগেও ছিল, এখন নেমে আসছে অন্ধকার। কবি ঝিলম নদীর তীরে বসে ঝকঝকে নদীর জল আর দেখতে পাচ্ছেন না, তার পরিবর্তে দেখতে পাচ্ছেন আকাশে ফোটা কিছু তারার প্রতিফলন নদীর জলে। সন্ধ্যার এই নিস্তব্ধ পরিবেশ একটা কিছু ঘটনা ঘটবার জন্য যেন আমাদের প্রতীক্ষা জাগিয়ে রাখে। কবি কৌতুহল আরো বৃদ্ধি করেছেন স্তবকের শেষ তিনটি পংক্তি ব্যবহার করে—

"মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।"

অতঃপর দ্বিতীয় স্তবকে সংঘটিত হয়েছে সেই চমকপ্রদ ঘটনাটি। সাধারণ ভাবে হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু ওই পরিবেশে এবং কবির বিশিষ্ট মানসিকতায় তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ভেসে এলো আকাশে উড়ন্ত বুনো হাঁসের দলের পাখা ঝাপটাবার শব্দ। সেই শব্দ কাছ থেকে ক্রমশঃ চলে গেল আকাশের বুক দিয়ে অনেক দূরে। সেই স্তব্ধ এবং বিমর্ষ পরিবেশ মুহূর্তে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল, আকাশে জেগে উঠল বিস্ময় এর আনন্দের তরঙ্গ। কবির মনে হয়েছে স্তব্ধতা যেন এতক্ষণ ধ্যান করছিল, এখন সেই ধ্যান ভেঙে দিয়ে গেল 'শব্দময়ী অপ্সররমণী'। তাতেই যেন শিহরিত সামনের তিমিরমগ্ন গিরিতট ও দেবদারু গাছের সারি।

তৃতীয় স্তবকেই ঘটেছে সেই বিস্ময়কর ঘটনা—নাটকে যাকে বলা হয় এবং নাটকের তৃতীয় অঙ্কেই যার সুনির্দিষ্ট অবস্থান, সেই climax এই কবিতায় তাকে বলা যেতে পারে কবির মানসিকতায় এক নাটকীয় পরিবর্তন যার ফলে কবিতাটি স্পষ্টত তত্ত্বমুখী হয়ে পড়েছে। কবি এই বলাকার পক্ষ-সঞ্চালনকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে মেনে নিতে পাবেন নি, তাঁর মনে হয়েছে এই শব্দময়ী উচ্ছ্বাসের পেছনে এক গভীর সত্যবাণী নিহিত আছে, সেই বাণীটি হল, "হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।"

বদ্ধতার মধ্যে মুক্তি নেই, বিশ্বচক্রও সে কথা বলে। সদা সচলতা এবং সদা সক্রিয়তা ও পরিবর্তনই যে জড় প্রকৃতির ধর্ম সে কথা কবি বুঝতে পেরেছেন বলাকার ওই অতিবান্দিত ধ্বনিবিস্তারের মধ্য দিয়ে। চোখের সামনে যে পর্বত মালা এবং বৃক্ষশ্রেণী অনড় স্তব্ধতায় অটল হয়েছিল, তাঁর মনে হয়েছে তাদের মধ্যে অকস্মাৎ যেন এক বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। পর্বত হতে চেয়েছে কালবৈশাখীর মেঘের মত বাধাবন্ধন হারা এবং বৃক্ষশ্রেণী যেন পাখা মেলে উড়ে যেতে চেয়েছে আকাশে।

চতুর্থ স্তবককে নাটকীয় ভাষায় বলা যায় গ্রন্থি বিস্তার। যে বেগের প্রমত্ততা কবি চোখের সামনে প্রকৃতির মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন—এই স্তবকে চোখের গভীরে ঘন অনুভূতি দিয়ে তাকে দেখেছেন প্রকৃতির অন্তঃপুরে। বলাকা যে আকাশে মুক্তি খোঁজে সেই আকাশকেই কবির একমাত্র আকাশ মনে হয় নি, মুক্তি যাতে পাওয়া যায় কবির কাছে তা-ই এখন আকাশ, তৃণদল তার ক্ষুদ্র কাণ্ড-পত্র নিয়ে যে মাটির ওপর সচল থাকার চেষ্টা করছে সেই মাটি-ই তার কাছে আকাশ। সেই তৃণদলের যে অঙ্কুর মানুষের চোখে পড়ে না তার

চিত্রও ভেসে উঠেছে কবির কল্পনার দৃষ্টিতে। মাটির নীচে তৃণাঙ্কুর লক্ষ লক্ষ বীজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করে। কবির মনে হয়েছে সেই অঙ্কুর আসলে আকাশের উড্ডীয়মান বলাকার মতই অজস্র বীজের সমষ্টি। মাটির নীচের অন্ধকারই তাদের আকাশ—সেই আকাশে তারা সতত ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। এই একই গতির ছন্দে উল্লসিত সমগ্র বিশ্ব এমনকি আকাশের অন্ধকারও ছন্দময়—নক্ষত্র যেন পাখি, তার পাখার স্পন্দনে আন্দোলিত হচ্ছে অন্ধকার।

পঞ্চম অঙ্কে যে Catastrophe নাটকে প্রত্যাশিত, এখানে পঞ্চম স্তবকে তার সাক্ষাৎ আমরা পাই জড় প্রকৃতি ও মানবচেতনার এক উজ্জ্বল সমাহারে। জড় প্রকৃতি যেমন ছন্দময়, মানবচেতনাও তাই। মানুষের নিভৃত চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার গোপন বাণী চিরকাল তার অন্তরের অন্দর মহলে বাঁধা থাকে না। সেই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তারা বেরিয়ে আসে বাইরে, সময়ের অনন্ত আকাশে তারা উড়ে চলে দলে দলে, ওই মুক্ত বলাকারই মতো; এর সমর্থনে কবি তাঁর নিজের চিন্তার কথা বলেছেন। কবি প্রৌঢ় বয়সে একথা অনুভব করেছেন যে, তাঁর নিজের চিন্তাও তাঁর অন্তরের নিভৃতলোকে কোনদিন স্থির হয়ে থাকে নি, তারা চির পরিবর্তনশীল। লক্ষ্যহীন, সুস্পষ্ট পরিণতিহীন চিন্তা তাঁর ভেসে বেড়িয়েছে চিরদিন ওই মুক্ত বিহঙ্গেরই মতো। কাজেই জড় প্রকৃতি, কল্পনায় উজ্জীবিত প্রকৃতি এবং চেতন লোকের এক সংবদ্ধ সামগ্রিকতা নিয়ে যেন নাটকের বিমোক্ষণের মত উদ্‌গত হয়েছে এই সত্যবাণী "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!"

॥ চার ॥

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতা অর্থাৎ এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি যে তত্ত্বগত মূল্যে এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা একথা সঙ্গত কারণেই স্বীকার করেছেন বিভিন্ন সমালোচক। কিন্তু তাত্ত্বিক মাহাত্ম্যই কবিতাটির একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় নয়, কাব্যিক সৌন্দর্যেও এটি অনবদ্য এক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর বক্তব্য এবং তত্ত্ববাণী এমন ধীরে ধীরে পাঁচটি স্তবকে উন্মীলিত করেছেন যে কবিতাটির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন নাট্য সৌন্দর্যেরও সন্ধান পেয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু এর কাব্যিক সৌন্দর্যের প্রধান দিক সংবদ্ধ ও প্রতীকধর্মী ভাষা এবং উপমা ও চিত্রকল্পের অসাধারণ ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ মূলত সংগীত রীতির কবি, অন্তত সংগীতরীতি তাঁর কাব্যে বৃহত্তর ভূমিকা লাভ করেছে। এই কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, সাংগীতিক ব্যঞ্জনা কেমন করে সহযোগিতা করতে পারে গাঢ় চিত্রকল্পের।

সন্ধ্যারাগে যে ঝিলমের স্রোত ঝিকমিক করছিল, অন্ধকার নেমে আসার পর তার স্পষ্ট সীমারেখা আছে কিন্তু ঔজ্জ্বল্য নেই, এ কথা বোঝাতে একটি অব্যর্থ উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—

> "আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
> বাঁকা তলোয়ার।"

রবীন্দ্রোত্তর কালের কবিগণ প্রথাবিরোধী উপমা প্রয়োগ করার জন্য খ্যাতিমান হয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে আমরা কবির এই উপমা এবং 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে প্রযুক্ত উপমাগুলির অভিনবত্ব মনে রাখতে বলি।

কবি এই কবিতায় আকাশের তারাকে দু'বার দু'টি চিত্রকল্পে স্থান দিয়েছেন, দু'টিই অনবদ্য, তবে প্রথম স্তবকের নির্মাণ যে অনির্বচনীয়ত্ব লাভ করেছে দ্বিতীয়টি ঠিক তা নয়। প্রথম চিত্রকল্পে যে সৌন্দর্য ফুটেছে বিশ্লেষণে তার সবটা বোঝা যাবে না—

"দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে।"

এখানে ছোট্ট একটা রূপক আছে, তারাফুল। প্রকৃত রসিক যিনি নন তাঁর কাছে এই রূপকটিই প্রধান বলে মনে হবে, কিন্তু এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমাসোক্তি। রাত্রির নদীর ওপর নায়িকার ব্যবহার আরোপ করা হয়েছে, যে দিনে হতাশ ভাঁটার শেষে রাত্রের উচ্ছ্বাসে তারাফুল মাথায় দিয়ে নায়কের উদ্দেশ্যে ছুটে আসে অভিসারে। কিন্তু সেই সমাসোক্তির মধ্যেও কবি দিন ও রাতের কালব্যাপ্তি ঢুকিয়ে তার মধ্যে অভিনব চিত্রকল্পের দ্যোতনা করেছেন এবং বলা বাহুল্য এতগুলি সৌন্দর্যসম্মিতি সচেতন প্রয়াসে হয় না। কবির অনায়াস সৃষ্টি-প্রতিভাই এমন এক আশ্চর্য চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে পারে।

প্রথম বারে নক্ষত্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়েছে ফুল, দ্বিতীয়বারে তার সঙ্গে অনুল্লিখিত অভিন্নতা পেলাম আমরা বিহঙ্গের। কবি লিখেছেন—

"নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।"

এই প্রয়োগের প্রথমাংশ খুব অস্পষ্ট নয়। কবি বিশ্ব-প্রকৃতিতে এক গতি সচলতা এবং আনন্দিত আন্দোলনের কথা বলেছিলেন—আমরা মনে করতে পারি নক্ষত্ররূপ বিহঙ্গের পাখার স্পন্দনে অন্ধকারও এখন আর স্তব্ধ ও গতিহীন থাকতে পারছে না সে-ও চমকিত হয়ে উঠছে। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তির শেষ দুটি শব্দ আমাদের নতুন করে ভাবায়। আলোর ক্রন্দনে অন্ধকার চমকিত হয়, না পাখার স্পন্দনে! যুগপৎ দুটিকেই সত্য বলে মেনে নিতে হলে নক্ষত্রকে মনে করতে হয় জোনাকি। জোনাকির পাখার স্পন্দনে অন্ধকার মাঝে মাঝে চমকে ওঠে এ চিত্র আমরা যেমন কল্পনা করতে পারি। তেমনি এ কথা চিন্তা করতেও কোন অসুবিধা নেই যে জোনাকির আলো নিরবচ্ছিন্ন নয় বলেই তাতে আলোর স্থির প্রশান্ত মহিমা নেই, আছে অস্থির আলোর ক্রন্দন।

অলংকার হিসাবে নিদর্শনা কিনা, আমাদের ভাববার দরকার নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তি—

"শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।"

—আমাদের মনে চকিতে বিদ্যুৎ রেখার এক চিত্র অঙ্কিত করে দেয় যা মুহূর্তে বিদীর্ণ করে দিয়ে যায় সমস্ত আকাশ। কবি শব্দের সঙ্গে বিদ্যুতের প্রভাব তুলনা করেছেন বাস্তব পৃথিবীতে হয়তো তা অসম্ভব—কিন্তু কবির বর্ণনায় আমরা চোখের গভীরে যেন দেখতে পাই সেই আকস্মিক শব্দলহরীকে যা মুহূর্তে বিদ্যুৎরেখার মত ছুটে যায় দূর থেকে দূরান্তরে।

অসাধারণ এক রূপক কিম্বা সমাসোক্তি অথবা সংকর অলংকার চিত্রকল্পে উন্নীত হয়েছে এই বর্ণনায়—

"ওই পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।"

মুনি ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করতে স্বর্গ থেকে সুন্দরী অপ্সরাদের পাঠানো হতো আমরা জানি। এখানে বলাকার পক্ষধ্বনিজাত শব্দ এবং পূর্বেকার স্তব্ধতা—উভয়কেই personify করা হয়েছে। অপূর্ব একটি কল্পচিত্র আমাদের অনুভূতিতে ফুটে ওঠে যখন কবি বলেন ধ্যানমগ্ন স্তব্ধতার ধ্যানভঙ্গ করে গেল পক্ষধ্বনির শব্দময়ী অপ্সরা।

বিরোধাভাস বা Epigram অলংকার হিসাবে খুব উচ্চস্তরের নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথেব হাতে তা যে অসাধারণ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে তার পরিচয় আমবা তাঁর গল্পে নাটকে কবিতায় উপন্যাসে বহুবার দেখেছি। 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি', 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান,' তমি আমায় আঘাত করতে পারো, আহত করতে পারো না'—এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আমাদের মনে পডবে। এই কবিতায় তাব দুটি উদাহরণ আমরা উদ্ধৃত করতে পারি—

(ক) অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

(খ) শুনিতেছি আমি নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে।
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।

Personification-এর আর একটি ভাল উদাহরণ কবির নিজের চিন্তা প্রসঙ্গে এই উক্তি—
"এই বাসা ছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে কোন্ পার হতে কোন্ পারে!"

কিন্তু চিত্রকল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সম্ভবত এটি, এবং এটি বিশ্লেষণ করেই আমাদের বক্তব্য শেষ করবো—

"তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।"

কবি এখানে বলাকার মুক্ত পক্ষ সঞ্চারের সঙ্গে জড় প্রকৃতির মুক্তির উদ্বেলতার তুলনা করতে গিয়েছিলেন। বলাকা মুক্তি পায় গগন পরিভ্রমণে. সেই তার আকাশ; সামান্য যে তৃণদল সেও মাটির ওপর তার ক্ষুদ্র শরীর মেলে দেয়, নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়—সেই তৃণের পক্ষে মাটিই তার মুক্তির আকাশ, কিন্তু এই তৃণকে কবি যে অল্পমূল্য দিতে চান না সে কথা বোঝা যায় তাঁর লিখনভঙ্গি থেকে। তৃণকে হাঁসের সঙ্গে তুলনা করে তিনি 'ঝাপটিছে ডানা' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন, অথচ একই স্তবকে নক্ষত্র-বিহঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর প্রয়োগ 'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে'। এই প্রয়োগ লক্ষ্য করবার মতো। কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রকল্প শ্রেষ্ঠত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মাটির নীচে যে শ্বেতশুভ্র অঙ্কুব যাতে লক্ষ লক্ষ বীজ থাকে—

মাটির নীচে গাঢ় অন্ধকারে সে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার, এগিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কবির চোখে এও এক বলাকা; তাদের এগিয়ে যাবার আকৃতিতে, প্রচেষ্টায় এবং বর্ণে। বলাকা মুক্তি খোঁজে উর্ধ্ব গগনে, অঙ্কুর মুক্তি খোঁজে নিম্নতম প্রদেশে—তাই মাটির আঁধার নীচই অঙ্কুরের মুক্তির ক্ষেত্র, সেই তার আকাশ। গাঢ় রসবোধ এবং বলিষ্ঠ কবি কল্পনায় এটি রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকল্পে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের অনন্য চিত্রকল্প রচনা এবং সংবদ্ধ বাণী বিন্যাসের সৌজন্যে এই কবিতাটি কাব্য সৌন্দর্যে রীতিমত উল্লেখযোগ্য কবিতা হয়ে উঠেছে।

॥ ছ ॥

ঝড়ের খেয়া

(৩৭ সংখ্যক কবিতা)

॥ এক ॥

কবিতার সমালোচনা

'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম প্রধান কবিতা। এর পটভূমিতে রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রতি তাঁর ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না। তিনি বলেছিলেন, "য়ুরোপের দম্ভ ও লোভ যে সর্বজাতির কল্যাণযাত্রার পথকে রুদ্ধ করে জগদ্দল পাথরের মতো সবার বুকের উপর চেপে বসে থাকবে তা কখনও বিধাতার অভিপ্রায় হতে পারে না। এতে সারা জগতের অন্তরাত্মা প্রপীড়িত। য়ুরোপের পক্ষেও এতে মঙ্গল নেই। প্রপীড়িত জাতিদের জন্য যে মুক্তির প্রয়োজন সেই মুক্তি য়ুরোপেরও চাই। সকলকে মুক্তি না দিলে তারও তো মুক্তি নেই। যে অকল্যাণ সে অন্যের উপর চাপাতে চাচ্ছে সেই অকল্যাণের চাপেই সে মরবে। তারই হাতের আগুনে তারই ঘর দগ্ধ হয়ে ছারখার হয়ে যাবে।" তবে এই যুদ্ধের ভিতরও কবি বিধাতার এক শুভ অভিপ্রায় দেখে বলেছিলেন, "জগতে যুগে যুগে হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে বিধাতার এই উদ্বোধন আসে।...মন্থনে দুধ হতে মাখন বেরিয়ে আলাদা হয়ে উঠে আসে। আজও দুঃখের মন্থনে জীর্ণ প্রাচীনতা হতে নবীনের সাধনা উঠে আসবে।..এই জগৎ জোড়া সাগর মন্থনের মধ্যে শুধু বিষ দেখলেই চলবে না। এতে অমৃতও উঠেছে।" 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় কবির এই আশাবাদী মনোভাবেরই পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। ধ্বংসের মধ্য দিয়েই যে নবযুগের উত্তরণ, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে নবীন প্রাণের উদ্বোধন এটা কবির নিকট এক উপলব্ধ সত্য। তাই কবি বলেছেন, "যাকে সবাই বদ্ধ করে রাখতে চায় তাকেও মৃত্যু এসে অন্তত একদিন মুক্ত করে দিবেই। 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ'। প্রতিদিনই দেখছি বীজ হতে অঙ্কুরে, অঙ্কুর হতে বৃক্ষে, বৃক্ষ হতে ফুলে, ফুল হতে ফলে, ঘাস হতে বীজে ক্রমাগতই চলেছে প্রাণের লীলা। জীবনে মরণে সর্বভাবে আমরা গতি মাত্রারই লীলা দেখছি।...কোন বস্তুরই কোন স্থির সত্তা নেই। মনের জগতেও দেখি সব চিন্তা সব কর্ম ক্রমেই বিকশিত হতে হতে কোথায় যেন যাত্রা করেছে।...মৃত্যু কখনও জীবনকে পরাস্ত ও ব্যর্থ করে না, মৃত্যুই বরং জীবনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করে। আসল কথা জীবন ও মৃত্যু পরস্পর বিরোধী নয়। একটি আরেকটিকে পূর্ণ করে।...জীবন মৃত্যুর দোলাতেই গতির ঐশ্বর্য দীপ্যমান হয়ে ওঠে।" মহাপ্রলয়ের মধ্য দিয়ে, রক্ত-সমুদ্র পাড়ি দিয়েই যে নবযুগের তীরে উত্তরণ করতে হবে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির এটাই প্রধান বক্তব্য।

'ঝড়ের খেয়া' কবিতার সময় এক অন্ধকার ঝড়ো রাত্রি, স্থান এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র। সেই সমুদ্রে এক তরী বন্দরের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়েছে। তরীর একজন কাণ্ডারী আছেন। কাণ্ডারীর আহ্বান কানে নিয়ে একদল দাঁড়ী নিজ নিজ আরামের শয্যাতল ছেড়ে সেই ঝড় মাথায় নিয়ে অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে এসেছেন দাঁড় হাতে। এই কাণ্ডারী আর দাঁড়ীর দল—

এঁরাই সেই স্থানকালের পাত্র। এ কবিতার গূঢ় অভ্যন্তরে একটি নাটক আছে। কাণ্ডারী আর দাঁড়ীদের সংলাপে, উত্তরে প্রত্যুত্তরে কবিতা নাটকীয় হয়ে উঠেছে। অনেক সময় সে সব সংলাপ উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রয়েছে, আবার কিছু কথা উদ্ধৃতি চিহ্নের বাইরেও আছে।

যখনই যুগসংকট উপস্থিত হয়, কাল আবিল হয়ে ওঠে, সমস্যায় বিদীর্ণ হয়, তখন ইতিহাস পুরুষের কণ্ঠে নতুন পথে যাত্রার আহ্বান ধ্বনিত হয়। পুরোনোর পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্ত অতীত ঘুচিয়ে অনাগত ভবিষ্যৎকে বর্তমানের মধ্যে মূর্ত করে তোলার জন্য প্রাগ্রসর চেতনায় আলোকিত যুগন্ধর পুরুষ আহ্বান জানান। এরকম যুগন্ধর পুরুষকেই বলা হয়েছে কাণ্ডারী। তাঁর আহ্বানে অনুগামীরা বেরিয়ে আসেন। এ কবিতায় সেই অনুগামীরাই দাঁড়ী। কাণ্ডারীর দৃষ্টি নিবদ্ধ সুদূর ভবিষ্যতে, তাঁর বজ্রমুষ্ঠিতে হাল, তিনি কর্ণধার। কিন্তু তাঁর চেষ্টায় শুধু ইতিহাসের তরী গতি পায় না, গতি পায় অনেক দাঁড়ীর সমবেত দাঁড় টানায়। ইতিহাসের তরী বর্তমানের বন্দর ছেড়ে ভবিষ্যতের নতুন সৈকতের সন্ধানে যাত্রা করে। এই যাত্রাপথ ভয়াল ভীষণ। সম্মুখে মৃত্যুর সমুদ্র তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত লাভ করতে হয়। সমুদ্রের অপর তীরে অমৃত। ভবিষ্যতে অমৃত। অন্ধকার থেকে আলোয় মৃত্যু থেকে অমৃতে মানুষের এই যাত্রা চলছে চিরকাল। কেন না বারবার বর্তমান মানুষের নিজের ভুলে ভরে ওঠে, তখনই ভুল থেকে বেরিয়ে সত্য লাভের আকুতি জাগে। আর সেই সত্য সন্ধিৎসা থেকেই ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার উৎসাহ মানুষকে পেয়ে বসে। এ কবিতায় সেই দুঃসাহসিক যাত্রার এক বলিষ্ঠ ছবি এক অন্তর্গূঢ় নাটকে ফুটে উঠেছে।

বলাকা-পূর্ব গীতাখ্য কাব্যত্রয়ের ভক্তিপর্বের আত্ম-নিমগ্নভাবের কথা মনে রেখে 'বলাকা'র 'শঙ্খ' কবিতায় কবি বলেছিলেন ঃ

"চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি স্বর্গ।"

না, পূজার ঘরে ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে শান্তিস্বর্গ খোঁজা আর; 'বলাকা'য় সম্ভব হলো না। কবি পূজার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এবং যা দেখলেন—তার সম্পর্কে 'ঝড়ের খেয়া'য় লিখলেন ঃ

"দুঃখের দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তিব ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে।"

দুঃখ-পাপ-অশান্তি অমঙ্গলের এমন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রবীন্দ্র-কবিতায় আগে কখনো শুনি নি। 'শঙ্খ' কবিতায় মানুষকে আহ্বান জানানোর শঙ্খ ধুলোয় পড়ে আছে দেখে কবি হাতে তুলে নিলেন, মানুষকে ডাক দিলেন অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। সেই সংগ্রামেরই বলিষ্ঠ রূপ আঁকা হয়েছে 'ঝড়ের খেয়া'য়।

যে-যুগসংকটের প্রতি ইঙ্গিত আছে এ কবিতায়। তা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। উগ্র 'জাতি-অভিমান' সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয়। যখন একটি জাতি ভাবতে শুরু করে, তার পৃথিবী জুড়ে প্রভুত্বের অধিকার আছে, আর সকল জাতি তার দাস, তখন সেই সংকীর্ণ 'জাতি-অভিমান' 'মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান' ঘটায়, তখন লোভী জাতি বিশেষের

লোভ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, 'বঞ্চিতের নিত্যচিত্তক্ষোভ' জাগে। একদিকে 'প্রবলের উদ্ধত অন্যায়' নখদন্ত বিস্তার করে। অন্যদিকে 'ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ' দেখা দেয়, একদিন য়ুরোপীয় জাতিগুলি নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে এশিয়ায় আফ্রিকায় প্রভুত্বের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করেছিল। প্রভুত্ব বিস্তারে জর্মানি যথা সময়ে মন দেয় নি। যখন মন দিল, তখন 'আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে আর যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।' এই ভাষায় রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' গ্রন্থ ভুক্ত 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই যুগকে তিনি এই প্রবন্ধে বলেছিলেন 'বৈশ্যরাজক', বুঝেছিলেন সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের গান্ধর্ব বিবাহ একালে ঘটেছে। জর্মান পণ্ডিত জর্মান প্রভুত্বের যে তত্ত্ব প্রচার করছে, তার উৎপত্তি 'জর্মন-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।' এইসব সত্যের বোধে উজ্জ্বল 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধটি। এ সব সত্যবোধের চকিত উদ্ভাস 'ঝড়ের খেয়া'য়ও আছে। তার সঙ্গে আবার কবিজনোচিত ভাবালুতার কুয়াশাও আছে।

এ কবিতায় পাপের দায় তিনি অত্যাচারী অত্যাচারিত, প্রভু-দাস, বিজেতা-বিজিত নির্বিশেষে সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন ঃ

"ওরে ভাই কর নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত,
এ আমার এ তোমার পাপ।"

একেই আমরা বলেছি ভাবালুতার কুয়াশা। এই কুয়াশার স্পর্শমাত্র নেই 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে। এ কথা সত্য যুদ্ধ যারা বাঁধায়, তাদের সঙ্গে নিরীহ মানুষরাও মরে, শুধু পাপীই শাস্তি পায় না। এই অসংগতির একটা ব্যাখ্যা 'ঝড়ের খেয়া' কবিতা লেখার এক বছরেরও বেশি আগে 'শান্তিনিকেতন' ভাষণ মালার 'পাপের মার্জনা'য় কবি এ ভাবে দিয়েছিলেন ঃ

সেইজন্য এক-এক সময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে, যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু এই জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেই জন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তে, হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

সমগ্র মানবসমাজ অবিচ্ছেদ্য। দেহের একজায়গায় আঘাত লাগলে সেই বেদনা যেমন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই একের পাপের ফলভোগ অপরকে করতে হয়। এজন্যই 'জাতি অভিমানে' যারা মত্ত হলো, তাদের মত্ততার ফলভোগ করতে হয় নিরীহ দাসজাতিকে। এসব কথায় উপমা আছে, কিন্তু যুক্তি নেই যে যুক্তি ছিল 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে। বাতাস যদি গরম হয়ে হাল্কা হতে থাকে, তার কোনও প্রতিক্রিয়া অনেকক্ষণ দেখা যায় না। তারপর হঠাৎ ঝড় ওঠে ভাঙা চোরা শুরু হয়। এ ভাবেই সমাজের কোথাও পাপ জমে উঠলে তার বিষক্রিয়া সমগ্র মানবসমাজকে ভোগ করতে হয়। এ কথাই 'ঝড়ের খেয়া'য় তিনি লিখলেন ঃ

"বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়।"

মানুষের পাপে বিধাতার বক্ষের তাপ থেকে আজ বায়ুকোণে ঝড় উঠেছে। এই পাপও সকলের, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তও হবে সকলে। কোনও মানুষই স্বতন্ত্র নয় বিচ্ছিন্ন নয়, তাই সম্মিলিত এই যন্ত্রণাভোগ। পাপ ও তার ফলে দুঃখভোগের এই কাব্যিক ব্যাখ্যার মধ্যে একটা ফাঁকি আছে, ভাবালুতার কুয়াশা আছে। গান্ধীজী যখন এ কবিতা লেখার বছর পনেরো পর বিহারের ভূমিকম্পকে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা নামক পাপের জন্য ভগবানের শাস্তি বলেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানালেন। এ যদি শাস্তিই হয়, তাহলে নিম্নবর্গের দরিদ্র হিন্দুদের মাটির ঘরগুলি ভগবান কেন ভাঙলেন? উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দালানকোঠা কেন অটুট রইল? এখানে ছিল রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। এ আপত্তি আমরাও করতে পারি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে এই কবিতায় কবি বলেন ঃ 'এ আমার এ তোমার পাপ।/বিধাতার বক্ষে এই তাপ/বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়।' 'পাপের মার্জনা'য় কাব্যিক এ সব ধারণা থেকে আবার তিনি অবিচ্ছেদ্য মানবের একটি দুর্বল তত্ত্ব দাঁড় করালেন।

যারা প্রাণ সম্পদে দীন, জীবনের মহৎ অর্থ সম্পর্কে উদাসীন, প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে, তারা দুঃখ-বিপদ মৃত্যু এড়িয়ে থাকতে চায়। তারা মৃত্যুর গর্জন শুনতে পায় না। যেখানে ক্রন্দনে আর্তনাদে লক্ষ কথা থেকে মুক্ত রক্তের কল্লোল, যেখানে বহ্নিকন্যা তরঙ্গে উচ্ছ্রিত হয়ে পড়ছে, বিশ্বাসভরা ঝড়ের মেঘ জমেছে, যেখানে আকাশ আর পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচে গিয়ে শুধু মরণে মরণে আলিঙ্গন চলেছে, শুধুই চারদিকে ভয়াল ভীষণ পরিবেশ আর ভীতিবিহ্বল মূর্ছা—সেখানে তারই মধ্য দিয়ে পথ করে তরী নিয়ে পাড়ি দিতে হবে নতুন সমুদ্রতীরে। এ কবিতার আরম্ভেই অশুভ শক্তিতে বিপর্যস্ত জগৎ ও জীবনের ছবি। এরই মধ্যে তরীর কাণ্ডারী এসেছেন, আদেশ ধ্বনিত হয়েছে ঃ 'বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ।' তরী বন্দরে বিশ্রাম নেয়, আবার সমুদ্রে ভাসে ইতিহাসের তরী এককেটি কালের বন্দরে সাময়িকভাবে বাঁধা পড়ে। এ বন্ধন চিরদিনের নয়। কেননা ইতিহাস-তরীর যাত্রা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে। যেখানে পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে বেচা-কেনায় বর্তমান দুঃসহ হয়ে ওঠে, জীর্ণ হয়, তার সতেজ রূপ হারিয়ে অতীতের মতো ধূসর হয়ে ওঠে, সত্যের পুঁজি ফুরোয়, মিথ্যায় বিবর্ণ হয়, বর্তমানের নামে অতীতের ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনা জমে, তখনই যুগস্রষ্টার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নবযুগের আহ্বান। সেই যুগস্রষ্টাই কাণ্ডারী। তাঁরা বলেন, এই যুগবিপর্যয়ের তুফানের মধ্য দিয়েই শুভ্র মানবিকতার ভোরের স্বপ্নে যাত্রা করতে হবে নতুন সমুদ্রতীরের সন্ধানে।

কাণ্ডারীর উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বানে দাঁড়ীরা দাঁড় হাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। ভবিষ্যৎকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁব কাণ্ডারী। আর তাঁদের অনুগামীরা, তাঁদের স্বপ্নে বিভোর তরুণরা? এঁরাই দাঁড়ী। রাত্রির অন্ধকারে তাঁদের মনে উষার স্বপ্ন। তাই তাঁদের কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব কত আর'। তাঁদের যে তব সয় না। তিমির বিনাশী আলোর অভ্যুদয় যখন উষায় ঘটে, তখন মনে হয় পূর্বদিগন্তে তরুণ অরুণের রক্তচ্ছটায় এক স্বর্ণদ্বার খুলে যায়। হঠাৎ ঘুম ভাঙা আর্তকণ্ঠে দাঁড়ীদের এই প্রশ্ন উচ্চারণের মুহূর্তে ঝড়ের মেঘে আলো কালোয় ঢাকা পড়ে, রাত্রি আছে কি নেই বোঝা যায় না। শুধু দিগন্তে

মৃত্যু সমুদ্রের ঢেউ ফেনিয়ে ওঠে। তারই মধ্যে কাণ্ডারীর কণ্ঠে আহ্বান ঃ 'নূতন সমুদ্র তীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি'।

এই দাঁড়ীর দল রাত্রির অন্ধকারে নিরাপদ নিশ্চিন্ত শয্যা ছেড়ে যখন বেরিয়ে পড়েন তখন তাঁদের বিদায় মুহূর্ত মা আর প্রেয়সীর 'যেতে নাহি দিব'র করুণ মিনতিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। মায়ের কান্নার পিছুটান আর প্রেয়সীর দ্বারে দাঁড়িয়ে মুদিত নয়নের মিনতি উপেক্ষা করে তবুও তাঁদের যাত্রা করতে হয়। কেননা তাঁদের অন্তরে যে সুদূরের আহ্বান। তারা যে ভবিষ্যতের স্বপ্নে ব্যাকুল। নিরাপদ গৃহকোণে তাঁদের সেই ব্যাকুলতা তৃপ্ত হতে পারে না। তাই বিচ্ছেদের হাহাকার তখন ঘরে ঘরে বেজে ওঠে। ঘরে ঘরে আরামের শয্যাতল শূন্য হয়। এসব চিত্র তখনকার স্বাধীনতা যোদ্ধা বিপ্লবীদের জীবন থেকে কবিতায় এসে থাকতে পারে। মনে রাখতে হবে, এই কবিতা লেখার মাস দুই আগে বাঘা যতীন ও তাঁর অনুগামীদের ব্রিটিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে আত্মোৎসর্গের গৌরবময় ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে।

ইতিহাসের তরী মৃত্যু ভেদ করে চলে। কখন সে তরী ভবিষ্যতের তীরে পৌঁছাবে তা জিজ্ঞেস করার সময় পর্যন্ত নেই। কেননা দাঁড়ীর দল যাত্রার বেগে চঞ্চল। তাঁরা তরঙ্গের সঙ্গে লড়ে তরী বেয়ে চলেছেন: পাল তাঁদের টেনে রাখতে হচ্ছে। নইলে ঝোড়ো বাতাসে সে পাল ছিঁড়ে যাবে, বজ্রমুষ্ঠিতে হাল ধরে থাকতে হচ্ছে পাছে তরী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। এই বিপদসঙ্কুলযাত্রা শেষে তাঁদের মধ্যে কারা বেঁচে থাকবেন, কারা মরবেন—তা কারো জানা নেই। তবুও তরী বেয়ে চলতে হবে। প্রথম স্তবকের 'বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ'—এটি ধুয়োর মতো আরও হ্রস্বাকারে ফিরে এসেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের শেষে—'বন্দরের কাল হল শেষ'। কেননা এই তো কবিতার মূল ভাব যে বর্তমান ছেড়ে ইতিহাসকে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করতে হয়।

কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ অজানা, অচেনা। অজানার জন্য ঝড়ের বাতাসে প্রচণ্ড আহ্বান ধ্বনিত হয়। মৃত্যুর বিনিময়ে নবজীবন, লাভ করতে হয়। ভবিষ্যতে সেই নবজীবন। জীর্ণ বর্তমানকে ঘুচিয়ে ভবিষ্যতে পৌঁছতে হয়। তাই নবজীবনের অভিসারে মৃত্যুর গান ধ্বনিত হচ্ছে। পৃথিবীর সব দুঃখ সব পাপ সব অমঙ্গল, সব হিংসার বিষ আদর্শের আকাশকে ব্যঙ্গ করছে, এসব অশুভ অমঙ্গল মানুষের অন্তর-লালিত আদর্শকে মিথ্যা বলতে চায় এ সব আদর্শ অর্থহীন, তবুও যাত্রীর দল কাণ্ডারীর নেতৃত্বে দাঁড়ীর দল নিখিলের হাহাকার কানে নিয়ে, মাথার ওপর উন্মত্ত দুর্দিন নিয়ে, চিত্তে অন্তহীন আশা নিয়ে চলেছেন তাঁদের সমুদ্রযাত্রায়। কবি নির্ভীক এবং দুঃখে অভিহত সকলকেই সম্বোধন করে বলছেন, ইতিহাসের এই বিশেষ কাল ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের পাপে আবিল হয় নি, এ সকলের পাপে আবিল হয়েছে। মনুষ্যকৃত এই পাপে বিধাতার বক্ষে যে তাপ জমেছিল, তা থেকেই আজ বায়ুকোণে ঝড় ঘনিয়ে উঠেছে। প্রবল অন্যায় উদ্ধত হয়েছে। দুর্বলের ভীরুতাও এজন্য দায়ী। সে প্রথম ভীরু না হলে প্রবলের পক্ষে অন্যায়ে এমন উদ্ধত হওয়া সম্ভব ছিল না। লোভী লোভে নিষ্ঠুর হয়েছে। স্বভাবতই যে বঞ্চিত তার নিত্য চিত্ত ক্ষোভ জেগেছে। জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান মনুষ্যত্বের অসম্মান ঘুচিয়েছে। এই অসম্মানে বিধাতার কথা বিদীর্ণ হয়েছে। তবুও তার মধ্যেই কবি বলেন, ঝড় ভেঙে পড়ে তো পড়ুক, জাগুক তুফান, নিখিলের যত বজ্রবাণ নিঃশেষ হয়ে যাক। অপরকে নিন্দা করার সময় এখন নেই। নিজে সাধু এমন অভিমান বুকের মধ্যে পুষে রাখা এখন অর্থহীন। সংকট থেকে থেকে তীব্রতর হোক, বিপর্যয়

সর্বগ্রাসী হোক। তাহলেই সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হবে সকলের সম্মিলিত বেদনাভোগে ও পাপের প্রায়শ্চিত্তে। যাত্রাপথের প্রতিকূলতাই যাত্রীদের প্রলয়-সমুদ্র অতিক্রম করে 'নূতন সৃষ্টির উপকূলে নূতন বিজয়ধ্বজা' তুলতে উদ্বুদ্ধ করবে। আমরা আগে 'এ আমার এ তোমার পাপ' ইত্যাদি উপলব্ধির অসংগতির কথা আলোচনা করেছি। এখানে শুধু কবিতার অনুসরণে ব্যাখ্যা করতে হলো।

দুঃখ পাপ অশান্তির অস্তিত্ব, তার হল না, পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর লুকোচুরি বিষয়ে কবির উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা শুনি। দুঃখ পাপ অশান্তি মৃত্যু জীবনকে আজ বিদ্রূপ করছে। এগুলিই অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপে দেখা দিচ্ছে। এ সবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই যাত্রীদের অকম্পিত বক্ষে বলতে হবে যে তাঁরা এ সবে ভয় করেন না। তাঁদের শান্তি, শিব অর্থাৎ মঙ্গল এবং সত্যের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করতে হবে।

তাঁরা জানেন, মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করে তাঁরা অমৃত লাভ করবেন। যা মৃত নয়, তা-ই অমৃত। যা মৃত বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের নবজীবনের আশ্বাসে উদ্দীপ্ত করে, তা-ই অমৃত। তাঁরা জীবনের দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরা সত্য লাভ করবেন। পাপ তাঁর উৎকট প্রকাশের লজ্জায় মরে যাবে। অহংকার তার বিকট সজ্জায় ভেঙে পড়বে। দুঃখ পাপ অহংকার সব হার মেনে শান্তি শিব ও সত্যের জন্য পথ ছেড়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত মিথ্যা পরাভূত হবে, সত্য জয়ী হবে। এরকম বিশ্বাস এই সমুদ্রযাত্রীদের আছে। নইলে তাঁরা কখনোই আত্মোৎসর্গের পথে এমন নির্ভীকভাবে অগ্রসর হতে পারতেন না। প্রভাতের আলোকসমুদ্রে রাত্রিশেষের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে প্রসন্ন প্রভাত আসন্ন হয়ে ওঠে। তারাঝরা আকাশের পূর্বদিগন্তে উষার স্বর্ণদ্বার খুলে যায়। কবির কাছে এই সমুদ্রযাত্রীদের মনে হলো রাত্রিশেষের নক্ষত্রের মতো। তাঁরা তাঁদের আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে নবজীবনের সৈকতে ইতিহাসের তরীকে পৌঁছিয়ে দেবেন। ঝড়ো রাত্রির অন্ধকারেও তাঁদের মনে দূর প্রভাতের প্রত্যাশা আর উষার স্বর্ণদ্বারের স্বপ্ন আছে বলেই এভাবে তাঁর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। তাঁরা জানেন বীরের রক্তস্রোত আর মাতার অশ্রুধারা ব্যর্থ হতে পারে না, ধরার ধূলোয় হারাতে পারে না, তার বিনিময়ে স্বর্গ লাভ হবে, এ কি পৃথিবীর বাইরে কোনও স্বর্গ? এ কি সেই স্বর্গ যার কথা নানা ধর্মে বলা হয়েছে? এ কি জগদতীত কোনও স্বর্গ? মর্ত্যসীমা লঙ্ঘন করে মানুষের মধ্যেই দেবতার অমর মহিমা দেখা দেবে এ তাঁদের স্থির বিশ্বাস। দেবতার অমর মহিমা কি মানুষকে বাদ দিয়ে আর কোনও কিছু? এ কি মানবাতিরিক্ত? নিশ্চয়ই নয়। পৃথিবীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা-ই স্বর্গ। মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা-ই দেবতার অমর মহিমা দুঃখে, পাপে, অমঙ্গলে, অশান্তিতে, অহংকারে, জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে, ভীরুর ভীরুতা-পুঞ্জে, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা তার নিজের সারাৎসার প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, বিকশিত হতে পারছে না। ইতিহাস পুরুষ কাণ্ডারীর আদর্শে উদ্দীপ্তচিত্তের এইসব দাঁড়ী তাঁদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তখন বিকশিত করে তোলার সুযোগ পাবেন, তখন মানুষ হিসেবে তাঁদের সীমাবদ্ধতা ঘুচে যাবে। এই সীমাবদ্ধতাই কবিতার ভাষায় 'মর্ত্যসীমা'। তখন তাঁদের মধ্যেই দেবতার অমর মহিমা দেখা দেবে। সেই মহিমা এখনও ব্যক্ত হয় নি বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে একদিন তা ব্যক্ত হবে। আজ যা কল্পনা, তা সেদিন সত্য হবে—এ কবিতার যাত্রীদের মনে এ আশ্বাস

আছে। এসব আশ্বাস্‌-বাক্যে আবু সয়ীদ আইয়ুব 'মানুষের ধর্ম' রচয়িতার মানবিক ধর্মমতের এ কবিতায় পূর্বাভাস দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'এখান' থেকে খুব বেশি দূরে নয় সেই স্থান যেখানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করবেন : ভগবান বলতে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না।

সমালোচকের এই ধারণা বোঝবার জন্য এ কবিতা লেখার বাইশ বছর পরে 'মানুষের ধর্ম' ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তা জানা প্রয়োজন। সেখানে তিনি বলেছিলেন :

'অন্তত আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে— তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝাবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব হৃদয় আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনো ছড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানুষের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাকে উপলব্ধি করি। তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ব্রহ্ম।'

এই মানবিক ভূমাকে তিনি মানব, চিরমানব, মহামানব, সর্বজনীন মানব বিশ্বমানব, Universal Man, Man the eternal—এরকম নানা নামে অভিহিত করেছেন। এক কথায় তিনি অমানব বা অতিমানব কোনও সত্য নন, জগদতীত কোনও সত্য নন, মানবাতিরিক্ত কোনও সত্য নয়। তাঁর এই ধারণা মৃত্যুর মাত্র কুড়ি মাস আগে লেখা 'রবিবার' গল্পের অধ্যাপক দাদু তাঁর নাতনি অচিরাকে যা বলেছেন, তাতে এই ভাষায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

'পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা সামনে আছে, আরও স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে। তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।'

স্থূলত্ব বর্জনে সিদ্ধ, মর্ত্যসীমা চূর্ণ করার সাধনায় সফল, মৃত্যুঞ্জয় অমৃতের সাধক মানুষের মধ্যেই দেবতার অমর মহিমা দেখা দেবে। তাই দেবতা অতীতে ছিলেন না। ভবিষ্যতে দেবতা মানুষের মধ্যেই দেখা দেবেন। কল্পনা সেদিন সত্য হবে। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার শেষে কল্পনার সেই সত্যরূপ আভাসিত হয়েছে। এ কবিতা শেষ হয়েছে প্রশ্নের পর প্রশ্নে। প্রশ্ন উচ্চারিত হলেও কোথাও কোনও সংশয় কবির মনে নেই। যে আশ্বাসে কবিতার যাত্রীরা চলেছেন, তা স্থির ও নিষ্কম্প। তাঁরা জানেন রাত্রির তপস্যা দিন আনবে। বিশ্বস্রষ্টা যাঁকে কবিতায় কবি বলেছেন বিশ্বের ভাণ্ডারী তিনি এঁদের রক্তঋণ শোধ করবেন। এঁদের রক্তপাত, দুঃখ ও আঘাতের বিনিময়ে এঁরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবেন। সেখানে মানুষ তার জীবধর্ম অতিক্রম করে যথার্থ মৃত্যু উত্তীর্ণ মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই মানবধর্ম প্রতিষ্ঠারই তার দেবতার অমর মহিমা লাভ। তাঁদের রণরক্ত সফলতা ধরার ধূলিতে অমরাবতী রচনায় সার্থক হবে।

॥ দুই ॥

কবিতার বিষয়বস্তু

(পংক্তি ১-১৬)

দূরে (ইউরোপে) যুদ্ধের গর্জন উত্থিত হয়েছে, যে গর্জনের শব্দ এদেশেও (ভারতবর্ষে) ভেসে আসছে। দূরের যুদ্ধ বলে এর প্রতি উদাসীন মনোভাব দেখানো নিরর্থক। ঐ যুদ্ধের হানাহানি রক্তপাত হতে আমরা দূরে সরে থাকতে পারি না। তরল অগ্নিশিখার তরঙ্গ চতুর্দিকে ছুটে চলেছে, বিষবাষ্পে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হবার উপক্রম হয়েছে। তার মধ্যেই মানব-ইতিহাসের কর্ণধারের ডাক শোনা যাচ্ছে। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এতদিনের আরাম ও ঐশ্বর্যের ঘাটের বাঁধন চুকিয়ে দিতে। এখন সুখের ডাঙ্গায় বসে পুরাতন যুগের সব মতামত ও আচার-বিচার আঁকড়িয়ে বসে থাকলে চলবে না। নতুন সত্যের জগতে এখন লেনদেনের পালা আরম্ভ হতে চলেছে। বর্তমানের এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগর পার হয়ে নতুন যুগের স্বর্ণদ্বারে উপনীত হতে হবে।

(পংক্তি ১৭-৩৪)

সত্যের পুঁজি যা ছিল তা ফুরিয়ে গিয়েছে বলেই চতুর্দিকে চলেছে বঞ্চনা ও শঠতার প্রাবল্য। এরই মধ্যে কাণ্ডারী ফুকরিয়ে বলেছে ঝড় তুফানের মধ্য দিয়ে দুঃখ-সাগর অতিক্রম করে নতুন যুগের তীরে পৌঁছতে হবে। সে আহ্বানে ত্রস্ত মাঝি-মাল্লারা দাঁড় হাতে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

(পংক্তি ৩৫-৪৪)

ঘুম ভাঙা মানুষের দল বাইরে ছুটে এসে দেখছে, ঊষা এখনও অনাগত। তাই তাদের প্রশ্ন নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার খুলতে আর কত দেরি? এ ভীত, চকিত, অসহায় মানুষের প্রশ্ন। প্রভাত যে হয় নি এটা এখন নিশ্চয় করে বলা যায় না। হয়তো প্রভাত উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তা হয়তো পুঞ্জীভূত ঘন কালো মেঘের আবরণে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দিগন্তে তুফানের ঢেউ গর্জিয়ে, ফেনিয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে কাণ্ডারীর হাঁক শোনা যাচ্ছে, "যাত্রা কর, যাত্রা কর, এ বন্দর ছাড়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"এ আহ্বান অমোঘ। তাই মৃত্যু সাগর পাড়ি দিয়ে অজানা বন্দরের দিকে নৌকোর যাত্রা শুধু জল।

(পংক্তি ৪৫-৫৩)

নৌকা কোন্ ঘাটে পৌঁছবে এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এখন সময় নেই। এখন শুধু বিক্ষুব্ধ সাগর তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করে নৌকাকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে। নৌকোর লক্ষ্য কোথায় ও কোন্‌দিকে তা শুধু কালের কর্ণধারেরই জানা। এখন শুধু জীবন-মৃত্যুকে উপেক্ষা করে তরণী চালিয়ে যাওয়া।

(পংক্তি ৫৪-৬২)

কাণ্ডারীর হুকুম এসেছে এ যুগের শেষ হয়েছে। সুতরাং এত কালের পরিচিত বন্দরের মায়া ত্যাগ করে যেতে হবে। অজানা সমুদ্র তীরে অজ্ঞাত দেশে যাবার জন্য তরঙ্গ নির্ঘোষে আহ্বান বেজে উঠেছে। শূন্যে শূন্যে সুগভীর গর্জনে সেই আহ্বানেরই সাড়া জাগিয়েছে। আজ এই দুঃখময় রাত্রির অভিসারে শুধু কণ্ঠে কণ্ঠে মরণের সঙ্গীত।

(পংক্তি ৬৩-৭৩)

যাত্রারম্ভে কি কোন শুভ লক্ষণের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে? চতুর্দিক তো শুধু কান্নার রোলই শোনা যাচ্ছে। এতকালের হিংসা, দ্বেষ, পাপ, অনাচার সবই যেন মৃত্যু-সাগর তীরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, চোখের জল, মৃত্যু, প্রলয়াগ্নিশিখা সব যেন পথ রোধ করে দাঁড়াতে চায়। তবু এর মধ্য দিয়েই তরী চালিয়ে যেতে হবে। মাথার উপর যতই উন্মত্ত ঝড় ঝঞ্ঝার তাণ্ডব চলুক না কেন, তথাপি এর মধ্য দিয়েই যাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। যত দুঃখই আসুক না কেন তা মাথা পেতে নিতে হবে।

(পংক্তি ৭৪-৮৬)

আজ পারস্পরিক নিন্দা গালাগালি দেবার দিন নয়। সকলকেই মস্তক অবনত করতে হবে। আজ আমার তোমার সকলের পাপেরই পায়শ্চিত্তের দিন এসেছে। অনেক দিনের বৈষম্য ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদের গ্লানি আকাশ-বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে। বিধাতার পক্ষে এতকাল পাপের যে তাপ জমছিল আজ বায়ুকোণে তা ঝড়ের মেঘ হয়ে প্রচণ্ড এক যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শক্তিমানের যত অন্যায়, ভীরুর যত ভীরুতা, লোভী-বঞ্চকের যত লোভ, বঞ্চিত সর্বহারার মর্মবেদনা, জাত্যাভিমানিদের নীচতা, মহাকালের দেবতার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন সবই আজ বিধাতার কথা বিদীর্ণ করে এই ঝড়ে জলস্থলে হাহাকার করে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। দূরে নিকটে কোথাও আজ শান্তি নেই। সর্বত্রই মানুষের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত চলছে।

(পংক্তি ৮৭-৯৩)

আজ মাথার উপরে ঝড় ভেঙ্গে পড়ুক, তুফান উঠুক, নিখিলের যত বজ্রবান চতুর্দিক থেকে নিক্ষিপ্ত হোক তাতে দৃক্‌পাত করলে চলবে না। এখন সমালোচনার সময় নয়, সৎ কথা সদুপদেশ এখন মূল্যহীন। সাধুত্বের অভিমান এখন দূরে ছুঁড়ে মেলে দিয়ে এখন তরণী বয়ে চলতে হবে। প্রলয় সাগর পার হয়ে নবযুগের নতুন সৃষ্টির তীরে বিজয়কেতন উত্থিত করতে হবে।

(পংক্তি ৯৪-১০৭)

দুঃখ, পাপ, অশান্তির ঘূর্ণীপাক এটাতো প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা। সমগ্র পৃথিবীতে মৃত্যু অশান্তি ক্রমাগত নিরবধিকাল ধরে আসা যাওয়া করছে। জীবনকে একটু বিদ্রূপ করে

তারা মিলিয়ে যাচ্ছে। পাপ, দ্বেষ, নীচতা, স্বার্থকে এতদিন ক্ষুদ্রভাবে দেখা হয়েছে, এখন তার পুঞ্জীভূত বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এই ভয়ঙ্কর রূপের ভিতর দিয়েই পাপের স্বরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য না দেখলে পাপের ভয়ঙ্করত্ব উপলব্ধি করা যেত না এবং তার প্রতিকারের কোন চেষ্টা হত না। আজ নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে বলতে হবে তার অপেক্ষাও মানুষ অধিক সত্য।

(পংক্তি ১০৮-১১৭)

পাপকে ভয় করার কারণ সে নিজেই ভীত। সে গর্তে লুকিয়ে নিজের লজ্জা ঢাকতে চায় ও আত্মরক্ষা করে। মৃত্যুর সেই গহ্বরে ঢুকে অমৃত যদি খুঁজে বার করতে না পারি, দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে সত্য যদি না মেলে তবে বৃথাই এ যুদ্ধ, বৃথা এ মৃত্যু। এই মহাযুদ্ধে পাপ নীচতা গর্ত ছেড়ে বাইরে এসেছে। এই প্রত্যক্ষীভূত অবস্থাতেও সে যদি নিশ্চিহ্ন না হয় তবে আর উপায় কী? অস্ত্রশাস্ত্রের অসহ্য ভারে সজ্জিত অত্যাচারীর নিষ্ঠুর দম্ভ যদি আজ ভেঙ্গে চূর্ণ না হয়ে যায় তবে যারা গৃহ ছেড়ে বাইরে চলে এসেছে তারা কি বৃথাই মরবে? অন্তরের কি আশ্বাসে তবে এরা আজ নক্ষত্রদলের মতো প্রভাত আলোর দিকে মরতে ছুটেছে।

বীরের এত রক্তস্রোত, মাতার এত চোখের জল সবই কি বৃথা এই পৃথিবীর ধুলায় পড়ে শেষ হয়ে যাবে? এত মূল্য দিয়েও কি মানুষের স্বর্গরাজ্য লাভ সম্ভব হবে না? যিনি বিশ্বের ভাণ্ডারী তিনি কি এত পেয়েও তার বদলে কিছু দেবেন না? তিনি কি এই আত্মত্যাগীদের ঋণ পরিশোধ করবেন না?

(পংক্তি ১১৮-১২৭)

অন্ধকারের তপস্যা তো অন্ধকারেই শেষ হয় না, সে দীর্ঘ দিনের সৃষ্টি করে। দুঃখের তপস্যা কি দুঃখেই সমাপ্ত থাকতে পারে? মৃত্যুকে স্বীকার করে, তার মর্ত্য সীমাকে অস্বীকার করেই আজ মানুষ সকল বাধা অতিক্রম করেছে। মৃত্যুর বাধাকেও সে মানে নি। এই মৃত্যু ভীতিই তো মানুষকে অমৃতলোক হতে বঞ্চিত করে রাখে। মর্ত্যসীমা চূর্ণীত হয়েছে, তবে এর পরেও কি অমৃত অলভ্য রইবে? মৃত্যু জয়কারী মানুষকে অবশ্যই দৈবমহিমার অধিকারী হতে হবে। ভয় যখন বিদূরিত করা গেছে। তখন অমৃত লোকের কূল কি দেখা না দিয়ে পারে?

॥ তিন ॥

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ ও টীকা

দূর হতে—রবীন্দ্রনাথ যখন এ কবিতা লেখেন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুধু হয়েছে। কিন্তু সে রণাঙ্গণ ইউরোপে, ভারতবর্ষ হতে বহুদূরে। **মৃত্যুর গর্জন**—যুদ্ধ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু। তাই রণকোলাহলকে কবি মৃত্যুর গর্জন বলে অভিহিত করেছেন। **ওরে উদাসীন**—এ সম্বোধন ভারতবাসীকে লক্ষ্য করে; ইউরোপে যখন যুদ্ধ চলছে তখন ভারতবাসী সেটা তাদের কোন

ব্যাপার নয় বলে একটা উদাসীন ভাব দেখাচ্ছে। ইউরোপের যুদ্ধও যে সমগ্র মানবজাতির ঘোর দুর্দিনের সূচনা করেছে তা যেন ভারতবাসী উপলব্ধিই করতে পারছে না। **ক্রন্দনের কলরোল**—উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি। রণাঙ্গণে আহত সৈনিকদের কাতর যন্ত্রণাধ্বনি, তুলনীয়—

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।"

(নজরুল)

লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল—অসংখ্য আহত সৈনিকের দেহ হতে নির্গত রক্তের স্রোত। **বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ**—আগ্নেয়াস্ত্রের গোলাগুলি হতে নির্গত অগ্নিস্রোত। **বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ**—বিষ উদ্গারণকারী ঝড়ের মেঘ। এখানে লেখক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিষবাষ্পের উল্লেখ করেছেন। **ভূতল গগন**—ধরণীতল ও আকাশ। যুদ্ধ শুধু মাটির উপরে চলে নি, আকাশেও চলেছিল। **মরণে আলিঙ্গন**—যুদ্ধের কি নির্মম চিত্র। দুই প্রতিপক্ষের সৈনিক পরস্পরকে আক্রমণ করে মৃত্যু বরণ করে এবং জড়াজড়ি করে পড়ে থাকে; এটাই মরণ আলিঙ্গন, তুলনীয়—

"সেথা অস্ত্রে অস্ত্রে কোলাকুলি হয়, খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়
সেথা ভ্রূকুটির সহ গর্জন মেশে রক্ত রক্ত সনে।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে—মৃত্যুদেশের স্তূপের মধ্য দিয়েই পথ খুঁজতে খুঁজতে, নূতন সমুদ্রতীরে—নতুন এক আদর্শময় পৃথিবীর দিকে। **কাণ্ডারী**—মাঝি। মানবজাতির ভাগ্য বিধাতা। **বন্দরে বন্ধন কাল**—যে পরিচিত জগতে আমরা এতদিন আবদ্ধ ছিলাম তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলেছে। জাহাজ যেমন এক বন্দর ত্যাগ করে অন্য বন্দরের দিকে যাত্রা করে, আমরাও তেমনি পরিচিত অভ্যস্থ পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও যাত্রা করছি। যুদ্ধ যেন এই পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে নতুন এক পৃথিবীর দিকে নিয়ে চলেছে। **এবারের মত**— পুরাতন জীবন যাপন প্রণালী এবার ছাড়তে হবে। **পুরানো সঞ্চয়**—আগে যা পুঁজি করা ছিল। অচল টাকার মত পুরানো মত। পুরানো বিশ্বাস অথবা ধ্যান ধারণা নতুন পৃথিবীতে অচল হয়ে যাবে। **বঞ্চনা**—ঠকানো; প্রতারণা। মিথ্যাচারের দ্বারা মানুষ এতকাল পরস্পরকে বঞ্চনা করে এসেছে এবং তা ক্রমে জমে উঠেছে। **সত্যের যত পুঁজি**—ধ্রুব সত্য। মানুষ মিথ্যাচারের দ্বারা ধ্রুব সত্যকে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। **তুফান**—সামুদ্রিক ঝড় (Typhoon)। **নূতন সমুদ্র তীরে**—অজানা, আচেনা ভবিষ্যতের দিকে। **দাঁড়ী**—দাঁড়টানা মাঝি। ভাগ্য বিধাতা যখন কাণ্ডারী রূপে বন্দর ছাড়বার আহ্বান জানিয়েছেন তখন সকল মানুষকে দাঁড়ী রূপে দাঁড় টেনে বিশ্বতরণীকে নতুন ভবিষ্যতের দিকে চালিত করতে হবে। **নূতন উষা**—নবযুগের প্রভাত। **স্বর্ণদ্বার**—সোনার ফটক; উষা উদয়াচলের সোনার দরজা খুললে তবেই সূর্যদেব তার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হন। রবীন্দ্রনাথ এখানে সুন্দর একটি রূপকাশ্রিত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যাত্রীদল অন্ধকারময় সমুদ্রের বুকে ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে অজানা বন্দরের দিকে নৌকা চালিত করে চলেছে। তাদের এই বিপদসঙ্কুল নৌ-যাত্রায় তারা কতক্ষণে দুঃস্বপ্নের রাত্রি অপগত হয়ে প্রভাত দেখা দেবে তারই প্রতীক্ষা করে আছে।

কালোয় ঢেকেছে আলো—দুর্যোগের অন্ধকার এমনভাবে চতুর্দিক ঢেকে ফেলেছে যে দুঃস্বপ্নের রাত্রি অতীত হয়েছে না প্রভাতের আলোকে আবরিত করে রেখেছে তা বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। **দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ**—বিপর্যয় দিক দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে।

যুদ্ধ দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। **ফুকারে**—উচ্চস্বরে ডাকে। **বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে**—আত্মীয় বিয়োগের মর্মভেদী হাহাকার ধ্বনি চতুর্দিক বেদনাবিধুর করে তুলেছে। **ঘরে ঘরে শূন্য হলো আরামের শয্যাতল**—গৃহ-সুখ লোভী মানুষ আজ সকল সুখ বিসর্জন দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। **দুলিয়া চলেছে তরী**—তরণী বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথে যাত্রা করেছে। এটা হেলছে দুলছে। যে কোন মুহূর্তেই এটা নিমজ্জিত হতে পারে। তুলনীয়—

"হেলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ হে।" (নজরুল) **অজানা সমুদ্রতীর**—সমুদ্র পারের অচেনা দেশ। এখানে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করা হয়েছে। **নিখিলের হাহাকার**—বিশ্বের আর্তরব। **কার নিন্দা কর তুমি**—যে পাপ বহুদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তার দায়িত্ব কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দেশের উপর চাপানো বৃথা। এটা সমগ্র মনুষ্য সমাজেরই পাপ। কেন না অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী সকলেই সমভাবে দোষী। **লোভীর নিষ্ঠুর লোভ**—পরাস্বপহরণকারীর সীমাহীন লোভ। অপরের জিনিস নিষ্ঠুর ভাবে কেড়ে নিতে লোভী মানুষের বিবেকে বাঁধে না। তুলনীয়—

> "এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
> রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"
>
> (রবীন্দ্রনাথ)

জাতির অভিমান—উচ্চজাতি বা উচ্চবর্ণের বলে আভিজাত্যগর্ব। জাতিভেদের অভিমান মনুষ্য সমাজের এক দুরপনেয় কলঙ্ক। **নিন্দবাণী**—আত্মঅহমিকায় অপরকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে কিছু বলা। **নূতন সৃষ্টির উপকূলে**—মনুষ্যত্বের নূতন উপস্থাপনায়। **তোরে করিয়াছি জয়**—মৃত্যুকে জয় করবার জন্য প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে তারই স্মরণ করছেন। **মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত**—মৃত্যুকে জয় করতে পারলেই তবে অমৃতলাভ করা সম্ভব। কবি অন্যত্র বলেছেন—**"মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতকে সন্ধান করার জন্য পৃথিবী জুড়ে প্রলয় ব্যাপার চলেছে।"**

ঘর ছাড়া—আদর্শ জগৎ স্থাপনার জন্য যাঁরা ঘর ছাড়া হয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। কবি অন্যত্র বলেছেন—**"বড় আদর্শ যাঁদের তাঁদের দুঃখ অপমান ও নির্যাতনের কোষ নেই। কিন্তু তাঁরাই তো ভবিষ্যৎ যুগ তৈরি করছেন। সেই সব ভবিষ্যৎ যুগের স্রষ্টার দল এখন পদে পদে অপমানিত।"** **প্রভাত আলোর**—নতুন যুগে নতুন ঊষার আলোক কবি অন্যত্র বলেছেন—**"পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘর ছাড়ার দল বেরিয়ে পড়েছে, তারা এক ভাবী কালকে মানস লোকে দেখতে পাচ্ছে যে কাল সর্বজাতির লোকের।"** **লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র**—অগণিত তারকা। নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যে অসংখ্য নাম না জানা মানুষ যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছে, কবি সেই বীরদের উজ্জ্বল নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মাতার এ অশ্রুধারা—যুদ্ধে আত্মাহুতি দানকারী কত শত সহস্র বীরের মাতারা পুত্রহারা হয়ে চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে দিয়েছেন। তুলনীয়—**"মা কাঁদিছে পিছে, প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।"** (রবীন্দ্রনাথ)। **হবে হারা?**—এত আত্মত্যাগ, এত দুঃখ সবই কি বৃথা হয়ে যাবে? রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী মন এই ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। **স্বর্গ**—আদর্শ জগৎ। **বিশ্বের কাণ্ডারী**—মানব জাতির ভাগ্য বিধাতা ভগবান। **ঋণ**—পৃথিবীতে মানুষই শুধু ঋণী নয়। মানুষ যে মহৎ কার্য করে বিধাতাকে উপহার দেয় সে জন্য বিধাতাও মানুষের নিকট ঋণী। তাই যে সব মানুষ নতুন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে, জীবন দান করে চরম মূল্য দিয়ে গিয়েছে তাদের সেই দানের ঋণ কি বিধাতাপুরুষ

অপরিশোধিত রাখবেন?' যে আদর্শের জন্য মানুষ এত ত্যাগ স্বীকার করেছে তা কি নিষ্ফল হয়ে যাবে? **রাত্রির তপস্যা**—দুর্যোগের ঘনঘোর রাত্রিতে মানুষ নবদিনের জন্য যে তপস্যা করেছে। কবি অন্যত্র বলেছেন, **"অন্ধকারের তপস্যা তো অন্ধকারেই শেষ হয় না, সে দিনকে আনে। দুঃখের তপস্যা কি দুঃখেই সমাপ্ত হতে পারে?"** **মর্ত্যসীমা**—পৃথিবীর বন্ধন সীমা। তুলনীয়—

"হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়।"

অমর মহিমা—অবিনশ্বর গৌরব। আদর্শ জগৎ প্রতিষ্ঠার গৌরব। **দেবতার**—দেবলোকের অধিবাসীর স্বর্গীয় গৌরব। এখানে কবি মানুষের স্বপ্নের আদর্শ জগতের কথা বলেছেন।

॥ চার ॥

● ব্যাখ্যা

(এক)

"দূর হতে কী শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।"

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের ৩৭ সংখ্যক কবিতার সূচনা। কবি রচনাটির নাম রেখেছিলেন 'ঝড়ের খেয়া'। ইয়োরোপীয় মহাসমরে নরহত্যার যে বীভৎস তাণ্ডব সংঘটিত হয়েছিল, চতুর্দিকে ব্যথিত ক্রন্দনের যে তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছিল তারই পটভূমিকায় কবি মানবতার কাছে ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে আশা-আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি আরম্ভ করেছেন।

পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে আহ্বান করে কবি পরিবেশের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যারা নিজেদের অসহায় দীন মনে করে, যারা সত্যের পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে বসে আছে, যারা নির্বিকার ঔদাসীন্য নিয়ে নবাগত দিনের বিপ্লবের তাৎপর্য না বুঝে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে তারা যেন সচেতন হয়। দূর থেকে ভেসে আসছে মৃত্যুর গর্জন। বিদ্বেষবশে মানুষ পরস্পর হানাহানি করছে। প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোককাতর মানুষের ক্রন্দনধ্বনি আকাশে বাতাসে। আহত ব্যক্তিদের রক্তস্রোত যেন ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ যেন প্রচণ্ড ঝড়। সেই ঝড়ের তাড়নায় উত্তাল সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যেন মানবসমাজের যাত্রা। তাই যাত্রীদেব পক্ষে নিশ্চেষ্ট উদাসীন থাকা সঙ্গত নয়।

(দুই)

**"এসেছে আদেশ
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।"**

আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথ 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির রূপকার্যের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন যে পাশ্চাত্য মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি রূপে নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে। প্রাচীন রাজনীতি, আদর্শ এবং সংস্কার পরিবর্তনের কাল সমাসন্ন। সমুদ্রযাত্রীকে নতুন বন্দরের সন্ধানে যেতে হবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করতে হবে। কারণ পুরাতন বন্দরে আবদ্ধ থাকা চলবে না—এই আদেশ জারি হয়েছে। পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে আর কোন সার্থকতা নেই।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে মহাসমরে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য এই শিক্ষাই দিয়েছে যে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও নতুনের সন্ধান পেতে হবে, নতুন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে যেতে হবে। পুরাতন আদর্শ নিরর্থক হয়ে পড়েছে। সে আদর্শ এখন প্রাণহীন প্রথা মাত্র। বহু ব্যবহারে এবং অন্ধ পুনরাবৃত্তিতে প্রাচীন প্রথা সত্যের পুঁজি ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং পুরাতনের বিধ্বস্ত রূপের মধ্যে নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

(তিন)

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব আর'
এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।"

'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একটি রূপক বর্ণনার মাধ্যমে সমাজের আদর্শ বিবর্তনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের মতো জীবনে মানবযাত্রীরা সচকিত হয়ে উঠেছে। এতদিন তাদের জীবন পুরানো বাঁধা পথে নিস্তরঙ্গ গতিতে চলমান ছিল। অকস্মাৎ মহাযুদ্ধ, মৃত্যুর গর্জন, ক্রন্দনের রোল এবং রক্তের স্রোত নিয়ে এসেছে। মানবসমাজ সচেতন হয়ে উঠেছে, নতুন জীবনের স্বপ্নও তাদের মনে জেগেছে।

মৃত্যুভয় এবং শোকের বেদনা যেন গাঢ় অন্ধকারের মতো জীবনাকাশকে ছেয়ে ফেলেছে। নৈশ অন্ধকারের গাঢ়তা ভেদ করে কখন উষার স্বর্ণ আভা ফুটে বেরুবে তাঁর প্রত্যাশা নিয়ে মানবযাত্রীদের উৎকণ্ঠা। তারা যেন ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে। রাত্রি যেন আর শেষ হয় না, ঝড়ের তাণ্ডব যেন প্রশমিত হয় না। অথচ দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়েছে তীব্র। রূপকের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবকে অপূর্ব কাব্যরূপ প্রদান করেছেন।

(চার)

"বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন-মাঝে
বিচ্ছেদের হাহকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;"

চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে, কঠিন আত্মত্যাগের দ্বারা জীবনে চরম সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার এটাই মর্মার্থ। ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের জন্য মানুষকে ব্যক্তিগত

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-বিরাম বর্জন করতে হয়। মহাসত্যের আহ্বানে মৃত্যুবরণের জন্য যে বীরেরা অগ্রসর হয়ে আসে তাদের আত্মদান ব্যর্থ হয় না।

দুঃখ বরণের আদর্শকে ব্যঞ্জনাময় করার জন্য কবি বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেছেন যে কারা আদর্শের আহ্বানে গৃহসুখ বর্জন করে বাইরে এসেছে। তাদের স্নেহকাতরা জননীরা চোখের জল ফেলছেন এবং তাদের পত্নীরা নিঃসীম বেদনা নীরবে বহন করে গৃহদ্বারে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিয়জনের মৃত্যুদুঃখ পরিবারের পক্ষে বড়ই দুর্বহ প্রিয়বিরহের বেদনায় তাদের চিত্তে হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে। তবু প্রতিটি পরিবারের সমর্থ বীরেরা গৃহসুখের আরাম-শয্যা পরিহার করে দুঃখবরণের কন্টকাকীর্ণ পথে ঝাঁপিয়া পড়ছে, কারণ এই দুঃখবরণ পরিণামে নিরর্থক হবে না।

(পাঁচ)

"তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী;
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।"

'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় সমুদ্রযাত্রার রূপকে নৌকা পরিচালনার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। যত দুঃখই আসুক, যত সংকটই উপস্থিত হোক, মহৎ আদর্শ প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হলে চলবে না।

জীবন-সমুদ্রে প্রচণ্ড বিপ্লব উপস্থিত; মহাসমরে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য। তবু পরপারে উত্তীর্ণ হবাব জন্য সমাজের তরীটিকে চালাতে হবে। অশান্তির তরঙ্গ বাধা দেবে, আদর্শের পাল বিচলিত হতে পারে, সংকল্পের হাল শিথিল হতে পারে। কিন্তু যাত্রীকে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে। আদর্শকে সুস্থির রেখে সংকল্পকে সুদৃঢ় করে মরা-বাঁচার প্রশ্নকে অবাস্তব করে দিয়ে জীবনপণ সংগ্রাম করতে হবে। কবির বাণীতে এই নির্দেশই ঘোষিত হয়েছে।

(ছয়)

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসাহলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
ঊর্দ্ধ আকাশের ব্যঙ্গ করি।

গ্লানিময় সমাজ থেকে মুক্ত হবার জন্য চরম দুঃখের ব্রত অবলম্বনের কথা 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় বলা হয়েছে। আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথ সমুদ্র-যাত্রার রূপকের অঙ্গ রূপে

বিক্ষুব্ধ তরঙ্গগুলিকে গ্লানিময় সমাজের হিংসাদ্বেষ ও পাপ-অকল্যাণের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কবি বলেন যে আদর্শব্রতী যাত্রীদল সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে সুস্থ পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে; কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ সমাজের যত কুশ্রীতা তরঙ্গের মত উর্ধ্বমুখী হয়ে নির্মল আকাশকে যেন ব্যঙ্গ করছে। সমাজ জীবনে অবিচার, অত্যাচার ও হিংসাদ্বেষের ফলে পাপ ও অমঙ্গলের অত্যধিক প্রাধান্য ঘটেছে, মানুষের দুঃখবেদনা শতগুণ বেড়েছে। তবু যাত্রীকে নির্ভীকভাবে আদর্শ প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

(সাত)

"হে নির্ভীক দুঃখ অভিহত,
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ,
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু-যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—"

পুরাতন পৃথিবীতে প্রথাসর্বস্ব জীবনযাত্রায় অনেক দিনের অনেক পাপ ও গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়েছে। মহাসমরের মৃত্যুবিভীষিকার সেই গ্লানিপুঞ্জ অপসারিত হবার সম্ভাবনা। এই বিশ্বাস 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রযাত্রার রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপকে কবি মনুষ্যসমাজের পাপ ও গ্লানিকে বুঝিয়েছেন। মেঘ যেমন ধীরে ধীরে বায়ুকোণে পুঞ্জীভূত হয়ে প্রচণ্ড ঝড় সৃষ্টি করে তেমনি মানবসমাজের বহু পাপ ক্রমশঃ জমা হয়ে প্রচণ্ড নরঘাতী রক্তাক্ত যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। এটা ব্যক্তিবিশেষের কৃত কার্য নয়, সকলকে নিয়ে যে সমাজ সেই সমাজই এর জন্য দায়ী। সুতরাং কাউকে দায়ী করে তাকে নিন্দা করে কোন লাভ হবে না। সমাজের এই কলঙ্কের দায় নিজের মাথায় নিয়ে কলঙ্কমোচনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করাই কর্তব্য।

(আট)

"তোরে নাহি করি ভয়;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য সেই চিরন্তন এক।"

মহান সত্যের জন্য নির্ভীক সংগ্রামের আবেদন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় তরুণ দলকে আশা-আশ্বাসে উদ্বোধিত করেছেন, মানবসমাজে সুদীর্ঘ কাল ধরে বহু পাপ, বহু গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়েছে। অন্যায় অত্যাচার দেশের আকাশ বাতাস কলুষিত করে ফেলেছে, পাপের প্রতাপ এতই বেড়েছে যে অসত্য সত্যকে অবলীলায় বিদ্রূপ করে। অন্যায় ও অবিচার মানবসমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করতে হবে। তার দায়িত্ব নেবে নির্ভীক তরুণ দল।

তাই রবীন্দ্রনাথ তরুণদের বলেছেন যে, তারা যেন অন্যায় অসত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে

অকম্পিত বুকে সুদৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারে যে অসত্যকে ভয় করি না। তারা যেন বলে যে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিন তারা অসত্যকে পরাজিত করছে। সত্যের উপর অবিচলিত বিশ্বাস রেখে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার একতম আদর্শের জন্য তারা প্রাণ বিসর্জন করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। এই নির্ভীকতাই পাপকে শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত করে।

(নয়)

"মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে বুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর ছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?"

'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় মহাসমরে যে মৃত্যুযজ্ঞ সংঘটিত হচ্ছে তার একটা শুভ পরিণামের কথা কল্পনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, বহুদিনের পুঞ্জিত পাপের ফলে এই মরণযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। মৃত্যুর অগ্নি শিখায় পাপের আবর্জনা পুড়ে ছাই হবে, ঐশ্বর্যের অহংকার, প্রতাপ, শক্তির দম্ভ চূর্ণীকৃত হবে। প্রেম ও কল্যাণ শক্তির অভ্যুত্থান ঘটবেই। আলোচ্য অংশে সেই আশীর্বাদ ধ্বনিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখব্রত সাধনায় বিশ্বাসী, তিনি মনে করেন যে, মৃত্যুর মধ্য থেকেই অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাবে। চরম দুঃখের মূল্যেই পরম সত্যের প্রাপ্তি ঘটে। যাঁরা মৃত্যু ও দুঃখকে বরণ করে থাকেন তাঁদের অন্তরে একটা স্থির বিশ্বাস থাকে যে, পাপ এক সময় আত্মপ্রকাশ করতে নিশ্চয়ই লজ্জা পাবে এবং অহংকারের বিপুল সজ্জা অবশ্যই বিধ্বস্ত হবে। দুঃখব্রতী সাধকেরা যেন অন্ধকার আকাশের নক্ষত্র। এই নক্ষত্রগুলি রাত্রি শেষে বিলীন হয়ে যায়; কিন্তু তাদের আত্মত্যাগের ফলেই প্রভাতের নির্মল আলোর প্রকাশ। সত্য ও শিবের নির্মল প্রকাশের জন্যই চাই আদর্শব্রতী তরুণ দলের মহান আত্মোৎসর্গ।

(দশ)

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?"

'ঝড়ের খেয়া' কবিতার উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন ভঙ্গিতে পরম আশাবাদ প্রকাশ করেছেন। বক্রোক্তির অলংকৃত ভাষায় কবি যে প্রশ্ন করেছেন তাতেই তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর আভাসিত হয়েছে। ইউরোপীয় মহাসমরে নরবলির বিপুল সমারোহ মানবসমাজে এক কল্যাণকর পরিবর্তন নিয়ে আসবে এই বিশ্বাসবশে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ সাধনার মূল্যায়ন করেছেন।

মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বীরো আত্মদান করেছে, কত জননীর প্রিয়তম পুত্রেরা মৃত্যুবরণ করে মায়ের চোখে জল ঝরিয়েছে। এই রক্তদান ও অশ্রুনিষেক কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতা এই মহৎ দানের প্রতিদান না দিয়ে পারেন না। আত্মদানের এই ঋণ তিনি অবশ্যই পরিশোধ করবেন। রাত্রির পর যেমন দিনের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী, তেমনি দুর্ভাগ্যের চরম দুর্দশার পর সৌভাগ্যের সূর্য উদিত হবেই। ভবিষ্যতের মহতী আশায় উদ্বোধিত হয়ে বর্তমানের দুঃখ নির্ভীক ভাবে বরণ করবার উৎসাহ আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

(এগারো)

"নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

দুঃখের চরম দিনে মৃত্যুর বীভৎসতায় মানুষ তার ঐহিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সাময়িক লাভের লোভ কিছুমাত্র না থাকায় দুঃখব্রতী সাধক পার্থিব জগতের সীমা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অপার্থিব জগতের দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। আদর্শনিষ্ঠ কবি বিশ্বাস করেন যে, নিঃস্বার্থ নির্ভীকতায় যাঁরা মৃত্যু বরণ করেন তাঁরা মর্ত্যলোকের সীমা পেরিয়ে দেবলোকের মহিমা লাভ করেন। এরাই স্থূল লৌকিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম অলৌকিক অমরত্বের অধিকারী হন।

॥ পাঁচ ॥

॥ এক ॥

'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির মূল বক্তব্য ও নামকরণ

'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা, ইউরোপ থেকে সদ্য প্রত্যাগত কবি জাতিবিদ্বেষের ও ঈর্ষাকলুষতার পঙ্কিলতা দেখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা আসন্ন। নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে পুরাতন পৃথিবীর ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণকর হবে। এই মৃত্যুযজ্ঞে যারা প্রাণ দেবে তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটি আদর্শ জগতের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

পৃথিবী মহাপাপের লীলাস্থল হয়ে উঠেছিল। ভীরুর ভীরুতা, উদ্ধত প্রবলের অন্যায় অত্যাচার, লোভীর লোভ, বঞ্চিতের বেদনা পৃথিবীতে পুঞ্জিত হয়ে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। এর প্রতিবিধানের জন্য একদল আদর্শনিষ্ঠ দুঃখব্রতীর নির্ভীক নিরলস সাধনা দরকার। এরা মায়ের অশ্রু, প্রিয়ার ব্যাকুলতা, গৃহের আরাম সব কিছু উপেক্ষা করে চরম দুঃখবরণের

জন্য প্রস্তুত হলেই কল্যাণ ও শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

কবিতাটির উল্লিখিত মূল বক্তব্য প্রকাশের জন্য কবি যে কাব্যরূপক গ্রহণ করেছেন তাতে 'ঝড়ের খেয়া' নামকরণের সঙ্গতি আছে। কবি মানবসমাজকে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সংকুল সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পৃথিবী যেন ঝড়ের তাণ্ডবে ধ্বংসোন্মুখ। তবু আদর্শ সমাজরূপ একটি তরণী মৃত্যু ভেদ করে দুলে দুলে চলছে। এদিকে 'ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।' কবি বলেন—

"যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
ঊর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।"

পাপসমাকীর্ণ বিক্ষুব্ধ সমাজকে ঝটিকা সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে সমুদ্রপারের জন্য আদর্শ সমাজরূপ একটি খেয়া-তরণীর কল্পনা কবি করেছেন। এই খেয়ার যাত্রীদের হতে হবে নির্ভীক বীর। কবির নির্দেশ—

"তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;"

ঝড়ের রাতে দুস্তর সমুদ্র পার হবার জন্য যে খেয়া-তরণীর কল্পনা করা হয়েছে তার বিশেষত্ব, তার দুঃখ ও বিপদের সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতে তীরে উত্তীর্ণ হবার আশা কবি এই কবিতাটির মধ্যে চমৎকার রূপকের ব্যঞ্জনা দ্বারা বলেছেন। তাই নামকরণটি বক্তব্যের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে।

ঝড়ের রাতে চরম বিপদ ও মৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়ে উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ এক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে কূলে উত্তীর্ণ হওয়া খুবই সুকঠিন। যে খেয়া-তরণী এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে পারে তাই লাভ করে কালজয়ী মহিমা। এই রূপকটিকে ব্যবহার করে কবি এই সত্যটিকেই ইংগিতপূর্ণ করেছেন যে, সামাজিক গ্লানির চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও ত্যাগব্রতী সাধকেরা সুস্থ সবল সুন্দর সমাজ গঠন করে মহিমান্বিত অমরতা অর্জন করবে। উপমেয় এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করে উপমানের নামানুসারে নামকরণ করায় কবিতাটির ব্যঞ্জনাধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

॥ দুই ॥

'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির বর্ণনাভঙ্গি

'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে বেশ একটু অভিনবত্ব আছে। কবি বলতে চেয়েছেন যে, মহৎ জীবন লাভ করতে হলে মহৎ মূল্য দিতে হয়। সত্যকার জীবনে কোথাও ফাঁকির কারবার নেই। দুঃখের প্রতিকূলতায়, ভয়ের বিমূঢ়তায়, প্রাপ্তির দুর্লভতার জন্য হতাশায়

মুহ্যমান হলে চলবে না। দুঃসাধ্য সিদ্ধিকে করায়ত্ত করতে হলে দুশ্চর সাধনার পথ নির্ভীক ভাবেই অবলম্বন করতে হবে।

এই সত্যকে রূপ দেবার জন্য কবি একটি চমৎকার রূপকল্প ব্যবহার করেছেন। প্রচণ্ড ঝড় এসেছে, সমগ্র আকাশ অন্ধকার মেঘে আচ্ছন্ন, তীব্র বায়ুর ভীষণ গর্জন, সমুদ্রের বুকে উত্তাল তরঙ্গের বিক্ষোভ। সমুদ্রগামী তরণীর নাবিকদল এই ঝড়ো আবহাওয়ায় বন্দরে নোঙর করে নিশ্চিন্ত আরামে সুখনিদ্রায় নিমগ্ন। এই সময় যেন অধিনায়কের অমোঘ নির্দেশ এল— "বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ।" এই প্রচণ্ড তুফানের মধ্যেই পরপারে যাবার জন্য বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তরী ভাসাতে হবে। কবিতাটির সূচনায় রূপকচ্ছলে কবি অপূর্ব একটি বাস্তবচিত্রের সাহায্যে কঠিন সাধনার জন্য প্রস্তুতির ভাবটিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

উৎসাহী নাবিকেরা কাণ্ডারীর নির্দেশে তরণীতে এসেছে। কিন্তু তাদের কাছে পরপারের দিশা নেই, রাত্রি প্রভাতের সম্ভাবনা নেই, আশার আশ্বাস নেই, এই ভাবটিকেও কবি রূপক-চিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন—'দিগন্তে ফেনায়ে ওঠে ঢেউ'—তবু দুঃসাহসী নায়কের নির্মম নির্দেশ 'নূতন সমুদ্র তীর পানে দিতে পাড়ি।' বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে কবি দেখালেন যে যাত্রীদের জননীরা ও প্রেয়সীগণ বিচ্ছেদবেদনায় কাতর, যাত্রীরাও আরামের শয্যাতল ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। মহৎ দুঃখকে এইভাবে বরণ করেই মানুষ অমরতার মহিমা অর্জন করে।

কবিতাটির প্রথম অংশের এই রূপক চিত্রটিকে পরবর্তী অংশে কবি ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করেছেন' পৃথিবীর দুঃখ, পাপ ও অমঙ্গলই প্রচণ্ড তুফান রূপে দেখা দিয়েছে। সামাজিক মানুষের কৃতকর্মের ফলেই এই বিভীষিকার সৃষ্টি, এই অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষকে দোষী সাব্যস্ত করে লাভ নেই। অন্যায় অত্যাচার ও পাপের বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রাম ঘোষণা দ্বারাই সত্য ও শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কবি অপূর্ব কাব্য ভাষায় প্রবহমান ছন্দের ঝংকার তুলে প্রত্যয়নিষ্ঠ ভঙ্গিতে অনুভূত সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

কবিতাটির উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় প্রবল আশাবাদ প্রকাশ করেছেন বিশ্ব সাহিত্যের ভাণ্ডারে তার তুলনা খুব বেশি মিলবে না। মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করে অমৃত আহরণের অভিপ্রায় ভারতীয় উপনিষদের রসপুষ্ট কবির পক্ষেই সম্ভব। দুঃখব্রতী সাধকদলকে তিনি প্রভাত আলোয় হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কঠিন তপস্যাকে বলেছেন অন্ধকার রাত্রি, সাধনার সিদ্ধিকে বলেছেন আলোকময় দিন। সুগভীর প্রত্যয় নিয়ে কবি বলেছেন, "রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?" এই কবির ভাষা যেন ঋষি কণ্ঠে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রের ভাষার মতই অর্থবান হয়ে উঠেছে, ভাবের মহনীয়তায়, প্রকাশের সাবলীলতায় ও ভাষার ঐশ্বর্যে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

।। তিন ।।

"নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

—কবির এই উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর মানস-বৈশিষ্ট্যের কি পরিচয় পাওয়া যায় তা 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির পটভূমিকায় আলোচনা কর।

'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি মানসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি ধর্মে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদী মানব প্রেমিক। মানবকল্যাণের আদর্শকেই তিনি শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করতেন এবং সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ববিধ ত্যাগ এবং দুঃখবরণকেই শ্রেয় মনে করতেন। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় তিনি দুঃখবরণের মহিমা এবং কঠোর সাধনার সার্থকতা বর্ণনা করে কল্যাণের সুচিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। তাই কবিতাটির উপসংহারে কবির ব্যাকুল প্রশ্ন—চরম দুঃখের ভিতর দিয়ে পরিণামে কি পরম কল্যাণ আসবে না!

কবিতাটির পটভূমিকা ছিল প্রথম ইউরোপীয় মহাসমরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী। 'বলাকা' কাব্যে কবি 'সবুজের অভিযান' লিখে জনগণকে বলেছেন "জীর্ণজরা জরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।" মৃত্যুর অগ্নিতে পুরানো দিনের সঞ্চিত জঞ্জাল পুড়িয়ে ফেলে সেখানে নতুন জীবনের শুভ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত। এই বিশ্বাস বলে রবীন্দ্রনাথ বীভৎস মৃত্যুযজ্ঞের একটি শুভ পরিণামের প্রত্যাশা করেছিলেন। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি সেই প্রত্যাশারই বাণীরূপ।

কবি বলেছেন যে, সমস্ত পৃথিবী পাপে এবং গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়েছে। 'মৃত্যু করে লুকোচুরি সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।' জীবনকে বিদ্রূপ করে সেই মৃত্যুর ভীষণতা অভ্রভেদী বিরাট হয়ে উঠেছে। কিন্তু আত্মোৎসর্গে উদ্দীপিত সংগ্রামীকে বলতে হবে 'তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।' এইভাবে মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করেই সাধক অমৃতত্বের সন্ধান পায়, দুঃখের সঙ্গে নির্ভীক সংগ্রাম করেই সে সত্যকে আবিষ্কার করে। অন্তরের এই আশ্বাস নিয়েই শত শত বীর মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আকাশের অগণিত নক্ষত্র যেমন আত্মবিলোপের দ্বারা পৃথিবীতে প্রভাত-আলো নিয়ে আসে তেমনি মৃত্যু দুঃখের মধ্য থেকেই কল্যাণের আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

'ঝড়ের খেয়া' কবিতার বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তরী চালানার দুঃসহ কষ্ট এবং চরম বিপদের সম্ভাবনার রূপক বর্ণনা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিধর্মের একটি বড় আদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বীরের রক্ত ধারা ও মাতার অশ্রুধারা যে আদর্শের জন্য প্রবাহিত হয়েছে বিশ্ববিধাতা কখনই সেই আদর্শকে মূল্যহীন করে রাখবেন না। মর্ত্যভূমির এই চরম ত্যাগের ফলেই স্বর্গভূমি অধিকৃত হবে। রাত্রির তপস্যাই উজ্জ্বল দিবালোক আনয়ন করবে। দুঃখব্রতের যে সাধনা সে সাধনা কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। কবিজীবনের এই পরম বিশ্বাস অপূর্ব ভাষাভঙ্গিতে এবং সাবলীল ছন্দে যেন এখানে পরিগ্রহ করেছে।

॥ জ ॥

নববর্ষের আশীর্বাদ

(৪৫ সংখ্যক কবিতা)

॥ এক ॥

রচনাকাল ও নামকরণ

কবিতাটির রচনাকাল ৯ই বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব সমাপ্ত হবার পর কবি এটি রচনা করেন এবং কবিতাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩২৩ সংখ্যার 'সবুজপত্র' নামক মাসিক পত্রিকায়। প্রথম প্রকাশের সময় কবিতাটির নাম ছিল 'নববর্ষের আশীর্বাদ'। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে সংকলনের সময় এটি ৪৫-এই সংখ্যা শীর্ষনাম হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং এই কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এর কারণ হিসাবে কবি যে কথা বলেছেন। শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন—"বেদের গান সমাপ্ত হয় পুনরুক্তি দিয়ে। আমার এই কবিতায় যদি বলাকার সব কথার পুনরুক্তি হয়ে থাকে তবে ভালই হয়েছে। এই একটি কবিতার মধ্যে আমার সব কথার সারটুকু দিয়ে আমি 'বলাকা'র পালা শেষ করে দিচ্ছি।"

এই কবিতা 'বলাকা'র শেষ কবিতা। যৌবন বন্দনা বিষয়ে আলোচনায় বলেছি এ বইয়ের একটি বিশেষ সুর যৌবন স্তরের দীপক তান। আর এই তান প্রথম ও শেষ কবিতায় সাধা হয়েছে। ভেতরের অন্যান্য কবিতায় সে সুর তো ফিরে ফিরেই বেজেছে।

১৩২৩ (১৯১৬) বঙ্গাব্দের ৯ই বৈশাখ এ কবিতা লেখা। এ বাংলা নববর্ষ বরণের কবিতা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৩ এর সবুজপত্রের বৈশাখ সংখ্যায়। এই কবিতাটি পড়ে পরের মাসের 'সাহিত্য' পত্রে সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যা লিখেছিলেন, তা মনে পড়ে। কবিতাটিতে আছে 'দূর হতে দূরে/বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘ তান সুরে'। সুরেশচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বাঁশি বাজা, ঢাক বাজা এ সব বাজা বোঝা যায়।' কিন্তু পথ বাজা একটা হেঁয়ালি মাত্র এ রকম তাঁর মনে হয়েছিল।

পুরোনো বছর বিদায় নিয়েছে এর দৈনন্দিনতায় ক্লান্ত ও জীর্ণ শেষ রাত্রিটিও ভোর হয়েছে। যাত্রীর বেশে বিদায়ী বছর যে পথ ধরে চলে গেছে, সে পথে আজ বৈশাখের খর রৌদ্রের তাপ। সেই রুদ্র রৌদ্র ও পথে ভীম ভৈরব গান গাইছে। সে-গানে মাধুর্য নেই, আছে ভয়-জাগানো সুর। কেন না প্রকৃতিতে তখন শুষ্কতা, আগুনের হল্কা, ধূসরতা, সবুজ উধাও, তাই ভয়াবহ ধু ধু বিরূপতা—রূপের অভাব।

এমন গ্রীষ্ম নিসর্গের বর্ণনায় কবি লিখেছেন—

"দূর হতে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।"

এই পঙ্‌ক্তি কয়টির ভাষা, কল্পনা ও চিত্রকল্পে রক্ষণশীল সমালোচক সুরেশচন্দ্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই বাচ্যোৎপ্রেক্ষায় উপমেয় পথ আর উপমান একতারার সাদৃশ্য বুঝতে না পেরে তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন নিকট-সাদৃশ্যের জন্য উপমেয় পথকে উপমান একতারা বলে প্রবল যে সংশয় দেখা দিচ্ছে, সেটা তাঁর কাছে দেখা দেয় নি। এজন্যই সংশয়বাচক 'যেন'র উল্লেখ তিনি অর্থহীন ভেবেছিলেন। আসলে সমস্যাটা পথের সঙ্গে একতারার সাদৃশ্য, গ্রীষ্মের পথের সুরের সঙ্গে একতারার তীব্র ঝঙ্কারের সাদৃশ্য—কোনোটাই 'মুখ যেন চন্দ্র' জাতীয় কবিতায় প্রচলিত উৎপ্রেক্ষার সাদৃশ্যের মতো নয়। প্রচলিত সাদৃশ্যগুলিকে কবিপ্রসিদ্ধি বলা হয়। এই কবিপ্রসিদ্ধির বাইরে নতুন উপমান প্রথমাবধিই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এসে যাচ্ছিল। 'বলাকা'র বছর বাইশ আগে 'চিত্রা'র 'সুখ' কবিতায় নদীর ঘাটমুখী গ্রামের আঁকাবাঁকা পথকে 'তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো' তিনি বলেছিলেন। এই উপমানও প্রথাসিদ্ধ ছিল না। সমাজপতি মহাশয়ের এ উপমায় নিশ্চয়ই সুখকর অভিজ্ঞতা হতো না।

যা হোক, 'বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘ তান সুরে' পঙ্‌ক্তিকে ঘিরে সুরেশচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক আপত্তি বিষয়ে আমরা অন্যত্র যা লিখেছি, তা এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 'পথ বাজার' মধ্যে বিশেষ করে এই কবিতার ভাষাভঙ্গিতে বাউলের একতারার মতো পথ বেজে চলার দৃশ্য ও গানকে কবি যেভাবে মিশিয়েছেন, এ দেশের লোকজীবনের ছবিকে যেভাবে ধরেছেন, তার কোনও কিছুই অনুভব না করে সুরেশচন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। জীবনের সুখ-দুঃখের সুর জীবনের পথে বাজতে শুনে রবীন্দ্রনাথ কি অপরাধ করেছিলেন, সুরেশচন্দ্রের সমালোচনা পড়ে একালের বাঙালি পাঠক আমরা বুঝতে পারি না। পথ দেখার জিনিস, তাই দৃশ্য। অন্যদিকে সুর কানে শুনি, তাই শ্রব্য। দৃষ্টি ও শ্রুতি, অন্য ভাষায় রূপ ও শব্দ অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণ—এই দুই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এখানে মিশে গেছে। একে ইংরেজিতে বলা হয় Synaesthesia (সিনেসথিসিয়া) বাংলায় বলতে পারি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ বা সমন্বয়।

বর্ষশেষের রাত্রি যাত্রীর বেশে যে পথ ধরে বিদায় নিল। সে-পথ আজ গ্রীষ্মে ধূলিধূসর। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে এসে যাকে যাত্রী বলছেন, সে ওই রাত্রি নয়। সে-যাত্রী বাংলার তরুণেরা। গ্রীষ্মের শুষ্ক পথে উত্তপ্ত বাতাসে বারবার ঘূর্ণি উঠছে। সে ঘূর্ণি বাতাস উড়িয়ে নেয় ধুলোবালি খড়কুটো ঝরাপাতা। এই ঘূর্ণাপাকে খড়কুটো পাতা যেভাবে মাটি থেকে পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করে উড়ছে, ঠিক সেভাবেই এই তরুণ যাত্রীদেরও প্রিয়জনের মমতার বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে হবে জীবনের রূঢ় রৌদ্রে দুঃসাহসের আনন্দে। যা কঠিন, তা-ই আজ তাদের সাধ্য। এই কঠিন কর্তব্যের পথে নতুনের সন্ধানে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের কল্যাণ কামনায় গৃহকোণে মঙ্গলশঙ্খ বাজবে না, সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ জ্বলবে না, প্রেয়সীর অশ্রুতে ছলছল চোখ তাদের বিদায় জানাবে না। তা হলে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে! গৃহকোণের নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম নিস্তরঙ্গ জীবন তাদের জন্য নয়। পথে হঠাৎ উঠবে কালবৈশাখীর ঝড়। ঝড়ের সোঁ সোঁ বাতাসে এদের জন্য আশীর্বাদ মন্ত্র ধ্বনিত হবে। তারপর গ্রীষ্ম শেষে যখন বর্ষা আসবে শ্রাবণের ঘন কালো রাত্রির আকাশ তখন ক্ষণে ক্ষণে বজ্রধ্বনিতে খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে। এই কালবৈশাখী ও শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ এই তরুণ দলকে যাত্রাপথে উৎসাহিত করবে। তারা এসব বাধাবিঘ্নে পিছিয়ে তো পড়বেই না, বরং আরও সে দীপকতানে দীপ্ত হবে। পথে পথে কণ্টক তাদের অভ্যর্থনা জানাবে।

তাদের পদতল আপদ বিপদে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হবে, রক্তাক্ত হবে। কিন্তু তারা জানে তাদের পদস্পর্শে কণ্টক ফুল হয়ে ফুটে উঠবে। তাদের জীবন নির্বিঘ্ন নয়; আপন পৌরুষগুণে, আত্মশক্তিতে অনমনীয় অবস্থায় বীতবিঘ্ন হয়ে উঠবে—বিঘ্ন বিগত হবে মায়াবিনী শক্তিতে নয়, চরিত্র মহিমায়। যে সাপ গর্তে লুকিয়ে আছে, তারা তাদের লুকোনো ফণা তুলে এই যাত্রীদের বরণ করবে। এদের উদ্দেশ্যে 'ছি ছি' রব উঠবে। কিন্তু দুর্জয় সংকল্পে রুদ্র এদের দোয়া দেবে অর্থাৎ আশীর্বাদ করবে, রুদ্রের প্রসাদ এদের উদ্দেশ্যে ঝরে পড়বে।

যাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ক্ষতি, তা-ই এদের পদপ্রান্তে নিবেদিত অমূল্য অদৃশ্য উপহার মনে হবে। ক্ষতিকে তোয়াক্কা না করে অমৃতের সন্ধানে এদের যাত্রা হবে অব্যাহত। এরা অমৃতের অধিকার চায়। যা মৃত নয়, মৃত্যুর কারণ নয়, তা-ই অমৃত। অমৃত মৃত্যু জয় করে। মরার আগে দু'বেলা মরার ভয় কাটিয়ে এরা অমৃত পেতে চায়। এদের জন্য সুখশান্তি ও বিশ্রাম আরাম নয়। বরং মৃত্যু ওদের দ্বারে ওৎ পেতে আছে। এই সবই ওদের জন্য নববর্ষের আশীর্বাদ আর রুদ্রের প্রসাদ। লক্ষ্মী এমন লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের বরদানের জন্য হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছেন না। এই ঘরছাড়া দিকহারাদের জন্য অলক্ষ্মীর বর অপেক্ষা করছে।

পুরোনো বছরের জীর্ণ ক্লান্তি কেটে গেল। প্রথম স্তবকের প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি অবিকল ফিরে আসে শেষ স্তবকের আরম্ভে। তারপর 'বলাকা'র প্রথম তিনটি কবিতায় পুনরাবৃত্ত যৌবনের প্রাণ প্রাচুর্যের অনুষঙ্গে যে মত্ততার ভাবের কথা 'সবুজের অভিযান' কবিতা পাঠের সময় বলেছি, সেই মদ আর মত্ততার চিত্রকল্প হঠাৎ এসে যায় : 'এসেছে নিষ্ঠুর/হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর/হোক রে মদের পাত্র চুর।' বাধার দরজা ভাঙুক নিষ্ঠুরের পদাঘাতে, দৈনন্দিনতায় স্তিমিত সুখের লৌহকপাট ভেঙে লোপাট হোক। তবে প্রথম তিনটি কবিতায় যৌবনের অফুরন্ত প্রাণে মত্ত ভাবটির সূত্রে মদের চিত্রকল্প এসেছিল—তার আলোচনা 'সবুজের অভিযান' কবিতা পাঠ প্রসঙ্গে আমরা করেছিলাম। কিন্তু এ কবিতায় গৃহসুখকে মদ বলেছেন, আর গৃহ মদের পাত্র। সে-পাত্র ভেঙে চুরে যাক্ অর্থাৎ ঘরোয়া জীবনের সুখ, আটপৌরে জীবনের নিশ্চয়তা—এসব দূর হোক্। প্রথম তিনটি কবিতায় মরণবিহারে মত্ত জীবনের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করতে গিয়ে যেভাবে মদের কথা বলেছেন, সে আকর্ষণ এখানে একইভাবে থাকলেও মদ্যপাত্র চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার ভাবনাটা অন্য অর্থে এসেছে। তরুণদলের উদ্দেশ্যে এ কবিতায় শেষ আহ্বান :—যে অলক্ষ্মীর হাতছানিতে এই লক্ষ্মী ছাড়ার দল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, যাকে এরা চেনে না, জানে না—তার প্রসারিত পানি ধরেই এদের জীবনপথে অগ্রসর হতে হবে। অলক্ষ্মী হাত বাড়িয়েছে। সে হাত ধরার মুহূর্তেই যৌবন স্পন্দিত হৃদয়ে অলক্ষ্মীর দীপ্ত বাণী ধ্বনিত হবে, উৎসাহে তারা জ্বলে উঠবে, ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে এই অদ্ভুত চঞ্চল যৌবনের দূতেরা জীবন পথে শ্রান্তি হীন যাত্রী হবে।

'বলাকা'র এই জাতীয় কবিতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও তার কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ যে যৌবনস্তোত্র রচনা করেছিলেন, সে স্তোত্র শিকল ভাঙার গান হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফিরতি হাবিলদার সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে গীত হতে শুনে আমাদের এই জড় রাজ্যে প্রাণের অগ্নিশিখা জ্বলেছিল তাই বলাকা'র যৌবন সূক্তরাজিকে নজরুলের আগমনী বলতে পারি।

॥ দুই ॥

কবিতার আলোচনা

নববর্ষের কবিতা সাধারণত আশা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের মত আশাবাদী কবির কবিতায় সেই সুরই আমরা আশা করি, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ'। অথচ এই কবিতায় নববর্ষেও কবি মধুর কোন বাণী শোনাতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে সর্বনাশের যে ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে বলাকা কাব্য গ্রন্থের প্রথম কটি কবিতার আবির্ভাব, 'বলাকা'-র শেষ কবিতায় সেই সর্বনাশ সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত। কারণ যে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় কবি অস্থির ছিলেন তখন তা উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছে। কিন্তু লক্ষণীয়, এই সর্বনাশকে কবি এড়িয়ে চলতে বলেন নি, বলেছেন বরণ করে নিতে। কবিতাটি সম্বন্ধে এটি প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, কবি নিজেই যে বলেছেন এই কবিতার মধ্যে বলাকার সব কথার পুনরুক্তি হয়েছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও কবিতাটির আলোচনা দরকার। কিন্তু তার পূর্বে কবিতাটির মমার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি যে মূল্যবান কথাগুলি বলেছেন সেগুলি স্মরণ রাখা দরকার বলে মনে করি।

হে যাত্রী, জাগো, পুরোনো বছরের রাত্রি ক্লান্ত জরাগ্রস্ত হয়ে বিদায় নিল। তোমার পিছনের সব ভার সব বাধা কেটে গেল। তপ্ত রৌদ্রের ভৈরব সুরে রুদ্র তোমাকে সম্মুখের পথে এগিয়ে যাবার জন্য ডাক দিয়েছেন। নিরুদ্দেশ-যাত্রী বৈরাগীর একতারার উদাস সুরে তাঁর ঘর-ছাড়ানোর ডাক বেজে উঠেছে। দূর হতে দূরে বিস্তৃত পথটাই যেন সেই একতারার দীর্ঘ তার। তাতে যেন শীর্ণ তীব্র (Shrill) দীর্ঘ তান বাজবে।

পথকে যেমন পথহারা মনে হয় এমন আর কিছুকে নয়। সে যেন কী একটা মহাবস্তু হারিয়ে গ্রামে-প্রান্তরে অরণ্যে-পর্বতে নদীতে-সাগরে সর্বত্রই তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একে বৈরাগী তার উপরে সে পথহারা। সে ক্রমাগত লোকের-পর-লোক যুগের-পর যুগ পার হয়ে চলেছে।

বৎসরের প্রথম আহ্বান পুষ্পিত বসন্তের মনোহর সুরে নয়, বৈরাগীর রুদ্র দীপ্ত তপ্ত তীব্র-জ্বলন্ত সুরে সেই আহ্বান ধ্বনিত। ওরে যাত্রী, পথের ধূলাতেই তোর জন্ম। সেই তোকে মানুষ করেছে। গতির আশ্রয় দিয়ে পথই তোকে ধরার অচলতার বন্ধন হতে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। চলার অঞ্চলটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পথই তোকে জড়িয়ে কোলে তুলে দিগন্ত পার হয়ে দিগন্তরে নিয়ে যাক। গৃহবদ্ধ বিষয়ী গৃহস্থলীর মঙ্গল শঙ্খ, সন্ধ্যাদীপ, প্রিয়ার অশ্রু এসব তো তোর জন্য নয়। এইসব বাঁধনে বদ্ধ হবার জন্য তুই আসিস নি। তুই যে অপারের যাত্রী।

কালবৈশাখীর আশীর্বাদ ও বর্ষা-রাত্রির বজ্রনাদে ভরা শঙ্খ নিয়ে তোর জন্যে পথে পথে রুদ্র প্রতীক্ষা করছেন। কোন্ বাঁকে যে তাঁর আশীর্বাদ সহ তিনি এসে দেখা দেবেন সে খবর এখনও কেউ জানে না। পথে পথে তোর জন্য প্রতীক্ষা করছে কণ্টকময় অভ্যর্থনা, গর্তে গর্তে বিষধর সর্পের গুপ্ত ফণা। নিন্দায় নিন্দায় সেই পথে তোর জয়শঙ্খ ধ্বনিত হবে। তীক্ষ্ণ কণ্টক, প্রাণান্তক আঘাত অজস্র নিন্দা এই সবেই তো তাঁর আশীর্বাদ, সুখ-

সম্পদে তো তাঁর আশীর্বাদ নয়। সুখ-সম্পদে উপহার চোখে দেখা যায় তার মূল্যও বোঝা যায় কিন্তু ক্ষতির মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ রূপে রুদ্র যে অদৃশ্য উপহার দেন তার মূল্য কে বুঝবে। অমৃতের অধিকার যদি চেয়ে থাকিস তবে মনে রাখিস তা সুখ নয়, শান্তি নয়, আরাম নয়। মৃত্যু এসে তোকে আঘাত করবে, কেউ দুয়ার খুলে তোকে ঘরের ঠাঁইটুকুও দেবে না, সব আশ্রয় করে তোকে হারাতে হবে—এই হল রুদ্রের প্রসাদ। তবু ভয় করিস নে। তুই যাত্রী, তোর আবার ভয় কিসের! যে দেবতা তোকে বর দেবেন তিনি নিজেই ঘরছাড়া লক্ষ্মী-ছাড়া, নিরুদ্দেশের যাত্রী। তোর অমৃতের অধিকার এই রকমই হবে না তো কী!

ওরে যাত্রী, পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি কেটে গেল। গেল তো গেল, বেশ হল। নিষ্ঠুর রুদ্র এসে সব নেশা যদি এখন চূর্ণ করে তো করুক। যে-সব নেশায় মত্ত করে বেঁধে রাখে সেইসব সুরার পাত্র আজ চূর্ণ হয়ে যাক। বন্ধন আজ মুক্ত হোক।

সেই অজানা অচেনা বন্ধুর হাত ধর। তিনি তোকে দুর্গম কঠিন পথ পার করে যুগ-যুগান্তরের বাধা পার করে নব নব লোকে নিয়ে যাবেন। তাঁর হাতে হাত রাখতে ভয় পাচ্ছিস? প্রেমের নব মিলনের প্রথম মুহূর্তে এমন হয়েই থাকে, তোর হৃদ্‌কম্পে যদি তাঁর দীপ্ত বাণী বেজে ওঠে থাকে তবে বাজুক, এই প্রসাদ অন্নপূর্ণার নয়।

রুদ্রের এই প্রসাদ। অমৃতের অধিকার যদি সত্যিই চেয়ে থাকিস তবে এইসব ক্ষতি-নিন্দা-আঘাত-অপমান মাথায় করে চলতে হবে। ওরে যাত্রী, কিসের ভয়! পুরাতন রাত্রি ক্ষয় হয়ে এসেছে। নবজীবনের অরুণালোক যে পূর্বকাশে দেখা দেবে তার সূচনা আমার প্রাণের মধ্যে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যার মধ্যেই আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাই। সমস্ত কবিতাটির ব্যঞ্জনা বিষাদময় হলেও কবিতার শেষ পংক্তি এবং কবির ব্যাখ্যা প্রমাণ করে কবি নৈরাশ্যবাদী নন। সমগ্র মানবজাতি তখন যে তীব্র সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছিল তাতে গভীর আশাবাদী কবির মনেও আশ্বাস জাগিয়ে রাখা কঠিন। কিন্তু লক্ষণীয়, কবি সংকটকে স্বীকার করে নিলেও নৈরাশ্যকে স্বীকার করে নেন নি, তিনি তাঁর সংগীতে এই কথাই বলেছেন—

"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

এখানেও আমরা দেখি, বিপদকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু তাকে বলেছেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ঈশ্বরের যেমন মধুর রূপ আছে. তেমনি আছে তাঁর রুদ্র মূর্তি। পালন কর্তার ভূমিকা যেমন ঈশ্বর পালন করেন, তেমনই প্রয়োজন জাগে কখনও ধ্বংস কার্যের। সুতরাং যখন তিনি সেই প্রয়োজনে অনুভব করেছেন তাকেও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু ধ্বংসের এই বিষণ্ণতা থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য ধ্বংসকেও তিনি লীলা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কবিতার সর্বত্র আমরা কবির এই মানসিকতা দেখতে পাই। সেই জন্যই কালবৈশাখীর প্রলয়কে তিনি বলেন আশীর্বাদ। পথে বিভিন্ন বিপদ সম্বন্ধে তাঁর অভিব্যক্তি—

"পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা,
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ—"

আসলে, এসব কিছুকেই কবি মনে করেন ধ্বংসের দেবতা রুদ্রে প্রসাদ। কষ্টকর অধ্যায়কে এভাবে আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানে পরিণত করবার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও দেখিয়েছেন। রক্তকরবী নাটকে যক্ষপুরীর স্বর্ণ খোদাইয়ের কাছে মানবতা যখন নিষ্পেষিত, তখন মানুষের আনন্দ-মূর্তি রঞ্জন সেখানে আসে। সেই একই খোদাই সেখানে চলতে থাকে কিন্তু তার কলুষতা আর থাকে না, কারণ সেখানে তখন শুরু হয় খোদাই-নৃত্য।

এ ছাড়াও কবি এই কবিতায় অমৃত-তত্ত্ব যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতেও আমরা দেখতে পাই দুঃখ এখানে সাধনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অমৃতের অধিকার অর্জন করতে হলে যে অশান্তির আঘাত এবং মৃত্যুর প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয় অমৃত-ত্ব অর্জনের পক্ষে তাও অনিবার্য। সেই কারণেই কবি অন্যত্র বলেছেন—'মৃত্যু অমৃত করে দান।'

কবি যে বলেছেন, বলাকা কাব্যগ্রন্থের সমস্ত বক্তব্যের পুনরুক্তি আছে এই কবিতায়, সে কথাও অনেকাংশে সত্য বলে আমাদের মনে হয়। বক্তব্যগুলি ক্রমান্বয়ে এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে!

প্রথমত, চরৈবেতি মন্ত্র বলাকার প্রধান সুর! যে অকারণ অবারণ চলার কথা রবীন্দ্রনাথ বলাকার অনেক কবিতায় বলেছেন, 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোন্‌খানে' নামক যে পংক্তি প্রায় 'বলাকা'-র প্রতিনিধিত্ব করেছে—সেই পথ চলার মন্ত্রই উচ্চারিত এই কবিতায়। নতুন বর্ষশেষে পথিককে তিনি থামতে বলেন নি, পথকেই আপন করে নিতে বলেছেন। স্পষ্ট করে বলেছেন—

'তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান'

অথবা—

'ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী;'

এই পথ চলার মন্ত্রতে সমগ্র বলাকার প্রতিধ্বনী আমরা এখানে শুনতে পাই। দ্বিতীয়ত, ঘরের আরাম যে এখন উপভোগ করার সময় নয়---সন্ধ্যার দীপালোক এবং প্রেয়সীর অশ্রুচোখ উপেক্ষা করে রুদ্রের আহ্বানে যে এখন সাড়া দিতে হবে. একথা রবীন্দ্রনাথ বলাকার অনেক কবিতায় বলেছেন। প্রসঙ্গত, ৪-সংখ্যক কবিতাটির কথা আমাদের মনে পড়বেই।

তৃতীয়ত, মানব সভ্যতার যে সংকটময় এবং ধ্বংসাত্মক রূপের কথা কবি বলাকার বিভিন্ন কবিতায় বলেছেন এখানেও তার অনুরূপ চিত্রই আমরা পাই। কবি জানেন, নতুন বৎসরে কোন শান্তির আশ্বাস তিনি মানুষকে শোনাতে পারবেন না, কারণ নাগিনীরা যখন দিকে দিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছড়াচ্ছে, শান্তির ললিতবাণী তখন ব্যর্থ পরিহাসের মতই শোনাবে। তাই তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেছেন, এখন পদে পদে বিপদ—বহু গুপ্ত সর্পের গূঢ় ফণা এখন উদ্যত হয়ে আছে মানবত্বের বুকে ছোবল হানবার জন্য।

এতদ্‌সত্ত্বেও 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে নৈরাশ্যের সুর ফোটেনি। ফুটেছে আশার বাণী। কারণ এত সব বিপদ দুর্বিপাককে তিনি মনে করতে পারেন, অনাগত সুদিনের জন্য দুঃখ সাধনা। সেকথা তিনি বলাকার একটি কবিতায় স্পষ্ট করেই বলেছেন—'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।' এখানে সমস্ত কবিতায় রাত্রির তপস্যা মূর্তিই প্রতিফলিত। একেই আমরা বলাকা কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে এর সাদৃশ্যের চতুর্থ দিক বলতে পারি।

পঞ্চমত, অজানাকে বরণ করে নেবার যে শপথ তিনি বলাকার একেবারে সূচনায়

অর্থাৎ প্রথম কবিতায় গ্রহণ করতে বলেছেন সেই বক্তব্যই ফিরে এসেছে শেষ কবিতায়। কবি বলেছেন—

'নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি—'

এতগুলি বক্তব্যের এই নিপুণ পুনরাবর্তনে কবিতাটি 'বলাকা'-র যোগ্য উপসংহার রচনা করেছে।

॥ তিন ॥

কবিতার সারসংক্ষেপ

(প্রথম স্তবক)

কবিতাটি বর্তমানে যেভাবে প্রকাশিত তাতে এর চারটি স্তবক আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্যাখ্যার সময় এটি পাঁচ স্তবক সমন্বিত একটি কবিতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা প্রকাশিত পাঠ হিসাবে চার স্তবকেরই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রকাশ করবো।

পুরাতন বছরের ক্লান্ত রাত্রি এখন অবসিত, কিন্তু তব যাত্রী এখনও বিশ্রামের কোন অবকাশ পাবে না। কারণ পুরাতন বর্ষশেষে তার পথপরিক্রমা শেষ হয়ে যায় নি, নতুন করে আবার শুরু করে আবার শুরু হয়েছে। রুদ্রের ভৈরব তেজ এখন সেই পথে দীপ্তি ছড়াচ্ছে এবং পথচলার আমন্ত্রণ শোনা যায় সেই দীপ্ত তেজে। বৈরাগীর একতারা যেমন মানুষকে ঘরের বার করবার সুর শোনায়, সামনের এই দীর্ঘ পথ যেন শব্দবিহীন সুরে মানুষকে ঘরছাড়া করবার বাণীই ব্যঞ্জিত করছে।

(দ্বিতীয় স্তবক)

যাত্রীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন পথের ধূসর ধুলাই তার প্রকৃত ধাত্রী। নিত্যকালের চলার আঁচল দিয়ে পথই তাকে আপন করে সরিয়ে নিয়েছে পৃথিবীর স্থির ও শান্তির জীবন থেকে। যে সংকটময় কালের মধ্যে এখন মানুষের যাত্রা তাতে কোমল মানবিক বোধ নিয়ে কালক্ষেপের সময় এখন তার নেই। প্রেয়সীর অভিমান, ঘরের শঙ্খধ্বনি ও শুভ্র দীপালোক এখন আর তার জন্য নয়। যে রুদ্রের আহ্বানে এখন পথিকের পদযাত্রা সেই রুদ্রের আশীর্বাদ হিসাবে পথে এখন অপেক্ষা করছে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, শ্রাবণরাত্রির বজ্রপতন, অকস্মাৎ কণ্টক এবং গুপ্ত সর্পের ছোবল। এই আকস্মিক বিপদ এবং সর্বদা নিন্দাবাদই হবে তার এখনকার সঞ্চয়। কিন্তু তবু তাকে যাত্রা বন্ধ করলে চলবে না।

(তৃতীয় স্তবক)

জীবনপথের যাত্রীদের এখন শুধু ক্ষতিই হবে পদে পদে। যে অমৃত মানুষ আকাঙ্ক্ষা করেছে তা সুখ নয়, বিশ্রাম নয়, শান্তি বা আরামও নয়। নববৎসর তার জন্য রুদ্রের প্রসাদধন্য যে আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে সে হচ্ছে চারিদিকে কেবল নিষেধের বেড়াজাল। কিন্তু কবি যাত্রীকে উৎসাহিত করে বলেছেন, যাত্রীর এখন প্রধান বরদাত্রী ঘরছাড়া অলক্ষ্মী, সুতরাং ভয় নেই।

(চতুর্থ স্তবক)

পুরাতন বৎসরের শেষে মধুর আসে নি, এসেছে নিষ্ঠুর। সুতরাং ঘরের বন্ধ দ্বার ভেঙে, ঘরের মায়া ভুলে পথে বেরিয়ে আসতে হবে। এখন সর্বনাশের পথে যে আহ্বান জানাচ্ছে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু কবি ভরসা দিয়ে বলছেন, যাত্রী যেন নির্ভয়ে তাঁর হাত ধরে। তাঁর দীপ্ত বাণী যেন তাদের হৃৎকম্পনে জেগে ওঠে। পুরাতন রাত্রি কেটে গিয়েছে, এবার কাটুক রাত্রির তমসা।

॥ চার ॥

শব্দার্থ ও টীকা

(প্রথম স্তবক)

যাত্রী—যাত্রী বলতে কবি বুঝিয়েছেন জীবনপথের যাত্রীকে। তা ছাড়াও যাত্রী বলবার আরেকটি কারণ, 'বলাকা'-য় যে গতিতত্ত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন সেখানে অবিরাম চলাই প্রধান কথা। সুতরাং মানুষমাত্রই সেখানে যাত্রী। ৩৭-সংখ্যক বিখ্যাত কবিতায় তিনি লিখেছেন—

'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
'বন্দরের কাল হল শেষ।'

তপ্ত রৌদ্র—এটিও আলংকারিক প্রয়োগ। অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যে যাত্রা করতে হচ্ছে সে কথা বোঝাবার জন্যই এ কথা বলা হয়েছে। **রুদ্র**—ঋগ্‌বেদে অগ্নিকেই বলা হয়েছে রুদ্র। রুদ্র বলতে বজ্র বা বজ্রধারী মেঘরূপ দেবতাও বোঝানো হয়। বেদে রুদ্রের যে বিবিধ গুণের উল্লেখ দেখা যায় সেগুলি জানা দরকার। রুদ্রের বর্ণ পিঙ্গল, মাথায় জটা, সূর্যের মত তিনি দীপ্তিশালী। হাতে তাঁর বজ্র থাকে, ধনুর্বাণ থাকে। তিনি ধ্বংসের দেবতা। কণ্ঠ তাঁর নীলবর্ণ, দেহের রং লাল। রুদ্র ক্রুদ্ধ হলে বজ্রাঘাতে মানুষ ও পশু বধ করেন বটে, প্রসন্ন হলে বিপদ থেকে ত্রাণও করেন। ঋগ্‌বেদে এ কথাও বলা হয়েছে যে, রুদ্র একাধারে রুদ্র (ভয়ানক) ও শিব (মঙ্গলময়) **ভৈরব**—মহাদেবের ভয়ংকর মূর্তিকে বলা হয় ভৈরব মূর্তি এই ভীষণতার আটটি অঙ্গ আছে—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধন, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ ও সংহার। **বাজে পথ....সুরে**—পথ কেমন করে সুর ধ্বনিত করতে পারে, রবীন্দ্রনাথের স্বয়ংকৃত ব্যাখ্যায় তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। **যেন পথহারা...একতারা**—পথকে পথহারা বলার মধ্যে বৈপরীত্য জনিত এক ধরনের আলংকারিক ব্যঞ্জনা আছে যাকে বলা হয় বিরোধাভাস। কবি বলতে চান, বৈরাগী যেমন পথে নেমেই পথ হারাবার আহ্বান ধ্বনিত করে যায় একতারায় পথ নিজেই যেন অন্তহীন চলার বাণী জাগিয়ে তোলে বৈরাগীর সেই একতারার মত।

(দ্বিতীয় স্তবক)

ধূসর পথের...তোর ধাত্রী—মানুষের ধাত্রী বা পালয়িত্রীর সম্মান এখানে কবি আরোপ করেছেন পথের ধূসর ধূলার ওপর। এর ব্যাখ্যা দুভাবে হতে পারে। প্রথমত, ঈশ্বরের পৃথিবীতে পথের আবরিত মুক্তাঞ্চলই মানুষের প্রকৃত পালন-কর্তৃ, গৃহ এবং গৃহসুখ গড়ে তোলে মানুষ নিজে। পথের ধূলাই মানুষের প্রথম এবং অন্তিম আশ্রয়। দ্বিতীয়ত, যে সংকটের মধ্যে দিয়ে মানবসভ্যতা সেই সময় অগ্রসর হচ্ছিল তাতে গৃহের বদ্ধতা নয়, পথের সচলতাই মানুষের প্রকৃত আশ্রয় হওয়া উচিত। সেই জন্যও পথকে কবি ধাত্রী বলে থাকতে পারেন। **চলার অঞ্চলে**—পথ যে চলে, সেই সচলতাই তার স্নেহের আঁচল। **ঘূর্ণাপাকে**—পথ সোজা চলে না প্রায়ই, তার গতি পাক খাওয়া। একেই বলা হয়েছে ঘূর্ণাপাক। **বক্ষেতে আবরি**—বুকে আবৃত করে বা জড়িয়ে ধরে। এখানে একটি চমৎকার চিত্রকল্প রয়েছে। শিশুকে মা হাতে জড়িয়ে কোলে তুলে নেন, এখানে পথকে মানুষের ধাত্রী বলা হয়েছে বলে কবি মনে করছেন যেন পাকখাওয়া পথ হাতের মত জড়িয়ে কোলে তুলে নেয় মানুষকে। **ধরার বন্ধন**—পথ অবশ্য ধরণীর বাইরে নয়, কিন্তু কবি বলতে চান গৃহ ও গৃহস্থালীরূপ পৃথিবীর যে বন্ধন তার কথা। **হরি**—হরণ করে, সরিয়ে। **মঙ্গলশঙ্খ**—শঙ্খ কবির কাছে বিধাতার মহাআহ্বানের প্রতীক হিসাবে গৃহীত হয়, সেই কথা আমরা বলাকা-র ৪-সংখ্যক কবিতা থেকে জানতে পারি। এখানে তাই মঙ্গলশঙ্খ বলে তিনি গৃহের শান্তি বোঝাতে চেয়েছেন। **প্রেয়সীর অশ্রুচোখ**—এ কথা বলতে প্রেয়সীর বেদনা বোঝানো হয় নি, তার অভিমানের প্রতিই কবি ইঙ্গিত করেছেন। প্রেয়সীর সঙ্গে মান-অভিমানের পালা এখন সাঙ্গ করতে হবে, এই কবির বক্তব্য। **কালবৈশাখীর আশীর্বাদ**—কালবৈশাখীর ভীষণ রূপ আমাদের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে, তাকে আশীর্বাদরূপে কল্পনা বিশেষ কোন কবি করেন না। এখন দুর্যোগের দেবতা জেগেছেন বলে এগুলিকেই তাঁর আশীর্বাদ মনে করা হয়েছে। **বজ্রনাদ**—বাজ পড়ার শব্দ। **কন্টকের অভ্যর্থনা**—কন্টক অভ্যর্থনা করে না, বিক্ষত করে। এখানেও সেই একই কথা, কবি অমঙ্গলকেই বরণ করে নিয়েছেন। **গুপ্তসর্প**—যে সাপ লুকিয়ে আছে। আভিধানিক অর্থে নয়, সংগুপ্ত বিপদ বোঝাতেই কবি এই শব্দ প্রয়োগ করেছেন। **রুদ্রের প্রসাদ**—স্পষ্ট করেই কবি এখানে বলেছেন, যে দেবতা এখন জেগে উঠেছেন তিনি ধ্বংসের দেবতা সুতরাং এই বিপন্ন অমঙ্গলই তাঁর প্রসাদ বলে আমাদের মেনে নিতে হবে।

(তৃতীয় স্তবক)

অমূল্য অদৃশ্য উপহার—ক্ষতি কেমন করে উপহার আনতে পারে এবং তা কেমন করে অমূল্য হতে পারে, সাধারণ বুদ্ধিতে তা বোঝা না গেলেও কবি বলতে চান এই ক্ষতি একদিন পরম লাভের দ্বারা উম্মোচন করে দেবে। সুতরাং সেদিন তাকে নিশ্চয়ই অমূল্য বলে বোঝা যাবে। **অমৃত**—সুধা বা পীযূষ। এটি পান করেই দেবতারা অমরত্ব লাভ করেন। অমৃতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন আখ্যান পাওয়া যায়। মহাভারতে পাই, অসুরদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে দেবতারা তাঁদের শক্তি হারিয়ে ফেলেন। সেইজন্য

তাঁরা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে শক্তি ও অমরত্ব প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু উপদেশ দেন যে, সমুদ্রমন্থন করে এই অমৃত সংগ্রহ কর। বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করে অমৃতমন্থনে সাহায্য করেন। মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকী সর্পকে মন্থন রজ্জুরূপে ব্যবহার করে সমুদ্রগর্ভ থেকে অমৃত ওঠে। **দ্বারে দ্বারে পাবি মানা**—এর সঙ্গে তুলনায় 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান'-এর এই পংক্তি ঃ 'তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।' **রুদ্রের প্রসাদ**—দেবতা হিসাবে রুদ্র ভয়ংকর বলে তাঁর প্রসাদও এরকম ভীতিপ্রদ। **অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী**—তুলনীয় ঃ 'লক্ষ্মীরে হারাই যদি অলক্ষ্মীরে পাবো।'

(চতুর্থ স্তবক)

নিষ্ঠুর—রুদ্র দেবতা তাঁর বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক দিক নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর রূপ কঠোর, নির্মম—তাই তাঁকে বলা হয়েছে নিষ্ঠুর। **দ্বারের বন্ধ**—ঘরের প্রশান্ত আরামের কথাই বলা হয়েছে। **হোক রে মদের পাত্র চুর**—এখানে মদ এবং নেশা সমার্থক হয়ে উঠেছে, মদের পাত্র বলতে কবি বুঝিয়েছেন নেশার পাত্র। ইতিপূর্বে ঘরের প্রসঙ্গে কবি যে কথাগুলি বলেছেন তাকেই বলা যায় ঘরের নেশা। এর মধ্যে আছে ঘরের মঙ্গলশঙ্খ, সন্ধ্যার দীপালোক এবং প্রেয়সীর অশ্রুচোখ—। **পাণি**—হাত। **তার দীপ্ত বাণী**—তার বলতে নিশ্চয়ই এখানে রুদ্র দেবতার এবং তাঁর বাণী যখন দীপ্ত তখন সে বাণীর মর্মকথা এখানে না বললেও আমরা বুঝতে পারি সে বাণী বিষণ্ণতার নয়, আশ্বাসের। সেই জন্যই কবি অন্তিম পংক্তিগুলিতে বলতে পেরেছেন পুরাতন রাত্রী কেটে গিয়েছে, ভালই হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

বিষয়মুখী সংক্ষিপ্ত

॥ এক ॥

৪৫-সংখ্যক কবিতায় নব বৎসরে কিছু ভয়ঙ্করও ধ্বংসাত্মক পরিণামের কথাই কবি বলেছেন, কিন্তু কবিতার কোথাও তুমি কোন আশার সুর শুনতে পাও কি?

৪৫-সংখ্যক কবিতায় প্রায় সর্বত্রই কিছু ভয়ঙ্কর পরিণামকে সাদরে বরণ করে নেবার কথাই কবি বলেছেন। কিন্তু কবিতার একেবারে শেষের দিকে অস্পষ্টভাবে আমরা আশার সুর শুনতে পাই। সেখানে কবি অচেনাকে ভয় করতে নিষেধ করেছেন। সৃষ্টির দেবতাকে আমরা এতদিন আমরা পেয়েছি, তাঁর নির্দেশেই চলেছি। এখন যে ধ্বংসের দেবতা এসেছেন তাঁকে আমরা চিনি না, তবু কবি তাঁর হাত ধরতে বলেছেন; অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ এবং তাঁর অভিলাষকেই বরণ করে নিতে বলেছেন। তাঁর দীপ্ত বাণীই যেন আমাদের হৃৎকম্পনে বেজে ওঠে, এই অনুরোধ এবং প্রত্যাশাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। কবিতার প্রথম পংক্তিতে পুরাতন বৎসরের রাত্রিকে জীর্ণ ও ক্লান্ত বলায় কবির যে নৈরাশ্য প্রকাশিত হয়েছিল, কবিতার শেষ পংক্তিতে কখনোই সেই নৈরাশ্য নেই, কারণ রাত্রিকে এখন তিনি সেরকম কোন অসুন্দর বিশেষণে অভিষিক্ত করেন নি—শুধু পুরাতন রাত্রি কেটে যাবার কথাই বলেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর সেই ভঙ্গি আমাদের মনে আশা জাগিয়ে তোলে যে ভঙ্গিতে তিনি বলেছেন

'গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।' অর্থাৎ যে রাত্রি কেটে গিয়েছে তা যাক, তার জন্য ভেবে বৃথা কালক্ষেপ করে কোন লাভ নেই—এখন সামনে যা আসছে সাহসভরে তাকেই বরণ করে নিতে হবে।

॥ দুই ॥

কবি এই কবিতায় পাঠকদের যাত্রী বলেছেন কেন? তাদের কি এখনও চলতে হবে? কেন? পথের কি কি প্রশস্তি এখানে করা হয়েছে?

মানুষকে সাধারণভাবে যাত্রী বলা হয় জীবনকে এক পথ পরিক্রমা মনে করে। কিন্তু এখানে কবি জীবন বলতে ঘরের আরাম এবং জীবন সংগ্রাম দুই-ই বোঝেন। মানুষ সেই সময়ে এক সংকটময় অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, সেই জন্যই কবি তাদের বলেছেন যাত্রী।

তাদের যে এখনও চলতে হবে সে কথা বোঝা যায় কবির এই কথায়,—'তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান।' অর্থাৎ পথের আহ্বান তাদের এখনও শেষ হয় নি, পথে তাদের এখনও হাঁটতে হবে।

মানব সভ্যতার দুঃসময় এখনও অতিক্রান্ত হয় নি বলেই এই পথ পরিক্রমা অব্যাহত থাকবে, এটাই সম্ভবত কবির অভিমত।

প্রথম স্তবকে পথ সম্বন্ধে কবি বলেছেন, পথ যেন পথহারা বৈরাগীর একতারা। 'শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতার সুরে' যেন পথের গান শোনা যাচ্ছে। আসলে বৈরাগীর একতারায় যাকে পথে নামার আমন্ত্রণ, পথকে তাই পথ হারাবার আমন্ত্রণ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন কবি। অথবা পথই যেন একতারার একটি মাত্র তার, এ কথাও মনে করা যেতে পারে।

এরপর দ্বিতীয় স্তবকে পথের ধূলাকে মানবের ধাত্রী বলেছেন কবি। কারণ পথের ধূলাতেই মানুষের জন্ম এবং পথের ধূলাতেই মানুষের লয়। একটি সুন্দর রূপক প্রয়োগ করে তিনি বলেছেন, পথ যে এঁকে-বেঁকে চলে সেই চক্রগতিই পথ নামক ধাত্রীর আঁচল এবং এই আঁচলের ঘূর্ণাপাকে বুকের কাছে মানুষকে স্নেহের আশ্রয় দান করেই পথ তার ধাত্রীর ভূমিকা পালন করে।

॥ তিন ॥

"এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"-

—নব বৎসরের আশীর্বাদ এবং রুদ্রের প্রসাদ কি আলাদা? রুদ্রের প্রসাদ বলতে কিসের উল্লেখ করেছেন কবি? এদের কি প্রসাদ বলে মনে হয়?

না, রুদ্রের প্রসাদ এবং নব বৎসরের আশীর্বাদ আলাদা নয়। কবি রুদ্রের প্রসাদ হিসাবে পূর্বে যারা উল্লেখ করেছেন তাদেরই অভিহিত করেছেন নব বৎসরের আশীর্বাদ রূপে।

রুদ্রের প্রসাদ বলতে কবি কিছু অবাঞ্ছিত এবং ভীতিপ্রদ বস্তুর উল্লেখ করেছেন। যে পথে মানুষ এই নতুন বছরে হাঁটবে সে পথে অপেক্ষা করে আছে দুরন্ত কালবৈশাখী, কবি

যদিও তাকে বলেন আশীর্বাদ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে শ্রাবণ রাত্রির ভয়ংকর বজ্রপাত। যে পথ মানুষ পরিক্রমণ করবে তা কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সেখানে পদে পদে কন্টকের ভয়। নিত্য নতুন বিপদের গুপ্তসর্প তাদের গূঢ় ফণা বিস্তার করে আছে মানুষকে দংশন করবার জন্য। কোন কাজেই এই কোন প্রশংসা পাওয়া যাবে না, প্রতি কাজেই ভাগ্যে জুটবে নিন্দা—যদিও এই নিন্দাকেই কবি গ্রহণ করেন বিজয়শঙ্খের রোল হিসাবে। এখন কোন বিষয়েই লাভের কোন সম্ভাবনা নেই, সর্বত্রই বিভিন্ন ক্ষতিকে বরণ করে নিতে হবে। এবং কোথাও শান্তি নেই, আরাম নেই, বিশ্রাম নেই—মৃত্যুর করাল ছায়া সর্বত্রই দোদুল্যমান দিকে দিকে শুধু নিরুৎসাহ নিষেধের সমারোহ। এইগুলিকেই কবি রুদ্রের প্রসাদ হিসাবে অভিহিত করেছেন।

দেবতার প্রসাদ বলতে আমরা অতি মঙ্গলপ্রদ উৎকৃষ্ট বস্তুই বুঝে থাকি। যেসব ভয়ঙ্কর বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে আপাত দৃষ্টিতে তাকে দেবতার প্রসাদ মনে হয় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে দেবতার কথা বলা হয়েছে তিনি রুদ্র—ধ্বংসের দেবতা; সুতরাং তাঁর প্রসাদ তো ধ্বংসাত্মক এবং ভীতিপ্রদ হবেই।

॥ চার ॥

"হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পাত্র চুর।"

—দ্বারের বন্ধ দুর হওয়ার অর্থ কি? মদের পাত্র চুর হওয়া বলতেই বা কবি কি বুঝিয়েছেন? এর পরিবর্তে কাকে কবি ইঙ্গিত বলে মনে করেন?

দ্বারের বন্ধ দূর হওয়ার অর্থ বন্ধ দ্বারের মধ্যে আটকে না থাকা। ঘরের প্রশান্ত আরামের দিন যে এখন নয় সে কথা কবি এর আগেই বলেছেন। তিনি পথে সংকটের ও সংগ্রামের জীবন যাপন করার কথা বলেছেন বলেই দ্বার বন্ধ করে বসে না থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন।

মদ কথাটি এখানে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নি, বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই নেশা অর্থে মদ কথাটি ব্যবহার করেন, এখানেও তাই করেছেন। মানুষ স্বভাবতই তার ঘরের জীবন বেশি কাম্য বলে মনে করে—স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত সংসারের আকর্ষণ তার কাছে মায়াময়। একেই কবি এখানে নেশা বা মদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে সংসারের নেশার প্রকৃতি বোঝাতে তিনি কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখও করেছেন, এর মধ্যে আছে ঘরের মঙ্গলশঙ্খ যার মধ্যে সেই শঙ্খধৃত দুটি কোমল হস্তের ব্যঞ্জনা আছে উহ্য। সন্ধ্যার দীপালোকের কথাও কবি বলেছেন, এবং সেই দৃশ্যও আমরা এক অবগুণ্ঠনবতীসহই আমরা পেয়ে যাই। কবি স্পষ্ট করে আরো বলেছেন প্রেয়সীর অশ্রুসিক্ত চোখের কথা। এইসব চিহ্ন ঘটনা ও ব্যক্তি দ্বারা বিধৃত গৃহের জীবন মদের মত যে নেশা জাগায় সেই মদের পাত্র কবি চুরমার করে ফেলতে বলেছেন।

ঘরের পরিবর্তে কবি পথকেই এখন আকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করেন, কারণ যে সংকটময় পরিস্থিতি মানবজীবনের পঙ্কিল করে তুলেছে তা থেকে উদ্ধার পেতে গেলে গৃহের আরাম ত্যাগ করে মানুষকে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে।

॥ ছয় ॥

॥ এক ॥

৪৫-সংখ্যক কবিতার মূল বক্তব্য

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটি যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন এর নাম ছিল 'নববর্ষের আশীর্বাদ'। কিন্তু কবিতাটির বিষয়বস্তু এবং কবির মানসিকতা বিচার করলে এটিকে আশীর্বাদ বলা শক্ত, কারণ মানবসভ্যতার অতি সংকটময় কালে কবি জীবনের দুর্যোগময় রূপটিই দেখেছেন এবং আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপের কথাই শুনিয়েছেন।

মানুষকে তিনি জীবনপথের যাত্রী হিসাবে কল্পনা করে নিয়ে বলেছেন, পুরাতন বৎসরের কিছু অশুভ ও অমঙ্গলচিহ্নের দ্বারা জীর্ণ সময় কেটে গেলেও এখনই দুর্যোগ মোচন হয়ে যায় নি—সংকট থেকে উত্তীর্ণ হতে গেলে মানুষকে এখনও বিপজ্জনক পথ পরিক্রমা অব্যাহত রাখতে হবে। মানুষের জীবন যিনি পরিচালিত করেন তাঁর উদাত্ত আহ্বান এখন শোনা যাচ্ছে—মানুষকে সংকটাকীর্ণ পথে এসে দাঁড়াতে হবে। পুরাতন বৎসরের অবসান ঘটলেও পুবাতন সংগ্রামের অবসান হয় নি।

জীবনপথের যাত্রীকে কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ঘরের চেয়ে পথই তার আপনার—পথ তার ধাত্রীস্বরূপা; মায়াময় সংসারের যে বন্ধন সে বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে পথ, পথ তার বক্রতায় পাকে পাকে জড়িয়ে ধবে যেন কোলে তুলে নেয় পথিককে। বর্তমান সংকটে সেই পথকেই করে নিতে হবে আপনার। ঘর-সংসারের কোমল মাধুর্য দিয়ে অভিভূত হবার সময় এখন নেই। তাই এখন ভুলে যেতে হবে মঙ্গলশঙ্খের মাধুর্য, সন্ধ্যাদীপের পবিত্রতা। প্রিয়তমার অভিমানক্ষুব্ধ অশ্রুকাতর চোখের আহ্বান। দ্বারের বন্ধ এখন নির্মম হাতে চূর্ণ করতে হবে, সংসারের নেশা ভুলে যেতে হবে এই সময়ের জন্য।

ঘরের প্রশান্ত আরাম ছেড়ে পথে নামলেই যে নিরাপদ জীবন পাওয়া যাবে, একথা কবি বলেন নি বরং তিনি এমন কথাই বলেছেন যে পথ এখন কুসুম-বিস্তীর্ণ নয়, পথে এখন শ্রাবণরাত্রির বজ্র হুঙ্কার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড মত্ততা। পদে পদে কণ্টক এখন বিক্ষত করে দেবে, অজানা গুপ্ত সর্প তার উদ্যত ফণা নিয়ে এখন অপেক্ষা করে আছে ছোবল হানবার। বলা বাহুল্য, এই সমস্তই কবি বিপদের ভয়ঙ্করতা বোঝাবার জন্য রূপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কবি বলেছেন, যে সংকট এখন সমস্ত মানবজাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হলেই যে মানুষ তাকে অভ্যর্থনা করে নেবে এমন নয়। মানুষের নীচতায় মানুষের মন এখন এমন নীচুতে নেমে এসেছে যে মানুষের কল্যাণের জন্য কেউ এগিয়ে এলেও মানুষ তার নিন্দাই করবে, উপকারের পরিবর্তে মানুষের অপকারই হবে তার প্রাপ্য। কিন্তু কবি এতে মানুষকে হতোদ্যম হতে বারণ করেছেন, তিনি তাদের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, এই সংকটময় মুহূর্তে মানুষের জীবনে এই হল স্বাভাবিক প্রাপ্তি। এখন রুদ্র জেগেছেন। মানুষ এগুলিকে যেন রুদ্রের প্রসাদ হিসাবে এবং নববর্ষের আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। কবির আশ্বাস এই যে, এর ফলেই মানুষ অমৃতের অধিকার পাবে। অমৃত সংগ্রহ করতে গেলে যেমন হলাহল সম্পূর্ণ বর্জন করা যায় না, তেমনি কেবল সুখ আরাম এবং

বিশ্রামের দ্বারা অমৃতময় মধুর মানবজীবন পাওয়া যায় না—তার জন্য দুঃখের সাধনা করতে হয়। ভবিষ্যৎ সুখী মানবজীবনের জন্য এই কঠিন পরীক্ষায় তাদের উত্তীর্ণ হতেই হবে।

কবিতাটি প্রথম থেকে নৈরাশ্যের সুরে বাঁধা মনে হলেও কবি যে হতোদ্যম নন তার প্রমাণ কবিতার মধ্যভাগে ও শেষাংশে আছে। তৃতীয় স্তবকে তিনি যে অমৃতের কথা বলেছেন তাতে এর প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে নিদারুণ বিপদকেও যেভাবে তিনি চিত্রিত করেছেন তার মধ্যে এ প্রমাণ আছে। এ ছাড়াও সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে কবিতার শেষে, যেখানে তিনি অজানা দেবতাকে অনুসরণ করতে বলেছেন, অজানা সংকটে এগিয়ে যেতে বলেছেন পুরাতন রাতের গ্লানি কেটে যাক, এই আশা ব্যক্ত করেই তিনি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টিতে সমাপ্তিরেখা টেনেছেন।

॥ দুই ॥

"বলাকা কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় মনে হয় যেন কবি নৈরাশ্যপীড়িত কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি আমাদের আশার সুরই শুনিয়েছেন"—মন্তব্যটি বিচার কর।

অথবা

॥ তিন ॥

কবি মানবজীবনের মহাসংকটেও কিভাবে রুদ্রের প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন সে কথা ব্যাখ্যা করে কবির যে মানসিকতা এখানে প্রকাশিত তা আলোচনা কর।

মানবসভ্যতা যে এক অতি সংকটময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে এ কথা কবি বলাকা কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় বর্ণনা করেছেন। বলাকার শেষ কবিতাটিতেও তিনি মানুষের এই দুঃসময়ের যথোচিত পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সমগ্র বর্ণনাটি তিনি যেভাবে করেছেন এবং কবিতার সমাপ্তিতে যে আশ্বাস দিয়েছেন তাতে তাঁর মন যে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েনি বরং তিনি যে এই সংকট উত্তীর্ণ হবার বলিষ্ঠ আশাই শোনাতে পেরেছেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কোন অবকাশ থাকে না।

নববর্ষের আশীর্বাদ জানাবার জন্যই কবি এই কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু এ সান্ত্বনা তিনি জানাতে পারেন নি যে পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ক্লান্তি এবং জীর্ণতা কেটে গেছে। তিনি জানেন বর্তমান বৎসরটিও সংকটের মধ্য দিয়েই অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই বিশ্বাসও তাঁর আছে যে, এই সংকট চিরস্থায়ী নয়। মানবসভ্যতার বর্তমান সংকট একদিন কেটে যাবেই। তাই এই সংকট এবং দুর্যোগকেই তিনি সহনীয় করার চেষ্টা করেছেন অন্যভাবে।

কবি বলেছেন এখন ধ্বংসের দেবতা রুদ্র মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কেবল সুখ এবং আরামেই মানবজীবনের স্বার্থকতা নয়, প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য শান্তির মতো অশান্তিরও প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে। সেই অশান্তি এবং সুখ দুঃখ সহন পরীক্ষার দ্বারা মানুষকে দগ্ধ করে তাকে প্রকৃত অমৃতের অধিকারী করবার জন্যই রুদ্রের এই খেলা।

সেই কারণেই আজ পথের ধূলাকে কবি বলেছেন মানুষের ধাত্রী এবং ঘরের প্রসন্ন আরাম তিনি ত্যাগ করতে বলেছেন। পথে কালবৈশাখীর তাণ্ডব আছে তিনি জানেন, কিন্তু তাকে তিনি বলেন 'কালবৈশাখীর আশীর্বাদ'। পথ কণ্টকাকীর্ণ একথাও তিনি জানেন। কিন্তু কণ্টকের জ্বালার কথা তিনি বলেন না, বলেন—'পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা'। এখন লাভের দিন নয়, প্রতি পদক্ষেপে ক্ষতির সম্ভাবনা, কিন্তু সেই ক্ষতিই মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য এখন যে আমাদের দরকার এ কথা আমরা বুঝতে পারি কবির এই মন্তব্য থেকে—

'ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।'

কবি এখন নিন্দাবাদকেও মনে করেন বিজয় শঙ্খধ্বনি। কবি অমৃতের ধারণাই পরিবর্তিত করে দিয়েছেন, অর্থাৎ অমৃত সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরশন করে দিয়ে বলেছেন—

'চেয়েছিলে অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি। নহে সে আরাম।'

তাই মৃত্যুর নিয়ত হাতছানিকেও কবি নিরুৎসাহ হবার কারণ বলে মনে করেন না, যে কোন সৎকার্যে ব্রতী হতে হলে চারিদিকে নিষেধের সতর্কবাণীতেও স্তিমিত হয়ে পড়ার কারণ আছে বলে মনে করেন না—বরং সেটাকেই তিনি মনে করেন নববর্ষের আশীর্বাদ।

কবি আজ নিষ্ঠুরকে বরণ করে নেন এবং আজ যখন নিষ্ঠুর দেবতার লীলার সময় এসেছে তখন নিঃসঙ্কোচে তাঁর শরণাপন্ন হবার আহ্বান জানিয়েছেন কবি। হতে পারে তিনি আমাদের অপরিচিত, তবু তাঁর প্রসারিত হাত যেন আমরা ধরতে পারি, যেন তাঁর দীপ্ত বাণী আমাদের হৃৎকম্পনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—এই আকাঙ্ক্ষাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। কবিতার শেষ দুটি পংক্তি কবির আশাবাদী মনের সাক্ষ্য বহন করে বলেই আমরা মনে করি। সেখানে কবি পুরাতন বৎসরের কথা বলেন নি, বলেছেন পুরাতন রাত্রির কথা। পুরাতন কেটে গিয়েছে যাক, যে সংকট এগিয়ে আসছে তা আসুক, সব কিছু তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে হবে—এই কথার মধ্যে আশ্বাসী মনোভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই আমরা মনে করি ধ্বংসের পটভূমিতে রচিত হলেও, ধ্বংস ও নৈরাশ্য কবিতাটির শেষ কথা নয়—কবির আশাবাদী মানসিকতা সমগ্র কবিতাটিকে নৈরাশ্যের জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আশার আলোকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছে।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"এই কবিতায় যদি বলাকা-র সব কথার পুনরুক্তি হয়ে থাকে তবে ভালই হয়েছে।" সত্যিই কি এই কবিতায় বলাকা কাব্যগ্রন্থের সব বক্তব্য প্রচ্ছন্ন আছে? আলোচনা কর।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের এই শেষতম কবিতার মধ্যে 'বলাকা'-র সমস্ত বক্তব্যেরই পুনরুক্তি ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বয়ং কবি তাঁর কবিতার মর্মার্থ সবচেয়ে বেশি বোঝেন, সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। আমরা এই কবিতার ভাববস্তু আলোচনা করলেও কবির বক্তব্য সঠিক বলেই বুঝতে পারি। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে

আরও ৪৪টি কবিতা আছে, প্রত্যেকটির ভাববস্তুর সঙ্গে এর সাধর্মসন্ধান সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে 'বলাকা'-র যে কটি প্রধান বক্তব্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি তাদের সঙ্গে কবিতাটি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

প্রথমত, বলাকা কাব্যগ্রন্থের প্রধান সুর সচলতা। বৈদিক চরৈবেতির মন্ত্র যেন এরও বীজমন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৩৬-সংখ্যক কবিতায় বলেছেন—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।'

এই পংক্তি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন হয়ে গিয়েছে। বলাকার এই গতিতত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন এবং কেউ কেউ Bergson-এর গতিতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর তুলনাও করেছেন। সেই চলার মন্ত্র এই কবিতাতেও আমরা প্রতিধ্বনিত হতে দেখি—কবি পুরাতন বৎসরের শেষেও যাত্রীদলকে থামবার আদেশ দেন নি তাদের ঘর অপেক্ষা পথকেই আপন করে নিতে বলেছেন। এমনকি পথের মহনীয়তা বাড়াবার জন্য এমন কথাও বলেছেন—

"ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।"

দ্বিতীয়ত, ঘরের প্রসন্ন আরামের দিন যে গত হয়েছে, এখন যে রুদ্র দেবতার মহাশঙ্খধ্বনি কবি শুনতে পেয়েছেন—একথা কবি বলাকার বিভিন্ন কবিতায় বলেছেন। সেই চিন্তার সঙ্গে একেবারে অভিন্ন ভাবনা এই কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। "শঙ্খ" কবিতায় কবি লিখেছেন—

'তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।'

এই কবিতায় তিনি বলেছেন—

"চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।"

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ, সন্ধ্যার দীপালোক এবং প্রেয়সীর অশ্রুচোখকে উপেক্ষা করে কবি পথে বেরিয়ে পড়তে বলেছেন এই কবিতায়। একই কথা, একই আক্ষেপ শুনি 'শঙ্খ' কবিতায়—

"আরতিদীপ এই কি জ্বালা?
এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথব রক্তজবার মালা?
হায় রজনীগন্ধা!"

তৃতীয়ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের আগেই তার পূর্বাভাষ কবি পেয়েছিলেন। মানবসভ্যতার যে এক চরম সংকটের দিন এগিয়ে আসছে এই অনুভূতি তাঁর চিত্তে জেগেছিল এবং তাঁর সেই আশঙ্কা তিনি বলাকা কাব্যগ্রন্থের প্রথম কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এরপর

৩৬-সংখ্যক ও ৩৭-সংখ্যক কবিতা দুটি মানুষের এই নিদারুণ সংকট এবং ক্রান্তিকালের স্পষ্ট প্রতিফলনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই সংকটের বহমান প্রবাহ কবি এই কবিতাতেও উপস্থিত করেছেন। নতুন বছরে কোন সুস্থ ও সমৃদ্ধিশালী জীবনের চিত্র তিনি তুলে ধরতে পারেন নি, তিনি জানিয়েছেন এই সংকটের মধ্য দিয়েই বর্তমান বৎসরকালও আমাদের অতিক্রম করতে হবে। তিনি বলেছেন—

"পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা,
....
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা—
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

চতুর্থত, আজানা এক জীবন চর্যা এগিয়ে আসছে, তাকে বরণ করে নেবার কথা 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই কবি বলেছেন। তিনি বলেছেন—

'আনবে টেনে বাঁধা পথের শেষে।
বিবাগীকর্ অবাধ-পানে,
পথ কেটে খাই আজানাদের দেশে।'

এই কবিতাতেও অজানা অচেনা দেবতার হাত ধরার কথা আছে, আমাদের বক্ষস্পন্দনে তাঁর দীপ্ত বাণী জেগে উঠুক একথাও তিনি বলেছেন। এর জন্য বিস্তর চিন্তা-ভাবনা এবং বিচার-বিবেচনা পরিত্যাগ করবার দৃঢ় আহ্বান জানিয়ে তিনি সেখানে বলেছিলেন—

'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা।'

এখানে সেই একই সুরে কবি বলেছেন—

'ভয় নাই ভয় নাই, যাত্রী—
ঘরছাড়া, দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।'

পঞ্চমত, গভীর দুঃসময়ের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও বলাকার কোন কবিতাই চরম নৈরাশ্যের মধ্যে শেষ হয় নি। অনাগত সুদিনের জন্য দুর্দিনের এই প্রস্তুতিকে কবি স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, 'রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন!' এখনেও আমরা দেখি সমস্ত দুর্বিপাককে তিনি বলেছেন রুদ্র দেবতার প্রসাদ। অমৃত সম্বন্ধে আমাদের প্রাক্-ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে তিনি বলেছেন, অমৃতের অধিকার অর্জন্ করতে হলে সুখ, বিশ্রাম ও শান্তি ত্যাগ করতে হবে।

এইসব কারণে আমাদের মনে হয়, 'বলাকা'-র এই শেষ কবিতাটিতে বলাকা কাব্যগ্রন্থের সব চিন্তাই আবর্তিত হয়ে ফিরে এসেছে বলে কবি যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক।

॥ এগারো ॥

'বলাকা' কাব্যের ৬ সংখ্যক ('ছবি') ও ৭ সংখ্যক ('শাজাহান') কবিতা দুইটির তুলনামূলক আলোচনা

নিজের লেখার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন "আমার কাব্যে ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু যোগান নতুন পথ নেয়।" ('নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের সূচনাংশ)। রূপ থেকে রূপান্তরে ভাববীজের ক্রমঅভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যধারার বিবর্তন চলেছে—রবীন্দ্রনাথের জীবন বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য এর সঙ্গে কবি মিলিয়ে নিয়েছেন নতুন ভাবনা চিন্তা এবং জীবন উপলব্ধিকেও। তাই এই যাত্রা কখন রূপ থেকে রূপান্তরে কখন ভাব থেকে ভাবান্তরে কখন বা বিপরীত ক্রমানুসারে। তবে কয়েকটি ধ্রুব চেতনা বা স্থায়ী বিকাশ হলেও বিশেষ পরির্বতন হয় নি। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

রবীন্দ্র-কাব্যধারায় 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের আমাদের আলোচ্য এই (ছবি) ৬-সংখ্যক, ও (শাজাহান) ৭-সংখ্যক কবিতা কবির নতুন উপলব্ধির কবিতা। শুধু তাই নয় কবিতা দুটির যাত্রা হয়েছে—গতির মধ্য দিয়ে অসীম থেকে সীমায়, ভাব থেকে রূপে আর, প্রেম থেকে সৃষ্টিতে।

ছবি ও শাজাহান কবিতা দুটিতে আমরা কিছু অমিল বা আপাত বৈপরীত্য দেখতে পাই। প্রথমত, 'ছবি' কবিতাটি একটি ছবিকে নিয়ে লিখিত। সমালোচকদের মতদ্বৈধতানুসারে কেউ বলেন কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীকে নিয়ে লিখিত আবার কেউ বলেন এটি কাদম্বরী দেবীর (নতুন বৌঠান) ছবিকে অবলম্বন করে লিখিত। কিন্তু 'শাজাহান' কবিতাটি স্থাপত্য ভাস্কর্যকে নিয়ে লিখিত।

দ্বিতীয়ত, দুটি কবিতাতেই একটি আপাত বিরোধিতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। ছবি (৬ নং) কবিতায় কবি প্রথমে বলেছেন—

"তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।"

তারপর এই চিন্তাভাবনার সমস্ত আশঙ্কা কাটিয়ে পরে বললেন—

"কী প্রলাপ কহে কবি!
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?"

সুতরাং এই উক্তি তো সত্যিই আপাতবিরোধী বটে। ছবি কবিতায় যদিও কবির উপলব্ধি, ছবি ধৃত মৃত সত্তা স্ফূর্ত জীবনাবেগ করতে পারে না, কিন্তু সে তার জীবিত ভালোবাসার পাত্রকে জীবনাবেগে পূর্ণ করে দিতে পারে। হতে পারে তার প্রেরণা। এ ক্ষমতা ছবির

আছে। ছবিতে ব্যক্ত সত্তা Potential energy বা স্থির শক্তির মতো জীবিত প্রিয়জনের বিত্তে অবস্থান করে সেখানে Kinetic শক্তির উদ্ভব ঘটাতে পারে, হতে পারে তার বিত্তে আবেগের দ্যোতনা, যা তার কর্মে সক্রিয় তার এবং চেতনায় অনুভবের বেগ সঞ্চারিত করে দেয়। ছবিধৃত সত্তা জীবনকালে একদা তার প্রিয়জনের চিত্তে যে প্রেমানুভূতি সঞ্চারিত করে দিয়েছিল, সেই সত্তার স্মৃতিতে প্রেমানুভূতির আবার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তার ফলে ঐ জীবিত প্রিয়জনের কাছে জগৎ ও জীবন নতুন মাধুর্যে ভরে ওঠে।

এতো গেলো জীবিত ব্যক্তির চিত্তে মৃত ব্যক্তির স্মৃতির কার্যকারিতা। শাজাহান কবিতাতেও দুই আপাতবিরোধী উক্তি দেখা পেল। ছবি কবিতার ছবির শিল্পী কবি নিজে নন। কিন্তু, শাজাহান কবিতায় মমতাজের স্মৃতি মন্দিরের পরিকল্পক শিল্পী শাজাহান নিজেই, তাই শিল্প তাজমহল এবং শিল্প-কেন্দ্রিক মমতাজ শাজাহানের আরো গভীর আত্মিক। মৃত্যু উত্তর শাজাহানকে এখনও মমতাজের গভীর প্রেমানুভূতি গ্রহণে তৎপর? মমতাজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কি এখনও অক্ষয়? এই ভালোবাসার আকর্ষণে কি তাঁর আত্মা এখনও মমতাজের আত্মার সমীপবর্তী হতে চায়? শাজাহানের জীবাত্মা কি মমতাজের জীবাত্মার মিলন-প্রয়াসী? এর উত্তর জীবিত মানুষের কাছে খুবই জরুরী। কবির উক্তিতে পাচ্ছি— শাজাহানের সৌন্দর্যদূত মৃত পত্নীর বেদনাকে ভুলতে দিচ্ছে না। মৃত্যু যে বিচ্ছেদ বেদনার সৃষ্টি করে, মানুষ স্মৃতিসৌধ রচনা করে বেদনাকে প্রকাশ করে, সেই সৌধ যেন ঘোষণা করে—মৃত্যু বিচ্ছিন্ন করে কেড়ে নেয় বটে, কিন্তু স্মৃতিতে জাগরুক থাকে। কারণ, জীবিত মানুষ তার মৃত প্রিয়জনকে বারবার ফিরে ফিরে কাছে পেতে চায়। প্রিয়জনের মৃত্যুর পরও সে মনে করে মৃত প্রিয়জনের সত্তা তার কাছে-কাছে, পাশে-পাশে আছে। সে গভীর প্রত্যয়ে অনুভব করে, "আমি ভালোবাসি যারে, সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।" শাজাহান ও তাঁর প্রিয় পত্নীর মৃত্যুতে যে তাজমহল রচনা করেন, সেই স্মৃতিসৌধ রূপে দূত জানায় সে মৃতকে ভোলা হয় নি—

'তবুও তোমার দূত অমলিন
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা গড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া
যুগে-যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বার্তা নিয়া
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

কিন্তু পরক্ষণেই কবি বলছেন—

'মিথ্যা কথা—কে বলে যে ভোল নাই
কে বলেরে খোল নাই
স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার?'

এই উক্তিদ্বয় ও আপাতবিরোধী। তথাপি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনা বা অনুভব বা উপলব্ধি থেকে যে উত্তর পেয়েছেন তা নেতিব্যঞ্জক। মৃত্যু উত্তর সত্তা পার্থিব জীবনকালের কোনো

বিচ্ছেদে আর বিধৃত নন। তখন তিনি দেহাতীত; বুদ্ধ অনাসক্ত সংস্কারহীন নিত্যযুক্ত আত্মা এবং অসীম ও অনন্ত দেশকালে পরিভ্রমণশীল। যাই হোক না কেন শিল্পগত আরো কিছু অমিল আমরা লক্ষ্য করেছি। যেমন—

ছবি কবিতাতে যেখানে মৃতসত্তার আবেদন জীবিত মানুষের কাছে, শাজাহান তেমনি মৃতসত্তার আবেদন মরণোত্তর সত্তার কাছে। তখন তার আবেদন আর পার্থিব কিছুর সঙ্গে, মমতাজ সত্তা বা মমতাজস্মৃতি বা তাজমহল স্মৃতিমন্দিরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তখন তার মুক্তগতি অসীম অনন্তের যাত্রাপথে প্রতীয়মান।

ছবি কবিতায় কবি তাঁর নিজের মনের বেদনার কথাই প্রকাশ করেছেন আর শাজাহান কবিতাতে সম্রাট শাজাহানের অন্তর্বেদনার প্রতি কবি তাঁর দরদ ও সহানুভূতি জানিয়েছেন।

আমরা ছবি ও শাজাহান কবিতা দুটিতে আপাত বিরোধীভাবের প্রসঙ্গ আলোচনা করলাম। কিন্তু এখানেই এই আলোচনার সমাপ্তি নয়। কবি নিজেই এই বিরোধী উক্তিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। ছবি কবিতাটি গতিতত্ত্বের ওপর লিখিত একটি বিশিষ্ট কবিতা। কারণ প্রাথমিক যে অচল জড়ত্বের ধারণা কবির হয়েছিল, পরে তা ভেঙে গেল। তিনি বুঝলেন যে তাঁর প্রিয়া তো স্থির রেখার বন্ধনে বাঁধা পড়ে নেই। তাঁর প্রিয়ার মধ্যে আনন্দের যে প্রকাশ—তিনি যে সৃষ্টির আনন্দকে বাণী দিয়েছেন সেই আনন্দ তো থামে নি। সেই মানবী চোখের সামনে হয়তো নেই কিন্তু নয়নের মাঝখানে ঠাঁই নিয়েছেন। কবি যে তাঁকে সাময়িকভাবে ভুলেছিলেন তা যথার্থ বিস্মৃতি নয়, সে ভুল বাইরের। কবি জীবনের চৈতন্যলোক থেকে কবি পত্নী মাত্র চৈতন্যের জীবনে চলে গেছেন। ছবি কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ও কবি বলেন "ছবিতে দেখি স্থিতি জীবনের সঙ্গে মিলতে গিয়ে বিস্মৃতির মধ্যে বিলীন হয়। স্মৃতিগুলি সব আলাদা হয়ে থাকলে সবগুলি স্মৃতির ভারে আমরা পিষে মরতাম। খাদ্য যেমন পরিণত হয়ে প্রাণশক্তির মধ্যে যুক্ত হয়ে সহজ হয়ে থাকে—আলাদা হয়ে থাকলে আমাদের সারাজীবনের ভুক্ত খাদ্যের চাপেই আমরা মারা যেতাম, তেমনি জীবনের মধ্যে হাজার হাজার বস্তু প্রাণরসে পরিণত হয়ে রয়েছে। তারা নষ্ট হয় নি। নামরূপ ত্যাগ করে তারা মর্মে ও প্রাণে মিলিয়ে আছে। খাদ্য যেমন রস আকারে দেহগত হয়, বস্তুত তেমনি বিস্মৃত হলেও মর্মগত হয়ে জীবনের সঙ্গে সহজ যোগযুক্ত হয়ে কাজ করে।"—সুতরাং এটি আপাতবিরোধী তো নয়ই এবং গতিতত্ত্বের উপরই দাঁড়িয়ে আছে।

শাজাহান কবিতায় উন্মুক্তভাবে গতির কথা স্পষ্টত ব্যক্ত না হলেও কবিতাটি গতিরাগের কবিতা। এখানে গতির কথাই ব্যঞ্জিত হয়েছে। কবিতাটি প্রেমের চিন্তা এবং সৌন্দর্য নিয়ে লেখা বলেই আমাদের মনে হয়; কিন্তু গতিই আসল। আর সেই গতির কথাই বৈপরীত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বলা হয়েছে। কবি গতিতত্ত্বের এক দুরূহ বিত্তকে অতিসুচারু রূপে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। গতি জীবনের সত্য, গতি আছে বলেই কোথাও মালিন্য জমেনি। মৃত্যুই এই গতির প্রতীক। মৃত্যু এসে জগতকে পবিত্র করে দেয়; অথচ মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিচ্ছেদ বেদনা। শাজাহানের সেই মৃত্যুবেদনার প্রকাশ হল তাজমহল। তাজমহল রচনা করে শাজাহান বলতে চান যে তিনি তাঁর পত্নীপ্রেম ভোলেন নি। যে প্রেম মোহবশতঃ স্থানে বা কালে আবদ্ধ—যে প্রেম অচল। সেই প্রেম চেয়েছিল সম্রাটকে পথের মধ্যে সিংহাসন পেতে বসিয়ে বিলাসের সম্ভাষণে ভোলাতে, কিন্তু সম্রাটের জীবন গতিশীল, সে জীবন

তো বদ্ধ হতে চায় নি। সে যে চিরযাত্রী, তার কাজ তাকে যতই বাঁধবার চেষ্টা করে সে তো ভারমুক্ত, সে থাকতে পারে না সে মুক্ত পুরুষ। বন্ধন ছিঁড়ে সে চলে যায়। কবিতাটি আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেন—"কাল যেসব ধূলো ঝাঁটিয়ে ফেলে সেই ধূলোর মধ্যে যদি জীবনের বীজ পড়ে তার তা প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু যার মালা হতে সেই বীজভ্রষ্ট, সে পুরুষ বিশ্ব বন্ধন পার হয়ে কোথায় চলে যায় কোন বীজ ফুটলো, কোন বীজ ফুটলো না—তা দেখার জন্য সে দাঁড়ায় না। তার কীর্তি বলে—তার চিহ্ন নিয়ে আমি আছি বটে, কিন্তু সে আজ নেই। যতদূর দেখতে পারি কোথায় ত তাকে আর দেখা যায় না।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোন বিরোধী ভাবে এই কবিতার উপজীব্য বিষয় নয় শুধু কঠিন পদ্ধতি এবং দুরূহ ভাববিন্যাসে আপাতবিরোধী অভিব্যক্তির মাধ্যমেই এই গতির সত্যির কথা বর্ণিত হয়েছে। কবি গতির ব্যঞ্জনা এনে এই আপাতবিরোধীভাবকে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

এইভাবে গভীর বিচারে দেখলে আমরা দেখবো দুটি কবিতার মধ্যে মিল আছে বহু জায়গায়। যেমন—

১) দুটি কবিতাই ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র' নামক পত্রিকায়।

২) দুটি কবিতাই কোন এক মানবীকে নিয়ে লেখা। ছবি কবিতার মানবী হল কবি পত্নী আবার মতান্তরে, নতুন বৌঠান আর, শাজাহান কবিতার মানবী হল মমতাজ।

৩) দুটি কবিতাই অতীতকে, বিস্মৃতিকে ভুলে যাওয়ার জন্য রচনা।

৪) দুটি কবিতাই ভাস্কর্য থেকে সাহিত্য। ছবি ও ভাস্কর্য আর তাজমহল ও স্থাপত্য-ভাস্কর্য।

৫) দুটি কবিতার মধ্যেই দেখি গতিতত্ত্ব।

৬) দুটি কবিতার মধ্যে রয়েছে প্রেমানুভব।

৭) দুটি কবিতার মধ্যে রয়েছে গভীর মৃত্যু দর্শন।

৮) দুটি কবিতাতেই মোট দুটি ভাগ আছে। একটিতে প্রতিপাদ্য বিষয় আর অন্যভাগে তার প্রতিবাদ।

৯) বাদ-প্রতিবাদের ফলে দুটি কবিতাতে এসেছে একটি নাটকীয়তা যা কবিতার শিল্পিগত ও সৌন্দর্যগত কাঠামোকে করেছে পরিপুষ্ট।

১০) ছবি জীবিত প্রিয়জনের চিত্তে প্রেম ও প্রেরণা সঞ্চারী, তাজমহল তেমনি পৃথিবীতে সৌন্দর্য প্রেম ও আনন্দ পৃথিবীর সমকালীন ও এখনো অনাগত জীবিত মানুষের মনে প্রেম সঞ্চারী।

আগেই বলেছি যে, কবিতা দ্বয়ের গঠনেও মিল আছে। প্রত্যেক কবিতারই দুটি করে ভাগ। প্রথমটিতে একটি প্রতিপাদ্য, দ্বিতীয়টিতে আকস্মিক জোরের সঙ্গে তার প্রতিবাদ। এর ফলে কবিতা দুটিতে নাটকীয়তা এসেছে। যেন পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ। যেমন—ছবিতে প্রথম ভাগে (প্রথম থেকে শুরু করে চতুর্থ স্তবকের শেষ, "তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি") একটি প্রতিপাদ্য—ছবি ধৃত মৃতসত্তার কোনো জীবনোপথ লীলা নেই। তারপর থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত উক্ত ভাবনার প্রতিবাদ, "বিস্মৃতির মর্মে বসি" সে জীবিত প্রিয়জনের রক্তে দোলা দেয়, তারি অনুভবে কবির কাছে জগৎ সৌন্দর্য প্রতিমা রূপে প্রতিভাত হয়।

কিন্তু, শাজাহান কবিতায় ব্যাপারটি যেন উল্টে গেছে। ছবিতে যা ছিল উত্তরপক্ষের প্রতিপাদ্য, তারই প্রায় সমধর্মী প্রতিপাদ্য এই কবিতার। পূর্বপক্ষে এবং তারই প্রতিবাদ আবার আলোচ্য কবিতার উত্তরপক্ষে। শাজাহান কবিতায় কবির প্রাথমিক ধারণা, মমতাজ স্মৃতি তাজমহলের মধ্য দিয়ে শাজাহানের মমতাজের প্রতি চিরন্তন ভালবাসার ঘোষণা ব্যক্ত হচ্ছে, "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।" শুরু থেকে চতুর্থ স্তবকের উদ্ধৃত পংক্তি পর্যন্ত এই প্রতিপাদ্য। তারপরে হঠাৎ বিস্ময়ের অভিঘাতের মতো নতুন উপলব্ধির শুরু, মিথ্যা কথা—কেবলে রে ভোল নাই?/কে বলে রে খোল নাই/স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার থেকে শুরু করে শেষ স্তবকের "দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে" পর্যন্ত। এর পরের পঙ্‌ক্তিগুলোকে উপসংহার ভাষণ বলা যেতে পারে। এখানে উত্তর ভাগের প্রতিপাদ্য, মরণোত্তর সত্তার কোনো পার্থিব জগৎকেন্দ্রিক ও ভালবাসা ব্যঞ্জক ঘোষণার কোনো সুযোগই (scop) নেই। কারণ, মরণোত্তর সর্বপ্রকার পার্থিব সংযোগ ও সংস্কারমুক্ত।

সুতরাং আপাত অর্থে যেটি বিরোধিতা আসলে তা বিরোধিতা নয়। গভীর ব্যঞ্জনা আছে এর অর্থের মাধ্যমে। রয়েছে গতি-সত্য ও সৌন্দর্যের মিলন সাধনা। নেতি নেতি করে কোনো মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না। 'না'-ই যদি সাহিত্য শিল্প অথবা জীবনের মূল কথা হয়ে থাকে তাহলে সারা বিশ্ব রিক্ত হয়ে যেতো। ছবি ও শাজাহান কবিতা দুটিতে তাই দেখি সীমা অসীমের কোলাকুলি, স্থিতি থেকে গতির উপাসনা আর নেতি দিয়ে আরম্ভ করে অস্তিতে বিলীন হওয়ার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। আর এখানেই কবির ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে বিশ্বজনীনতার মঙ্গল ও সৌন্দর্যের রাজপথে।

॥ বারো ॥

'বলাকা' ঃ অতিরিক্ত কবিতার আলোচনা

॥ ক ॥

পাড়ি (৫-সংখ্যক)

'পাড়ি' (৫-সংখ্যক) কবিতাটি সম্বন্ধে স্বয়ং কবি বলেছেন—

এই কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে লেখা।

....যে সময়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার চিন্তা আমার মনে কাজ করছিল। তাকে আমার চিত্ত এইভাবে দেখেছে—যুদ্ধের সমুদ্র পার হয়ে নাবিক আসছেন। ঝড়ে তাঁর নৌকার পাল তুলে দিয়ে। তিনি প্রমত্ত সাগর বেয়ে এই দুর্দিনে কেন আসছেন? কোন্ বড় সম্পদ নিয়ে এবং কার জন্য তিনি আসছেন? এই কবিতায় দুটি প্রশ্নের কথা আমি বলেছি। নাবিক যে সম্পদ দিয়ে আসছেন তা কি এবং নাবিক কোন্ ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন? যুদ্ধের সাগর যিনি পার হয়ে আসছেন তিনি কোন্ দেশে কার হাতে তাঁর সম্পদকে দান করবেন?

প্রথম শ্লোক যখন চারিদিকে গভীর রাত্রি, সাগর মত্ত, ঝড় বইছে, এমন দুর্দিনে নাবিকের কি ভাবনা ছিল যে এমন সময়ে তিনি কূল ছাড়লেন? কি সঙ্কল্প তাঁর মনে ছিল যার জন্য পরম দুর্দিনে নিয়মের দ্বারা সংযত লোকসমাজের কূলকে ত্যাগ করে তিনি মত্ত সাগর পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়েছেন?

দ্বিতীয় শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরের আভাস আছে। সেই আভাসটা এই যে—কোনো একটি গৌরবহীনা পূজারিণী এক জায়গায় অজানা অঙ্গনে পূজার দীপ জ্বালিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, যুদ্ধের সাগর পার হয়ে নাবিক সেই পূজা গ্রহণ করবার জন্য এই প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ছেড়েছেন। যে অঙ্গনে কারো দৃষ্টি পড়ে না, সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু তাঁকে আসতে হলে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আসতে হবে।

ঝড়ের মধ্যে এই বিবাগীর, ঘরছাড়ার এ কী সন্ধান? কত না জানি মণিমাণিক্যের বোঝা নিয়ে তিনি নৌকা বেয়ে আসছেন। বুঝি কোনো বড় রাজধানীতে তিনি ধনসম্পদ নিয়ে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু নাবিকের হাতে যে দেখি একটি মাত্র রজনীগন্ধার মঞ্জরী। তিনি যাকে খুঁজছেন তাঁকে তো তবে মণিমাণিক্য দেবেন না। তিনি অজ্ঞাত অঙ্গনে এক বিরহিণী অগৌরবার কাছে সেই মঞ্জরী নিয়ে আসছেন। এরই জন্য এত কাণ্ড? হাঁ, এরই জন্য নাবিকের নিষ্ক্রমণ।

যে রজনীগন্ধার সৌরভ অন্ধকারে বিস্তৃত হয়, তা সেই অচেনা অঙ্গনের উপযুক্ত। দিনের বেলা সেই সৌরভ সঙ্গোপনে থাকে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার সৌন্দর্যের প্রকাশ। সেই সৌরভময় ফুল নিয়ে নাবিক বেরিয়েছেন। নতুন প্রভাত আসন্ন, সেই নব-প্রভাতের উপহার নিয়ে নবীন যিনি তিনি আসছেন। যে তপস্বিনী পথের পাশে নতুন প্রভাতে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে অপেক্ষা করছে তাকে সমাদরের মালা পরিয়ে দিতে তিনি বার হয়েছেন। সে রাজপথের পাশে রয়েছে, তার লোককে দেখাবার মতো ঘর-দুয়ার নেই—তারই জন্য নাবিক অসময়ে

সকলের অগোচরে বার হয়েছেন। সেই তপস্বিনীর রুক্ষ অলক উড়ছে, পলক সিক্ত হয়েছে, তার ঘরের ভিত ভেঙে গিয়েছে, সেই ভিতের ভিতর দিয়ে বাতাস হেঁকে চলেছে। বর্ষার বাতাসে তার প্রদীপ কম্পিত হচ্ছে—ঘরের মধ্যে ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে তার দৈন্য-দশার মধ্যে ভয়ে ভয়ে সে রাত কাটাচ্ছে, তার আশঙ্কা হচ্ছে যে বর্ষার বাতাসে তার কম্পমান দীপশিখা কখন নিয়ে যাবে। সে একপ্রান্তে বসে আছে, তার নাম কেউ জানে না। কিন্তু তারই কাছে নাবিক আসছেন।

আমার উৎকণ্ঠিত নাবিক আজকের দিনেই যে বার হয়েছেন তা নয়। কত শতাব্দী হল তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে, কত দিন থেকে কত কাল সমুদ্র পার হয়ে তিনি আসছেন। এখনও রাত্রির অবসান হয় নি, প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। যখন তিনি আসবেন তখন কোনো সমারোহ হবে না, তাঁর আগমন কেউ জানতেই পারবে না। তিনি আসলে অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোকে ঘর ভরে যাবে। নতুন সম্পদ কিছু পাওয়া যাবে না, কেবল দৈন্য ঘুচে যাবে। তপস্বিনী যে দারিদ্র্য বহন করেছিল তা ধন্য হয়ে উঠবে, শূন্য পাত্র পূর্ণ হয়ে যাবে। তার মনে অনেক দিন ধরে সন্দেহ জাগছিল, সে ভাবছিল যে তার প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করা ব্যর্থ হল বুঝি, কিন্তু তার সেই সংশয় ঘুচে যাবে। তখন তর্কের উত্তর ভাষায় মিলবে না, সে প্রশ্নের মীমাংসা নীরবে হয়ে যাবে।

ইতিহাসের বড় বড় বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ইতিহাস-বিধাতা সাগর পার হয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসছেন। সেই মাল্য কে পাবে? আজ যারা বলিষ্ঠ শক্তিমান ধনী, তাদের জন্য তিনি আসছেন না। তারা যে ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত; কিন্তু তিনি তো ধনরত্নের বোঝা নিয়ে আসছেন না। তিনি প্রেমের শান্তি বহন করে, সৌন্দর্যের মালা হাতে করে আসছেন। আজ তো শক্তিমানেরা সেই মাল্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই, তারা যে রাজশক্তি চেয়েছে। কিন্তু যে অচেনা তপস্বিনী আপন অঙ্গনে বসে পূজা করছে, আমার নাবিক রজনীগন্ধার মালা তারই জন্য নিয়ে আসছেন, সে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাচ্ছে, মনে করছে তার অজ্ঞাত অঙ্গনে পথিকের পদচিহ্ন বুঝি পড়ল না। সে যখন মাল্যোপহার পেয়ে ধন্যা হয়ে যাবে তখন সে বলবে—তোমার হাতের প্রেমের মালা চেয়েছিলাম এর বেশি কিছু আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। ধনধান্যে আমার স্পৃহা ছিল না। এই রিক্ততার সাধনা যে করেছে, এই কথা যে বলতে পেরেছে, সে দুর্বল আপরিচিত দরিদ্র হোক, নাবিক সেই অকিঞ্চনের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন। এরই জন্য এত কাণ্ড, এত যুগ যুগান্তরের অভিসার! হাঁ এরই জন্য। সকল ইতিহাসের এটাই অন্তর্নিহিত বাণী।

গত মহাযুদ্ধে এক দল লোক অপেক্ষা করে বসে ছিল যে যুদ্ধাবসানে তারা শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আরেক দল লোক পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল; তারা অখ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম কাণ্ডকারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর ও চরম সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছে, বিশ্বাস করেছে। বিশ্বে যারা পরাজিত অপমানিত, তারা মনুষ্যত্বের চরম দানের পথ চেয়েই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গলের আদর্শের বিপরীত পথে চলেছে। কিন্তু তবুও যদি তারা প্রদীপ না নেবায়, তপস্যায় যদি ক্ষান্ত না হয়, অপেক্ষা যদি করে থাকে, তবে তখন সেই নাবিক এসে তাদের ঘাটে তরী লাগাবেন আর তাদের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেবেন।

—শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৯, আচার্য রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপনা
প্রদ্যোতকুমার সেন কর্তৃক অনুলিখিত।

কোনো বিশেষ যুদ্ধ বা ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত না করে সহজ সাধারণভাবে এই কবিতার অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে।—

গতি অনন্তের প্রতীক। গতির আহ্বানবাণী ঝড়ের ও উত্তাল ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। গতির নিমন্ত্রণ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে আমাদিগকে অজানা কূলের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এই যে অহরহ নতুনের আমন্ত্রণ আসছে, তাকে কে স্বীকার করে অকূলে ভাসবে তা এখন কারও জানা নেই। যে এখন অখ্যাত অজ্ঞাত হয়ে আছে, সেই হয়তো তাকে স্বীকার করবে এবং তার দ্বারা বিখ্যাত ও গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে।

এই যে আহ্বান আসছে তার অনুসরণ করলে ধনসম্পত্তি লাভ হবে না। কেবল আত্মপ্রসাদ মাত্র এর পুরস্কার—এটাই তার প্রিয়ের হাতের রজনীগন্ধার মঞ্জরী।

যার জন্য অকস্মাৎ এই নাবিক যাত্রা করে বাইরে এসেছেন, সে তো অতি অখ্যাত; কেউই তাকে এখনও চেনে না, সে পথপ্রান্তবাসী। কিন্তু তাকেই বিখ্যাত করে তোলবার জন্য নাবিকের এই অভিযান ও অভিসার।

এই নেয়ের আহ্বান যে বরণ করে নেবে, তার সকল দৈন্য ধন্য হয়ে যাবে, তার আত্ম-অবিশ্বাস চিরকালের জন্য ঘুচে যাবে।

॥ খ ॥

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি

(১৬-সংখ্যক)

১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসের সবুজপত্রের ৬৮৭ পৃষ্ঠায় এটা 'রূপ' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গতি যে কেবল গতিতে পর্যবসিত থাকতে চায় না, তার লক্ষ্য যে সকল সময়েই অব্যক্ত হতে ব্যক্ত হওয়া, নিরাকার থেকে সাকার হওয়া, এই পরম সত্যটি এই কবিতার প্রতিপাদ্য। এই কবিতাটিতে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে।

গতিতে বস্তুর রূপ ফুটে উঠে, আর স্থিতিতে বস্তুর স্তূপ জমা হয়ে একাকার হয়ে যায়। ('চঞ্চলা' কবিতার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) কবি নিজে এই কবিতার ব্যাখ্যা করে রেখেছেন—

(১ম শ্লোক)

চারিদিকে বিশ্বের বস্তুরাশি যেন হাহা করে হেসে উঠেছে। ধূলোতে বালিতে তাদের করতালি হচ্ছে, তারা উন্মত্তভাবে নৃত্য করছে। বস্তুর সংঘাতে বস্তুর যে লীলা হচ্ছে, যেন তারই কোলাহল শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে রূপের মত্ততা। রূপ বস্তুর আকারে গতি পেয়েছে, তার সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে।

চারিদিকে বস্তু-পুঞ্জ সত্তা ধারণ করে প্রকাশের মত্ততায় মেতে উঠেছে। তাই দেখে কবির মন তাদের খেলার সাথী হতে চায়। বস্তুর দল কবির ভাবনা-কামনাকে বলছে, আমাদের খেলার সঙ্গী হও—লক্ষ্যগোচর হও, ধূলা-বালির মধ্যে রূপ ধারণ করে।

(২য় শ্লোক)

মানুষের যে অব্যক্ত স্বপ্নের দল তারা যেন কূল পেলে বেঁচে যায়। তারা অপ্রকাশকে পেরিয়ে বস্তুর ডাঙায় সৃষ্টির সঙ্গে মিলতে চায়। তারা যেন মজ্জমান প্রাণীর মতো অতলের নীচ থেকে ইটকাঠের মুষ্টি দিয়ে ধরণী আঁকড়ে ডাঙায় উঠতে চায়।

এমনি করে মানুষের চিত্তের চিন্তাগুলি বাইরে কঠিন আকার ধারণ করছে। মানুষের শহরগুলি আর কিছু নয়, তারা মানুষের ভাবনা ও কামনারই ব্যক্ত প্রকাশ। কোনো শহর কেবল কতকগুলি বাড়ির সমষ্টি নয়। মানুষের যে-স্পর্শাতীত প্ল্যান, চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা রূপ-জগতে সুস্পষ্ট হতে চাচ্ছে, তারাই যেন লোহা-লক্কড়ের ভিতর দিয়ে এই শহরে স্পর্শগোচর হয়েছে। দিল্লী নগরীতে কত সম্রাট এসেছে, আবার তারা চলে গেছে, মরে গেছে। কিন্তু দিল্লীতে তাদের ভাবনা, ইচ্ছা, প্রতাপ কালে কালে স্তরে স্তরে জ্বলে ওঠে ইট কাঠের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে এই মহানগরী তৈরি করে গেছে। চিত্তের বেদনাকে বাদ দিলে বস্তুগুলি কেবলমাত্র খোলস হয়ে দাঁড়ায়; চিত্তের যে কঠিন চেষ্টা নিজেকে রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছে, সেই চেষ্টাতেই নগর-নগরী হয়েছে।

(৩য় শ্লোক)

যে-সকল চেষ্টা রূপ ধারণ করতে পারল, তাদের তো আজ দেখছি; কিন্তু যেগুলি এখনো ব্যক্ত হয় নি, তারাও যে রয়ে গেছে। অতীতের পূর্ব পিতামহদের কামনা, ধ্যান-তপস্যা কি লুপ্ত হয়ে গেছে? না, তারা শূন্যে শূন্যে কানাকানি করে ফিরছে, তারা বলছে, 'তোমাদের বাণী পেলে আপনাদের প্রকাশ করি। আমাদের কোনো আধার নেই, তোমাদের বাণী সেই আধার দেবে। আমরা যে অন্তরের কথা বলতে চাই, শ্রুত হতে চাই।' লোকালয়ের তীরে তীরে এমনি কত অশ্রুত বাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের হাতে আলো নেই। কিন্তু অতীতের সেই অব্যক্ত ইচ্ছা চেষ্টা বর্তমান কালের আলোর তীর্থে, প্রকাশের ঘাটে উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছে। তারা সব পুরাকালের আলোকহীন যাত্রা। প্রকাশের ঘাটে উঠতে পারলে তারা বাঁচে।

তারা চিত্ত গুহা ছেড়ে ছুটেছে। তারা রূপ পাবার আশায় অন্ধ-মরু পাড়ি দিয়ে চলেছে। তারা আকারের তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিরাকারকে আঘাত করেছে। তারা কতদিন ধরে অব্যক্ত মরু পার হবার জন্য যাত্রা করেছে—বলছে 'কোথায় গেলে আকার পাই?' তারা প্রকাশ হবার জন্য কবির সাহায্য প্রার্থনা করছে।

(৪র্থ শ্লোক)

আমাদের ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগে, আমরা সবাই তাকে রূপ দিতে পারি না। কিন্তু তারা সব পাড়ি দিয়েছে। কে জানে কোন্ ঘাটে তারা উঠবে?

একদিন তারা নতুন আলোতে বিকশিত হবে। কত যুগ-যুগান্তর আগে মানুষের মনে প্রেমের জন্য, শান্তির জন্য যে-সকল আকুল তৃষ্ণা জেগেছিল, তারা যুগে যুগে মানব-সমাজের নানা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কোনো না কোনো ব্যবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে। পুরা যুগের মানুষদের চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষার দিনে একযুগের পাড়ি শেষ করে নবযুগে রূপের বন্দরে এসে ঠেকল। আজকের দিনে যে-সকল ব্যক্তিবিশেষ প্রচ্ছন্নতার ভিতরে থেকে কত গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তপস্যা করছে, তাদের অপূর্ণ কামনাগুলিও পাড়ি দিতে বসেছে—হয়তো তারা কোনো ভাবীকালে অপূর্ব-আলোতে প্রকাশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু কত পুরাতন, দূরবর্তী অতীতের ইতিহাসে এদের জন্ম হয়েছিল। তখন তো কেউ জানতে পারবে না। আজ তারা বাসা ছাড়া পাখির দলের মতো মানসলোকের নীড় ত্যাগ করে ডানা মেলেছে। তারা যেদিন বাসায় পৌঁছবে, সেদিন কোন নীড় ত্যাগ করে তারা এসেছে তা কেউ জানবে না।

আমার ভাবনা-কামনা নিয়ে কোন্ এক কবি যে কবিতা লিখবে, কোন্ এক চিত্রকর যে ছবি আঁকবে, কোন এক রাজপুরীতে যে হর্ম্য তৈরি হবে, আজ দেশে তাদের কোনো চিহ্ন নেই। আজ সেই সব অরচিত যজ্ঞভূমির উদ্দেশ্যে বর্তমানের মানুষ ভাবীকালের দিকে মুখ করে তীর্থযাত্রীর মতো চলেছে। হয়তো কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রামের রণশৃঙ্গের ফুৎকারে আজকের দিনে আবদ্ধ তপস্যার আহ্বান রয়েছে। ফরাসী বিপ্লবে মানুষের যুগ-সঞ্চিত ইচ্ছা ও বেদনার আহ্বান ছিল। তাই তারা ডাক শুনতে পেয়ে সংগ্রাম স্থলে এসে পৌঁছেছিল।

যে ইচ্ছা আজ ফললাভ করতে পারল না, ভাবীকালের কোন্ ভীষণ সংগ্রামে তাদের ডাক রয়েছে।

জগতে অসংখ্য অশ্রুত বাণী অতৃপ্ত বাসনা ব্যক্ত হয়ে আকার পাবার জন্য ছট্‌ফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে; বর্তমানের নিষ্ফলতা ও অপ্রকাশ ভাবীকালে সফলতা ও প্রকাশ পাবার জন্য ব্যাকুল। অমূর্ত নিরাকার চিত্তবেদনাগুলি আধারের অন্বেষণে অস্থির। এইজন্য এরা সব গতি। এই বেদনাগুলি সত্য বলে গতিও সত্য। কিন্তু এই বেদনা যেমন কেবলমাত্র বেদনাতেই পর্যবসিত থাকতে চায় না, গতিও তেমনি চিরকাল কেবল গতি হয়েই থাকতে চায় না। এইজন্য আমাদের ভাষায় সুব্যবস্থার নাম গতি; আর দুর্বব্যস্থার নাম দুর্গতি। চিত্তের বেদনা এক আধারেই নিজেকে চিরদিন বদ্ধ রাখে না, ক্রমাগতই সে আধার থেকে আধারে গতিশীল। এজন্য তাজমহল সম্বন্ধে কবি বলেছেন—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' বের্গসঁ আধার স্বীকার করেন না; গতি চিরকালই গতি, গতিই কাল। নগর প্রভৃতি স্থিতিশীল জিনিস কল্পনা মাত্র। বুদ্ধির সৃষ্টি; সত্যের হিসাবে এর মূল্য শূন্য।

॥ গ ॥

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে

(১৯-সংখ্যক)

কবি এই কবিতায় বলতে চেয়েছেন যে—মৃত্যুর ভেতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন হয় না। সীমাকে পদে পদে মরে পুনরুজ্জীবিত হতে হয়। মৃত্যু (annihilation) নয়, তা যদি হত, তবে বিশ্বের প্রকাশ এমন সুন্দর হত না। মৃত্যুতে রূপের বিনাশ নয়, রূপের নবীনতা সম্পাদন হয়। এই কবিতার কবিকৃত ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ—

(১ম শ্লোক)

আমি জগৎকে ভালোবেসেছি বলে আমার আনন্দ আছে। আমি জীবন দিয়ে এই বিশ্বকে ঘিরে ঘিরে বেষ্টন করে রেখেছি। আমি বিশ্বের প্রভাত-সন্ধ্যায় আলো অন্ধকারকে আমার চেতনা দিয়ে পূর্ণ করেছি—তারা আমার চৈতন্যের ধারার উপর দিয়ে ভেসে গেছে। আমি অনুভব করেছি যে জীবন ভুবনের সঙ্গে মিলে গেছে, এরা তফাৎ নয়। আমি জীবনকে আলাদা ভালোবাসি না বলে আমার কাছে জগতের আলোকে ভালোবাসা মানেই আমার প্রাণকে ভালোবাসা। আমি জীবনকে কখনো জগৎ ছাড়া দেখি না, তাই আমার ভয় হয় না পাছে জগতের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়। আমি যদি জগৎ থেকে দূরে কারারুদ্ধ হয়ে থাকতাম, তবে এই অনুভূতি হয় তো থাকত না। কিন্তু আমি জগতে বাস করছি বলে আমার কাছে জীবন ও ভুবনের ভালোবাসা এক হয়ে আছে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জগৎ ও আমার চৈতন্য এক হয়ে গেছে বলে, চৈতন্য থেকে বিরহিত জগৎটা আমার কাছে একটা (Annihilation) জীবন ও ভুবন যখন মিলিত হচ্ছে, তখনই উভয়ে সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভ করছে।

(২য় শ্লোক)

—এও যেমন একটা সত্য, তেমনি এই বস্তুবিশ্বে একদিন আমাকে মরতে হবে এই ব্যাপারটাও তেমন সত্য। এমন একদিন আসবে, যখন আমার যে বাণী ফুলের মতো ফোটে, তা বাতাসের স্পর্শে ফুটে উঠবে না। আমার চোখ প্রতিদিন আলো আহরণ করছে, কিন্তু সেইদিন আমার চোখের সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখন আমার হৃদয় অরুণোদয়ের আহ্বানে ছুটছে, সেদিন তা ছুটবে না। একদিন রজনী কানে কানে তার রহস্যবার্তা বলবে না—সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কাজ ফুরিয়ে যাবে। তাই পার্থিব জীবনের যে এমনি করে অবসান হবে এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

(৩য় শ্লোক)

জগৎ জীবনকে এমন একান্ত করে চাইছে। আলো-অন্ধকারের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে সে কত করে জগৎকে চাচ্ছে এবং উভয়ের মিলনের দ্বারা এই চাওয়ার সার্থকতা

হচ্ছে। এ-সত্য। তেমনি একদিন এই জগতের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, আমাকে মরতে হবে, সেও সত্য, তাই কি করে এই contradiction হতে পারে, এই দুই সত্যের মধ্যে কি মিল নেই? যদি মিল না থাকে, তবে জগৎকে যে চাইলুম, সে যে আমাকে ভোলালে, তা যে একটা মস্ত প্রবঞ্চনায় গিয়ে ঠেকল। বিশ্বের সঙ্গে জীবনের যে আনন্দ-সম্বন্ধ স্থাপিত হল তা যদি একদিন মিথ্যা হয়ে যায়, যদি এমন করে সব ছাড়তে হয়, তবে তা কোনো মানে থাকে না।

অথচ কোনো ক্রুরতা তো বিশ্বে বলীরেখা আঁকে নি। যদি বিশ্ব এতদিন এত বড় প্রবঞ্চনাকে বহন করে এসে থাকে, যদি মৃত্যুর নিরর্থকতায় সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,—তবে তার কোনো চিহ্ন এই পৃথিবীতে কেন দেখছি না? তা হলে তো বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য থাকত না। পুষ্পকে কীট কাটলে তা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যদি একটি মৃত্যুও সত্য হত তবে সব মৃত্যু বিশ্বে তার দংশনের ছিন্ন ফুটো রেখে দিয়ে যেত। তবে মৃত্যুকীট অনায়াসে পৃথিবীকে শুকিয়ে কালো করে দিত। অথচ কেন এই পৃথিবী সদ্য ফোটা ফুলের মতো আমার সামনে রয়েছে? এই সৌন্দর্যের emphasis. এর মানেই হচ্ছে যে মৃত্যুই সর্বগ্রাসী abyss নয়। মৃত্যুই চরম সত্য নয়। যদি তাই হত, তবে তার প্রত্যেক দংশন ভুবনকে ছিদ্রে আচ্ছন্ন করে কালো করে শুকিয়ে ফেলত।

আলোচনা

(১)

"এমন একান্ত করে চাওয়া"—এমন করে যে জগৎকে চাচ্ছি আর এমন করে যে জগৎকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এই দুটোই যদি সমান সত্য হয়েও দুটো contradictory হয় তবে জগতে এই ভয়ানক অসামঞ্জস্যের ভার এই প্রবঞ্চনা থেকে যেত। তার সৌন্দর্যের মধ্যে ক্রুরতার চিহ্ন দেখতাম। কিন্তু তা তো কোথাও দেখি না। তবে এই দুই সত্যের মিল কোথায়?

এই উত্তর এই কবিতায় নেই,—কিন্তু সেটাকে এমনি ভাবে বলা যেতে পারে।—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন (renewal) হয় না। ('ফাল্গুনী'তে আমি এই কথাই বলেছি। 'ফাল্গুনী' 'বলাকা'-র সমসাময়িক।) সীমাকে পদে পদে মরতে হয়, পুনঃপুনঃ প্রাণসঞ্চার না হলে সে যে জীবন্মৃত হয়ে রইল। রূপ form যদি স্থবির হয়—fluid জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয়, তবে সেই অচলরূপেই তার সমাধি হল। মৃত্যু রূপকে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়। যদি তার জীবন এক জায়গায় থেমে রইল তবে তো তার প্রসারণশীলতা (elasticity) রইল না। ইতিহাসে তাই দেখতে পাই প্রথার গণ্ডিতে বদ্ধ হয়ে থাকার দরুণ মানুষের মনের প্রসারণশীলতা যখন চলে গেল, তখন আবার নব যুগ তার বাণীকে বহন করে এনে সেই বন্ধন ছিন্ন করে দিল। অসীমের প্রকাশ (manifestation) সীমাতে হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যেই সীমার চরম অবসান নয়—মৃত্যু তার বিশিষ্ট রূপকে ভেঙে দিয়ে তাকে নব নব আকারে পুনরুজ্জীবিত করে। আনন্দ হচ্ছে জীবনের positive দিক, তার negative দিকটার কাজ হচ্ছে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তার প্রবাহকে পুনঃপ্রবর্তিত করা।

এই নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতির বোঝাকে যে বইতে হবে, তা নয়।

মানুষের জীবনের শৈশবকাল থেকে একটা ঐক্যধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে—বিস্মৃতির সিংহদ্বার দিয়ে সেই ধারাকে আসতে হয়েছে। আমাদের সচেতন জীবনের মধ্যেও কত বিস্মৃতির ফাঁক আছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ রয়েছে। যে সত্য আমাদের দেহে আবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তা আজ আমার চেতনার আলোয় বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই আলোরও মেয়াদ (term) আছে। এই বেড়ারও অবসান আছে।

এক একসময় ঠেলা আসে, তখন তার ধাক্কায় সব বিদীর্ণ হয়ে যায়। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের অবস্থানও ঠিক এই রকমের। সে যতক্ষণ পরিণতি লাভ করেছে, ততক্ষণ তার বৃদ্ধি সেই সীমাবদ্ধ জায়গাতেই আছে। কিন্তু এই পরিণতির শেষ হলেই তাকে বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে যেতে হবে। ব্যক্তি গত জীবনেরও এমনি করে adjustment হয়, তবে পরিণতির দ্বারকে ভাঙতে হয়—বিশালতার মুক্তিক্ষেত্রের জন্য।

এই কোনো দার্শনিক speculation-এর কথা নয়, এ হচ্ছে poetry-র কথা।—সত্যের positive দিক হচ্ছে আনন্দ। কিন্তু তার negative দিকও তার আছে। যদি সেটাকেই বড় করে দেখতুম তবে পদে পদে মৃত্যুর পদচিহ্ন চোখে পড়ত। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জরারই ছায়ার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে, সে চলেছে। যা দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে সত্যের positive দিকটা। তবে এ দুটো দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? যখন সীমার রূপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া অসীমের অন্য গতি নেই, তখন তাকে কারাগারকে ভেঙে ফেলেই বার বার শাশ্বত স্বরূপকে দেখাতে হবে।

(২)

স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে আমার বিলাতে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তাঁরও এই মত। আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা চক্র (cycle) আছে, সেটাকে যখন সম্পূর্ণ করব তখন স্মৃতির ধারা পূর্ণতা লাভ করবে। এখন আমার মনে নেই আমার পূর্বেকার জীবনে কি হয়েছিল, এখন আমার সামনের দিকেই গতি। একটা অধ্যায় যখন পূর্ণ হবে তখন পিছন ও সামনের সঙ্গে আমার যোগ হবে।

'জীবনদেবতা'র group-এর কবিতাগুলিতেও এই ব্যাপারটি ঘটেছে। আমার প্রথম কবিতাগুলিতে আমি নিজেই জানি না কি বলতে চেয়েছি। 'কে সে, জানি তাই তারে'—এই ভাবের মধ্যে দিয়ে group করতে করতে অজ্ঞাতভাবে আমার কবিতার ভিতর দিয়ে একটা অভিজ্ঞতাকে পেলাম। আমার চক্র সম্পূর্ণ হল, আমার অনুভূতির রেখাটি আবর্তন করে এসে আরেক বিন্দুতে মিলল—ঐক্যটি পরিস্ফুট হল, আমি বুঝতে পারলাম।

তেমনি করে জীবনের এক একটা চক্ররেখা (cycle) আছে। যখন তা সম্পূর্ণ হবে, তখন অনুভূতির ভেতর দিয়ে মর্মগত (significant) সত্যটিকে বুঝতে পারা যাবে। নভেল যখন সবটা শেষ করি, তখনই সব অধ্যায়ের সমষ্টিগত উপাখ্যান-ধারাটি পূর্ণ হয়। পিছনে যা ফেলে চললুম, তা দেখবার সময় নেই—আমাকে সামনে চলতে হচ্ছে। চলা যখন শেষ হয়ে চক্র পূর্ণ হল, তখন সম্মুখ-পশ্চাৎ মিলিত হল। আমার স্মৃতিগুলি ঐক্য-ধারায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

তর্কের দ্বারা এই সত্যের প্রমাণ হয় না, এ ব্যাপার আমাদের instinct-এর। যে পাখির ছানা (chick) ডিমের খোলসের মধ্যে আছে, তার কাছে প্রমাণ নেই যে বাইরে একটা

জগৎ আছে। তার আবেষ্টনটি বাইরের জগতের সম্পূর্ণ উল্টো! কিন্তু এই বাইরের জগতের প্রমাণ আছে তার instinct-এ তারই প্রেরণায় সে ক্রমাগত খোলসে ঘা দিচ্ছে। তার ভিতরে তাগিদ impulse আছে, তাঁর বিশ্বাস তাকে বলে দিচ্ছে—'এখানে স্থিতি, এখানে গতি নয়, কৃত্রিম আশ্রয় ভেঙে ফেল্।' অথচ খোলসের গণ্ডির মধ্যে এই মুক্ত জগতের কোনো প্রমাণ নেই।

মানুষের অভিজ্ঞতাও তেমনি আমরা দেখতে পাই। সব ধর্মের system-এ একটা অকৃতজ্ঞতার ভাব আছে; তা কেবল বলছে যে এই যে যা দেখছ তা শেষ কথা (absolute) নয়। সব ধর্মতন্ত্র বলছে যে বিরুদ্ধে যেতে হবে। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস বর্তমান আছে যে, যা দেখেছি তার চেয়ে যা অগোচর অপ্রত্যক্ষ তা ঢের বেশি মূল্যবান। সেই প্রেরণা, বিদ্রোহ আমাদের instinct-এ তার দেওয়ালে এই ধাক্কা মারতে ত্রুটি করছে না, যা প্রত্যক্ষ-গোচর তাকে সে আঘাত করছে, ঠোকর মারছে।

সব মনুষ্যত্বের বিশ্বমানবের ইতিহাসে এই প্রেরণা (urging) চলে আসছে। যা প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক যাকে তর্কের দ্বারা বোঝান যায়—তাকে মানুষ অবিশ্বাস করে এসেছে। বর্বরদের তো এই বিদ্রোহের ভাব নেই, কারণ তাদের জ্ঞানানুশীলন (culture) নেই। যখন আমার বুদ্ধি আমাকে স্থির রাখতে পারল না, এগিয়ে নিয়ে গেল। তখন সত্যকে পেলুম। যে সত্য আমার গণ্ডিকে অতিক্রম করে বর্তমান আছে, তাকে তখন আমি লাভ করলুম। মানুষ যেমন জ্ঞান-জগতে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি আমার অধ্যাত্মজগতের যে আবেষ্টন আছে, তার মধ্যেকার সত্যকে নেবার জন্য আমার personality-তে 'ভূমৈব সুখম্' এই বিশ্বাসের প্রেরণা রয়েছে। আমরা জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে মেনে নিচ্ছি না, তাই ক্রমাগত আবেষ্টনে ঠোকর দিচ্ছি। এই বিশ্বাসের দ্বারা যারা অনুপ্রাণিত, 'অমৃতাস্তে ভবন্তি',—তারাই অমৃতকে লাভ করে।

(৩)

প্রত্যেক form-এর মধ্যে দুটো জিনিস রয়েছে—খানিকটা তার প্রকাশিত আর বাকিটা তার আচ্ছন্ন। যা আচ্ছন্ন রয়েছে, একটা বিরুদ্ধ শক্তি তাকে ঘা না দিলে তার পূর্ণ বিকাশ হয় না। মৃত্যু প্রকাশের প্রবাহকে ক্রমাগত মুক্তি দান করে চলেছে। মৃত্যুতে form-এর কোনো বিনাশ হয় না। তার renewal বা নতুন নতুন প্রকাশ হয়।

॥ ঘ ॥

দুই নারী

(২৩-সংখ্যক)

এই কবিতাটি ১৩২১ সালের সবুজপত্রের ফাল্গুন মাসে 'দুই নারী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি এই কবিতার বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

সৃজনের প্রথম ক্ষণে দুইভাবের নারী অতল অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছিল। একজন সুন্দরী। তিনি উর্বশী। বিশ্বের কামনা-রাজ্যে আধিপত্য করেন। আরেকজন লক্ষ্মী, তিনি কল্যাণী। একজন স্বর্গের অপ্সরী। আর অন্যটি স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন হরণ করেন, আরেকজন পূরণ করেন।

একজন তপস্যাকে ভঙ্গ করে দেন। সেই ভাঙনে, যে আলোড়ন জেগে উঠছে সে যেন তাঁর উচ্চহাস্য। তিনি সুরাপাত্র নিয়ে দুই হাতে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মাদকতাকে আকাশে-বাতাসে বিকীর্ণ করে দিয়ে যান।

তাঁর আগমনে বিশ্ব যেন বসন্তের কিংশুকে গোলাপ ফেটে পড়তে চায়। সমস্তই যেন বাইরের দিকে বিকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যখন হেমন্তকাল আসে, তখন অন্য মূর্তি দেখি। তখন দেখি, তা ফল ফলিয়েছে, আপনাকে পূর্ণতার ভিতরে সম্বৃত করেছে; তখন বসন্তের আত্মবিস্মৃত অসংযম অন্তরে পরিপাক পেয়ে সফলতায় পরিণত হয়েছে। এক নারী সেই বসন্তের আবেগকে বাইরের তাপে আন্দোলিত করে দিলেন, অন্যজন তাকে শিশিরস্নাত করে অন্তরের মাধুর্যে ফলবান করে তুললেন।

হেমন্তকাল যখন ফসল ফলল, তখন তার মধ্যে চঞ্চলতা রইল না, সমস্ত স্তব্ধ হল. তার মধ্যে দক্ষিণ-বাতাসের মাতামাতি থেমে গেল। হেমন্ত সেই আপনার শান্ত সফলতাটিকে বিশ্বের আশীর্বাদের দিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

পুষ্পের মধ্যে প্রাণের প্রকাশের অধৈর্য আছে। কিন্তু তার এই জীবনের আবেগ তাকে একটি পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—তাকে মৃত্যুর সীমায় গিয়ে পৌঁছতে হয়—তবেই সে চরম সার্থকতা লাভ করে, ফলে পরিপক্ক হয়। জীবন যদি আপনারই সীমা-রেখার মধ্যে পর্যাপ্ত হত, তবে মৃত্যু হঠাৎ এসে তাকে ভয়ানক বিচ্ছেদে নিয়ে যেত এবং মৃত্যু তার একান্ত বিরুদ্ধ হত কিন্তু মৃত্যুকে যখন কল্যাণের দিক দিয়ে দেখব, তখন বুঝব যে জীবন তার সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতের মধ্যেই প্রবেশ করছে।

সীমার মধ্যে এই অনন্তের আভাস, সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টির মধ্যে অনির্বচনীয়ের প্রকাশের মত। শিল্পীর রচনার মধ্যে যে সংযমের ব্যঞ্জনা আছে তার দ্বারা মনে হয় যে সবটা যেন বলা হল না। কিন্তু নেই বলতে গিয়ে থেমে যাওয়ার মধ্যে প্রকাশের অসম্পূর্ণতা বা অপরিস্ফুটতা নেই; কারণ সেই কবিতা বা চিত্র বলাকে অতিক্রম করে, যা অনির্বচনীয় তাকেই ব্যক্ত করে এবং এই সংযমের সঙ্গে তার বাণীর পূর্ণতার বিরোধ নেই। জীবনের নিত্য আন্দোলনের মধ্যে তখনই অসমাপ্তিকে দেখি, যখন মনে হয় যে মৃত্যু তাকে ভয়ানক নিরর্থকতায় নিয়ে যাচ্ছে। যখন মৃত্যুর মধ্যে জীবনের একান্ত বিচ্ছেদ দেখি তখনই কাড়াকাড়ি,

তখনি বিরোধ ঘোচে না। কিন্তু যখন কল্যাণকে লাভ করি তখন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনের পরমার্থতা ও অসীমতা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

আমাদের জীবনের এই ব্যঞ্জনারই প্রতীক আমরা প্রকৃতির মধ্যে পাই। গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে সেখানে সে আপন চরম অর্থকে লাভ করছে। এক জায়গায় এসে নিরর্থকতার মরুভূমিতে তো সে ঠেকে যায় নি—তাহলে হয় তো মৃত্যু তার কাছে ভয়াবহ হত। কিন্তু সে যখন সমুদ্রে বিশ্রাম পেল, তখনই তার পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। তাই তার শেষটা ভয়ানক পরিণাম বলে বোধ হয় না। সেই গঙ্গাসাগরের সঙ্গমস্থলই অনন্তের পূজামন্দির। কল্যাণী যিনি, তিনি উদ্ধত বাসনাকে সেই পবিত্র সঙ্গম তীর্থে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। একজন সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেন। অন্যজন তাদের সেখানে ফিরিয়ে আনেন। যেখানে শান্তির পূর্ণতা সেখানে লক্ষ্মীর স্থিতি।

উর্বশী আর লক্ষ্মী, এরা মানুষের দুটি প্রবর্তনার প্রেরণার প্রতিরূপ। সর্বভূতের মূলে এই দুই প্রবর্তনা আছে। একটি শক্তি, সে ভিতরে যা-কিছু প্রচ্ছন্ন আছে তাকে উদ্‌ঘাটিত করে, এবং আরেক শান্তি, সে অন্তর্নিহিত পরিপক্কতার মধ্যে সফলতার পর্যাপ্তিতে নিয়ে যায়—তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে।

ভাঙা-চোরা যখন চলতে থাকে, জীবনে যখন অভিজ্ঞতার ভূমিকম্প হতে থাকে, তখন তার মধ্যে যথেষ্ট বেদনা আছে। সেই উদ্দাম শক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু কেবল যদি এই চঞ্চলতাতেই তার সমাধি হত, তবে দুর্গতির আর অন্ত থাকত না। তাই দেখতে পাই এর মধ্যে লক্ষ্মীর হাত আছে। তিনি বাঁধন-ছাড়া তানকে শমের দিকে ফিরিয়ে এনে ছন্দ রক্ষণ করে। যে প্রলয়ঙ্করী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি সেই শক্তিই একান্ত হয়, তবেই সর্বনাশ ঘটে। কিন্তু সে তো একা নয়, গতি প্রবর্তিত করবার জন্যে সে আছে; গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আরেক শক্তি আছে তাকেই বলি কল্যাণী। এই নিয়ন্ত্রিত গতি নিয়েই তো বিশ্বের সৃষ্টি-সঙ্গীত।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' আর 'শকুন্তলা'র মধ্যে এই দুই শক্তির কথা আছে। শিবের তপস্যা যখন ভাঙল তখন অনর্থপাত হল, আগুন জ্বলে উঠল। সেই অগ্নি আবার নিবল কিসে? গৌরীর তপস্যা দ্বারা।

'শকুন্তলা'র প্রথমাংশ ঠিক এইভাবে ট্র্যাজেডিকে দেখানো হয়েছে। প্রবৃত্তি শকুন্তলাকে উদ্দাম করেছিল। কিন্তু পরে আবার যখন তপস্যার দ্বারা শকুন্তলা কল্যাণী হয়ে জননী হয়ে শান্ত চিত্ত হলেন, তখন তাঁর ইষ্টলাভ হল।

কালিদাসের এই দুটি কাব্যে মানুষের দুই রকমের প্রবর্তনার কথা উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। গৌরী আর শকুন্তলা নারী ছিলেন, এটাই কাব্যের আসল কথা নয়—কিন্তু এঁদের উপলক্ষ্য করে শক্তির দ্বিবিধ মূর্তি ফুটে উঠেছে। সেটাই কালিদাসের আসল দেখাবার জিনিস। গৌরী অনেক দিন শান্তভাবে শিবের সেবা করে আসছিলেন। কিন্তু যে ধাক্কায় তিনি শিবের জন্যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন, সেই ধাক্কা এল যার কাছ থেকে, তাকে আমরা কল্যাণী বলিনে, তবু সে না হলে শিবকে জাগাবারও উপায় থাকে না। শিব যখন আপনার মধ্যে আপনি নিবিষ্ট, তখন তাঁর থাকা না-থাকা সমান। যে-শক্তি চঞ্চল করে, তাকে বর্জন করে যে শান্তি, সে শান্তি মৃত্যু;—তাকে সংযত করে যে শান্তি তাতেই সৃষ্টি; অতএব তাকে বাদ দেওয়া চলে না।

শকুন্তলা সংসারে অনভিজ্ঞ, তার সরলতার মধ্যে যে-শান্তি সে যেন অফলা গাছের

ফুলের মতো। ভরতকে যে চাই। সেই চাওয়ার মূল ধাক্কাটা শকুন্তলাকে যে দিলে সে তাকে দুঃখই দিলে। কিন্তু এই দুঃখের ভিতর দিয়ে যখন সে জীবন পরিণতির মধ্যে এসে পৌঁছল তখনি সে সত্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সাঙ্গ করলে। এই প্রদক্ষিণ যাত্রার প্রথম বিপক্ষ বেদনা, শেষ পরিসমাপ্তিতে শান্তি।

গ্যেটে যে চার লাইনে শকুন্তলার সমালোচনা করেছেন, আমার মনে হয় সেটা তিনি খুব ভেবে চিন্তেই লিখেছিলেন। একথা আমি আগেও বলেছি। তিনি বলেছেন যে, কালিদাস ফুলকে ও ফলকে; স্বর্গকে ও মর্ত্যকে একত্রিত করেছেন; এর মধ্যে গভীর অর্থ আছে। এটা নিতান্ত কবিত্বের উক্তি নয়। কুঁড়ি থেকে ফোটা ফাউস্ট প্রথমে নির্জনে বাস করছিলেন—জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বইয়ের পাতার মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। সেই কুঁড়ির মধ্যে পাপের আঘাত ছিল না। তিনি বল্লেন যে এখানেই যদি সব শেষ হল তবে এই দুর্গতির যথার্থ পরিসমাপ্তি হল না;—এবার হাওয়ায় আছাড় খেয়ে সেই ফিরে পাবার পথকে পেতে হবে। সে যদি বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝরে পড়ত, তবে তো তাতে ফল ধরত না, তবে তো সে ফিরে পাবার পথ পেত না। শকুন্তলার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না, জগতের ভাল-মন্দের বিষয় সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সে তপোবনে সখাদের সঙ্গে সঙ্গে সরল মনে আলবালে জল-সেচনে ও হরিণ শিশু প্রতিপালনে নিরত ছিল। সেই অবস্থায় সে বাইরে থেকে কঠোর আঘাত না পেলে তার জীবনের বিকাশ হত না। সেখানে জীবনের পতন, দুঃখ সেখানে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কালিদাস তাকে তা শেষ করতে দেন নি। তিনি Problem of Evil নিয়ে পড়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে জগতে কিছুই স্থির হয়ে নেই, তাই কুঁড়ির থেকে ফুল, তার থেকে ফল হচ্ছে, কোনো জায়গায় ছেদ নেই।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা কালিদাসের এই বইকে নীতি উপদেশমূলক (didactic) বলবে। কিন্তু যা ধর্মনীতির দিক দিয়ে ভালো সেও কল্যাণ নীতির দিক ভালো হবে না এমন তো কোনো কথা নেই। শিবের সতী সৌন্দর্যেরও সতী। উমা যখন বসন্ত পুষ্পভবনে সেজে এসেছিলেন, তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যমদে বিশ্ব মত্ত হয়ে উঠেছিল। উমা যখন তপস্বিনী সেজে আভরণ পরিত্যাগ করলেন, তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যসুধায় দেবতা পরিতৃপ্ত হলেন। দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য সত্যের কল্যাণমূর্তিকে যত্নপূর্বক পরিহার করতে চায়, পাছে পাঠকেরা বলে বসে এ মূর্তি সত্য নয়। পাঠকদের চেয়ে বড় হয়ে উঠে কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর বলবার সাহস তার নেই। সত্যকে বিরূপ করে দেখিয়ে তবে সে প্রমাণ করতে চায় যে, সত্যের সে খোসামুদি করে না। সত্যের সুন্দর রূপ প্রকাশ করাকে তারা ইস্কুল-মাস্টারি বলে ঘৃণা করে। একথা ভুলে যায়—নীতি বিদ্যালয়ের ইস্কুল-মাস্টার কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থে পরিণত করে তুলেছে—কবি যদি সেই বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে সত্যের পূর্ণতা দেখাতে পারে তাহলেই কবির উপযুক্ত কাজ হয়।

—শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৩০।

রবীন্দ্রনাথের বের্গসঁর মতো দুটি চেষ্টা স্বীকার করেন।—অবিরাম চলা এবং চলা হতে মুক্তির অন্বেষণ। বের্গসঁ একটিকে সত্যানুসন্ধান ও অপরটিকে জীবনধারনাপযোগী যন্ত্রানুসন্ধান বলেন; রবীন্দ্রনাথ দুটিকেই সত্যানুসন্ধান বলেন ও এদের একটিকে 'উর্বশী' ও অপরটিকে 'লক্ষ্মী' নাম দিয়েছেন। উর্বশী ও লক্ষ্মী মানুষের দুটি প্রবর্তনার প্রতিরূপ—একটি শক্তি। ভিতরের প্রচ্ছন্নকে উদ্‌ঘাটিত করে; আর একটি শান্তি সে অন্তর্নিহিত পরিপক্কতার মধ্যে

সফলতার পর্যাপ্তিতে নিয়ে যায়—তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে। একজন গতি প্রবর্তিত করেন, অপর জন গতি নিয়ন্ত্রিত করেন। এক নারী বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাইরে বিকীর্ণ করে দেন, অন্যজন বিশ্বকে শিশিরস্নাত করে অন্তরের মাধুর্যে ফলবান করে তোলেন। যিনি কল্যাণী লক্ষ্মী তিনি উদ্ধত বাসনাকে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। যেখানে শান্তির পূর্ণতা লক্ষ্মীর স্থিতি সেখানে।

॥ ৬ ॥

স্বর্গ কোথা জানিস কি তা ভাই

(২৪-সংখ্যক)

'বলাকা' কাব্যের ২৪-সংখ্যক কবিতাটির বিশ্লেষণ কবি স্বয়ং এইভাবে করেছেন—

মানুষ যে স্বর্গকে খোঁজে, তাঁকে সে পৃথিবীর বাইরে মনে করে। তাই সেই স্বর্গে পৌঁছবার জন্য সে সমস্ত ত্যাগ করে, সংসার ভাসিয়ে দেয়। যে স্বর্গকে মানুষ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জানে, তা অস্পষ্ট অব্যক্ত সৃষ্টিছাড়া।

(১ম শ্লোক)

আমি অনেকদিন পর্যন্ত সেই সৃষ্টিছাড়া স্বর্গে অব্যক্তের ভিতরে শূন্যে শূন্যে ঘুরেছিলাম। সেই স্বর্গ, যা অস্ফুট ছিল—যার অবস্থা প্রকাশের পূর্বেকার অবস্থা, তার থেকে যেই আমি মাটিতে জন্মালাম, পরম সৌভাগ্যে এই ধুলো-মাটির মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এলাম। আমি সুস্পষ্ট রূপলোকে স্থান পেলাম।

আমার এই জন্মলাভ যেন অনেকদিনকার সাধনার ফলে, এই স্বর্গের ধারণা যেন কেবল একটা ইচ্ছারূপে ছিল, তা প্রথমে রূপ ধরে নি।

অনেকদিন পর্যন্ত যেন সৃষ্টিনাট্যের নেপথ্য গত একটি ইচ্ছাস্বর্গের মধ্যেই ঘুরছিলাম। ভাবুকের মনের মধ্যে যখন কোনো একটা ভাব থাকে, তখন সে এটি বৃহৎ অপ্রকাশের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু যেই সে-ভাব একটু রূপ গ্রহণ করল, অমনি অনেকখানি ভাবের নীহারিকা ব্যক্ত আকার ধারণ করল। অতখানি ব্যাপক অস্ফুটতা যেন সার্থক হয়ে গেল। যে-স্বর্গ অব্যক্ত তা অনন্ত অসীম হতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র পরিমাণে রূপ দান করেও অনন্ত ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভ করে। তাই আমার পক্ষে মানুষ হয়ে জন্মানো বড় কথা। এই যে আমি আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করছি, তার মধ্যে যেন অব্যক্ত অসীমের সৌভাগ্য বহন করছি। এই যে আমি ধুলোমাটির মানুষ হয়েছি এই হাওয়ার মধ্যেই কত যুগের পুণ্য। আমার দেহে স্বর্গ তাই কৃতার্থ।

সেই স্বর্গ আমাকে আশ্রয় করে খেলা করতে পারল। আমাকে নিয়ে যে জন্ম-মৃত্যুর ঢেউ উঠল তার সংঘাতের দোলে সে আপনাকে দোলাতে পারল। স্বর্গ আমার মধ্যে নিত্য নবীন আনন্দচ্ছটায় লীলায়িত হচ্ছে, আমার ভালোবাসা বিচ্ছেদ-মিলন, লাভ-ক্ষতি এই সমস্তকে আপন খেয়ালে ভেঙেচুরে নানা রঙে বিচ্ছুরিত করছে।

(২য় শ্লোক)

স্বর্গ নীরব ছিল, তার মুখে বাণী ছিল না। আমি সেই গান গাইলাম, অমনি সেই স্বর্গ বেজে উঠল। সে আমার প্রাণের গানে আপনাকে খুঁজে পেল। আমার মধ্যে অব্যক্ত আপনার যে লক্ষ্যকে খুঁজছে, তাকে আমার প্রাণের গতির মধ্যে অভিব্যক্তির মধ্যে লাভ করেছে। তাই অসীম আকাশ আজ আমার মধ্যে নিবিষ্ট, তাই আমার সুখ-দুঃখের ঢেউয়ের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ সংহত।

আজকে দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে শঙ্খধ্বনি উঠেছে সে তো আমার প্রাণেরই ক্ষেত্রে, আমারই মধ্যে। সাগর তার বিজয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে—সে তো বাজছে আমারই চিত্তকূলে। আমি প্রাণ পেয়েছি, চেতনা পেয়েছি, এই জন্যই তো অঙ্গনে অঙ্গনে শব্দলোকের শঙ্খ বেজে উঠল—নইলে বাজবে কোথায়? তাই তো ফুল ফুটেছে। পুরাঙ্গনারা যেমন অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে উলুধ্বনি করতে করতে ছুটে আসে, তেমনি আমি আসাতে ফুলের ঝরণা-ধারার মধ্যে হুলস্থূল বেধে গেছে; অনন্ত স্বর্গ মাটির মায়ের কোলে আমার মধ্যে জন্মেছে,—বাতাসে এই বার্তা চারিদিকে প্রচারিত হল।

(৩য় শ্লোক)

এ পর্যন্ত এই শ্লোকগুলির মানে যা বললাম তাতে একে একরকম ব্যাখ্যামাত্র করা হল। কিন্তু কবিতা তো তত্ত্ব নয়, তা রস। কবি যে আনন্দের কথাটা এই কবিতায় বলতে চাচ্ছেন, সে হচ্ছে প্রকাশের আনন্দ।

সন্তান যখন বাপ-মার কোলে জন্মাল, তখন বিপুল আনন্দে ঘর ভরে উঠল—এ যেমন আমাদের মানবগৃহে, তেমনি অসীমের ক্ষেত্রেও; রূপ যখনই বাস্তব হয়ে উঠল তখনও এই ব্যাপারটি ঘটছে। বাস্তব হচ্ছে কোন্‌খানে? আমারই চৈতন্যের আলোকিত ক্ষেত্রে। এই জন্যে আমার চোখে যে মুহূর্তে দৃষ্টি জাগল অমনি যেন সোনার কাঠির স্পর্শে একটা সম্পূর্ণ বিশ্ব জেগে উঠল। যেই আমার কাজের দ্বারে চৈতন্য এসে দাঁড়াল, অমনি শব্দের জগতে এ কী কোলাহল! এই যে আমার চিত্তের প্রাঙ্গণে প্রকাশের মহামহোৎসব উঠেছে, কবি তারই বিচিত্র বিপুল আনন্দের কথা এই কবিতায় বলেছেন। এর তত্ত্ব কত লোকে কত রকম করে বুঝবে বোঝাবে? কিন্তু এর রসটুকুই কাব্যে প্রকাশ করা চলে।

যা স্পষ্ট নয়, ব্যক্ত নয়, সেই ঠিকানাহীন দেশকে আমি 'স্বর্গ' নাম দিচ্ছি।

পুণ্য সঞ্চয় করলেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে এই কথাই চলতি কথা; কিন্তু আমি বলছি যে, আমি স্বর্গ থেকে পুণ্যের জোরে মর্ত্যে নেমে এসেছি, আমি যখন গণ্ডিবদ্ধ প্রকাশের মধ্যে পরিস্ফুট হলাম, তখনই আমার সকল অপূর্ণতা সত্ত্বেও মর্ত্যের মধ্যে স্বর্গ ধন্য হল।

এই স্বর্গ-মর্ত্যের ভাবটা বহুপূর্বে আমার বাল্যকাল থেকেই আমাকে অনুসরণ করেছিল।

অল্প বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই আইডিয়ার ব্যাকুলতাকে আমি এক রকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। সন্ন্যাসী বললে—"যে ভববন্ধন সীমার শৃঙ্খলে আমাকে বেঁধে রাখে, আমি তাকে ছিন্ন করে অসীম প্রাণকে পাবার জন্য তপস্যা করব।"—সে লোকালয়কে তুচ্ছ মায়া, অন্ধতার গহ্বর বলে সমস্ত ত্যাগ করে দূরে চলে গেল। আকাশের রস-গন্ধ বর্ণচ্ছটা সব তার চৈতন্যের মধ্য থেকে অপসারিত হল; সে আপনাকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার করে অসীমকে পাবার জন্য পণ করল। তারপর কোথা থেকে একটি ছোট মেয়ে দেখা দিল; সে নিরাশ্রয় ছিল। সন্ন্যাসী তাকে গুহায় নিয়ে এল। মেয়েটি তাকে ধীরে ধীরে স্নেহের বন্ধনে বাঁধাল, তখন সন্ন্যাসীর মনে ধিক্কার হল। সে ভাবতে লাগল যে, এই তো প্রকৃতি মায়াবিনী দূতী হয়ে এমনি করে মেয়েটিকে পাঠিয়েছে, সে সন্ন্যাসীকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন করে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়। এই সংগ্রাম যখন চলছে—তখন একদিন সে ক্রোধের বশে মেয়েটিকে ত্যাগ করল; মেয়েটি যাকে নিতান্তভাবে আশ্রয়স্থল বলে জেনেছে, তার সেই অবলম্বন চলে যাওয়াতে সে ছিন্ন লতার মতো লুটিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী যতদূরে সরে যেতে লাগল, ততই মেয়েটির ক্রন্দন তার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হতে

লাগল। শেষে মেয়েটি যে বাস্তব, মায়া নয়—তা সে হৃদয়ের বেদনার আঘাতে বুঝতে পারল। মনের এই অবস্থায় সে দূরে দাঁড়িয়ে লোকালয়ের দৃশ্য দেখতে লাগল,—তার মাধুর্যে, মানুষের স্নেহপ্রীতি সম্বন্ধের সরসতায় তার মন ভরে উঠল। সে বললে—"ফেলে দিলুম আমার দণ্ড কমণ্ডলু—দূর হয়ে যাক এসব আয়োজন। সীমাকে বর্জন করে তো আমি কোনো সত্যই পাইনি। একটি ছোট মেয়েকে স্নেহ করতে পেরেছিলুম বলেই তো সেই রসের মধ্যে অসীমকে পেয়েছি—তার বাইরে তো সেই অনন্ত স্বরূপের প্রকাশ নেই।"—এই ভাবটাই আমার নাটিকাটির মূল সুর।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র প্রতিপাদ্য বিষয়টা বাল্যকালে আমার নানা কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। সীমার সঙ্গে যোগেই অসীমের অসীমত্ব, একথা ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, 'অবিদ্যা' বা সীমার বোধকেই একান্ত বলে জানার মধ্যে অন্ধ তামসিকতা আছে; আবার অসীমের বোধকেই একান্ত করে দেখার মধ্যেও ততোধিক তামসিকতা আছে; কিন্তু যখন বিদ্যা অবিদ্যাকে মিলিয়ে দেখব তখনই সত্যকে জানব।

সীমাকে নিন্দা করা গায়ের জোরের কথা। ঐকান্তিক (absolute) সীমা বলে কিছু নেই। সব সীমার মধ্যেই অনন্তের আবির্ভাবকে মানতে হবে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী সীমাকে 'না' করে দেওয়ায় যে মুক্তি, তার মধ্যে দিয়েই সার্থকতাকে চেয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে যায় অন্ধকারে।

তেমনি আবার সীমা-জগৎকে অসীম থেকে বিযুক্ত করে দিয়ে তার মধ্যে বদ্ধ হলে সেও ব্যর্থতা। কাব্যে শব্দকে বাদ দিয়ে যে রসিক রসকে পেতে চায়, সেই কিছুই পায় না। আবার রসকে বাদ দিয়ে যে পণ্ডিত শব্দকে পেয়ে বসে তার পণ্ডতারও সীমা নেই।

॥ চ ॥

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান

(২৮ সংখ্যক)

কবি বলছেন—আমি যদি পাখির মতন অচেতন হতাম, তা হলে আমি যে দান পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম; কিন্তু আমার চিত্তের ক্রিয়ার পরিচয় তখনই পাই, যখন আমি দানের চেয়ে অধিক প্রতিদান করি। এই পাওয়ার চেয়ে অধিক দেওয়াতেই সৃষ্টি শক্তির পরিচয়; যেখানেই আমার চিত্তের ক্রিয়া সেখানেই সৃষ্টি; কেবল গতিতেই সৃষ্টি হয় না।

আমার সৃষ্টি-শক্তি আছে বলেই আমি অসীমকে প্রকাশ করতে পারি। আমি যদি কেবলমাত্র অসীমের ছায়ামাত্র হতাম, তা হলে আমার মধ্যে তাঁর, প্রকাশ সম্ভব হত না।

সুর তোমার দান, কিন্তু আমার গান তদতিরিক্ত প্রত্যর্পণ। মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে রিক্ত হয়ে মুক্ত-হস্ত তোমার সেবায় নিযুক্ত করার সাধনা আমার নিজস্ব। বন্ধন থেকে মুক্তি আমারই উদ্ভাবনা। ধরণী তোমার সৃষ্টি, কিন্তু স্বর্গ রচনার ভার আমার উপর—তাই কবি অন্ধকার থেকে আলো ছেঁকে, মৃত্যু থেকে অমৃত আহরণ করে তাঁর জীবনের দুঃখভার দিয়ে স্বর্গ রচনা করবেন। কবি বলেছেন—

"আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও!"

অর্থাৎ, তোমার চাওয়ার তাগাদায় মানুষের শান্তি নেই,—তোমার চাওয়ার তাগাদাতেই সে আপনার অন্তর্নিহিত সম্পদকে ক্রমাগত ব্যক্ত করে।

কবি এই কবিতায় যে কথা বলেছেন, মানুষের ইতিহাসেও এই বাণী নিহিত আছে—পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার আরো বেশি সম্পদ দিয়ে ঐশ্বর্যশালী করে আমাদের উত্তরাধিকারীদের দান করতে হবে—এই অধিক দান করতে পারাতেই মানুষের গৌরব।—

"মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে
তুমি পাও।"

কবি নিজে এই কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তাও এখানে উদ্ধৃত হল—

তুমি মানুষ ছাড়া আর সব জীবকে যেটুকু দিয়েছ সে সেইটুকুই প্রকাশ করে। পাখিকে সুর দিয়েছ সে সেই বাঁধাসুরের দানটি বারবার ফিরিয়ে দেয়। তার বেশি সে দেয় না। আমাকে তুমি যে-সুর দিয়েছ, সে সুর তোমার কিন্তু আমি তার বেশি তোমায় ফিরিয়ে দিই—আমি যে গান গাই, সে গান আমার।

(১ম শ্লোক)

তুমি বাতাসকে ধরে রাখোনি। তার কোনো বাঁধন নেই, সে অনায়াসে তোমার সেবা করে, বিশ্বকে বেষ্টন করে কাজ করে। আমাকে তুমি যত বোঝা দিয়েছ তাকে আমার বয়ে বয়ে বেড়াতে হয়। আমার সেই বন্ধন থেকে মুক্তিকে আপনিই উদ্ভাবন করতে হয়। আমি

একে একে নানা বন্ধনদশার পাশমোচনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর থেকে মৃত্যুতে আপনাকে রিক্তহস্ত বয়ে বসে নিয়ে যাব। আমি তোমার সেবার জন্য স্বাধীনতা অর্জন করব। এই হাত দুটিকে মুক্ত করে তোমার কাজের জন্য নিযুক্ত করব, বলব—তোমার আদেশে তোমারই কাজে এখন থেকে প্রবৃত্ত হলাম। তুমি আমাকে বন্ধন দিলে, কিন্তু আমাকে ভিতর থেকে মুক্তিতে বিলীন হতে হবে,—আমার কাছে তোমার দাবী বেশি।

(২য় শ্লোক)

তুমি পূর্ণিমার হাসি ঢেলে দিয়েছ—ধরণীকে হাস্যময় সৌন্দর্য দান করেছ। ধরণীর অন্তস্তলে যে-রস নিহিত আছে, সে ফিরে সেই রসকে ঢেলে দিচ্ছে। কিন্তু আমায় তুমি দুঃখ দিয়েছ, তার ভার আমায় বইতে হচ্ছে। সমস্ত জীবনের এই দুঃখকে অশ্রু জলে ধুয়ে ধুয়ে তাকে আনন্দ করে তুলে আমাকে তোমার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে—তোমার কাছে নিবেদন করতে হবে। আমি দিনশেষে মিলনক্ষণে সকল দুঃখকে আনন্দময় করে তোমার কাছে নিয়ে যাব—আমার উপর এইভার রয়েছে।

(৩য় শ্লোক)

তুমি তোমার এই ধরণী মাটি দিয়ে তৈরি করেছ, এই ধরণী আলো-অন্ধকারে সুখ-দুঃখে মিলিত হয়ে রয়েছে। আমায় তুমি এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছ, কিন্তু কছু সম্বল সঙ্গে দিলে না,—একেবারে হাত শূন্য করে দিয়েছ, আর আড়ালে থেকে তুমি আমায় দেখে হাসছ। তুমি আমাকে এমনি অবস্থায় মাটিতে রেখে দিয়ে বললে; "তোমার উপর ভার হচ্ছে—এখানে স্বর্গ রচনা করবার। তুমি অন্ধকার থেকে আলো উদ্ভিন্ন করে, মৃত্যু থেকে অমৃতকে বহন করে এনে তোমার আপনার জীবন দিয়ে এই মর্ত্যলোকে স্বর্গ গড়ে তুলবে, তোমার উপর এই ভার রইল।"

(৪র্থ শ্লোক)

প্রকৃতিতে সব জীবকে তুমি তোমার দানের দ্বারা ভূষিত করলে এবং যাদের যা দিয়েছ তারা সেই সম্পদকেই প্রকাশ করছে। কেবল আমার কাছে তোমার দাবী রয়েছে, আমার কাছে তোমার আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। তাই আমি নিজের প্রেম দিয়ে যে অর্ঘ্য রচনা করে দিচ্ছি, সেই রত্নের দান তুমি তোমার সিংহাসন থেকে নেমে এসে বক্ষে তুলে নাও। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার পরিমাণ অল্প। কিন্তু আমি যে দান তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তা অনেক বেশি।

তুমি আমাকে অল্প দিয়ে তোমার জীবলোকে ছোট নগণ্য প্রাণী করে দাও নি, কারণ, আমার প্রতি তোমার যে-দাবীর জোর আছে তাতে আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন তা আমার জীবন থেকে উৎসারিত হয়। আমি কেবল স্বর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তোমার দাবী আছে বলে তা সঙ্গীত হয়ে প্রকাশিত হয়। তুমি আমাকে বন্ধন দিয়েছ, কিন্তু বলেছ যে এই বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলতে হবে। তুমি চাও যে আমি মুক্তি লাভ করি। তোমার দাবী আছে বলেই মানুষকে দুঃখের উপর জয়যুক্ত হয়ে সেই দুঃখকে আনন্দধারায় ধৌত করে পূর্ণ করে তুলতে হয়—তুমি পৃথিবীকে আপনি রচনা করলে, কিন্তু স্বর্গ রচনা করবার ভার দিলে মানুষের উপর। পৃথিবীতে মানুষের যে সূচনা হল, তাকে তো জ্যোতির্ময় বলা যায় না। কিন্তু মানুষকে

সেই শূন্যতা থেকে এই মর্ত্যধামেই অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত স্বর্গ রচনা করে তুলতে হবে। তাই মানুষ স্থির হয়ে বসে নেই—তার বিরাম নেই, শান্তি নেই। তার সঙ্গে তোমার এই যে কঠিন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে তারই তাগিদে সে আপনার অন্তর্নিহিত সম্পদকে ক্রমাগত ব্যক্ত করে। তাই তোমার জন্য তার যে প্রেমের অর্ঘ্য রচিত হয়, তাকে তুমি বহুমূল্য রত্নের মতো আদরের সঙ্গে বক্ষে তুলে নাও।

মানুষ তার ইতিহাসে যে মূলধন নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে, তার মধ্যেই তো সে থেমে থাকে না। সাহিত্য-রাজনীতি-ধর্ম-কর্ম মতে সে ক্রমাগত উদ্ভিন্ন হয়ে উঠছে। মৌমাছিরা যখন চাক বাঁধতে শুরু করে, তখন যার যে পরিমিত সামর্থ্যটুকু আছে, সে সেই অনুসারে একই বাঁধাপথে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে কাজে লেগে যায়। কিন্তু মানুষ তো সংকীর্ণ পথে চলে না; তার যে কোথাও দাঁড়াবার জো নেই। তার হাতে যে উপকরণ আছে, তাকে বিশালতর করে তুলতে হয়। সে আপনাকে আরো বিকশিত করবে, সে আরো এগিয়ে চলবে। ইতিহাসে তার এই আহ্বান রয়েছে।

মানুষের বর্তমান ইতিহাসেও এই বাণী রয়েছে। সে অতীত মানবদের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না—যা পেয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পদ দিয়ে তার সাজি ভরতে হবে। মানুষের এই গৌরব আছে, সে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলল, বলল—এই মাটির ধরা আমাকে যা দিয়েছে, আমি তার চেয়ে আরো বেশি একে দিয়েছি।

"দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে থুয়ে"—

যেখানে অপূর্ণতা সেখানেই শক্তির খর্বতা; সেখানেই দুঃখ। যখন মানুষের বাইরের অবস্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্য ঘটে, সে জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্যকে পায় না, তখন তার জীবন-বীণা ঠিক সুরে বাজে না। এই যে দুঃখের বাধা মানুষের পথ রোধ করে, এরই ভিতর থেকে তাকে পথ কেটে বার হতে হবে। সে শক্তি খাটিয়ে মহত্ত্বকে বাধামুক্ত করে প্রকাশ করবে, সকল আন্তরিক দৈন্য অপসারিত করে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবে—এই তার সাধনা। তার এই গোড়াকার দৈন্যই যদি চরম হত, তবে সে একরকম করে বোঝাপড়া করে নিতে পারত? কিন্তু তার অন্তরে ধর্মবুদ্ধি বা আর কোনো অনুভূতির চেতনা আছে,—যা তাকে ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে, সম্মুখ পানে চালিত করছে।

॥ ছ ॥

সে দিন তুমি আপনি ছিলে একা

(২৯-সংখ্যক)

২৯-সংখ্যক কবিতাটি আগের কবিতার আনুষঙ্গিক, এমন যেন কেউ মনে না করেন যে এতে আমি সৃষ্টির আরম্ভের কোনো বিশেষ সময়কার কথা বলেছি; এতে কোনো সৃষ্টিতত্ত্ব নেই, এখানে 'আমি' মানে ব্যক্তিবিশেষ নয়, 'আমি' মানে হচ্ছে যে-আমি ব্যক্তজগতের প্রতিনিধি- স্বরূপ। বিশেষ সময়ে আমি সৃষ্টি হয় নি; এমন কোনো এক সময় ছিল যখন আবী ঃ যিনি, তাঁর প্রকাশ ছিল না—তা বিশ্বাস করা যায় না।

(১ম শ্লোক)

তুমি যে কোনো সময়ে অব্যক্ত ছিলে তা নয়, কিন্তু যদি কল্পনা করা যায় যে আমি কোথাও নেই, তবে সেই অবস্থায় কি রকম হবে? এখানে তাই আমি বলেছি, আমি যখন ছিলাম না, তখন তুমি আপনাকে দেখতে পাও নি। সে অবস্থায় কারো জন্যে তোমার পথ চাওয়া ছিল না। এই যে সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে আজ ধীরে ধীরে আমার বিকাশ হচ্ছে, এই যে আমার এই চলার জন্য তোমার অপেক্ষা আছে, এই যে তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকো, তখন এসব কিছুই ছিল না। যখন আমর অস্তিত্ব ছিল না বলে আমি কল্পনা করছি, তখন এই যে দু'পারের আকাঙ্ক্ষার আবেগের হাওয়া আজ বইছে, তা ছিল না। আজ আমার থেকে তোমার কাছে, আর তোমার থেকে আমার কাছে কিছু কিছু aspiration আকাঙ্ক্ষা আসছে-যাচ্ছে—আমাদের উভয়ের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার আসা-যাওয়ার হাওয়া বইছে। কিন্তু সেদিন তা ছিল না—এপারের সঙ্গে ওপারের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

(২য় শ্লোক)

আমার মধ্যেই তোমার সুপ্তির থেকে জাগরণ হল। আমার মধ্যেই বিশ্বের প্রকাশ হল— বিশ্ব যেন ঘুম থেকে উঠল। আলোর যে ফুল ফুটল। তা আমার জন্যই বিকশিত হল, নইলে তার দরকার ছিল না। আমাকে তুমি এখানে নিয়ে এসে কত রূপে যে ফোটাচ্ছ তার ঠিক নেই। তুমি কত রূপের দোলায় আমাকে দোলালে—("আমাকে"—অর্থাৎ আমায় নিয়ে যে বিশ্ব, যে দৃশ্য, সেই সকলকে)।

তুমি যেন আমাকে বিক্ষিপ্ত করে দিলে। আমাকে এমনি করে ছড়িয়ে দিলে বলেই তোমার কোল ভরে উঠল। তুমি আমাকে ফিরে ফিরে নব নব রূপান্তরে নতুন করে পাচ্ছ।

(৩য় শ্লোক)

আমাকে এই নানাভাবে পাওয়াতেই তোমার আনন্দ। আমি এলাম অমনি সব শব্দিত হয়ে উঠল—নইলে তার আগে সব স্তব্ধ ছিল। আমার মধ্যেই তোমার দুঃখ, আমি এসেছি বলেই তোমাকে দুঃখ দিলাম। আমি এলাম বলে যে আনন্দের উদ্বোধন হল, তার মধ্যে তেজ থাকত না। যদি দুঃখ তাকে না জ্বালাত—আমার দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই আনন্দশিখা

জ্বলে উঠছে? জীবন-মরণের এই যে আন্দোলন—এ আমার নিয়েই হয়েছে। আমি এলাম বলেই তুমি এলে। আমার স্পর্শে তুমি আপনাকে স্পর্শ করলে, আমায় পেয়ে তোমার বক্ষ ভরে উঠল।

(৪র্থ শ্লোক)

আমার মধ্যে কত অভাব এটি অসম্পূর্ণতা আছে, তাই আমার চোখে লজ্জা, মুখে আবরণ; আমি সেই আবরণের ভিতর দিয়ে তোমায় দেখতে পাই না। তাই আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে, পদে পদে বাধা আছে বলে জীবন তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হল না। কিন্তু আমি জানি যে আমি এমনিভাবে আচ্ছন্ন আছি বলে তুমি অপেক্ষা করে আছ—কবে এই আবরণ উদ্‌ঘাটিত হবে? এই আবরণ একদিন খসে পড়ে যাবে না তা নয়—কারণ তোমার আমাকে দেখবার জন্য কৌতূহলের অন্ত নেই। তুমি ক্রমশঃ আমার মধ্যে তোমার দৃষ্টি পেতে চাও। আমাকে দেখবে বলেই তুমি এত আলো জ্বালিয়েছ, তুমি আমার আত্মার সঙ্গে পরিচিত হবে বলেই তোমার এই সূর্যতারার আলো জ্বলছে।

(আলোচনা)

(১)

"আমি এলেম, এল তোমার দুঃখ"—

বিশ্বের দুঃখ তো আমার সীমার মধ্যেই আছে। তোমার প্রকাশে যদি দুঃখ এসে থাকে, তবে সে তো আমিই বয়ে এনেছি। আমার আপনাদের মধ্যে দুঃখ নেই, আমিই তাকে এনেছি। কিন্তু তাতেই তো সব শেষ হয়ে যায় নি। আমার এই দুঃখের ভিতর দিয়েই তোমার আনন্দের উপলব্ধি হচ্ছে। অদ্বৈতের মধ্যে যেটা দ্বৈত সেটাই বড় কথা। শুধু monism তো negative। সীমা-সম্পর্কিত দুঃখের বিচিত্র লীলার ভিতরে যে আনন্দ সেটাই সত্যিকারের জিনিস।

এই কবিতায় "আমি" মানে হচ্ছে—সৃষ্ট জগৎ।

(২)

আমাদের দেহ হচ্ছে অসীমের প্রতিরূপ। সূর্যের আলো, প্রাণ, বাতাস, জল, আমার দেহ—এরা সব আকস্মিক জিনিস নয়, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই অসীমের background আছে। আমার মন যদি একটা isolated fact হয়, তবে আমি কিছুই জানতে পারব না। কিন্তু আসলে আমার মনের একটা বাস্তবতার background আছে বলেই আমি বুদ্ধির ও চৈতন্যের জগৎকে পাচ্ছি।

বিজ্ঞান এ পর্যন্ত বলে এসেছে যে প্রাণ ও অপ্রাণের মধ্যে ছেদ আছে। প্রাণবান্ জিনিস প্রাণেই নিঃসৃত হচ্ছে, কম্পিত হচ্ছে, বিজ্ঞান একে Radio-activity-র গতিশীলতা বলেছে। কিন্তু জগতের প্রাণের এই গতিবেগ অসীমেরই গতিশীলতার একটা প্রকাশ। বিজ্ঞানবাদ অনুসারে অণু-পরমাণু কিছুই স্তব্ধ হয়ে নেই, তারা নিজের বেগে চলেছে—nucleus-এর চারিদিকে electron গুলি সৌরজগতের আবর্তনের মতো ঘুরছে, কিন্তু এদেরও অসীমের Background আছে। আমরা কি বলতে চাই যে, এই যে আমরা আপনাকে জানছি, আমাদের

মনের সঙ্গে বিশ্বনিয়মের চিরন্তন যোগ রয়েছে, এটা কেবল একটা আকস্মিক যোগ; আর দেহ-মনের উপর যে Personality আছে, তার কি infinite background নেই? এ হতেই পারে না। 'অন্নং ব্রহ্ম'—আধিভৌতিক জগতেও অসীম আছেন, অসীমের আনন্দের মধ্যেই তাঁর personality-র বিকাশ। 'অন্ন' এক অর্থে impersonal। আপনাতে আপনার উপলব্ধি ও ঐক্যবোধের মধ্যে যে আনন্দ আছে, তাকেই personality-র বোধ বলা যায়। আমার personality তখনই দুঃখ পায়, যখন বাহিরে কিংবা অন্তরে এই ঐক্যের বিচ্যুতি ঘটে।

শৈশব থেকে এ পর্যন্ত যে একটা ঐক্য-ধারার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি—যার মধ্যে আনন্দ আছে, সেই ঐক্যের ভাবটিকেই আমি personality বলেছি।

অসীমের personality ও আমার ঐক্যবোধের মধ্যে harmony আছে। যখন অসীম-স্বরূপ দ্বৈতের মধ্যে ঐক্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন, তখনই তাঁর মধ্যে আনন্দ ও প্রেম জাগে। বন্ধুদের আত্মার প্রেমের মধ্যে এক জায়গায় বিচ্ছেদ আছে। কিন্তু তার মধ্যেও একটা ঐক্যসূত্র আছে। বিশ্বের মূলেও এই ব্যাপারটি আছে। আমি আর এক 'আমি'র প্রতিরূপ। আমার অন্তরের উপলব্ধিতে জীবলোকের নাট্যলীলা (drama of existence) আছে। আমার থাকার মধ্যে বিশ্বের মূলের এই থাকা আছে। আমি মানে একমাত্র 'আমি' নয়,—আমার ভোগ করা, দেখা, জানার উপরে যে আমিত্ব আছে তাই। আমি এসেছি বলেই দুঃখ আছে, আনন্দ আছে। আমি এসেছি বলেই এপার থেকে ওপারের চিরন্তন যোগাযোগ চলেছে।

॥ জ ॥

যৌবন

(৪৪ সংখ্যক)

৪৪-সংখ্যক কবিতাটি যৌবনের জয়গান।

যৌবন পথহীন সাগর-পারের পথিক; তার জানা চঞ্চল, অক্লান্ত। অজানার বুকে তাকে পাড়ি জমাতে হবে—জানার বাসা হতে বাহির হয়ে পড়তে হবে। ঝড়ে যে বজ্র আছে, তার মধ্যে যতই দুঃখবেদনা থাকুক না কেন, যৌবন তাকে ঝড় হতে ছিন্ন করে আনতে পারে। বিপদের মধ্য থেকে মরণকে মাথায় তুলে নেওয়ার মধ্যেই যৌবনের আনন্দ। সে আরাম চায় না, দুঃখবরণেই তার আনন্দ, তার তৃপ্তি। জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে বলেছেন—জগৎ নিজেকে সমর্পণ করে না, জগৎকে জোর করে কেড়ে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথও যৌবনকে উদ্দেশ্য করে সেই বাণীই উচ্চারণ করেছেন—বলেছেন, যৌবন সে তো 'ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে।'

যৌবন নিরাপদের চণ্ডীমণ্ডপে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় গতিবিহীন হয়ে বসে থাকবে কি? সে আয়ুর কাঙাল নয়, সে যে অমৃত-সন্ধানী মরণ-সন্ধানী,—মৃত্যুর অমৃত-মাধুরী সে আহরণ করবে। মৃত্যু যে অমৃতের পাত্রকে বহন করছে, 'মৃত্যুর অন্তরে পশি'—সেই সুধারস সে সঞ্চয় করে আনবে। অবগুণ্ঠিতা মরণের মুখাবরণকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যই তো তার যাত্রা!

যৌবনের অন্তরের আবেগ যদি জীবন্ত হয় তবে সে নিশ্চয়ই শাস্ত্রকারের পোকা-কাটা শুকনো তুলট কাগজের মধ্যে চলার বাণীর অন্বেষণ কববে না। পুঁথির বাণীতে প্রাণ কোথায়? যৌবনের বাণী তাই পুঁথির পাতায় নেই, আছে দক্ষিণ হাওয়ার বীণায়, আছে প্রলয়-মেঘে ঝড়ের ঝঙ্কারে যে বাণী শুনে অরণ্যে নবকিশলয়ের উদ্‌গম হয়, সেই বাণী যৌবনের; যে বাণী ঝড়-তুফানে ধ্বনিত হচ্ছে, যে বাণী উন্মত্ত ঢেউয়ের 'পরে তার বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়ে চলে যৌবন তাকেই তো গ্রহণ করবে, বরণ করবে। যৌবনের বাণী মধুর, তার বাণী জীবন্ত।

যৌবন কি একটুখানি প্রাণের গণ্ডির মধ্যে আপনাকে বদ্ধ রাখতে চায়? না, সে তো অফুরন্ত প্রাণের অধিকারী, সূর্যের আলোক যেমন শাণিত খড়্গের মত কুয়াশাকে ছিন্নভিন্ন করে দিক। শুষ্ক পুষ্পাবরণকে বিদীর্ণ করে যেমন সুন্দর সুকুমার জীবন্ত নবমুকুল ফুটে উঠে, তেমনিভাবে জরার কথা বিদীর্ণ করে লোক-লোকান্তরের অপার ক্ষেত্রে অনন্ত আলোকে নিত্য নব নব রূপে যৌবনের অমর কুসুম ফুটে উঠুক।

কামনায় ও আসক্তিতে যৌবনের দুর্গতি। যৌবন কি ভোগের সংস্কারের 'আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানি ভারে' কুণ্ঠিত অক্ষম অকর্মণ্য হয়ে থাকবে? ভোগের পঙ্ককুণ্ডে পচে মরবার জন্য যৌবনের আবির্ভাব হয় নি। জরার আবর্জনার ভার বইবার জন্য যৌবনের আবির্ভাব হয় নি। প্রতিদিনকার প্রভাত যে তাঁর আপন হাতে গড়া সোনার মুকুট যৌবনের ললাটে পরিয়ে দেবার জন্য আবির্ভূত হবে। যৌবন কি সেই স্বর্ণ-মুকুট ধারণ করবার যোগ্য হয়ে উঠবে না? জরার আবর্জনার ভার বয়ে যৌবন নিজেকে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ করবে না, নিজের মর্যাদা নষ্ট করবে না। তার কবি অগ্নি, দীপক তার রাগিণী, সূর্য তার মিতা ও প্রতিরূপ

যৌবনকে তাদেরই মত মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠতে হবে।

যৌবন সুখের প্রত্যাশী নয়, আনন্দের প্রত্যাশী। তাই নব নব প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিলাভ করা তার জীবনের ধর্ম। নব নব বিকাশ আছে বলে জগৎ যেমন চিরমধুর, চিরনতুন—যৌবনও তেমনি'।

বিকাশের একটি স্তরের পর আর একটি স্তর অতিক্রম করার মধ্য দিয়েই যে নিত্য নবীন থাকা যায় একথা রবীন্দ্রনাথ অন্য বহুস্থানেই বলেছেন। তুলনীয়—

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী তার বিচিত্র রঙের সাজ পরে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্বস্ব করে বসে থাকতে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে, এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি—সমস্তকে অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে, সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তের দিকে, 'আরোর' দিকে প্রকাশের এই কুল খোয়ানো অভিসার-যাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে ত' পদের চিহ্ন নেই। কিছু ত' দেখতে পাওয়া যায় না—না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত! কিন্তু শূন্য ত' নয়—কেন না ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি, সে ত' বুদ্ধিমানের চলা,—তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না, আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে চলায় মরা-বাঁচা জ্ঞান থাকে না। সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। এই চলাকে নিন্দার ভেতর দিয়ে, বাধার ভেতর দিয়ে চলতে হয়, কোন নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার একটিমাত্র কৈফিয়ৎ আছে,—সে বলছে, ঐ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকছে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যেদিক থেকে এ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে। ঐ দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তর-মেরুতে দক্ষিণ-মেরুতে টানে, অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়। বারংবার মরতে মরতে সমুদ্রপারের পথ বের করে, বারবার মরতে মরতে আকাশপারে ডানা মেলতে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী, তারাই এগোচ্ছে—ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে; যারা সর্বনাশা, কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না, তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো করে কুল আঁকড়ে বসে রইলো—তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেছে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্য লীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

ভগবানের বাঁশির ডাক, দুঃসাহসিক অভিসারে নতুনকে আহ্বান আমার বুকের মধ্যে বেজে ওঠে। তখন আমি বুঝতে পারি যে, সতর্ক বিজ্ঞতা বড় সত্য নয়, নবীনের দুঃসাহসিক

অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বড় সত্য। কেননা এই অনভিজ্ঞতার ঔৎসুক্যের কাছেই সত্য বারে বারে নতুন শক্তিতে নতুন মূর্তিতে প্রকাশ পায়। এই অভিজ্ঞতা অক্ষুণ্ণ বলেই পুরাতনের পর্বতপ্রমাণ বাধা ভাঙে এবং অসাধ্য সাধন হতে থাকে।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস বুদ্ধির দুঃসাহস আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। যারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তারাস লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হতে হরণ করেছে। কিন্তু ভালো মানুষদের ধমকানি খেয়েও এই অশান্তের দল জীর্ণ দেওয়াল ভেঙে পুরাতন বেড়া সরিয়ে কত উৎপাত করছে তার ঠিকানা নেই। এরা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করে তোলে, এবং মরবার বেলায় এরাই মরে। কিন্তু বাঁচবার পথ বাহির করে দেয় এরাই।

"Strive and thrive!" Cry, "Speed–fight on,
fare ever there as here!"

–Asolondo, Robert Browning

॥ ঝ ॥

বিচার

(১১ সংখ্যক)

১১-সংখ্যক কবিতাটি 'বলাকা' কাব্যে 'বিচার' নামাঙ্কিত হয়ে ১৩২১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত হয়।

(প্রথম স্তবক)

রিপু উদ্দাম হয়ে উঠলে পূর্ণকে আচ্ছন্ন ও ম্লান করে। পূর্ণের সৌন্দর্য উপলব্ধি না করে যারা তাঁকে খণ্ডিত করে প্রচ্ছন্ন করে, তারা তাঁকে অপমান করে। কবি এই অপমানের বিচার প্রার্থনা করছেন সেই পূর্ণের কাছে।

কিন্তু বিচার তো প্রার্থনা করবার আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে। বিচার তো নিরন্তর চলছে। কলুষিতকে ক্রমাগত বিচার করছে যা পবিত্র, যা সুন্দর। যে নিজেই অসুন্দর সে কখনো কলুষিতের বিচার করতে পারে না। কলুষিতের বিচার চলে তার বিপরীত সুন্দরের দ্বারা-- মাতালকে বিচার করছে শান্ত সপ্তর্ষি নিরবচ্ছিন্ন ও অকুণ্ঠিত শুচিতার এবং সৌন্দর্যের আদর্শ মানদণ্ডে। সৌন্দর্য যেন নিজেই কদর্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও বিচার আনে নৈতিক ধিক্কারই নীতিভ্রংশের চরম বিচার। যখন বিধাতা অনাচারী পাপীদের জন্যও তাঁর বিচারশলালায় সুরভি পুষ্প, পবিত্র সমীরণ ও বিহঙ্গ কূজন আয়োজন করে রাখেন, তখন সেই পাপীরা এই বিহঙ্গ কূজন আয়োজন করে রাখেন, তখন সেই পাপীরা এই করুণার প্রভাবে সেই সুন্দরকে আর অস্বীকার করতে পারে না।

(দ্বিতীয় স্তবক)

যেখানে ন্যায্য অধিকার, সত্য স্বত্ব নেই—সেখানে নিজের লোভকে প্রবল করে তোলা চুরি--সেই চুরি যেখানেই করা হোক, তা সুন্দরের ভাণ্ডারেই কর হয়ে থাকে; এবং সেই অনাচারের ফলে যিনি প্রেমে সব দিতে প্রস্তুত তাঁকে অপমান করা হয়। তখনই প্রেম আহত হয়, কারণ প্রেমের প্রতি অত্যাচার প্রেমেরই ব্যভিচার। কবি অপমানের শাস্তি প্রার্থনা করছেন প্রেমিকের কাছে।

কিন্তু তাঁর শাস্তি তো না চাইতেই চলছে—অনাচারীর পাপের জন্য যখন তার জননীর অশ্রু ঝরে, সতী স্ত্রী স্বামীর অনাচারের লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে বিনিদ্র অবস্থায় সমস্ত রাত্রি প্রতীক্ষা করে থাকে তার সৎপথে প্রত্যাবর্তনের জন্য, পাপীর অনাচারে যখন তার বন্ধুর হৃদয়ে ব্যথা লাগে, তখনই তো তার শাস্তি ও বিচার চলতে থাকে।

(তৃতীয় স্তবক)

যে যেখানেই চুরি করুক না কেন, পরস্বাপহরণ মাত্রই পরমেশ্বরের ভাণ্ডারে চুরি; কারণ—

"ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ ধনম্॥"

এই অপরাধের গুরুত্ব এত অধিক যে কবি তার জন্য কোনো শাস্তি বা বিচার প্রার্থনা করতে সাহস করলেন না, তিনি সেই দুর্বৃত্তের জন্য মার্জনা প্রার্থনা করলেন—তার এই অপরাধ রুদ্র দয়া করে মুছে ফেলুন, রুদ্রের দণ্ড ভোগ করতে গেলে সে তো একেবারে পিষ্ট ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু রুদ্রের কাছে তো প্রশ্রয় নেই, যেখানে সংশোধনের কোনো পথ না থাকে সেখানে তিনি ধ্বংস করে তার সংশোধন করেন। সুন্দর যেমন অসুন্দরের বিচারক এবং প্রেম যেমন অপ্রেমের বিচারক, তেমনি চোরকে বিচার করে তার পুঞ্জীভূত পাপ। নৈতিক সামঞ্জস্য নষ্ট হলে রুদ্র জাগ্রত হয়ে ন্যায়দণ্ড ধারণ করেন। মানুষ অপরের সঙ্গে সত্য ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকবে—এটাই হল বিধতার বিধান। সেই বিধান না মেনে যে সেই সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট করে জগতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে, রুদ্র তার বিচার করেন—এই বিচার লোকনিন্দার, নৈতিক ধিক্কারে, তার অধঃপতনে। রুদ্র সমস্ত আবর্জনা মার্জনা করেন, অপসারিত করেন। তিনি কোনো মলিনতাকে উপেক্ষা করেন না, ক্ষমা করেন না। মার্জনার অর্থই হল ধ্বংস। পুরানো অপসারিত না হলে নতুনের সৃজন হয় না এবং নতুনের সৃজনেই রুদ্রের মার্জনা প্রকাশ পায়।

নির্দয় গতির মধ্যে কবি যেমন আনন্দ দর্শন করেন, নির্মম রুদ্রের ভিতরও তেমনি তিনি মার্জনা ও করুণা লক্ষ্য করেন। তুলনীয়—

'Throw away thy rod,
Throw away thy wrath;
O my God,
Take the gentle path!
Then let wrath remove;
Love will do the deed;
For with love
Stony hearts will bleed.'

-Herleert (17th cent.) 'Discipline'.

॥ এঙ ॥

যখন আমার হাত ধরে

(২২ সংখ্যক)

'বলাকা' কাব্যের ২২-সংখ্যক কবিতাটি কবি বলতে চেয়েছেন যে, সুখ-ঐশ্বর্য যেমন মুক্তিলাভের অন্তরায়, তেমনি সম্মান সমাদরও মুক্তি পথের কম বাঁধা নয়। আগে বাইরের সম্মান কবিকে ক্ষণিক ঝুটা সম্পদে ভূষিত করেছিল, এখন নিজের অন্তর তেজের গৌরব লাভ করে আপন অন্তরের মহিমায় একলা পথে কবি যাত্রা শুরু করেছেন।

চরম সমাদর বাইরে নেই, তা অন্তরের ধন; যখন বাইরের খ্যাতির ঘটা ঘুচে যায়, একমাত্র তখনি জীবনদেবতার বা অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীর আদর অন্তরে অনুভব করবার অবসর পান কবি। যা অপরের অপেক্ষা রাখে তা তো বন্ধন। লোকের স্তুতি নিন্দায় তার নিয়ত পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অন্তরে কাব্য লক্ষ্মীর চরম সমাদর করলে বন্ধন মোচন হয়, তখন আপন যথার্থ স্বরূপকে জানা যায়।

কবি স্বয়ং এই কবিতাটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

(প্রথম স্তবক)

তুমি যখন আমায় সমাদর ক'রে পাশে ডেকেছিলে, তখন ভয় হয়েছিল পাছে সেই আদর থেকে আমি একটুও বঞ্চিত হই, পাছে অসতর্ক হয়ে আমার কিছু নষ্ট হয়—কোথাও সম্মানের কোনো হানি হয়। তখন আপন ইচ্ছা-মতো যে নিজের রাস্তায় চল্‌ব তার উপায় ছিল না—যে পথে চল্‌লে আপনাকে সহজে প্রকাশ করতে পারি সে-পথে চল্‌তে দ্বিধা হয়েছে। আমি চল্‌তে গিয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে গেছি, পাছে এদিক-ওদিক এক পা নড়্‌তে গিয়ে তোমাকে অসন্তুষ্ট করি। তুমি যখন আমায় সম্মান দিলে তখন এই বিপদ হল—আমি যে আমার মতে সহজ-পথে চলব তা' হল না, আপনাকে সহজে বহন ক'রে নেবার ব্যাঘাত ঘটল। পাছে আমি কোনো সময়ে তোমার সম্মান হারাই, পাছে কোথাও গেলে ক্ষতি হয়—এই আশঙ্কা দূর করতে পারি নি।

(দ্বিতীয় স্তবক)

আজ আমি মুক্তি পেয়েছি। তোমার সম্মানের বাঁধনে বাঁধা ছিলাম, আজ বেজে উঠেছে—অনাদরের কঠিন আঘাতে তার সংগীত ধ্বনিত হয়েছে। অপমানের ঢাক-ঢোল বেজে উঠল—আমি সম্মানের বন্ধন থেকে মুক্ত হলাম। আজ আমার ছুটি—যে-ফোটা আমার মনকে বেঁধেছিল, তা' আজ ভেঙ্গে গেল, হাত-পায়ের বেড়ি খ'সে গেল। যা দেবো আর নেবো দক্ষিণে-বামে তার পথ খোলসা হল। যখন সম্মানের বেষ্টনে বদ্ধ হয়ে পা ফেলছিলুম তখন আমার ভাবনা ছিল, কি দেবো আর কি নেবো। কিন্তু এবার দেবার-নেবার পথ খোলসা।

আমার এক সময় ছিল যখন আমাকে কেউ জানত না। আমি বিশেষ অনায়াসে বিহার করেছি, স্বচ্ছন্দে আকাশ-পৃথিবীতে উপরে উঠেছি, নীচে নেমেছি, কে কি বলবে, কাড়বে ত' ভাবি নি। সেই সময়ে আমার সম্মানের অধিকার ছিল না। আজ আবার আকাশ-পাতাল

আমায় খুব ক'রে ডাক দিল, আজ আমি অনাদৃতের দলে। যে লাঞ্ছিত, তার ভাবনা নেই— সমস্ত জগতে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে কে তাকে থামায়? এই যে আমি ঘরের মধ্যে সম্মানের বেষ্টনে ছিলাম, আজ তা ঘুচে গেল। আমি আমার আশ্রয়কে হারালাম। আজ আমায় ঘরছাড়া বাতাস মাতাল ক'রে দিল, আর আমার ভয় নেই। যখন রাত্রে কোনো তারা খসে পড়ে, তখন এক সময়ে তারকা সমাজে তার যে সম্মানের আসন ছিল তাকে সে হারিয়ে বসে; 'কুছ পরোয়া নেই' ব'লে অকাশে ঝাঁপ দেয়। তেমনি আমি আজ মরণ টানে ছুটে চলেছি, বল্‌ছি 'ভয় নেই, সব বাঁধন ছিঁড়ল'।

(তৃতীয় স্তবক)

আমি কাল-বৈশাখীর বাঁধন-ছিন্ন মেঘ। এবার ঝড় আমাকে তাড়া দিল, অপমানের ঝড় অচলা স্থিতি থেকে আমাকে পথে বার ক'রে দিয়েছে। সন্ধ্যা-রবির সোনার কিরণ আমাকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। যখন কালবৈশাখী তাড়া দিল, তখন আমি স্বর্ণ-কিরীট অস্তপারে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মেঘ হয়ে বজ্রমণিকে ভূষিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি সেই বাঁধনহারা বৈশাখের মেঘ—একা একা আপন তেজে ঘুরে বেড়াব। বাইরের সম্মান আমাকে আলোকিত করেছিল, কিন্তু এখন আমার ভিতরে বজ্রমাণিকের তেজ আছে। সেই তেজ আমাকে গৌরবান্বিত করেছে। বাইরের অস্তরবির কিরণ নয়। যে সম্মান আমাকে বাইরে টেনেছিল, আমি তাকে ফেলে দিয়ে আপন অন্তরের মহিমায় একলা পথে বেরিয়ছি।

আমি অসম্মানের মধ্যে মুক্তি পেলাম। সকলের চেয়ে চরম সমাদর যা', তা' বাইরে নেই। তা রয়েছে অন্তরে। যখন বাইরের খ্যাতির ঘটা ঘুচে যায়, একমাত্র তখনই তোমার আদর অন্তর পেয়ে থাকে। সেটাই সমাদরের শেষ, তাতেই মুক্তি হয়। যা' অপরের অপেক্ষা রাখে, ত' আমার পক্ষে বন্ধন—লোকের কথার উপর, স্তুতিবাদের তারতম্যের উপর তার নিয়ত পরিবর্তন হয়। কিন্তু তোমার আলো যখন অন্তরে আসে, তখন আপন যথার্থ স্বরূপকে জানি; তোমার চরম সমাদরে আমার বন্ধন মোচন হয়।

(চতুর্থ স্তবক)

গর্ভে যখন সন্তান থাকে তখন সে মাকে দেখে না। মা যখন তাকে মাটির উপর দাঁড় ক'রে দিল, তখন যেন সে সমাদরের বেষ্টন থেকে অসম্মানের ধরণীতে বিচ্যুত হল। কিন্তু তখনই শিশু মাকে দেখতে পেল। যখন সে আরামে পরিবেষ্টিত হয়েছিল, তখন সে মাকে জানে নি, দেখে নি। তুমি যখন আদরের মধ্যে সম্মানের দ্বারা আমাকে বেষ্টিত কর— হাজার নাড়ীর বাঁধনে যখন আমাকে জড়িত কর, তোমাকে তখন আমি জানতে পারি না, সেই আশ্রয়কেই জানি। কিন্তু যখন তুমি সম্মানের আচ্ছাদন থেকে আমাকে দূরে ফেল, তখন সেই বিচ্ছেদের আঘাতে আমার চৈতন্য হয়, আমি তোমার সেই বিচ্ছেদের আঘাতে আমার চৈতন্য হয়, আমি তোমার সেই আবেষ্টন থেকে মুক্ত হ'য়ে তোমার থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়াই, তখনই তোমাকে দেখতে পাই।

॥ ট ॥

এই দেহটির ভেলা নিয়ে

(৩০ সংখ্যক)

'বলাকা' কাব্যের ৩০-সংখ্যক কবিতাটি সম্পর্কে কবি স্বয়ং এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইরকম—

(প্রথম স্তবক)

যে দেহভেলা অবলম্বন ক'রে এতদিন জীবনস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, সেই ভেলাকে এবার ভাসিয়ে দাও। তাকে ফেলে দাও, সে চলে যাক। তার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগ নেই, সে চলে যাক। তার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগ নেই, এবার তার কাজ ফুরালো। কোনো ঘাটে পৌঁছাব কি না, যাব?—এ-সব প্রশ্ন নাই বা করলাম, এর উত্তর এর উত্তর নাই বা জানলাম।

(দ্বিতীয় স্তবক)

না-জানার দিকে যাত্রা করাই তো আমার আনন্দ। অজানাই আমাকে এখানে এনেছিলেন—তিনিই আমাকে আমার এই জন্মগ্রহণের দ্বারা জানানোর বন্ধনে বেঁধেছিলেন, আবার তিনিই তো সব গ্রন্থি খুলে সব চুকিয়ে দেবেন। আমার ঠিক সব খাপ খেয়ে যাবে, কোনখানে অসামঞ্জস্য থাকবে না। জানা পরিচিত সবকিছু মনের কোণে বাসা বাঁধে। তাই আমরা এখানে এসে সব ঘরকন্না গুছিয়ে নিই, নানা পরিচয়ের মধ্যে খুব করে সব জেনে নিই, 'এ আমার অমুক, সে আমার অমুক'—এইসব জানাজানির ভিতরে বন্দী হই। এমন সময় হঠাৎ অজানা খামকা এসে বাঁধা লাগিয়ে দিয়ে জানার সব বাঁধন সব ছিঁড়ে দেয়।

(তৃতীয় স্তবক)

এই ভেলার যে হালের মাঝি সে তো অজানা। সেই অপরিচিতই আমার কর্ণধার। সে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অজানাই আমার জানার বন্ধন—কেবলি ছিন্ন ক'রে ক'রে আমাকে মুক্তি দেয়। সে থেকে থেকে বার বার মুক্তি দিতে দিতে আমাকে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। তাই তো আমার সামনে দিকে যে অজানা আছে, তাকে আমি ভয় করতে চাই নে। আমি জানি সেই আমার হালের মাঝি, সে আমার এই জীবনেও আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মৃত্যু হঠাৎ এসে আমাকে চমক লাগিয়ে দেয়। আকস্মিক ঘটনা আমাকে ত্রস্ত করে। এমনি ক'রে নির্দয় যিনি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন ব'লে অপূর্ব অপরিচিতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার ভয় ভাঙ্গিয়ে দেন।

(চতুর্থ স্তবক)

তুমি ভাবছ যে, যেদিন চলে গেছে তাকেই ভালো জানি, অতএব তারই পুনরাবৃত্তি হোক, তাকেই বারে বারে ফিরে পাই। কিন্তু তুমি যে-কূল ছেড়েছ, সে-কূলে আর কিছুতেই

ফিরে যাবে না। তোমার কি পিছনের উপরেই একমাত্র নির্ভর? ঐ পিছনই কেবল বিশ্বাসযোগ্য? যা অতীত তাই কেবল তোমার প্রধান সম্পদ, এমনকি তুমি ভাগ্যহারা? কেন তুমি বলতে পারলে না—সামনের 'পরে তোমার বিশ্বাস আছে; সেখানে তোমার ভয় নেই? পিছন তোমাকে কিছুতে বেঁধে রাখবে না, এতেই তোমার আনন্দ হোক্।

(পঞ্চম স্তবক)

ঘণ্টা বেজেছে, সভা যে ভেঙে গেল—নৌকা ছাড়তে হবে, জোয়ার উঠেছে। তিনিই অজানা যাঁর সঙ্গে দেখা হ'বে বলে মনে করি? কিন্তু যাঁর মুখ দেখা আমার হয় না। তাঁকে জানি না ব'লে একটু ভয় হয় বইকি, একটু বুক দুলে ওঠে, মনে হয় কি জানি কেমন ক'রে অজানা আমার কাছে দেখা দেবে। এই শ্যামল পৃথিবী তার সূর্যালোক নিয়ে এবারকার মতো দেখা দিল; আবার অজানা কেমন ক'রে দেখা দেবে বলতে পার? এই পৃথিবীতে জন্মমুহূর্ত থেকে সূর্যালোকে লোকালয়ের নানা দৃশ্য, নানা ঘটনা, নানা অবস্থার মধ্যে অজানাকে ক্রমশই জানার ভিতর দিয়ে স্পর্শ করতে করতে চলেছি। অজানাকে কেবলি জানা, না পাওয়াকে কেবলি পেতে থাকাকেই তো জীবন বলে। এই জীবনকে তো ভালোবেসেছি। অর্থাৎ, সেই অজানাকে লেগেছে ভালো। সমুদ্রের এপারে তাকে ভালো লেগেছিল, সমুদ্রের ওপারেও তাকে ভালো লাগবে।

॥ তেরো ॥

'বলাকা' ঃ আলোচনার উপসংহার

আমরা এ বইয়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যা বলেছি, তা সংক্ষেপে এই শেষ পরিচ্ছেদে লিখছি এই আশায় যে তাতে পাঠকদের স্মৃতিচারণ সহজ হতে পারে। তাছাড়া সামগ্রিক বিচারে 'বলাকা' সম্পর্কে আরও কিছু বলার কথা আছে যা আমরা আলাদা পরিচ্ছেদ বিভাগে বলার সুযোগ পাই নি। কবিতা পাঠে বিশেষ বিশেষ কবিতাব প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়েও আমরা নানাপ্রসঙ্গ ভিত্তিক আলোচনায় ঐ পরিচ্ছেদের বাইরের কবিতাগুলির ভার যথাসাধ্য নির্দেশ করেছি। তা সত্ত্বেও যা বাদ পড়েছে, কবিতাগুলির শ্রেণীবিভাগে তা বলার সুযোগ হতে পারে।

তাই এখানে শ্রেণীবিভাগে অগ্রসর হচ্ছি আর তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন। 'বলাকা'য় মূলত দুই জাতীয় কবিতা উচ্চকণ্ঠ ও মৃদুকণ্ঠের কবিতা। উচ্চকণ্ঠের কবিতায় কবি আমাদের শোনানোর জন্য কিছু বলছেন। এসব কবিতার নির্দিষ্ট বক্তব্য আছে, উদ্দিষ্ট শ্রোতা আছে। মৃদুকণ্ঠের কবিতায় কবি আপন মনে কথা বলছেন, এসব তাঁর স্বগতোক্তি, আমরা তাঁর কথা আড়ি পেতে শুনছি। আমাদের মতো শ্রোতার কথা মনে রেখে আমাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন না।

উচ্চকণ্ঠের কবিতাগুলির মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় 'ছবি', 'শাজাহান', 'চঞ্চলা', 'বলাকা', 'ঝড়ের খেয়া'। আবার কবিতা হিসেবেও এগুলি উচ্চস্তরের এসব কবিতায় নির্দিষ্ট বক্তব্য আছে। 'বলাকা'র প্রথম ও শেষ কবিতাও এই শ্রেণীরই অন্তর্ভূক্ত, তবে কবিতা হিসেবে ওগুলির মতো এতো উচ্চস্তরের নয়।

কিন্তু এদের পাশে ৪ সংখ্যক ('শঙ্খ') কবিতা মৃদুকণ্ঠের, কবিতাটিও অসাধারণ। এ কবিতার শঙ্খ কি? কার শঙ্খ? প্রশ্নগুলির দ্ব্যর্থহীন উত্তর নেই। মানবতার শঙ্খ, ঈশ্বরের শঙ্খ—নানারকম উত্তর হতে পারে। কোন্ 'বাতাস আলো গেল মরে',—তারও একটিমাত্র সর্বজনমান্য উত্তর দিতে পারি না। কবিতার এই অনেকান্ত বা নানামুখী আবেদনেই এর মহত্ত্ব, মৃদুকণ্ঠের আরো কয়েকটি কবিতার কথা বলতে পারি—প্রথমেই ধরি ৩২ ও ৪১ সংখ্যক কবিতা। ৩২-সংখ্যক কবিতায় পদ্মাতীরের বিলীয়মান সূর্যাস্তের রক্তাভা আর ক্রমাগ্রসরমান অন্ধকার—এই দুই মিলিয়ে সন্ধ্যার যে রূপটির কথা কবি বললেন, তা আপন মনেই বলে চললেন। আমাদের শোনানোর জন্য বলেন নি। আড়ি পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ এ কথা শুনে চমকে উঠি ঃ 'তোমার এই অনন্ত-মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে।' অনন্ত সময়ের ধারার মধ্যে সেই বিশেষ সন্ধ্যার অনন্য রূপটি আকাশে পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল। ৪১-সংখ্যক কবিতায় পদ্মাতীরের সন্ধ্যা নয়, দিনের বেলাকার 'সজন-নির্জনের নিত্য সঙ্গমে'র চলচ্ছবি আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেলো, পলাতক চঞ্চল সময় থেকে একটি প্রহর বা প্রহরের একটি বিশেষ মুহূর্তকে কবিতায় চিরদিনের মতো ধরে রাখার চেষ্টা রবীন্দ্র-কবিতায় 'বলাকা'র আগেও পরে কতো অজস্রবার দেখেছি। 'বলাকা'র এই দুটি কবিতায়ও এ চেষ্টার সফল রূপ দেখি। কবিতা দুটি সম্পর্কে 'বলাকা' বই ১০-সংখ্যক কবিতার ভাষায় বলতে পারি ঃ কবির 'যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,/দেখা দেয়, মিলায়

পলকে।/বলে না আপন নাম। পথের শিহরে দিয়া সুরে/চলে যায় চকিত নূপুরে।' সময় চলেছে নর্তকীর মতো, তার পায়ের নূপুর বাজছে। বাজতে না বাজতেই মুহূর্তের সেই নূপুর নিক্কণ হারিয়ে যাচ্ছে। কবি সেই দ্রুত হারিয়ে যাওয়া নিক্কণ শোনাতে চান। হয়তো এই ১০-সংখ্যক কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে ৮-সংখ্যক অর্থাৎ 'চঞ্চলা' কবিতারও মিল আছে। এমনকি হয়তো বা বার্গসঁর Memory, Duration তত্ত্বও এখানে টেনে আনা যায়। কিন্তু এ সব করার উৎসাহ বইয়ের উপসংহারে আমাদের আর নেই। তবুও একটা কথা বলতে চাই। 'চঞ্চলা'য় কবি যেমন উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, উদ্দিষ্ট শ্রোতা ছিল, নির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল, ভাবনা ছিল—ওসব ১০-সংখ্যক কবিতায় নেই, ৩২ এবং ৪১-সংখ্যক কবিতায় তো নেইই। 'চঞ্চলা'য় কবি আলোকের তীব্রচ্ছটা বর্ণস্রোতে বিচ্ছুরিত হতে দেখেছেন। ১০-সংখ্যক ('উপহার') কবিতায় সন্ধ্যায় কবরী থেকে একটি রঙিন আলো অন্ধকারে থরথর কাঁপতে দেখছেন। সময়ের নিত্য চলিষ্ণু রূপ দেখার আগ্রহেই দুই কবিতায় এমন দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু 'চঞ্চলা' কবিতায় এ দেখার পেছনে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাবনানিষ্ঠ একটি মন কাজ করছে। তাই সে কবিতা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত। দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার—এমনি ধারার মনোভাব নিয়ে ৩২ বা ৪১-সংখ্যক কবিতা লেখা হচ্ছে, ১০-সংখ্যক কবিতায় কিছু ভাবনা থাকলেও 'চঞ্চলা'র মতো এতটা উচ্চকণ্ঠ নয়। এখানেই উচ্চকণ্ঠ ও নিম্নকণ্ঠের কবিতার পার্থক্য। 'বলাকা'র কবিতার ভাবনায় ও মননে যদি কোনও পাঠক ক্লান্ত হয়ে বলে ওঠেন ঃ 'শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়,/মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো', তা হলে আমরা বলবো উচ্চকণ্ঠের বিখ্যাত পাঁচটি কবিতায় শুধুই বাণী, স্পর্শ নেই—তা ঠিক নয়। যদিই বা এমন কারও মনে হয়, তাঁর জন্য রইল ৩২ ও ৪১-সংখ্যকের মতো কবিতাগুলি।

তবে একথা ঠিক নিম্নকণ্ঠে উচ্চারিত কিছু কবিতা আছে যেখানে তত্ত্বই প্রধান হয়ে উঠেছে, কবির উপলব্ধ সত্য ইন্দ্রিয়ময় অভিজ্ঞতার ভাষায় সজীব হয় নি রবীন্দ্রনাথকে বোঝার দিক থেকে এসব কবিতার তত্ত্বের মূল্য অসাধারণ। তা হলে দেখছি উঁচু গলায় বা নিচু গলায় কবিতা উচ্চারণের মধ্যে কবিতা ভালো কি মন্দ, তা নির্ভর করে না। তত্ত্বপ্রধান নিম্নকণ্ঠের ছন্দোবদ্ধ প্রায় গদ্যধর্মী কবিতার সংখ্যা 'বলাকা'য় নেহাৎ কম নেই। এমনকি 'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা' (২৯-সংখ্যক) কবিতা সম্পর্কে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছিলাম, এর তুলনায় 'রাজা' নাটকের সুদর্শনার উদ্দেশ্যে রাজার গদ্য সংলাপটি অনেক উচ্চস্তরের কবিতা। 'বলাকা'র দলবৃত্তে মুক্তকের নেশায় কবি গদ্য কথাকে অনেক কবিতার ছন্দে বেঁধেছেন, যেমন, ২৪, ২৮ ও এই ২৯-সংখ্যক কবিতা। বলতে পারি, এই তিনটি কবিতা ভাবের দিক থেকেও একসূত্রে গাঁথা, এখানে পৃথিবী ও পৃথিবী ধন্য হয়েছে যে-মানুষের আবির্ভাবে, সে-মানুষের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। স্বর্গ আর কোথাও নেই। পৃথিবীই স্বর্গ—এ-জাতীয় ভাবনায় লেখা হয়েছে ২৪-সংখ্যক কবিতা। এ-ভাবনা 'বলাকা'য় নতুন আসে নি। নিশ্চয়ই মনে পড়ে 'চিত্রা'র 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির কথা। নিশ্চয়ই মনে পড়বে 'বলাকা' বই ৩৭-সংখ্যক ('ঝড়ের খেয়া') কবিতার উপান্ত্য পঙ্‌ক্তিগুলি। ওখানে মৃৎ দিয়ে গড়া মর্ত্যের সীমা অতিক্রমকারী ও জীবসীমালঙ্ঘক মানুষের পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনার এবং নিজের মধ্যেই 'দেবতার অমর মহিমা' প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। এ কবিতার আলোচনা আমরা একাধিক প্রসঙ্গে আগে এই বইটিতে করে এসেছি। তাই এ প্রসঙ্গ থাক।

দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই মানুষের সম্পূর্ণ বিকাশ। মানুষের মধ্যেকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বেদনার বিনিময়ে লাভ করতে হয়। পাখির গানের মতো বিধাতার দান হিসাবে মানুষ কিছু পায় নি, শুধু পেয়েছে তার লক্ষ লক্ষ জীবকোষে গড়া শরীর। আর যা-কিছু সব, তা মানুষের স্বোপর্জিত। এই ভাবনাগুলি রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে-কোনও পাঠকের সুপরিচিত। আর এই সূত্রেই 'বলাকা'র অনেক কবিতা রচিত। ২২, ২৮, ৪১-সংখ্যক কবিতাগুলিকে দুঃখবরণের কবিতা বলতে পারি। ২২-সংখ্যক কবিতা থেকে উদ্ধৃতি কবি নিজেও দিয়েছিলেন তাঁর 'আত্মপরিচয়' বইটির তৃতীয় প্রবন্ধ 'আমার ধর্ম' বিষয়ক আলোচনায়।

আমরা প্রসঙ্গভিত্তিক নানা পরিচ্ছেদে 'বলাকা'য় যৌবন ও বসন্ত বন্দনার যোগ ও গতি ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই বন্দনা ও ভাবনা একসঙ্গে মিশে আছে 'বলাকা'র ১৮-সংখ্যক কবিতায়। যা জমানো, তা-ই বস্তু ভার। জমানোর স্বভাব থেকেই দুঃখের বোঝা বেড়ে যায়। কার পক্ষে বেদনার বোঝা নিঃশেষে খালি করা সম্ভব? যিনি যৌবনময়, 'সংশয়ের শীতে বৃদ্ধ' নন তাঁর পক্ষেই সম্ভব। যিনি চিরযৌবনকে মালা পরিয়েছেন, চলার স্নান সেরে পুণ্য হয়েছেন, মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে মেতেছেন; তাঁর পক্ষেই চির আনন্দলোকে পৌঁছানো সম্ভব। 'চঞ্চলা' কবিতার 'তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য বারি বারি/তুলিতেছে শুচি করি/মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন' স্বভাবতই ১৮-সংখ্যক কবিতা পড়ার সময় মনে পড়ে। আর এ-সব কারণেই এ কবিতাকে মনে হয় 'বলাকা'র চাবিকাঠির মতো। কেননা এখানে সব ভাবনা সংহত রূপ নিয়েছে।

১৯১৪ বা ১৩২১-এ রবীন্দ্রনাথ বয়সে ৫৩ বছরের হলেও তরুণদের দলে ভিড়ে গেলেন। 'সবুজপত্র'র সবুজ তাঁর মন ছুঁয়েছে। আমাদের এই স্থিতিশীল সমাজকে আঘাত হেনে জাগিয়ে তোলার ভাবনা তাঁর অনেক কালের। 'মানসী', 'সোনার তরী', গল্পগুচ্ছর 'একটা আষাঢ়ে গল্প'র যুগ থেকে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে। 'গোরা' উপন্যাসে, 'বলাকা'র একটু আগের 'অচলায়তন' ও এ সময়ের 'ফাল্গুনী' নাটকে, 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে। 'স্ত্রীর পত্র,' 'হালদারগোষ্ঠী,' 'পয়লা নম্বর' ইত্যাদি ছোটগল্পে রবীন্দ্র-মনের রূপরেখা আমরা আগের পরিচ্ছেদগুলিতে দেখার চেষ্টা করেছি। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ভারতবর্ষের অতীত দীর্ঘকাল ভূতের মতো আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল বলে আমরা চলতে শিখিনি। রবীন্দ্রনাথ বারবার চলার ডাক দিয়েছেন। বছর কয়েকের জন্য 'গীতাঞ্জলি' পর্বের আগে তিনি নিজেও অতীতের দ্বারা সম্মোহিত হয়েছিলেন। 'গীতাঞ্জলি' পর্বেই সেই আচ্ছন্নতা তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। তাই 'বলাকা'য় রবীন্দ্র-সাহিত্য ধারা যে-বাঁক নিল, তা গীতাঞ্জলি পর্ব থেকে সম্পূর্ণ পূর্বাপর যোগহীন নয়। যোগের অভাব 'গীতাঞ্জলি' পর্বেরও আগেকার প্রাচীন ভারতে মানস ভ্রমণের পর্বের সঙ্গে। তবে একটা কথা মনে না রাখলে এই পর্বের রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করা হবে। হিন্দু হিসাবে ধর্মের অভিমান, হিন্দুত্বের সঙ্গে ভারতীয়ত্বকে মিলিয়ে জাত্যাভিমান কোথাও কোথাও এ পর্বে প্রকাশ পেলেও পরধর্ম বিদ্বেষও পরজাতিনিন্দাকে তিনি দুর্বলতম মুহূর্তেও প্রশ্রয় দেন নি।

'বলাকা' পর্বে এসে তিনি ব্যক্তির মুক্তি চাইলেন। কেন না আমাদের সমাজ দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তিকে চেপে রেখেছে। 'হালদারগোষ্ঠী'র খাঁচায় হাঁপিয়ে ওঠা বনোয়ারিলালের মধ্যে ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এই পর্বে ছোটগল্পে রূপ পেলো, ডিম থেকে হাঁসের ছানার মতো বেরিয়ে পড়ার কল্পনায় তা স্পষ্ট হলো। অন্যদিকে খোলসটা সঙ্গে নিয়ে মৃণালের স্বামী 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে শম্বুক গতিতে চলেছে। এ পর্বের গল্পগুলির সঙ্গে 'বলাকা'র একটি কেন্দ্রীয়

চিত্রকল্প অর্থাৎ হংস বলাকার ডানা মেলে ওড়ার চিত্রকল্পের এই যোগের কথা আমরা বলেছি।

বলাকা-পর্বে তিনি বুদ্ধির দাসত্ব ঘোচানোর কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন, শিকল-দেবীর পূজাবেদী ভাঙার ডাক দিলেন। 'সবুজের অভিযান' এই সূত্রে স্মরণীয়। ডানা মেলে দেওয়া পাখির মতো সমাজের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার উৎসাহ তিনি জানালেন। 'কালান্তর' বইটির 'সমস্যা' প্রবন্ধে যাকে বলেছিলেন 'খুঁটাশ্বরী', সমাজের খুঁটিকে ঈশ্বরী অর্থাৎ দেবী জ্ঞানে পূজা—সেই 'খুঁটাশ্বরী'কে কবিতায় তিনি বললেন 'শিকল-দেবী'। 'সবুজের অভিযান' কবিতার খাঁচা, খাঁচায় বন্দী পাখি, খাঁচার বাইরের মুক্ত পাখির চিত্রকল্প 'একটা আষাঢ়ে গল্প'টিতে 'কালান্তর' গ্রন্থভুক্ত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে, 'তাসের দেশ' নাটকে জীবনের নানাপর্বে ঘুরে ফিরে এসেছে। নাটকে আমাদের আচারে-বিচারে, সংস্কারে ও বিধি-বিধানে বাঁধা সমাজকে তিনি বলেছেন 'অচলায়তন'। 'ফাল্গুনী'তেও শীতের জরাজয়ী যৌবনের ঋতু, মৃত্যুকে জয় করতে করতে এগিয়ে চলা প্রাণে স্পন্দিত ঋতু বসন্তের জয়গাথা একই ভাবের প্রেরণার তিনি এ-সময় রচনা করেছেন। 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতার বিদ্রোহী নবীন বীরের স্থবিরের শাসন-নাশনের কল্পনা বলাকা-পর্বেরই 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে উঁকি দিয়েছিল। এ দেশের জীবন্মৃত সমাজকে তিনি এ কালে উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার জানিয়েছেন। ১৯১২-১৯১৩-তে য়ুরোপ ভ্রমণের আগেই তাঁর মনে হয়েছিল যে য়ুরোপে আছে মুক্ত জীবনের আনন্দ। ভ্রমণকালে তা তিনি প্রত্যক্ষও করলেন। এবারে কবির এই তৃতীয় বিদেশ যাত্রার অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে 'বলাকা'র বেশ কিছু কবিতায় ও সমকালীন আরও অনেক রচনায়।

'বলাকা'র গতিভাবনা প্রসঙ্গে দার্শনিকতা আলোচনায় সংক্ষেপে যথাসম্ভব বলার চেষ্টা আমরা করেছি। এই পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ আমরা পরে করছি। গীতাখ্য-পর্বে তাঁর মন যে-পথে অগ্রসর হচ্ছিল, এমনিতেই তিনি গতিময় ভৌত ও প্রাণ জগতের ধারণায় এসে পৌঁছোতেন। পূর্ববর্তী পর্বে তিনি তাঁর ঈশ্বরকে পথিকরূপে দেখেছেন। পথিক ঈশ্বরকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে।' এই পান্থ ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য আসছেন। তার অর্থ এই নয় যে তিনি মানুষকে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল। উদ্ধার মানুষ নিজেকেই নিজে করবে। 'রাজা' নাটকের সুদর্শনা চরিত্রে এই আত্মোদ্ধারের নাটক দেখিয়েছেন। শুধু দুঃখ বিপদের আঘাত মানুষ জয় করছে না। নিজে মানুষ যে-পাপ, যে-অমঙ্গল, যে-অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে, তাকে অতিক্রমের শক্তি মানুষের ভেতরটায় জাগছে, সুদর্শনা চরিত্রে সেই শক্তিলাভের বলিষ্ঠ ছবি আঁকা হয়েছে। গীতাখ্য-পর্বের গীতিকবি দুঃখ-জয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু পাপ-অশান্তি-অমঙ্গল জয়ের কথা এভাবে বলেন নি। তিনি তা বললেন 'রাজা' নাটকে। এখানেই কবির চেয়ে নাট্যকার এগিয়ে আছেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের এই বক্তব্য আমরা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছি।

'ঝড়ের খেয়া'য় পাপের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপের সামনে দাঁড়িয়ে ঝড়ো অন্ধকারে রাত্রির সমুদ্রযাত্রায় আত্মাহুতির যে-বলিষ্ঠ সংকল্প উচ্চারিত হলো, তার সঙ্গে 'রাজা' নাটকেরই বেশি যোগ, বরং কম যোগ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির। এ পর্বে দুঃখ-জয়ের কথা বললেও এভাবে পাপ ও অশান্তির কথা তিনি বলেন নি, যেমন বলেছেন এখানে 'ঝড়ের খেয়া'য়—

> "দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
> অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে॥"

কবি নিজেও যেন এই দুই পর্বের পার্থক্য বিষয়েই ইঙ্গিতবহ কবিতার ভাষায় 'শঙ্খ'তে বলেছেন :

"চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি স্বর্গ।"

পূজার ঘর গীতাখ্য-পর্ব, এ-ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি দেখলেন মানবতার শঙ্খ ধুলোয় পড়ে আছে। মানুষের ন্যায় নীতির আদর্শ আজ ভূলুণ্ঠিত। তাই যুদ্ধ বেধেছে। শান্তির-রজনীগন্ধা ছেড়ে রক্তজবার মালা গাঁথায় আজ তাঁর উৎসাহ। যে-অন্যায় যুদ্ধ বেঁধেছে, তার বিবদমান কোনও পক্ষেই তাঁর আগ্রহ নেই। কেননা তিনি জানেন, দু'পক্ষই অন্যায়কারী। তিনি এ কবিতায় যে যুদ্ধের ডাক দেন, তা ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। তাই 'শঙ্খ' যুদ্ধোন্মাদনার কবিতা নয়, যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য অপরিহার্য যুদ্ধের কবিতা। এ প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডে 'শঙ্খ' কবিতার এক বিকৃত মুদ্রণের তৎকালীন তথ্য আমরা স্মরণ করেছি। আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল কিন্তু নৈতিকতায় বলিষ্ঠ আত্মরক্ষার যুদ্ধে উদ্দীপ্ত বেলজিয়ামকে নিয়ে 'বলাকা'র পঞ্চম কবিতায় তিনি লিখেছিলেন।

পথিক ঈশ্বর অনেককালের অনেক গ্রহ-তারায় আঁকা-বাঁকা পথ পেরিয়ে, অনেক ঝড়ের রাতের অন্ধকার উপেক্ষা করে মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য এসেছেন। মানুষকে বন্ধুরূপে পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন। এইসব ভাবনা গীতাখ্য-পর্বে এসেছিল বলেই 'বলাকা'য় কবি পৌঁছাতে পেরেছেন। 'বলাকা'র কবিতা আলোচনা করার সুযোগ 'কাব্য-পরিক্রমা'য় রবীন্দ্র-সাহিত্যেব অবিস্মরণীয় অকাল প্রয়াত সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী পান নি। কিন্তু 'গীতিমাল্য' পর্যন্ত যে-আলোচনা তিনি করেছিলেন, তাতেই 'বলাকা'য় উত্তরণের পথটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পথিক ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে এই পর্বেই মিশেছে অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে মানুষের বর্তমান দেহ-মন লাভের ধারণা। অজিতকুমারের ভাষায়, 'এই নরদেহ গড়িয়া উঠিবার অভিব্যক্তির ইতিহাসের স্তরে স্তরে যে ভগবানের আনন্দলীলা বিরাজিত তাহা উপলব্ধি করা এ কালের কবি ভিন্ন আর কোন কালের কবির দ্বারা সম্ভাবনীয় ছিল না।' আর এই প্রসঙ্গেই তিনি 'গীতিমাল্য'কে বলেছিলেন, 'এ কাব্য এভোল্যুশনে জীবলীলার কাব্য।' 'গীতিমাল্য' বিষয়ে আলোচনা শেষে যে 'আরো-আরো-আরো' প্রতীক্ষার কথা তিনি বলেছিলেন, তার পরের 'আরো' এই 'বলাকা'। প্রাণের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির আপাতত পরিণাম মানুষ ভাঙাগড়ায় নিত্য বিবর্তমান বিশ্বের পথ পেরিয়ে পথিক ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য কতো কাল ধরে আসছেন। গীতাখ্য-কাব্যত্রয়ের পর্বকে আমরা বারবার এককথায় গীতাঞ্জলি পর্ব বলছি। এই গীতাঞ্জলি পর্বের ওসব ভাবনা কল্পনার রেশ 'বলাকা'র ২৭, ২৯, ৩১, ৩৩ ও ৪২-সংখ্যক কবিতায় শুনতে পাই। এগুলির মধ্যে ২৯, ৩১ আর ৩২-সংখ্যক কবিতায় গীতাঞ্জলি পর্বের মতো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে 'প্রভু' সম্বোধনও তিনি জানিয়েছেন। পরে এরকম সম্বোধন রবীন্দ্র-কবিতায় খুব কমই শুনেছি। কাকে প্রভু নাথ, বন্ধু, সখা, প্রিয়, পিতা, জননী বলে সম্বোধন করা যায়? যিনি মানুষ ছাড়া আর অন্য একজন, এমন ঈশ্বরের বিশ্বাস থাকলেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এসব সম্বোধন করা চলে। 'বলাকা' পর্ব থেকে এরকম ঈশ্বরে বিশ্বাসের বদলে কবি যে-বিশ্বাস ক্রমে স্ফুট থেকে স্ফুটতর হচ্ছিল তা হচ্ছে—পূর্ণ বিকশিত মানুষই একদিন ঈশ্বর হয়ে উঠবে। সেদিন ঈশ্বরে-মানুষে পার্থক্য ঘুচে যাবে, দ্বৈতবোধ লুপ্ত হবে। যে মানুষের সুদূর-ভবিষ্যতের এই উন্নত রূপ তিনি ভাবছেন,

সে-মানুষ বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তি মানুষ নয়। এই ভাবনা ভাষা পেয়েছিল 'বলাকা' থেকে ১৭/১৮ বছর পরে 'মানুষের ধর্ম' ভাষণগুলির তৃতীয়টিতে এই একটিমাত্র বাক্যে :— 'সোহহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না।' এ ভাবনা তো অনেক পরের, 'বলাকা' অনেক আগে। যেহেতু 'বলাকা'য় এসব অনুভবের অস্পষ্ট প্রকাশ প্রথম ঘটেছিল, সেজন্যই এই বইটি সম্পর্কে বলা হয় যে এখান থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যধারা চলতে চলতে এক বাঁক নিল।

অজিতকুমার চক্রবর্তী য়ুরোপের যে অভিব্যক্তিবাদী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের চিন্তা-ভাবনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় স্মরণ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কবির আযৌবন পরিচয়। তাঁদের লেখা তিনি নিষ্ঠাভরে পড়েছেন। তাঁর রচনাতেও এই পরিচয় এখানে সেখানে ধরা দিয়েছে। তাই 'বলাকা'য় হঠাৎ অভিব্যক্তিবাদী ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁর রচনার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে রাতারাতি এখানে তিনি গতিতত্ত্বের কবি হয়ে ওঠেন নি। বার্গসঁর দর্শনচিন্তার সঙ্গে 'বলাকা'র মিল ও অমিল বিষয়ে সবচেয়ে বিস্তৃত আলোচনা ড. ক্ষুদিরাম দাস তাঁর 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' বইটিতে করেছেন। তিনি বারবার রবীন্দ্র-মনের বিবর্তনটি দেখিয়ে বরং এমন কথাই বলতে চেয়েছেন যে বার্গসঁর লেখাপড়া না পড়াটা বড়ো কথা নয়, এমনিতেই কবির মন এ দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল, তবে তিনি অনুমান করেছেন। কবি তৃতীয়বার বিলেতে থাকার সময় বার্গসঁর Creative Evolution-এর ১৯১১-তে প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ উল্টে-পাল্টে দেখেছেন। 'বলাকা'র গ্রন্থ পরিচয়ে সংকলিত অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা কবির একটি চিঠিতে বার্গসীয় দর্শন বিষয়ে একটি 'চটি বই' পড়ার সংবাদ আমরা পাচ্ছি। বার্গসঁর সঙ্গে তাঁর মিল এবং অমিলও এ চিঠিতে বলা হয়েছে।

যাঁরা সৃষ্টিতে বিশ্বাসী তাঁদের স্রষ্টা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেই হয়। আর যাঁরা অভিব্যক্তির কথা বলেন তাঁরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হতে পারেন, আবার না-ও হতে পারেন। য়ুরোপের অভিব্যক্তিবাদীদের পুরোধা বিজ্ঞানী ডারউইন। তিনি নিজেই প্রথমদিকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন, পরে যদিও তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ঈশ্বর আছেন কি নেই—তা জানার উপায় নেই, তিনি অজ্ঞেয়। শেষ দিকে তিনি অজ্ঞেয়বাদী হয়ে ওঠেন। বার্গসঁ এই অভিব্যক্তি প্রস্থানের এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক। কবির সঙ্গে 'বলাকা' লেখার পরে তাঁর সাক্ষাৎ আলাপও হয়েছিল। বার্গসঁ ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। স্রষ্টা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরন্তর অভিব্যক্ত হচ্ছেন। যা আছে অর্থাৎ সত্তা, তা-ই গতি। সত্তা ও গতি সমার্থক। যা কিছু আছে তাঁর সমস্তটা যে আমাদের গতি বলে মনে হয় না, তার কারণ আমরা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা সব কিছুকে স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করে দেখি। আমরা যদি অপরোক্ষানুভূতি বা ইনট্যুশনের (Intution) দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতাম, তাহলে আমরা বুঝতাম—বাইরে যা কিছু আছে স্থানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন লক্ষ লক্ষ একক হিসেবে নেই। এ আমাদের কাছে স্পষ্ট হতো যে যা-আছে, তা নিরন্তর হয়ে উঠছে; এ এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। যা নিরেট (solid) বস্তু (matter) বলে মনে হচ্ছে, তাও প্রাণের ঊর্ধ্বগামী আতশবাজি জ্বলে ওঠার পর ঝরে পড়া তার ছাই মাত্র অথবা আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গীর্ণ তরল লাভা স্রোতের জমাট বাঁধা রূপমাত্র। আসলে সমগ্র বিশ্ব প্রাণের প্রবাহ। কিন্তু তা অনুভব করার পথে বুদ্ধি বিভ্রাট বাধায়। ইনট্যুশনে সেই বাধা দূর করা যায়। আর তখনই বার্গসঁ কথিত *যথার্থ সময়ের বোধে আলোকিত হয়ে উঠতে পারি। অন্য দিকে আমরা যে সময়ের বোধে* সত্য দৃষ্টি হারিয়েছি, তাকে বার্গসঁ বলেন ঘড়ির সময় বা বৈজ্ঞানিক সময়। এই দুই সময়ের

ধারণা তাঁর চিন্তার একটি মূল ভিত্তি। ঘড়ির সময়ের মধ্যে দেশ অর্থাৎ স্থান ও কালের একটা ব্যবধান আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটায়। এই দৃষ্টি বিভ্রমের জন্য সর্বত্র আমরা গতি অনুভব করতে পারি না, আমাদের চেতনায় অনেকটাই স্থিতি বলে মনে হয়।

অজিতকুমারকে লেখা চিঠিতে এখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। তাঁর কাছে মনে হয়েছে, গতিও যেমন সত্য; স্থিতিও তেমনই সত্য। পদার্থ বিজ্ঞানও কবির পক্ষে, দার্শনিক বার্গসঁর পক্ষে নয়। কেন না পরমাণুর ভেতরের সত্য হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটনের স্থান ও গতিমাত্রা নিয়ত পরিবর্তিত হলেও অর্থাৎ সেখানে গতি থাকলেও বৈদ্যুতিক চার্জ ও ম্যাস থাকে অপরিবর্তিত, স্থিতিশীল। বার্গসঁ কোথাও স্থিতি স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বে গতি ও স্থিতির সামঞ্জস্য সহাবস্থানে বিশ্বাস'।

আরেকটি ক্ষেত্রে কবি ও দার্শনিকের পার্থক্য আছে। বার্গসঁ যে সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির কথা বলেন, তা কোনও লক্ষ্যমুখী নয়। যা আছে, তা পরে কী রূপ নেবে, আজকের উদ্ভিদ ও জীব ভবিষ্যতে কীভাবে রূপান্তরিত হবে—সবই অনিশ্চিত। অতীতেও যেসব রূপান্তর ঘটেছে, তাও এক অন্ধ আবেগে। অভিযোজনের (Adaptation) মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ ও জীবজগতে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে। তার সাক্ষ্যও এই লক্ষ্যহীনতার পক্ষে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিকে এক লক্ষ্যহীন অভিব্যক্তি ভাবতে কখনোই প্রস্তুত ছিলেন না। জড়জগৎ ও প্রাণজগৎ—দুই-ই তাঁর কাছে এক জ্যোতির্ময় গোলাপের মতো ফুটে ওঠা এক ফুল। যদিও এ ভাষা 'বলাকা'র ২৪/২৫ বছর পরের 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থের ২১-সংখ্যা কবিতার ভাষা, তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি, এ হচ্ছে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী ভাবনার ভিত্তি।

আমরা 'চঞ্চলা' ও 'বলাকা' এই কবিতা দুটিতে কোথায় বার্গসঁ সদৃশ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে আর কোথায় তা পায় নি—তার আলোচনায় এবারে প্রবেশ করতে পারি। 'চঞ্চলা'য় সমগ্র সৃষ্টিকে এক নদীপ্রবাহ ও 'বলাকা'য় এক ঝাঁক দুর্দম গতিতে উড্ডীন হংস-বলাকা রূপে কল্পনায় গতিময় অস্তিত্বের ধারণা আমাদের মনের মধ্যে জাগে। অভিব্যক্তিতে নিত্য পরিবর্তমান সত্তার ভাবনা কবিতা দুটিতে কাজ করেছে। পৃথিবীর উৎপত্তির পর যে-সব পরিবর্তন যুগে যুগে হয়েছে অভিব্যক্তিবাদীদের ধারণা সম্মত সে সব কথা 'চঞ্চলা' কবিতায় আছে। আজকের মানুষের রক্তে সেই আদি প্রাণী পদার্থ প্রটোপ্লাজমের জন্মস্থান সমুদ্রের স্মৃতি ঢেউ হয়ে নাচে, আর সমস্ত সত্তায় সেই সুদূর অতীতের মহারণ্যের ব্যাকুলতা কাঁপে, কবির 'মনে আজি পড়ে সেই কথা যুগে যুগে এসেছি চলিয়া/স্খলিয়া স্খলিয়া/চুপে চুপে/রূপ হতে রূপে/প্রাণে'—এখানে অ্যামিবা থেকে আজকের লক্ষ লক্ষ জীবকোষ বিশিষ্ট জটিল অবয়ব সংস্থানে অতুলনীয় মানুষ পর্যন্ত বিবর্তনের স্মৃতি তাঁকে বার্গসঁর পরিভাষায় ঘড়ির সময় থেকে যথার্থ সময়ের বোধে মুক্তি দিয়েছে। ঝিলমতীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর এমনই অপরোক্ষানুভূতির আলো জ্বলেছিল যে তিনি ঘড়ির সময় থেকে যথার্থ সময়ে উত্তীর্ণ হলেন। তখন তিনি জ্ঞেয় বিষয়ের প্রবাহের মধ্যে ভেসে চলতে চলতে অনুভব করেছিলেন যে আকাশের গ্রহ-তারা-নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে পর্বত-অরণ্য, পদতলের তৃণ, এমনকি ভূমিগর্ভের বীজ—সকলই হংস-বলাকার মতো পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে চলছে। এলাহাবাদে যে-রাত্রে 'চঞ্চলা' কবিতা লিখেছিলেন, সে-রাত্রির স্মৃতি কথায় কবি বলেছিলেন সে-রাত্রে আকাশের তার রাত জেগে ছাদে বসে দেখেছিলেন আর এদের চলমান রূপ তাঁর প্রত্যক্ষ হয়েছিল। মনে হয়েছিল এ বিশ্বের সবকিছু চলছে।

কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই দেখবো, রবীন্দ্রনাথ 'চঞ্চলা'য় তাবৎ সৃষ্টিকে অভিসারিকা রূপে দেখছেন, অভিসারিকা লক্ষ্যহীনভাবে পথে চলে না। প্রিয়ের সঙ্গে মিলন তার লক্ষ্য। সৃষ্টির অভিব্যক্তি চলছে অব্যক্ত থেকে ব্যক্তর দিকে যাত্রা একটি লক্ষ্য সামনে রেখে চলেছে—এ লক্ষ্য অভিসারিকার প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের লক্ষ্যের মতো। এমন কল্পনা যে-কবির, তিনি বার্গসঁর লক্ষ্যহীন সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির ধারণায় কখনোই সায় দিতে পারেন না। এ-কথা সত্য যে 'বস্তুফেনা' 'সূর্য চন্দ্র তারা যত/বুদবুদের মতো'—এ জাতীয় কল্পনার সঙ্গে বার্গসঁর মিল আছে। বার্গসঁ দার্শনিক হলেও নিজেও উপমার চিত্র লিপিতে লিখতে ভালোবাসতেন। প্রতি মুহূর্তে বর্তমানের মৃত্যু হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের নবজীবন স্ফুট হচ্ছে। 'চঞ্চলা' কবিতায় 'পলকে পলকে—/মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে'—এ সব কথা 'বলাকা'য় এসে কবি প্রথম বলেন নি, সারা জীবন বলেছেন। তাই এখানে বার্গসঁর প্রভাব নির্দেশ বাতুলতামাত্র। কেননা এ-জাতীয় অনুভব রবীন্দ্রনাথের চিরকালের। অণু-পরমাণুর ইলেকট্রন প্রোটনের গতির কথা এ কবিতায় আছে। গতির স্তব্ধতা মৃত্যু—এ ধারণাও প্রকাশ পেয়েছে। ও কথাও সত্য 'চঞ্চলা' ও 'বলাকা' কবিতা দুটিতে বাধাবন্ধহারা অকারণ অবারণ গতির ভাবনাও প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বার্গসঁর মতো স্থিতিহীন গতির ধারণা 'বলাকা'র কবিকে আচ্ছন্ন করেছিল—একথা বললে ভুল বলা হয়। কেননা একটি দুটি কবিতার সাক্ষ্যে একজন কবিকে বিশেষ দর্শনে বিশ্বাসী বলার উপায় নেই। 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা'র ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে তিনি 'চঞ্চলা' লিখেছিলেন। সমগ্র বিশ্বব্যাপী হংস-বলাকার পক্ষবিধুননে কবির অন্তর যে সন্ধ্যায় জেগে উঠেছিল, সে-সন্ধ্যার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 'বলাকা' কবিতাটি। এ দুটি কবিতার মতো এতো উচ্চস্তরের সৃষ্টি না হলেও ১৬-সংখ্যক কবিতায় গতিতত্ত্ব ঘোষিত হয়েছে। গতিতত্ত্বের প্রকাশই এক কথা; আর বার্গসঁর লক্ষ্যহীন সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির ধারণায় সায় দেওয়াই আরেক কথা। যন্ত্রবাদী-অভিব্যক্তিবিশ্বাসীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে বার্গসঁ যে অভিব্যক্তির ধারণা প্রতিষ্ঠা করলেন, তা আবার যন্ত্রবাদীদের মতোই হয়ে উঠলো। বার্গসঁর সমালোচনায় পণ্ডিতরা এভাবে আপত্তি তুলেছেন। এসব দার্শনিক জটিলতা কবিতার আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। আমরা বার্গসঁর দর্শক চিন্তার সঙ্গে নিজের থেকে বিবর্তিত রবীন্দ্রমনের মিল ও অমিল এ বইয়ের ভেতরে আলোচনা করেছি। আবার সংক্ষেপে এখানেও তা আলোচনা করা হলো।

'বলাকা' প্রসঙ্গে 'ছবি' (৬) ও 'শাজাহান' (৭) কবিতা দুটির গুরুত্ব থাকলেও এগুলিতে আর যাই থাক গতিতত্ত্ব নেই। 'ছবি'তে নিজেকে ও 'শাজাহান' কবিতায় এই 'ভারত-ঈশ্বর'কে কবি মানব পথিক রূপে ভাবছেন। একদিন তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী জীবনের পথে চলতে চলতে মৃত্যু-রাত্রির অন্ধকার আড়ালে থমকে দাঁড়িয়ে আছেন। মৃত্যুর মধ্যে এই মহীয়সী নারী চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন, শুধুই ছবি হয়ে রইলেন। এসব কথাই কবিতার আরম্ভে অনেকটা জায়গা জুড়ে তিনি বলেছেন। কিন্তু শেষদিকে কবি বললেন যে এ-ধারণা ভুল। প্রয়াতা আত্মীয়ার পথ চলা থামে নি। তাঁর পথ চলা চলছে কবির জীবনে, একদিন কবির মনে হয়েছিল তাঁকে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। বিস্মৃতির গভীরে তিনি থাকতেন, তাহলে তাঁকে স্মৃতির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হতো। ভাগ্যিস, মানুষ ভুলতে পারে নইলে তো দুর্বহ বোঝা নিয়ে মানুষের পথ চলাই সম্ভব হতো না। রবীন্দ্রনাথ অন্য প্রসঙ্গে দুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দের কথা বলেছিলেন। আমরা তাঁরই ভাষার অনুসরণে বলেছি স্মৃতিকে-আত্মসাৎ করা বিস্মৃতি। শুধুই যদি স্মৃতি হয়, তা হল

এ দুঃখের কারণ। স্মৃতিকে আত্মসাৎ করা বিস্মৃতি বলেই দুঃখ জয়ের আনন্দ হয়ে সেই মহীয়সী নারী কবির জীবনে আছেন। 'ছবি' কবিতার এসব গূঢ় উপলব্ধি শাজাহান, মমতাজ ও মমতাজের মৃত্যুশোকে সৃষ্ট তাজমহলকে ঘিরে অন্যরূপ কবি প্রকাশ করলেন।

শাজাহান একদিন ভেবেছিলেন, মমতাজের মৃত্যুতে তাঁর বেদনাকে, প্রিয়তমার স্মৃতিকে তিনি অমর করে রাখবেন। কিন্তু তা চাইলেই কি মানুষ পারে? যদি পারতো, সে হতো এক দুঃসহ অবস্থা। শাজাহানের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ভালোই হয়েছে। তাঁর পথ চলা সম্ভব হলো। স্মৃতির ভারমুক্ত হয়ে তিনি নিত্য আনন্দ লোকে উত্তীর্ণ হলেন। এই আনন্দলোকে ভারমুক্ত পথিককে পৌঁছিয়ে দিল তাঁর সৃষ্টি এ তাজমহল—যদিও তাজমহল নিজের স্মৃতিভারে পড়ে রইল।

'ছবি' ও 'শাজাহান' কবিতা দুটি প্রসঙ্গে এখানকার এই কথাগুলি বিস্তৃতভাবে কবিতা পাঠে ও অন্যত্র আমরা বলেছি। এ প্রসঙ্গে 'রাজপথের কথা' গল্প, 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটির 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে' রচনা দুটি, 'পুষ্পাঞ্জলি'র গদ্যাংশ 'প্রভাতে' থেকে আরম্ভ করে 'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'প্রথম শোক'—এসব নানাধরনের লেখার উল্লেখ আমরা করেছি এবং তাঁরই ভাষায় বলতে চেয়েছি যে জীবনে বাঁচতে হলে বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্য অনুরাগের অভাব নয়। এ বৃহৎ অনুরাগ। এই বৈরাগ্যই মানুষকে নিরাসক্ত করে, নির্লিপ্ত করে, পথের বন্ধন ছিঁড়তে উৎসাহিত করে, আর এই বন্ধন ছেদনেই পথ চলা সম্ভব হয়। এভাবেই মহৎ মানুষ পথিক হন। কবির এইসব চিন্তা ও অনুভূতি অনেক কালের, যৌবনকাল থেকে লালিত প্রিয় ভাবনা। তাই আমাদের ধারণায়, 'ছবি' ও 'শাজাহান' কবিতা দুটিতে এমন অভিনব কিছু পাই নি যা 'বলাকা'র আগে দুর্লভ। 'বলাকা'র গতিভাবনার সঙ্গে এদের যোগ নেই। এ পুরোনো ভাবনারই রসোজ্জ্বল রূপ। এরূপ আমরা পরেও অজস্রবার রবীন্দ্র-কবিতায় দেখেছি।

বলাকা

(মূল কাব্য)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

উইলি পিয়র্‌সন্‌ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
        আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
আমরা পিছনে নিজের গোপনে রাখ,
        আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

ছোটোরে কখনো ছোটো নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জানে,
        প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য—
        তোমারে আদরি আপনারে করি ধন্য।

৭ মে ১৯১৬
তোসা-মারু জাহাজ
বঙ্গসাগর

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১ ॥

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুজ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;
আর তো কিছুই নড়ো না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ওই-যে প্রবীণ, ওই-যে পরম পাকা—
চক্ষুকর্ণ দুইটি চিত্র ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে-আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

বাহির-পানে তাকায় না যে কেউ—
দেখে না যে বান ডেকেছে,
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, এ কী বিষম কাণ্ডখানা!
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমায় কাঁচা।
শিকল-দেবীর ওই-যে পূজাবেদী

চিরকাল কি রইবে খাড়া!
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন। বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর্ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে—
ঘুচিয়ে দে, ভাই পুঁথিপোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা।
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ, ১৩২১

॥ ২ ॥

এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো!
রক্ত মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ওই বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে।
এই বেলা নে বরণ ক'রে
সব দিয়ে তোর ইহারে।
চাহিস নে আর আগুপিছু,
রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর্ মাথা নিচু
সিক্ত আকুল কেশে গো।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে।
গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ
নিবল শয়ন-শিয়রে।
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো?
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

ছি ছি রে, ওই চোখের জল আর ফেলিস নে।
ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে,
কোণে আঁচল মেলিস নে।
কিসের জরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক-না তোর দ্বারের শিকল,
বাহির-পানে ছোট্-না সকল
দুঃখসুখের শেষে গো।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠবে না?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয় রে সেজে,
আয়-না বধূর বেশে গো।
ওই বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো।

রামগড়
৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

॥ ৩ ॥

আমরা চলি সমুখ-পানে,
কে আমাদের বাঁধবে?
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্তপায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলই ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।
মন ছড়াল আকাশ ব্যোপে,
আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে—
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর-গিরি করব রে জয়,
যাব তাদের লঙ্ঘি।
একলা পথে করি নে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপনি মেতে
আছে ওরা গণ্ডি পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধবে ওদের বাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ,
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান,
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন ক'রে

অমৃতরস আনব হ'রে
ওরা জীবন আঁকড়ে ধ'রে
মরণ-সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রামগড়
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

॥ ৪ ॥

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে,
একী রে দুর্দৈব!
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,
আয়-না রে নিঃশঙ্ক।
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে
ওই-যে অভয়শঙ্খ।

চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

আরতিদীপ এই কি জ্বালা?
এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথব রক্তজবার মালা?
হায় রজনীগন্ধ্যা!
ভেবেছিলেন যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি

লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।

যৌবনেরই পরশ-মণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্‌বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও-না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ।

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারা-সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

রামগড়
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

॥ ৫ ॥

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ওই-যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগর-সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে—
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূল-ছাড়া মোর নেয়ে?

এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে?
সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আসছে তরী বেয়ে।
কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
পথ-হারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে?
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথি
বিরহী মোর নেয়ে।

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
বিবাগী মোর নেয়ে?
নাহি জানি পূর্ণ ক'রে কোন্ রতনের বোঝা
আসছে তরী বেয়ে।
নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার—
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আন্‌মনে গান গেয়ে।
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে?

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।

তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আসছে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্তপলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
ওই-যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে, বাহির হল কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয় নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে
আসতে তরী বেয়ে।
বাজবে নাকো তূরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ—
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ—
দৈন যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক-পরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ,
কূলে আসবে নেয়ে।

কলিকাতা
৫ ভাদ্র, ১৩২১

॥ ৬ ॥

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?
—ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
অকাশের নীড়;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন।

কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে।
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে,
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে,
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায়;
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন,
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবই—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিতে নিশ্বাসে,
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল—
সে যে আজ হল কত কাল!
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তূলিকা ধরি রসের মুরতি
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি

কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশপাথারে;
পথের দু-ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরনে বরনে;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবননির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি, ওই তারা, ওই শশীরবি,
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি।
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাতে তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মরমুখর ছায়া মাধবীবনের
হ'ত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,

তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল?
ভুলি নে কি তারা?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা, নয় সে তো ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই—
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে,
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

এলাহাবাদ
৩ কার্তিক, ১৩২১
রাত্রি

॥ ৭ ॥

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা

যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল' নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ

বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌনজাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে—
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

চলে গেছ তুমি আজ
মহারাজ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি-'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান;

যমুনাকল্লোর-সাথে নহবত মিলায় না তান;
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

মিথ্যা কথা—কে বলে যে ভোল' নাই?
কে বলে রে খোল' নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণের যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যা ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমাকের ভরিতে
নাহি পারে—
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে

মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-'পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে;
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
'যত দূর চাই
নাই নাই, সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

এলাহবাদ
১৫ কার্তিক, ১৩২১
[পূর্বপাঠ: রাত্রি ১৪ কার্তিক]

॥ ৮ ॥

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছে যে নিরুদ্দেশ সেই চলা, তোমার রাগিণী
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া?
সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে;
বারম্বার ঝ'রে ঝ'রে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও;

ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমাকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণচলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।

নাহি জানে কেউ—
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজ অরণ্যের ব্যাকুলতা;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা-কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর্।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

এলাহাবাদ
রাত্রি
৩ পৌষ, ১৩২১

॥ ৯ ॥

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ?
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ?
তাই দেবলোক-পানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দমঞ্জরী;
তাই তো তোমারে ঘিরি বহে বারো মাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ন নিশ্বাস;
মিলন রজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে

ম্লান দীপালোকে
ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রু-গলা গান
তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান
হে পাষাণ, অমর পাষাণ!

বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি
সে রাজবিরহী
বিরহের রত্নখানি;
দিল আনি
বিশ্বলোক-হাতে
সবার সাক্ষাতে।
নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,
ঘিরিয়া ধরেছে তারে দশ দিক।
আকাশ তাহার 'পরে
যত্নভরে
রেখে দেয় নীরব চুম্বন
চিরন্তন;
প্রথম মিলনপ্রভা
রক্তশোভা
দেয় তারে প্রভাত-অরুণ,
বিরহের ম্লানহাসে
পাণ্ডুভাসে
জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণ

সম্রাট্‌মহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি সে অনঙ্গস্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।
রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

সম্রাটের মন
সম্রাটের ধনজন
এই রাজকীর্তি হতে করিয়াছে বিদায়গ্রহণ।
আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণসুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধন।

এলাহাবাদ
প্রভাতে
৫ পৌষ, ১৩২১

॥ ১০ ॥

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান?
প্রভাতের গান?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির 'পরে;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে?
কী তোমারে দিব আনি?
সন্ধ্যাদীপখানি?
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনেব।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায়?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার
হোক ফুল, হোক-না গলার হার,
তার ভার
কেনই বা সবে
একদিন যাবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে!

নিজ হতে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি।

তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি—
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে—
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।
আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথের শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে, না জানিতে, সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান।

শান্তিনিকেতন
১০ পৌষ, ১৩২১

॥ ১১ ॥

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কারা সবে ধুলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায়!
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার।
তার পরে দেখি,
এ কী,
খোলা তব বিচার-ঘরের দ্বার,
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের 'পরে;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা
তাদের মত্ততা-পানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধুলা দিয়ে যারা চলে যায়।
হে সুন্দর,
তোমার বিচার-ঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্যসমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গকূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লবীজনে।

প্রেমিক আমার,
তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বার
লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ

তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমরে কাঁদিয়া ডাকি—
খড়্গা ধরো প্রেমিক আমার,
করো গো বিচার।
তার পরে দেখি,
এ কী,
কোথা তব বিচার-আগার!
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা-'পরে;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহ-শেল ক্ষতবক্ষে করি লয় গ্রাস।
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার-আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনা-মাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে,
সখার হৃদয়রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তারা, মুগ্ধ তারা, হয়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সংগোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।
চোরা-ধন দুর্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার—
এদের মার্জনা করো হে রুদ্র আমার!
চেয়ে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে;

সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহারা পড়ে;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে বাতাসে কোথা যায় বহে।
হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান-বজ্রাগ্নি-শিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

শান্তিনিকেতন
১২ পৌষ, ১৩২১

॥ ১২ ॥

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
সুখে দুঃখে উঠে নেবে
বাড়ায়েছি হাত
দিন রাত;
কেবল ভেবেছি দেবে, দেবে, আরো কিছু দেবে।

দিলে তুমি, দিলে শুধু, দিলে—
কভু পলে পলে তিলে তিলে,
কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
দানের শ্রাবণে।
নিয়েছি, ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়ায়ে,
হাতে পায়ে রেখেছি জড়ায়ে
জালের মতন;
দানের রতন
লাগিয়েছি ধুলার খেলায়
অযত্নে হেলায়,
আলস্যের ভরে
ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে।
তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে—
তোমার দানের পাত্র নিত্য ভরে উঠিছে নিখিলে।

অজস্র তোমার
সে নিত্য দানের ভার

আজি আর
পারি না বহিতে।
পারি না সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা,
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে,
তত চেয়ে চেয়ে,
পাওয়া মোর, চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়,
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে
এ প্রার্থনা পুরাইবে কবে?
শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
ধুলায় ফেলিয়া টানি—
সারারাত্রি-পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় প'রে—
লবে মোরে, লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হতে
তব রিক্ত আকাশের নির্মল আলোতে।

শান্তিনিকেতন
১৩ পৌষ, ১৩২১

॥ ১৩ ॥

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস;
নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশিরমন্থর।

বহুদিনকার

ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।
বিরহী তোমার লাগি
আছি জাগি
দক্ষিণবাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে,
কত মধুমধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।

লিখেছে সে—
এসো এসো, চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝ'রে পড়ে ফোটা ফুল, খ'সে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার;
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।

সুরুল
২৩ পৌষ ১৩২১

॥ ১৪ ॥

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

সেইমত আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
এক বেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

শান্তিনিকেতন
২৬ পৌষ, ১৩২১

॥ ১৫ ॥

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করে নি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে—
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়।

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

সুরুল
২৭ পৌষ, ১৩২১

॥ ১৬ ॥

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি;
ধুলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে
আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষে ভাবনা
অসংখ্য কামনা
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হতে সাথী।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল;
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি
কাষ্ঠলোষ্ট্রসুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।
চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি,
সেই তো নগরি।
এ তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

অতীতের গৃহছাড়া কত-যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
খোঁজে তারা আমার বাণীরে
লোকালয়তীরে-তীরে
আলোকতীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্তগুহা ছাড়ি;

দেয় পাড়ি
অদৃশ্যের অন্ধ মরু ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে
আকারের অসহ্য পিয়াসে।

কী জানি কে তারা কবে
কোথা পার হবে
যুগান্তরে,
দূর সৃষ্টি-'পরে
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব আলোতে।
আজ তারা কোথা হতে
মেলেছিল ডানা
সেদিন তা রহিবে অজানা।
অকস্মাৎ পাবে তারে কোন্ কবি,
বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি—
গাঁথিবে তাহারে কোন্ হর্ম্যচূড়ে
সেই রাজপুরে
আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।
তার তরে কোথা রচে ঠাঁই
অরচিত দূর যজ্ঞভূমে?
কামানের ধূমে
কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম!

সুরুল
২৭ পৌষ, ১৩২১

॥ ১৭ ॥

হে ভুবন,
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে;
কী যে হল কানাকানি,
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।

মুগ্ধ চক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু, যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে।

সুরুল
২৮ পৌষ, ১৩২১

॥ ১৮ ॥

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত-কিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন;
ততক্ষণ
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন;
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে, পক্ককেশে।

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।
ওগো, আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস পিছে?
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রব না ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনের পরাইব মালা,

হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

সুরুল
প্রাতকাল
২৯ পৌষ, ১৩২১

॥ ১৯ ॥

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে;
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা—
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা
এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,

এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেইমত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল;
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না—
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

সুরুল
প্রাতঃকাল
২৯ পৌষ, ১৩২১

॥ ২০ ॥

আনন্দগান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পবে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।

যাবার হাওয়া ওই যে উঠেছে—ওগো,
ওই যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম যে ছুটেছে।

হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে।
কে গো তুমি, দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্-না ভাসিতে।

কোনো কালে হয় নি যারে দেখা—ওগো,
তারি বিরহে
এমন ক'রে ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে?

বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশ-রাশিতে।
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।

রেলগাড়ি
২৯ পৌষ, ১৩২১

॥ ২১ ॥

ওরে, তোদের তর সহে না আর?
এখনো শীত হয় নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান?
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল?

মরণপথে তোরা প্রথম দল,
ভাবলি নে তো সময় অসময়।
শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল
গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।
সবার আগে উচ্চে হেসে ঠেলাঠেলি ক'রে
উঠলি ফুটে, রাশি রাশি পড়লি ঝরে ঝরে।

বসন্ত সে আসবে যে ফাল্গুনে
দখিন-হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি—
তাহার লাগি রইলি নে দিন গুনে,
আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি!
রাত না হতে পথের শেষে পৌঁছবি কোন্ মতে?
যা ছিল তোর কেঁদে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে!

ওরে খেপা, ওরে, হিসাব-ভোলা,
দূর হতে তার পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধুলা
তোরা আপন মরণ দিলি পেতে।
না দেখে না শুনেই তোদের পড়ল বাঁধন খসে,
চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলি নে আর বসে।

কলিকাতা
৮ মাঘ, ১৩২১

॥ ২২ ॥

যখন আমায় হাতে ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি আপন পাশে,
রাত্রিদিবস ছিলেম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,
চলতে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছামতে
কোনো দিকে এক পা বাড়াই
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই।

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠল বাজি
অনাদরের কঠিন ঘায়ে,
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই-যে আমার হল ছুটি—
ভাঙল আমার মানের খুঁটি,
খসল বেড়ি হাতে পায়ে;
এই-যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়?
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তিমদে করল মাতাল।
খসে-পড়া তারার সাথে
নিশীথ-রাতে
ঝাঁপ দিয়েছি অতল-পানে
মরণ-টানে।

আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধন-ছাড়া,
ঝড় তাহারে দিল তাড়া;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্রমানিক দুলিয়ে নিল গলার হারে;

একলা আপন তেজে
ছুটল সে যে
অনাদরের মুক্তিপথের 'পরে
তোমার চরণ-ধুলায়-রঙিন চরম সমাদরে।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারই নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারই আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদনখানি।

শিলাইদা। কুঠিবাড়ি
রাত্রি
১৯ মাঘ ১৩২১

॥ ২৩ ॥

কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি!
একজনা উর্বশী, সুন্দরী
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী!
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ কবি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—
দু হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ-পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

পদ্মাতীরে
২০ মাঘ, ১৩২১

॥ ২৪ ॥

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই—
তার ঠিক-ঠিকানা নাই।
তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ,
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা,
ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুস।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধুলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুরই তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গে।

আমার গানে স্বর্গ আজি
ওঠে বাজি,
আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়,
আকাশ-ভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজল যে তাই শঙ্খ,

সপ্তসাগর বাজায় বিজয়ডঙ্ক,
তাই ফুটেছে ফুল,
বনের পাতায় ঝর্নাধারায় তাই রে হুলুস্থুল।
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটিমায়ের কোলে,
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দকল্লোলে।

শিলাইদা। কুঠিবাড়ি
২০ মাঘ, ১৩২১

॥ ২৫ ॥

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে,
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে,
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

পদ্মা
২০ মাঘ, ১৩২১

॥ ২৬ ॥

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই-যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরন হৃদয়-ব্যথার মতো;
দখিন-হাওয়া ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠিল কেবল মর্মরকল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আসবে আমার
রূপের আগুন ফাগুন-দিনের কাল

দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল,
সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।

পদ্মা
২২ মাঘ, ১৩২১

॥ ২৭ ॥

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজনা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি,
রাখব দেনা বাকি।
যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে,
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে,
তলব তারই আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

তাই জেনেছি আমি তাহার নইকো অজানা।
তাই জেনেছি ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা।
তাই ভেবেছি জীবন-মরণে
যা আছে সব চুকিয়ে দেব চরণে।
তাহার পরে
নিজের জোরে
নিজেরই স্বত্বে
মিলবে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজত্বে।

পদ্মা
২২ মাঘ, ১৩২১

॥ ২৮ ॥

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছে স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ যত বোঝা
তাই নিয়ে চলি পথে, কভু বাঁকা কভু সোজা—
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্ত হস্ত সেবায় স্বাধীন;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি;
সুখস্বপ্নরসরাশি
ঢালে তাই ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি।
দুঃখখানি মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।

মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

পদ্মাতীর
২৪ মাঘ, ১৩২১

॥ ২৯ ॥

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া;
এ পার হতে ও পার বেয়ে
বয়.নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণ-মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক;
আমি এলেম, এল তোমার দুখ;
আমি এলেম, এল তোমার আগুন-ভরা আনন্দ—
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে—
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয়;
দেখতে তোমায় বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।
ওগো আমার প্রভু,

জানি আমি, তবু
আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল—
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল।

পদ্মাতীর
২৫ মাঘ, ১৩২১

॥ ৩০ ॥

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দুদিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা,
তার পরে তার খবর কী যে ধারি নে তার ধার গো—
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী, সেই আমার আনন্দ।
সেই তো বাধায়, সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ—
এক নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দয়।
মানে না সে বুদ্ধিসুদ্ধি, বৃদ্ধ জনার যুক্তি—
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

ভাবিস বসে যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে,
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে।
ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না—
সেই কূলে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেছিস, পিছন তোরে ঘিরবে—
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে।

ঘণ্টা যে ওই বাজল কবি, হোক রে সভাভঙ্গ—
জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ।

এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,
তাই তো দোলে বুক।
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ—
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ!

পদ্মাতীর
২৬ মাঘ, ১৩২১

॥ ৩১ ॥

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে,
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই তো একে একে
যা-কিছু ধন তোমার কাছে আমার ক'রে লবে—
এমনি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য তব
তোমার আপন-কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।
এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।
এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি, আপনি যে লও চিনে
আমার পরান করি হিরণ্ময়।

পদ্মা
২৭ মাঘ, ১৩২১

॥ ৩২ ॥

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ওই মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারে।
চক্রবাকের নিদ্রা-নীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই-যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতশিরে
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার;

ওই-যে মরি-মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী;
ওই-যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়,
ঘুমে অলস কায়;
ওই-যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায়;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে;—
তোমার ওই অনন্ত-মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এমনি ক'রেই, প্রভু,
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

পদ্মা
২৭ মাঘ, ১৩২১

॥ ৩৩ ॥

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুশি হয়ে পথের পানে চাও।
খুশি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ-আভাসে।
খুশি তোমার ফাগুন বনে আকুল হয়ে পড়ে
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।
আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে,
তোমার সাগর অধিক ক'রে নাচে
দিনের পরে দিনে।

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী

পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

পদ্মাতীর
২৭ মাঘ ১৩২১

॥ ৩৪ ॥

আমার মনের জানালাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।
দেখতে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে নাম ধ'রে
সে নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকালবেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানে।
মনে হল আমারই প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান,
আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণমূলে
নেব আমি শিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।

সুরুল
২১ চৈত্র, ১৩২১

॥ ৩৫ ॥

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ওই
রৌদ্রে ঝলমল,

এমনি নিবিড় করে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে
তাই তো আমি জানি—
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকুল মানস-সাগর-জলে
কমল টলমল।
তাই তো আমি জানি—
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান,
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
আলোক জ্বলজ্বল।

শ্রীনগর। কাশ্মীর
৭ কার্তিক, ১৩২২

॥ ৩৬ ॥

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ওই পক্ষধ্বনি

শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!'

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

শ্রীনগর
কার্তিক, ১৩২২

॥ ৩৭ ॥

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন-
মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধচ বেচা-কেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
'তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর-পানে
দিতে হবে পাড়ি।'
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি

চারি দিক হতে ওই দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।
'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর'
এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী—
'নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।'

বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন-মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশে—
'বন্দরের কাল হল শেষ।'

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার—
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী;
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।

মরণের গান
উঠিছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসাহলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
উর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।
হে নির্ভিক, দুঃখ-অভিহত,
ওরে, ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান—
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।

ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে—
'তোরে নাহি করি ভয়;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য ও বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।'

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি মেলে দুঃখ-সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশলজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাসরবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

কলিকাতা
২৩ কার্তিক, ১৩২২

॥ ৩৮ ॥

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখতে কি পায় কেউ?

সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহগানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি।

আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজার বার
নূতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে যতন-ভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে দেয় যে তারে আনি।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদনা-ভরা শুধু চোখের খানে।
মিলব তখন বিশ্ব-মাঝে আমরা দোঁহে একা,
যেন নূতন দেখা।
তখন আমার অঙ্গ ভরি নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ,
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ—
তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানি,
কখনো জাফ্‌রানি—
আজ তোরা দেখ্‌ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টিধোওয়া আকাশ যেন নবীন আস্‌মানি।

অকূলের এই বর্ণ এ-যে নিশাহারার নীল—
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইছে দূরের হাওয়া
সাগর-পানে-ধাওয়া।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টিভরা ঈশানকোণের নব মেঘের বাণী।

পদ্মা
১২ অগ্রহায়ণ, ১৩২২

॥ ৩৯ ॥

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে

আপন বক্ষের কাছে; ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্পবিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্যবন্দনাসংগীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের 'পরে;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া; তাই হেরো যুগান্তরশেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেল কুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

শিলাইদহ
১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩২২

॥ ৪০ ॥

এইক্ষণে
মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়নবাতায়নে
যে তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলোতে
সে তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সংগীত,
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।

আজি মনে হয় বারে বারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছ কত দেখা—
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা।
সেই-সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে—
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে।

কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে

চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে,
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলিলগনে।
তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝংকারি উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়;
তাই আজি দক্ষিণপবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

শিলাইদহ
৭ ফাল্গুন, ১৩২২

॥ ৪১ ॥

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখিসম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবারে
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়,
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরে গান বাজে ওই একা ছায়াবটে;
নদীর এ পারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ও পারের জনশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না-চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষনিহত
আধোজাগা নয়নের মতো।
পথখানি বাঁকা

বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে—ফসল খেতের যেন মিতা—
নদী-সাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা।
ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলিকল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই-সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এই মতো অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চারণ,
যে আনন্দবেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

পদ্মা
৮ ফাল্গুন, ১৩২২

॥ ৪২ ॥

তোমারে কি বার বার করেছিনু অপমান?
এসেছিলে গেয়ে গান
ভোরবেলা;
ঘুম ভাঙাইলে ব'লে মেরেছিনু ঢেলা
বাতায়ন হতে,
পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে!

ক্ষুধিতদরিদ্রসম
মধ্যাহ্নে এসেছ দ্বারে মম।
ভেবেছিনু, 'এ কি দায়!
কাজের ব্যাঘাত এ যে!'—দূর হতে করেছি বিদায়।

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অদ্ভুত
দুঃস্বপ্নের মতো।
দস্যু ব'লে শত্রু ব'লে ঘরে দ্বার যত

দিনু রোধ করি।
গেলে চলি, অন্ধকার উঠিল শিহরি।

এরই লাগি এসেছিলে হে বন্ধু অজানা—
তোমারে করিব মানা,
তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,
তোমা-কাছে যত ধার সকলই ধারিব,
না করিয়া শোধ
দুয়ার করিব রোধ।

তার পরে অর্ধরাতে
দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধুলাতে
মনে হবে আমি বড়ো একা
যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।
এ দীর্ঘ জীবন ধরি
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারের মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে,
যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,
অর্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারে বারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারে-বারে-ফিরে-আসা হয়ে।

শিলাইদা
৮ ফাল্গুন, ১৩২২

॥ ৪৩ ॥

ভাব্‌না নিয়ে মরিস কেন খেপে?
দুঃখসুখের লীলা
ভাবিস এ কি রইবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন শিলা?
চলেছিস রে চলাচলের পথে
কোন্ সারথির উধাও মনোরথে—
নিমেষ-তরে যুগে যুগান্তরে

দিবে না রাশ ঢিলা।
শিশু হয়ে এলি মায়ের কোলে,
সেদিন গেল ভেসে।
যৌবনেরই বিষম দোলার দোলে
কাটল কেঁদে হেসে।
রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা?
আবার কবে কী সুর বাঁধা হবে
আজকের পালার শেষে!

চলতে যাদের হবে চিরকালই
নাইকো তাদের ভার।
কোথা তাদের রইবে থলিথালি
কোথা বা সংসার!
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণাপাকের হাওয়া
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চলছে নিরাকার।

ওরে পথিক, ধর্‌-না চলার গান,
বাজা রে একতারা।
এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইকো কূলকিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্নাহাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণ-বসন্তে তুই যের দখিন-হাওয়া
গৃহবাঁধন-হারা।

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ।
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা—
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সামনে সেও প্রেমের-কাঁদন-ভরা
চিরনিরুদ্দেশ।

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।

প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
    এমনি ভালোবাসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর বাঁশি বাজবে গো এই সুরে,
কোন্ মুখেতে সেই আচেনা ফুল
    ফুটবে আবার হেসে!

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
    মেলেছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
    সেধেছিলেম তান।
এত কালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরে
    নেব যে তার গান।

সে গান আমি শোনাব যার কাছে
    নূতন আলোর তীরে
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
    আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলিবনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তার বরণমালাখানি
    পরালো মোর শিরে।

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
    শুধু নিমেষ-তরে।
সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে একা
    উদাস প্রান্তরে।
এমনি করেই তার সে আসা-যাওয়া,
এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে
    মর্মরে মর্মরে।

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
    তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
    মোদের চেনাশোনা।

তারে নিয়ে হল না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা—
এমনি করেই আসা-যাওয়া ডোরে
প্রেমেরই জাল-বোনা।

শান্তিনিকেতন
২৯ ফাল্গুন, ১৩২২

॥ ৪৪ ॥

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে?
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের 'পরে
পুচ্ছ নাচাতে।
তুই পথহীন সাগর-পারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোর যে দাবি-দাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল আয়ুর ভিখারি?
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারি।
মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে;
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোমটা টানি।
সেই আবরণ দেখ্ রে উতারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি।

যৌবন রে, রয়েছ কোন্ তানের সাধনে?
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে?
তোমার বাণী দখিন-হাওয়ার বীণায়
অরণ্যের আপ্নাকে তার চিনায়,
তোমার বাণী জাগে প্রলয়-মেঘে
ঝড়ের ঝংকারে—
ঢেউয়ে 'পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয়-ডঙ্কা রে।

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।
খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্ঝটিকা,
জীর্ণতারই বক্ষ দু-ফাঁক ক'রে
অমর পুষ্প তব
আলোক-পানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব।

যৌবন রে, তুই কি হবি ধুলায় লুণ্ঠিত?
আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানিভারে
রইবি কুণ্ঠিত?
প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি,
আগুন আছে ঊর্ধ্বশিখা জ্বেলে—
তোমার সে যে কবি
সূর্য তোমার নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

শান্তিনিকেতন
৪ চৈত্র, ১৩২২

॥ ৪৫ ॥

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী!
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হতে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা,
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা—
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী—
ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল ওবে যাত্রী।
এসেছে নিষ্ঠুর—
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পাত্র চুর।
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী,
গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।

কলিকাতা
৯ বৈশাখ, ১৩২৩

গ্রন্থপরিচয়

ব্যাখ্যা ও আলোচনা : রবীন্দ্রনাথ[১]

ভূমিকা

এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। পরে চার-পাঁচটি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এইজন্যই একে 'বলাকা' বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা করে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।

১ ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা

এই কবিতার মূলগত ভাবটি এই—যৌবনের যে-একটি প্রবলতা সে সমস্তকে ভেঙে পরখ করে প্রত্যক্ষ করে দেখতে চায়। শাস্ত্রবাক্য আপ্তবাক্য এ-সব তার জন্য নয়। প্রবীণতা চায় যে-কোনো মতে পরের অভিজ্ঞতার বলে বিঘ্নব্যথাকে এড়িয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তারা আবার তাদের প্রবীণতার বোঝা চাপিয়ে দেবে। বাঁধা বুলি না মেনে প্রত্যক্ষের দ্বারা সব-কিছু অনুভব করার মধ্যে বেদনা আছে। কারণ, তাতে পরের অভিজ্ঞতার কর্ণধারত্ব নেই এবং বাঁধা পথের নির্বিঘ্নতাও নেই—কিন্তু এই তো যৌবনের ধর্ম। যৌবনই বিশ্বের ধর্ম, জরাটা মিথ্যা। যৌবন জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।

এই কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লিখিত।

২ সর্বনেশে : এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো

'সর্বনেশে' একটি রূপক বা symbol নয়। অন্তরে বা বাহিরে যদি সর্বনেশে আসে তবে তার কেমনতরো অভ্যর্থনা হবে? গ্রহণ না পলায়ন? এটাই চিন্তনীয় ছিল। দুঃখকালেই অন্তরের ও সমাজের প্রচ্ছন্ন সম্পদ দেখা দেয়। দুঃখের দিন ছাড়া অপ্রত্যক্ষ অন্তরসম্পদ আপনাকে প্রকাশ করে না। গত যুদ্ধকালে কত অখ্যাতনামা হীন দীন জন নিজেকে প্রত্যক্ষ করিয়েছে এবং নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করেছে।

তৃতীয় স্তবক॥ জ্ঞাত বস্তুর অভ্যাস অজ্ঞাতের ডাককে বাধা দেয়। আজ দুঃখের মরণের আহ্বানে নিরুদ্দেশের আহ্বানে জ্ঞাত অভ্যাসের মূলচ্ছেদ হল। অত্যন্ত নির্দিষ্ট আশ্রয়কেই 'ভিত্' বলা হয়েছে। ব্যক্তির ও মানবের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ আহ্বানের যুগ আসে। তখন বাহির ও ঘরের বিরোধ বাধে।

পঞ্চম স্তবক॥ তরুণী যেমন পিতার ঘর ছেড়ে পতিগৃহে গিয়ে নিজ যৌবনের সার্থকতা লাভ করে তেমনি আজ আমার অন্তরাত্মাকে পরিচিত ভূমি ছেড়ে অজানার দিকে আনন্দযাত্রা

১। 'বিশ্বভারতীর সাহিত্যক্লাসে আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যাপনার সময়ে' প্রদ্যোতকুমার সেন-কর্তৃক অনুলিখিত ও শান্তিনিকেতন পত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯-মাঘ ১৩৩০) ধারাবাহিকতভাবে প্রকাশিত। বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে পাদটীকাগুলি নূতন সংযোজন।

করতে হবে। এতে দুঃখ আছে, তবু এ সর্বনাশ নয়, কারণ এ পতিগৃহে যাত্রার মতো।

আলোচনা॥ য়ুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্তা এই কবিতা লেখবার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে যেন এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য গিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্‌বেগ ছিল। আমার যেন একটা নূতন অভিযান, adventure আরম্ভ হবে। হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে সর্বনেশের জন্য অর্ঘ্য রচনা করতে হবে। কেবল মতামত নয়, প্রাচীন মতামত সংস্কার প্রভৃতি যা-কিছু প্রিয় সব পিতৃগৃহের মতো ত্যাগ করে নব রক্তপট্টাম্বরে পতিকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, সর্বনাশের যে যুগসন্ধিক্ষণ এসেছে।

৩ আমরা চলি সমুখ-পানে

এই কবিতায় আমার আগের দুটি কবিতার ধারাটিই চলে এসেছে। 'বলাকা'র প্রথম কবিতাতে এই ভাবটিই ছিল—যৌবনের জয়ধ্বনির কথা, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পূর্বযুগের গণ্ডি ভেঙে ফেলে মুক্তি লাভ করে নূতন করে জীবনকে গড়ে তোলার কথা।

প্রতি যুগে যুবাদের উপর এ ভারটি রয়েছে, তারাই প্রলয়ের ভিতর দিয়ে চিরন্তন সত্যের নূতন পরিচয়কে লাভ করবে। এবারকার যে নবযুগের কথা বলা হয়েছে, এ যুগ সকল মানুষকে নিয়ে। মানুষকে যে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে রাখে সেই অন্ধকার রাত্রি অবসানপ্রায় আর নবযুগের প্রভাত আসন্ন এ কথা আমার মনে হয়েছিল, সেই ভাবের আবেগে এই কবিতাগুলি লেখা। মনে হতে পারে বুঝি লাইন মিলিয়ে কতকগুলি কবিতা লেখবার উদ্যোগেই এগুলি লেখা হয়েছে, কিন্তু তা নয়, আমার ভিতরে একটা তাগিদ এসেছিল—তারই প্রেরণায় এগুলি রচিত হয়। অনেক সময়ে কোনো কোনো রচনাকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রকাশ বলে আপাতত মনে হয়, পরে দেখা যায় তা ঠিক নয়। ভিতরে ভিতরে একটা বিশ্বব্যাপী সত্যের তাগিদ নানা ছলে নিজেকে প্রকাশের উপলক্ষ খোঁজে। নিজের জীবনের যে ঘটনাগুলি নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অঙ্গীভূত, সেগুলোকে উপকরণরূপে ব্যবহার করে মনের কোন্-একটা নিগূঢ় অনুভূতি নিজেকে ব্যক্ত করে।

'অন্তর্যামী' কবিতাতেও সেই কথাই বলেছি। তাতে লিখেছে যে, হাটে যাবার সংকল্প করে রাস্তায় বেরিয়েছিলুম, শেষে দেখি অগোচরে সেই সংকল্প কোন্-এক অজানার মধ্যে যাবার উপলক্ষ হয়ে উঠল। এ যেন তারহীন টেলিগ্রাফ-যন্ত্রে কান পেতে আছি ঘরের খবর পাবার জন্যে—হঠাৎ দেখি সেই ঘরের খবরকে ছাপিয়ে দিয়ে একটা আকাশের বার্তা এসে হাজির। বলাকার এই কবিতাগুলিকে সেই রকম কোনো-একটা উড়ো পথে কবির মনে পৃথিবীর কোন্-একটা গভীর বেদনার বার্তা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কবিতাপাঠ॥ এই কবিতায় ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের কথা নেই, কিন্তু এতে সমস্ত মানুষের সাধনার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতকে সন্ধান করবার জন্য পৃথিবী জুড়ে প্রলয়ব্যাপার চলছে। এক দল গত যুগের আইডিয়াল্‌কে আকড়ে ধরে তাকেই বিশ্বাস করে পড়ে আছে। তারা পুরাকালকে আশ্রয় করেছে বলে যে তাদের বিপদ নেই তা নয়, ভাবীকালকে বাধা দিতে গিয়ে তাদেরও লড়তে হয়। কার্যত কিছু না করলেও তারাই বেশি লড়াই করে। তাই আজ যারা পূর্বকার ন্যাশানালিজমের ভাবকে আঁকড়ে রয়েছে তারাও ঘরছাড়া, তাদের আশ্রয় নেই। তারা স্বাজাত্যের অপদেবতার মন্দিরটাকে রক্ষা করবার

প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পূর্বতন ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ মানুষকে কম দুঃখ দেয় না। এই একটি দল ছাড়া আর-এক দল আছে যারা নবযুগের বাণী বহন করছে। তারা ঘরছাড়ার দল। নৈরাশ্যের তাড়নায় তারা বার হয় নি। আলোকের পথে তাদের অভিযান, বাধাবন্ধ ছিন্ন করে নূতন যুগের অভিমুখে তাদের অভিসারযাত্রা। সেই যাত্রার মুখে তাদের বিঘ্ন বিপদ রক্তপাত সহ্য করতে হয়েছে।

যারা তামসিকতায় জড়িত হয়ে পূর্বের সংস্কারকে বিশ্বাস করছে তারা ভুলে যায় যে অনেক আগে তাদেরও এই ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে একটা স্থিতির মধ্যে আসতে হয়েছে। তারা মনে করে যে তারা সত্যের চরম সীমায় এসে পৌঁচেছে, এই চিরকেলে পথেই মঙ্গল হবে, তাই অন্যকে তারা বাধা দেয়। একটি ভৌগোলিক উপদেবতার কাছে তারা নরবলি দিয়েছে, তারা মানুষের নারায়ণকে অবজ্ঞা করছে। এই স্বাজাত্যাভিমানীদের সঙ্গে নবযুগের দলের বিরোধ চলছে। যারা উদার ও সর্বজনীন আইডিয়াল্‌কে বিশ্বাস করে তারা আজ দুঃখ পাচ্ছে, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করছে। কিন্তু তাদের এই নিন্দা দুঃখ অপমানের ভিতর দিয়ে আপন বিশ্বাসকে অবিচলিত রেখে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

এই ভাবটিই আমার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে এসেছিল এবং আমার এই কবিতায় তা প্রকাশ করতে চেয়েছি। দেশের যে গণ্ডির ভিতরে আশ্রয় লাভ করে আমরা তাকে ঘর মনে করেছিলাম, সেই সীমারেখা ত্যাগ করে যারা ঘরছাডা হয়েছে তারাই ভবিষ্যতের মহাযুগের যাত্রী; সম্মুখের বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে তাদের অগ্রসর হতে হবে।

৪ তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে

মানুষকে মিলিত করবার, নবযুগকে আহ্বান করবার, পঞ্চজন্য শঙ্খ ধুলায় পড়ে রয়েছে। একে গ্রহণ করবার মধ্যে অনেক দুঃখ আছে।

ব্যক্তিগত যে কথাটুকু এই কবিতার মধ্যে আছে, তাকে ছাড়িয়ে আমি যে ভাবটা প্রকাশ করতে চেয়েছি তা এই—

একটা সময় এসেছিল যখন বেদনার আঘাতে মনে হয়েছিল জীবনের কাজ তো সারা হয়ে গেছে, এখন পূজা অর্চনার দ্বারা শান্তি পাবার সময় এসেছে, এখন অন্য কোনো কাজের দাবি নেই। সে সময়ে এই পূজাকেই তখনকার একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবি এল, হঠাৎ মনে হল মানুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ তো বাজাতে হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোটো গণ্ডি থেকে বড়ো রাস্তায় তো ডাকতে হবে। এখন বললে চলবে না যে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাই। আমার আরাত্রিক পূজার কি সময় আছে? তবে কি জীবনের সন্ধ্যায় রজনীগন্ধার শুভ্র স্নিগ্ধ বিকাশ হবে না? তবে কি রক্তজবার মালা চাই? মনে করলেম বুঝি জীবনের শেষ বোঝাপড়া এবার করে নিতে হবে, কিন্তু নীরব শঙ্খ আমায় ইঙ্গিত করলে—মানুষকে কোন্ বিরাট যজ্ঞে ডাক দেবার জন্য তাকে ধ্বনিত করতে হবে।

আলোচনা॥ এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ শুরু হতে দু মাস বাকি আছে। তার পর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঔদ্ধত্যে হউক, ভয়ে হউক নির্ভয়ে হউক, তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বারস্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনো আরম্ভ হয় নি। আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে; তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে; যে কাল সর্বজাতির

লোকের। চাক-ভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রান্‌ড্‌ রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সার্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায় এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

আমি কিছুদিন থেকে এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের এই যুগ সমস্ত মানবের পক্ষে এক মহাযুগ, পৃথিবীতে এমন সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসেনি। একটা ভাবীকাল আসছে যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে। মন্থনে যেমন নবনী ভেসে ওঠে তেমনি বিশ্বের বিধাতার জগৎব্যাপী মন্থন-ব্যাপারে সাধকেরা উঠে পড়েছেন। এই বিবাগির দলের বেরিয়ে পড়ার প্রয়োজন ছিল। বিধাতা এমনি করে ঠেলা মেরে এঁদের বার করে দেন, এঁরা সংকীর্ণ পরিবেষ্টন থেকে সরে গিয়ে মুক্তিলাভ করেন।

পুরাণের কাহিনীতে আছে যে, দেবাসুরের মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল রাহু কেতু তা পাবার জন্য চেষ্টা করেছিল, অযোগ্যেরা অমৃতে ভাগ বসাতে চেয়েছিল, অমৃত চুরি করতে চেয়েছিল। প্রাচীন কালের সে লোভ এখানো রয়েছে, এখনো স্বার্থের ভোগে লাগাবার জন্য লুব্ধ মন অমৃতকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করবে। লীগ অফ নেশনে যে সার্বজাতিক উদ্যোগ হচ্ছে, বিশ্বের রাহু-কেতুরা তার আইডিয়ালিজ্‌ম্‌কে নিজের ভাগে নেবার জন্য বসে আছে। এমনি করে মহাযুদ্ধের সময়ে স্বার্থের জন্য যারা নিরপেক্ষতা যখন ভঙ্গ করা হল তখন যেমন যুবকের দল [illegible] রক্ষা করতে অস্ত্রধারণ করেছিল, তেমনি বুড়ো রাষ্ট্রনীতিকের দল স্বার্থসাধনের হিসাব কষে এতে যোগদান করেছিল।

যে বিশ্বব্যাপী প্রলয় মানবের চিত্তসাগরকে মথিত করেছে তাতে এই দুই বিরুদ্ধ দলের উদ্ভব হয়েছে। অমৃত গরল দুইই উত্থিত হচ্ছে। এই বিষ মানুষের বড়ো পাপকে বৃহৎ আকারে দেখিয়ে দেবে। দেবতাদের ভোগের অমৃত নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে, স্বাজাত্যের স্বার্থকে বাড়াবার জন্য চেষ্টা হবে; কিন্তু শেষে অসুরের দলই পরাজিত হবে, জয় হবে দেবতাদের, আর শিব আসবেন সমস্ত হলাহল নিঃশেষিত করতে।

আমাদের অনুভব করতে হবে যে বিধাতা ছোটো জায়গার মধ্যে কাজ করেন না। একটা বিরাট বিশ্বব্যাপার চলছে, পৃথিবী জুড়ে দৈত্যসুরে মন্থন চলছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবর্ষের আমরা কোন্‌ দিক ধরি? দেবতাদের দিক না দৈত্যের দিক? কিন্তু যে পক্ষই ধরি তাতে কিছু আসে যায় না। দেবতা যারা তারাই মন্থনশেষে অমৃত পাবার অধিকারী হবে। যারা গৃধ্নু তার বশে লালায়িত হয়ে ভোগ করবার জন্য ছুটবে তাদের ভাগ্যে অমৃত নেই।

কবি নিজের কবিতা যখন ব্যাখ্যা করে খতন তার কথারই যে প্রামাণ্য আছে তা নয়, কবিতা লেখা হয়ে গেলে সে অন্য পাঠকদের সমশ্রেণীর। সে কেবল তার হৃদয়াবেগের ইতিহাসটার কথা বলতে পারে, কারণ রচনাকালের সমস্ত আনুষঙ্গিকতার সেই সব চেয়ে বড়ো সাক্ষী। কিন্তু কবিতার মর্মগত অর্থ অপরেরও আবিষ্কার করবার ও ব্যাখ্যা করবার অধিকার আছে।

'বলাকা' রচনাকালে যে ভাব আমাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল এখনো সেই ভাব আমার মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করছি। বুকের মাঝে যে আলোড়ন হল তার কী সার্বজাতিক অভিপ্রায় আছে তা আমি ধরতে চেষ্টা করেছি। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময়ে সে চিন্তা আমার মনে বর্তমান ছিল, আমি মনে মনে একটা

পক্ষ নিয়েছি, একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি, সে ডাককে কেউ মেনেছে কেউ মানে নি। 'বলাকা'য় আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

৫ মত্তসাগর দিল পাড়ি

এই কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে লেখা। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যখন কোনো কবিতা মনেতে আকার ধারণ করে তখন তা কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাকে অনুসরণ করে না। যখন কোনো-একটি ভাবের বীজ চিত্তক্ষেত্রে এসে পড়ে তখন তা ভিতরে গিয়ে আপনা হতে অঙ্কুরিত হয় এবং মানবপ্রকৃতির কতকগুলি খাদ্য পেয়ে সেই অঙ্কুর বিশেষ আকার গ্রহণ করে। তখন ভেবে ভেবে লিখে কবিতাকে আকার দেবার দরকার হয় না। কোনো দার্শনিক তত্ত্বের যেমন ব্যাখ্যা হয় তেমন করে এই কবিতাকে যথার্থভাবে বোঝানো কঠিন ব্যাপার। কোনো গাছ বিশেষ বীজ থেকে যে বিশেষ আকার পরিগ্রহ করে, তার সেই বিশেষত্বের মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্য আছে, কিন্তু সেই গোপন প্রক্রিয়াটি আমাদের জানা নেই।

সে সময়ে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার চিন্তা আমার মনে কাজ করছিল। তাকে আমার চিত্ত এইভাবে দেখেছে—যুদ্ধের সমুদ্র পার হয়ে নাবিক আসছেন, ঝড়ে তাঁর নৌকার পাল তুলে দিয়ে। তিনি প্রমত্ত সাগর বেয়ে এই দুর্দিনে কেন আসছেন? কোন্ বড়ো সম্পদ নিয়ে এবং কার জন্য তিনি আসছেন? এই কবিতায় দুটি প্রশ্নের কথা আমি বলেছি। নাবিক যে সম্পদ নিয়ে আসছেন তা কী এবং নাবিক কোন্ ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন? যুদ্ধের সাগর যিনি পার হয়ে আসছেন তিনি কোন্ দেশে কার হাতে তাঁর সম্পদকে দান করবেন?

প্রথম স্তবক॥ যখন চারি দিকে গভীর রাত্রি, সাগর মত্ত, ঝড় বইছে, এমন দুর্দিনে নাবিকের কী ভাবনা ছিল যে এমন সময়ে তিনি কূল ছাড়লেন? কী সংকল্প তাঁর মনে ছিল যার জন্য পরম দুর্দিনে নিয়মের দ্বারা সংযত লোকসমাজের কূলকে ত্যাগ করে তিনি মত্তসাগর পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়েছেন?

দ্বিতীয় শ্লোকে [স্তবকে] এই প্রশ্নের উত্তরের আভাস আছে। সেই আভাসটা এই যে, কোনো-একটি গৌরবহীনা পূজারিনি এক জায়গায় অজানা অঙ্গনে পূজার দীপ জ্বালিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, যুদ্ধের সাগর পার হয়ে নাবিক সেই পূজা গ্রহণ করবার জন্যে এই প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ছেড়েছেন। যে অঙ্গনে কারো দৃষ্টি পড়ে না সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু তাঁকে আসতে হলে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আসতে হবে।

ঝড়ের মধ্যে এই বিবাগির, ঘরছাড়ার, এ কী সন্ধান এবং কাকে সন্ধান? কত না জানি মণিমাণিক্যের বোঝা নিয়ে তিনি নৌকা বেয়ে আসছেন। বুঝি কোনো বড়ো রাজনীতিতে তিনি ধনসম্পদ নিয়ে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু নাবিকের হাতে যে দেখি একটিমাত্র রজনীগন্ধার মঞ্জরী। তিনি যাঁকে খুঁজছেন তাঁকে তো তবে মণি-মাণিক্য দেবেন না। তিনি অজ্ঞাত অঙ্গনে এক বিরহিণী অগৌরবার কাছে সেই মঞ্জরী নিয়ে আসছেন। এরই জন্য এত কাণ্ড? হাঁ, এরই জন্য নাবিকের নিষ্ক্রমণ।

যে রজনীগন্ধার সৌরভ অন্ধকারেই বিস্তৃত হয় তা সেই অচেনা অঙ্গনের উপযুক্ত। দিনের বেলা সেই সৌরভ সঙ্গোপনে থাকে কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার সৌন্দর্যের প্রকাশ।

সেই সৌরভময় ফুল নিয়ে নাবিক বেরিয়েছেন। নূতন প্রভাত আসন্ন, সেই নবপ্রভাতের উপহার নিয়ে নবীন যিনি তিনি আসছেন। যে তপস্বিনী পথের পাশে নূতন প্রভাতে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে অপেক্ষা করছে তাকে সমাদরের মালা পরিয়ে দিতে তিনি বার হয়েছেন। সে রাজপথের পাশে রয়েছে, তার লোককে দেখাবার মতো ঘরদুয়ার নেই—তার জন্য নাবিক অসময়ে সকলের অগোচরে বার হয়েছেন। সেই তপস্বিনীর রুক্ষ অলক উড়ছে, চক্ষের পলক সিক্ত হয়েছে, তার ঘরের ভিত ভেঙে গেছে সেই ভিতের ভিতর দিয়ে বাতাস হেঁকে চলেছে। বর্ষার বাতাসে তার প্রদীপ কম্পিত হচ্ছে, ঘরের মধ্যে ছায়া ছাড়িয়ে দিয়ে। তার দৈন্যদশার মধ্যে ভয়ে ভয়ে সে রাত কাটাচ্ছে, তার আশঙ্কা হচ্ছে যে বর্ষার বাতাসে তার কম্পমান দীপশাখা কখন নিবে যাবে। সে এক প্রান্তে বসে আছে, তার নাম কেউ জানে না। কিন্তু তারই কাছে নাবিক আসছেন।

আমার উৎকণ্ঠিত নাবিক আজকের দিনেই যে বার হয়েছেন তা নয়। কত শতাব্দী হল তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে, কত দিন থেকে কত কালসমুদ্র পার হয়ে তিনি আসছেন। এখনো রাত্রির অবসান হয় নি, প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। যখন তিনি আসবেন তখন কোনো সমারোহ হবে না, তাঁর আগমন কেউ জানতেই পারবে না। তিনি আস্‌লে অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোকে ঘর ভরে যাবে। নূতন সম্পদ কিছু পাওয়া যাবে না, কেবল দৈন্য ঘুচে যাবে। তপস্বিনী যে দারিদ্র্য বহন করছিল তা ধন্য হয়ে উঠবে, শূন্য পাত্র পূর্ণ হয়ে যাবে। তার মনে অনেক দিন ধরে সন্দেহ জাগছিল, সে ভাবছিল যে তার প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করা ব্যর্থ হল বুঝি, কিন্তু তার সে সংশয় ঘুচে যাবে। তখন তর্কের উত্তর ভাষায় মিলবে না, সে প্রশ্নের মীমাংসা নীরবে হয়ে যাবে।

ইতিহাসের বড়ো বড়ো বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ইতিহাসবিধাতা সাগর পার হয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসছেন। সেই মাল্য কে পাবে? আজ যারা বলিষ্ঠ শক্তিমান, ধনী, তাদের জন্য আসছেন না। তারা যে ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত; কিন্তু তিনি তো ধনরত্নের বোঝা নিয়ে আসছেন না। তিনি প্রেমের শান্তি বহন ক'রে, সৌন্দর্যের মালা হাতে করে আসছেন। আজ তো শক্তিমানেরা সে মাল্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই, তারা যে রাজশক্তি চেয়েছে। কিন্তু যে অচেনা তপস্বিনী আপন অঙ্গনে বসে পূজা করছে, আমার নাবিক রজনীগন্ধার মালা তারই জন্য নিয়ে আসছেন। সে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাচ্ছে, মনে করছে তার অজ্ঞাত অঙ্গনে পথিকের বুঝি পদচিহ্ন পড়ল না। সে যখন মাল্যোপহার পেয়ে ধন্যা হয়ে যাবে তখন সে বলবে, 'তোমার হাতের প্রেমের মালা চেয়েছিলাম, এর বেশি কিছু আমি আকাঙ্ক্ষা করি নি। ধন-ধান্যে আমার স্পৃহা ছিল না।' এই রিক্ততার সাধনা যে করেছে, এই কথা যে বলতে পেরেছে, সে দুর্বল অপরিচিত দরিদ্র হোক, নাবিক সেই অকিঞ্চনের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন। এরই জন্য এত কাণ্ড, এত যুগযুগান্তরের অভিসার! হাঁ, এরই জন্য। সকল ইতিহাসের এটাই অন্তর্নিহিত বাণী।

গত মহাযুদ্ধে এক দল লোক অপেক্ষা করে বসে ছিল যে যুদ্ধাবসানে তারা শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আর-এক দল লোক পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল; তারা অখ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম কাণ্ডকারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর ও চরম সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছে, বিশ্বাস করেছে। বিশ্বে যারা পরাজিত, অপমানিত, তারা মনুষ্যত্বের চরম দানের পথ চেয়েই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গলের আদর্শের বিপরীত পথে চলেছে; কিন্তু তবুও তারা প্রদীপ যদি না নেবায়, তপস্যায় যদি ক্ষান্ত না হয়, অপেক্ষা যদি করে থাকে, তবে তখন সেই

নাবিক এসে তাদের ঘাটে তরী লাগাবেন আর তাদের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেবেন।

৬ তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা

প্রথম স্তবক॥ ঐ-যে আকাশের নক্ষত্র ছায়াপথে একত্র নীড় রচনা করে রয়েছে, ঐ-যে গ্রহ উপগ্রহ সূর্য চন্দ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো হাতে তীর্থযাত্রায় চলেছে, তুমি কি তাদের মতো সত্য নও? আজ কি তুমি কেবল চিত্ররূপে রয়েছ? ছবি দেখে অন্তরে এই প্রশ্ন উদিত হল।

দ্বিতীয় স্তবক॥ জগতের যা-কিছু সবই চলা পথে রয়েছে, তুমিই কি কেবল চিরচঞ্চলের মাঝখানে শান্ত নির্বিকার হয়ে থাকবে? জগৎযাত্রার পথে যে-সব পথিক বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে কি তোমার যোগ নেই? তুমি সকল পথিকের মাঝখানেই আছ, অথচ তাদের থেকে দূরে আছ; তারা চঞ্চলতায় গতি পেয়েছে, তুমি স্তব্ধতায় বদ্ধ।

এই-যে ধরণীর ধূলি এ অতি তুচ্ছ, কিন্তু এও ধরণীর বস্ত্রাঞ্চলরূপে বাতাসে উড়ছে। এই ধূলিরও কত বিকার, কত পরিবর্তন। বৈশাখে যখন ফুল ফোটে না, শুকিয়ে ঝরে যায়, যখন ধরণী বিধবার মতো তার আভরণ ত্যাগ করে, তখন সেই তপস্বিনীকে এই ধূলি গৈরিক বস্ত্র পরিয়ে দেয়। আবার যখন বসন্তের মিলন-উষা আসে তখন সে ধরণীর গায়ে পত্রলিখা এঁকে দেয়। এই-যে তৃণ বিশ্বের পায়ের তলে আছে এরা অস্থির, এরাও অঙ্কুরিত দোলায়িত হচ্ছে, উজ্জ্বল হচ্ছে, ম্লান হচ্ছে। এদের মধ্যে নানা বিকাশ ও পরিবর্তন আছে ব'লেই এরা সত্য। তুমিই কেবল ছবি, বরাবর এক ভাবে স্তব্ধ হয়ে আছ।

তৃতীয় স্তবক॥ আজ তুমি ছবিতে আবদ্ধ আছ বটে, কিন্তু তুমিও তো একদিন পথে চলতে। নিশ্বাসে তোমার বক্ষ দোদুল্যমান হত। তোমার প্রাণ তোমার চলায় ফেরায় সুখে দুঃখে কত নূতন নূতন ছন্দ রচনা করেছে। বিশ্বের ছন্দে প্রাণের ছন্দ তাল রক্ষা করে লীলায়িত হয়েছে। সে আজ কত দিনের কথা! তখন আমার নিজের জগৎ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যে জগৎ বিশেষরূপে আমারই, তাতে তুমি কত গভীররূপে সত্য ছিলে! এই জগতে সুন্দর জিনিস যা-কিছু আমি ভালোবেসেছি তার মধ্যে তোমার নিজের তুমি যেন লিখে দিয়েছিলে। তুমি নিখিলকে রসময় করে, তুলেছিলে, তোমার মাধুর্যের তুলিতে বিশ্বা সুন্দর মধুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তার আনন্দময় বার্তাকে তুমি মূর্তিমতী বাণী-রূপে আমার কাছে বহন করে এনেছিলে।

চতুর্থ স্তবক॥ আমরা দুজনে একসঙ্গে চলেছিলাম, হঠাৎ অনন্তরাত্রি তোমাকে অন্তরালে নিয়ে গেল। আমি চলতে লাগলাম, তুমি নিশ্চল হয়ে গেল। দিন ও রাত্রি আমার সুখদুঃখ বহন করে নিয়ে চলল, আমার চলা আর থামল না। আকাশের সাগরে আলো-অন্ধকারের জোয়ার ভাঁটার পালা চলেছে। আমি পথ দিয়ে যাত্রা করেছি, সেই পথের দু ধারে ফুলের দল চলেছে—কদম্ব শিউলি নাগেশ্বর করবী, নানা ঋতুতে এদের উৎসবের যাত্রা। আমার দুরন্ত জীবননির্ঝর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছুটেছে; অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত ধ্বংস হতে হতেই প্রাণের পথ তারা কেটে দিচ্ছে। তাই মৃত্যুই কিঙ্কিণী বাজিয়ে জীবনকে শব্দিত করছে, নানা দিকে প্রসারিত করে দিচ্ছে। আজ জানি না কাল কী হবে, পরক্ষণে কী ঘটবে—অজানা তার বাঁশি বাজিয়ে আমাকে দূর থেকে দূরে ডেকে ডেকে চলেছে। আমি প্রতিদিনের চলাকে ভালোবাসি ব'লেই জীবনকে ভালোবাসি। অজানার সুরে চলা আমার ভালো লাগে। তুমি আমার সঙ্গে চলেছিল, হঠাৎ একেবারে পথ থেকে নেমে গেলে। আমরা ক্রমাগত চলেছি;

হঠাৎ তুমি এক জায়গায় দাঁড়ালে, সেখানেই স্তম্ভিত হয়ে ছবি হয়ে রইলে।

পঞ্চম স্তবক॥ আমার হঠাৎ মনে হল—এ কী প্রলাপ বকছি? তুমি কি কেবল ছবি? না, না, তুমি তো শুধু তাই নও। কে বলে তুমি কেবল রেখার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে রয়েছ? তোমার মধ্যে যে সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশিত হয়েছিল ও মূর্তি গ্রহণ করেছিল, তা যদি এখনো না থাকত তবে এই নদীর আনন্দবেগ থাকত না। তোমার আনন্দ যে বাণীকে বহন করে এনেছিল তা তো থামে নি। বিশ্বের যে অন্তরের বার্তাকে তুমি এনেছিলে, তা চিরকাল ধ'রে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। তা যদি না হত, তবে মেঘের এই স্বর্ণচিহ্ন থাকত না। তোমার যে চিক্কণ কেশের ছায়া তা বিশ্বের নানা রূপের মধ্যে রয়েছে, তা যদি বিশ্ব থেকে মিলিয়ে যেত তবে সৃষ্টির আনন্দের মধ্যেই ক্ষতি হত, সেইসঙ্গে মাধবীবনের মর্মরায়মাণ ছায়া লুপ্ত হয়ে স্বপ্নপ্রায় হয়ে যেত।

তুমি আমার সামনে নেই, কিন্তু জীবনের মূলে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আছ, তুমি আর পৃথক হয়ে থাকলে না। তোমাকে আমি যে ভুলেছিলুম, সে ভুল বাইরের। তুমি আমার জীবনের চৈতন্যলোক থেকে মগ্নচৈতন্যের জীবনে চলে গেছ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আমার অন্তরের গভীর দেশে গেছ। আকাশের তারা রাত্রিকে বেষ্টন করে আছে, আমরা কত সময়ই তাদের কথা সচেতনভাবে ভাবি না, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে চলার মধ্যে তাদের দিকে না চেয়ে দেখলেও তাদের সংগীত ও আনন্দে আমাদের মন অলক্ষ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। তেমনি পথে চলতে চলতে ভাবছি যে ফুলকে ভুলেছি, কারণ সচেতনভাবে তাকে চোখে দেখছি না। কিন্তু আমার যাত্রাপথে সেই ফুল প্রাণের নিশ্বাসবায়ুকে সুমধুর করছে, ভুলের শূন্যতাকে পূর্ণ করছে। আমি ভুলি বটে, তবুও ভুলি না।

আমি তোমাকে বিশেষভাবে মানসচক্ষে দেখছি না ব'লে যে ভুলে রয়েছি তা নয়। বিস্মৃতির কেন্দ্রস্থলে বসে তুমি আমার রক্তেতে দোল দিয়েছ। তুমি চোখের বাইরে নেই, ভিতরে সঞ্চিত হয়ে আছ। সেইজন্যই আজকের বসুন্ধরার শ্যামলতার মধ্যে তোমার শ্যামলতা, আকাশের নীলিমার মধ্যে তোমার নীলিমা দেখছি। তুমি যে আনন্দ দিচ্ছ বিশ্বের আনন্দের মধ্যে তা মিলিয়ে আছে।

আমি যখন গান গাই, তখন কেউ জানে না যে তোমার সুর ভিতরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তুমি কবির বাইরে ছিলে, কিন্তু অন্তরের যে কবি সংগীত-কাব্য রচনা করছে তার প্রেরণা-রূপে তুমি মর্মস্থলে রয়েছ। তুমি কবির অন্তরে কবি হয়ে রইলে, আর বাইরের নিখিলে ব্যাপ্ত হয়ে থাকলে। তুমি শুধু ছবি নও।

তোমাকে একদিন সকালে লাভ করেছিলুম; তার পর রাত্রি এল, তুমি অন্তরালে চলে গেলে। রাত্রিতে তোমাকে হারিয়ে ফেলে, রজনীর অন্ধকারের মধ্যেই গভীরভাবে তোমাকে আবার ফিরে পেলাম।

১৪ কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে

এই আনন্দ-ছবি যুগ-যুগান্তর প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তা বিকশিত হল। যে সত্য অপ্রকাশিত ছিল, আজ তা রূপ ধরে ফুটে উঠেছে। বহিঃপ্রকৃতিতে এই মাধবীর বিকাশ যেমন সত্য তেমনি আজ আমার মনে যে আনন্দ জাগ্রত হল, যে ভাবের বিকাশ হল, সেও তেমনি সত্য। একটি আমার বাহিরে এবং অন্যটি আমার অন্তরে, তাই ব'লে তারা পরস্পরের তুলনায় কেউ বা বেশি কেউ বা কম সত্য তা নয়।

মানুষের যে আনন্দধারা আমি কবিতায় প্রকাশ করলাম তা তো একান্তভাবে আমারই

কল্পনা থেকে উদ্‌ভূত নয়। শিল্পী কাব্যে ও চিত্রে যে সৌন্দর্যকে রূপদান করে, যে আনন্দকে ফুটিয়ে তোলে, তা তো সেই রসমাধুর্য যা মানুষের কত প্রেমে অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিল। মানুষের সেই অব্যক্ত উদ্যম কবি বা শিল্পীর রচনায় রচিত হয়ে ওঠে। এই রচিত হয়ে ওঠবার তপস্যা গূঢ়ভাবে সকল মানুষের মনের ভিতরে আছে। সকল মানুষেরই মন আপনার বিচিত্র ভাবোদ্যমকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা করছে। সেই সকলের ইচ্ছা ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে রূপ লাভ ক'রে সফল হয়ে উঠছে। আমাদের মনে যে-সকল ইচ্ছার উদ্যম, আনন্দের উদ্যম, অন্তর্‌গূঢ় হয়ে আন্দোলিত হচ্ছে, তারাই হচ্ছে মানুষের সকল সৃষ্টির মূলশক্তি। তারাই চিত্রীর তুলিকায়, কবির লেখনীতে, মূর্তিকরের ক্ষোদনীযন্ত্রে কেমন করে প্রকাশিত হতে থাকে।

অনেক সময়ে 'বসন্তকাননের একটুকু হাসি' আমাদের মনে যে আনন্দ জাগিয়ে দিয়ে যায়, মনে হয়, হয়তো এ কোনোদিন বাহিরে কিছুতে বিকশিত হয়ে উঠবে না। কিন্তু মনে আশা আছে যে তা ব্যর্থ হয়ে যায় না। রোহিত-সাগর দিয়ে যেতে যেতে আমি একবার আশ্চর্য সূর্যাস্ত দেখেছিলুম। তখন মনে হয়েছিল যে এই অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সমাবেশকে তো ধরে রাখতে পারলুম না, ভাবলুম যে এই-যে বাইরের প্রকৃতির রূপের উচ্ছ্বাস আমার মনে ছায়া দিয়ে চলে গেল সে ছায়াও তো মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এই-যে অমৃতমুহূর্তে সৌন্দর্যে ডুব দিলুম, এর শেষ পরিণতি অপ্রকাশের বেদনার মধ্যে নয়—এই অনুভূতি আমার অন্তরলোকে আপন জায়গা করে নিলে। সেই আমার অন্তরলোক সকল মানুষের অন্তরলোকের সামিল। সেইখানে এই সমস্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ ও লয়—আকাশে মেঘের প্রকাশ ও লয়, অরণ্যে মাধবীর বিকাশ ও ঝরে পড়ার মতোই সৃষ্টিলীলা। এই লীলার আন্দোলন হচ্ছে বাহির থেকে অন্তরে, আবার অন্তর থেকে বাহিরে। আজ আমার চিত্তে যে আনন্দ দেখা দিয়েছে সে যদিও আমার চিত্তের মধ্যেই আছে, তবু তার মধ্যে একটি বেরিয়ে আসবার প্রয়াস আছে। তাই সে ধাক্কা দিচ্ছে রুদ্ধ দ্বারে। সমস্ত মানুষের মন জুড়ে এই ধাক্কাটি নিরন্তর চলছে। সেই ধাক্কাটি হচ্ছে বেরিয়ে আসবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা নানা উপলক্ষে জাগ্রত হচ্ছে ব'লেই মানবসমাজে সৃষ্টির কাজ চলছে। এর প্রেরণা, ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো আবশ্যকের প্রেরণা নয়; কেবলমাত্র প্রকাশের প্রেরণা। অতএব, রোহিতসমুদ্রে আকাশের যে বর্ণভঙ্গি মা আমার মনের মধ্যে একদিন আনন্দের ঢেউ হয়ে উঠেছিল সেই ঢেউ নিশ্চয় আমার রচনার সাধনায় বারবার ঠেলা দিয়েছে। আজ বসন্তে বাইরের যে মাধবীমঞ্জরী আমার অন্তরে আনন্দরূপ নিয়েছে, সে আমার মনের সাধারণ প্রকাশচেষ্টার মধ্যে একটি শক্তিরূপে রয়ে গেল—আমার নানা সুরে তার দোলা লাগবে—আমি কি তা জানতে পারব?

১৫ বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি

প্রথম স্তবক॥ চারি দিকে বস্তুরাশি যেন হাহা করে হেসে উঠেছে। ধুলোতে বালিতে তাদের করতালি হচ্ছে, তারা উন্মত্তভাবে নৃত্য করছে। বস্তুর সংঘাতে বস্তুর যে লীলা হচ্ছে, যেন তারই কোলাহল শোনা যাচ্ছে। চারি দিকে রূপের মত্ততা। রূপ বস্তুর আকারে গতি পেয়েছে, তার সংগীত শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় স্তবক॥ চারি দিকে বস্তুপুঞ্জ সত্তা ধারণ করে প্রকাশের মত্ততায় মেতে উঠেছে, তাই দেখে আমার মন তাদের খেলার সাথী হতে চায়। বস্তুর দল আমার ভাবনা কামনাকে বলছে, 'আমাদের খেলার সঙ্গী হও—লক্ষগোচর হও, ধুলাবালির মধ্যে রূপ ধারণ করো।'

মানুষের যে অব্যক্ত স্বপ্নের দল তারা যেন কূল পেলে বেঁচে যায়। তারা অপ্রকাশকে পেরিয়ে বস্তুর ডাঙায় সৃষ্টির সঙ্গে মিলতে চায়। তারা যেন মজ্জমান প্রাণীর মতো অতলের

নীচে থেকে ইঁটকাঠের মুষ্টি দিয়ে ধরণী আঁকড়ে ডাঙায় উঠতে চায়।

এমনি করে মানুষের চিত্তের চিন্তাগুলি বাইরে কঠিন আকার ধারণ করছে। মানুষের শহরগুলি আর কিছু নয়, তারা মানুষের সেই ভাবনা ও কামনারই ব্যক্ত প্রকাশ। কোনো শহর কেবল কতকগুলি বাড়ির সমষ্টি নয়। মানুষের যে স্পর্শাতীত প্ল্যান, চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা, রূপজগতে সুস্পষ্ট হতে চাচ্ছে, তারাই যেন লোহা-লক্কড়ের ভিতর দিয়ে এই শহরে স্পর্শগোচর হয়েছে। দিল্লিনগরীতে কত সম্রাট এসেছে, আবার তারা চলে গেছে, মরে গেছে; কিন্তু দিল্লিতে তাদের ভাবনা, ইচ্ছা, প্রতাপ, কালে স্তরে স্তরে জমে উঠে ইঁটকাঠের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে এই মহানগরী তৈরি করে গেছে।

তৃতীয় স্তবক॥ যে-সকল চেষ্টা রূপ ধারণ করতে পারল তাদের তো আজ দেখছি, কিন্তু যেগুলি এখনো ব্যক্ত হয় নি তারাও যে রয়ে গেছে। অতীতের পূর্বপিতামহদের কামনা ধ্যান তপস্যা কি লুপ্ত হয়ে গেছে? না, তারা যে শূন্যে শূন্যে কানাকানি করে ফিরছে; তারা বলছে, 'আমাদের বাণী নেই, তোমাদের বাণী পেলে আপনাদের প্রকাশ করি। আমাদের কোনো আধার নেই, তোমাদের বাণী সেই আধার দেবে। আমরা যে অন্তরের কথা বলতে চাই, শ্রুত হতে চাই।' লোকালয়ের তীরে তীরে এমনি কত অশ্রুত বাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের হাতে আলো নেই; কিন্তু অতীতের সেই অব্যক্ত ইচ্ছা চেষ্টা বর্তমান কালে আলোর তীর্থে, প্রকাশের ঘাটে উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছে। তারা সব পুরাকালের আলোকহীন যাত্রী, প্রকাশের ঘাটে উঠতে পারলে তারা বাঁচে।

তারা চিত্তগুহা ছেড়ে ছুটছে, তারা রূপ পাবার আশায় অন্ধমরু পাড়ি দিয়ে চলেছে। তারা আকারের তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিরাকারকে আঘাত করছে। তারা কতদিন ধরে অব্যক্তমরু পার হবার জন্য যাত্রা করেছে; বলছে, 'কোথায় গেলে আকার পাই?'

চতুর্থ স্তবক॥ আমার ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগে, আমরা সবাই তাকে রূপ দিতে পারলাম না, কিন্তু তারা বেরিয়ে পড়েছে। কোন্ পারে কোন্ তপস্যায় গিয়ে তাদের গতি শেষ হবে! তারা সব পাড়ি দিয়েছে, কে কোন্ ঘাটে উঠবে জানে না; তারা জানে না যে, একদিন তারা নূতন আলোতে বিকশিত হবে। কত যুগ-যুগান্তর থেকে মানুষের মনে প্রেমের জন্য, শান্তির জন্য, যে-সকল আকুল তৃষ্ণা জেগেছিল, তারা যুগে যুগে মানবসমাজের নানা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কোনো-না-কোনো ব্যবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে। পুরাযুগের মানুষদের চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষার দল এক যুগের পাড়ি শেষ করে নবযুগে রূপের বন্দরে এসে ঠেকল। আজকের দিনে যে-সকল ব্যক্তিবিশেষ প্রচ্ছন্নতার ভিতরে থেকে কত গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তপস্যা করছে, তাদের অপূর্ণ কামনাগুলি পাড়ি দিয়ে বসেছে—হয়তো তারা কোনো ভাবীকালে অপূর্ব আলোকে প্রকাশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু কত পুরাতন দূরবর্তী অতীতের ইতিহাসে এদের জন্ম হয়েছিল তখন তা কেউ জানতে পারবে না। আজ তার বাসাছাড়া পাখির দলের মতো মানসলোকের নীড় ত্যাগ করে ডানা মেলেছে। তারা যেদিন বাসায় পৌঁছবে, সেদিন কোন নীড় ত্যাগ করে তারা এসেছে তা কেউ জানবে না।

আমার ভাবনা কামনা নিয়ে কোন্-এক কবি যে কবিতা লিখবে, কোন্-এক চিত্রকর যে ছবি আঁকবে, কোন্-এক রাজপুরীতে যে হর্ম্য তৈরি হবে, আজ দেশে [কালে] তাদের কোনো চিহ্ন নেই। আজ সেই-সব অরচিত যজ্ঞভূমির উদ্দেশে বর্তমানের মানুষ ভাবীকালের দিকে মুখ করে তীর্থযাত্রীর মতো চলেছে। হয়তো কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রামের রণশৃঙ্গের ফুৎকারে আজকের-দিনে-আরব্ধ তপস্যার আহ্বান রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবে মানুষের যুগসঞ্চিত ইচ্ছা ও বেদনার আহ্বান ছিল, তাই তারা ডাক শুনতে পেয়ে সংগ্রামস্থলে এসে পৌঁচেছিল। যে

ইচ্ছা আজ ফললাভ করতে পারল না, ভাবীকালের কোন্ ভীষণ সংগ্রামে তাদের ডাক রয়েছে।

১৬ হে ভুবন আমি যতক্ষণ

প্রথম স্তবক॥ যতক্ষণ বিশ্বকে ভালোবাসি নি ততক্ষণ আমার জীবনে তার দান কিছু কম পড়েছিল। তখন তার আলোতে সব সম্পদ পূর্ণ হয় নি—কারণ, যখন আলোর মধ্যে আনন্দকে দেখি তখনই আমার কাছে তার সার্থকতা আছে। আলো আছে ব'লেই গাছপালার অস্তিত্ব আছে কেবল এই ব্যাপারটি যখন আমার কাছে সপ্রমাণ হল তখনো তার আসল তাৎপর্য (significance) আমার কাছে সুস্পষ্ট হয় নি। কিন্তু যখন ভুবনের দিকে চেয়ে থেকে আনন্দের উদ্‌বোধন হল তখন যে আলো আমার মনের সঙ্গে মিলন সম্পাদন করল তার সত্য আমার কাছে প্রচ্ছন্ন রইল না। আমি যতক্ষণ ভুবনকে ভালোবাসি নি ততক্ষণ সমস্ত আকাশ দীপ হাতে চেয়ে ছিল—আমার আনন্দের দ্বারা তার আলোর সত্য পূর্ণতা লাভ করবে ব'লে। আকাশ সূর্য চন্দ্র তারার বাতি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করে আছে—কখন আমি প্রেমের আনন্দদৃষ্টি দিয়ে তার সত্যকে উপলব্ধি করব! সে বহু বৎসর ধরে দীপ জ্বালিয়ে এই আনন্দের অপেক্ষা করে আছে—কখন আমার জীবন তারার পূর্ণ সত্যকে পাবে!

দ্বিতীয় স্তবক॥ যে দিন প্রেম গান গেয়ে এল—তোমার সঙ্গে আমার মিলন হল, সে দিন কী যেন কানাকানি হল। ভুবনের সঙ্গে আমার পরিণয় হল, সে বললে—আমি তোমায় বরণ করলুম। আমার প্রেম বিশ্বের গলায় আপন মালা পরিয়ে দিয়ে হেসে দাঁড়ালো। সে তার দিকে হেসে চাইল, তার পর একটা-কিছু দিল। যা গোপন বস্তু, কিন্তু যা চিরদিনের জিনিস। সে তাকে সেই আনন্দসম্পদ দিয়ে গেল যা তার তারার আলোয় চিরদিনের মতো গাঁথা হয়ে রইল। এই সম্পদ উপহার পাবে ব'লেই ভুবন তারার দীপ জ্বালিযে অর্ঘ্য সাজিয়ে পথ চেয়ে বসে ছিল—কবে আমার প্রেমের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হবে, সে এসে ভুবনের গলায় মালা পরিয়ে দেবে! তারার আলোর মধ্যে এই প্রতীক্ষা ছিল। যে দিন প্রেম এলো সে দিন সে এমন-কিছু দিয়ে গেল যা ধ্রুবতারায় ধ্রুব হয়ে রইল, যা ভুবনকে পরিপূর্ণতা দান করল।

১৭ যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি

প্রথম স্তবক॥ আমি যতক্ষণ স্থির হয়ে আছি ততক্ষণ বস্তুসমূহ ভারস্বরূপ হয়ে থাকে। তখন জীবনের বোঝা, সঞ্চয়, ধন, আমার পক্ষে দুর্বহ হয়। যখন আমার চলা বন্ধ হয়ে যায় তখন ধন জন যা-কিছু জমতে থাকে তা কিছুই চলে না, তারা আমাকে ঘিরে ফেলে। সেই সঞ্চয়কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমি জেগে আছি। বইয়ের পোকা যেমন তার পাতার মধ্যে বসে বসে তাদের কাটে আর খায়, তেমনি আমি এই জায়গায় বসে বসে কেবল খাচ্ছি আর জমাচ্ছি। আমার চোখে ঘুম নেই—মনের মাথায় বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে। দুঃখ নূতন নূতন হয়ে বেড়ে চলেছে, বোঝাই হয়ে উঠছে। আমি স্থির হয়ে আছি ব'লে সতর্ক বুদ্ধির ভারে, সংশয়ের শীতে, জীবনের চুল পেকে গেল; সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় স্তবক॥ আমি যেই চলতে শুরু করলেম অমনি তার মাথায় পিঠে যে বোঝা চারি দিক থেকে এটে দিয়েছিল, চলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে সংঘাতের দ্বারা তার আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল, ব্যথার সঞ্চয়ের ক্ষয় হল। চলার সংঘর্ষে, আনন্দের আবেগে, যে আবরণ জড়িয়ে ধরেছিল তা ক্ষয় হতে থাকে। মন মতামতের (option) দুর্গে বদ্ধ হয়ে, বাঁধা

আইডিয়ার মধ্যে থাকলে, সে বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যা চলে না, স্থির হয়ে জমতে থাকে, তা মলিনাতার আবর্জনা। মন যতই নূতন পরিবর্তনের মধ্যে চলছে ততই সে নব সম্পদে ভূষিত হচ্ছে। সমাতনের অচলতার দ্বারা মন নবীভূত (purified) হতে পারে না। চলার মানেই সকল বস্তু ধৌত নির্মল হয়ে যাচ্ছে। জরা জীবনকে যে পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন করে রাখে, জীবনের চলার প্রাণশক্তি (vigour) সেই সঞ্চিত স্তূপকে ফেলে এগিয়ে চলে। স্থবিরতা কেবলই পুরাতনকে আঁকড়ায়—সে বোঝা ফেলে দিয়ে হালকা হতে চায় না, তাই সে মলিন স্তূপের দ্বারা জড়িত হয়ে থাকে। এর থেকে বাঁচবার উপায় হচ্ছে মনকে নিত্যনবীন পথে চালনা করা। চলার আনন্দরস পান করে মনের যৌবন বিকশিত হয়।

তৃতীয় স্তবক॥ আমি থামব না। আমি বলব না যে, 'আমার চলা সারা হয়ে গেল, সুতরাং এখন আমি যা সঞ্চয় করেছি তাই দিয়ে-থুয়ে আমি গৃহস্থ হয়ে বসলাম।' আমি যাত্রী, আমি সম্মুখপানে চলব। কে পিছন থেকে ডাকছে, আমি তার কথা শুনব না। আমি আর সঞ্চয়—স্থবিরতা—মৃত্যুর গোপন প্রেমে ঘরের কোণে লুকাব না, আমি ঘরছাড়া হয়ে পথের পথিক হব। আমি চিরযৌবনকে মালা পরাব। এ-যে চিরযৌবন চলেছে পথিকের বেশে; তাকে আমি আমার যা-কিছু নিজের রচনা, সৃষ্টি, নিজের যে-সব দেবার জিনিস, সমস্তই দেব। যে বার্ধক্য সঞ্চয়ের দুর্গে সতর্ক বুদ্ধির দেওয়ালে বন্ধ হয়ে বসে তার আয়োজনকে আজ দূরে ফেলে দিয়ে আমি হালকা হয়ে চলব।

চতুর্থ স্তবক॥ হে আমার মন, অনন্ত গগন যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ হয়ে গেছে। যে রথ তোমায় নিয়ে চলেছে বিশ্বকবি তার মধ্যে বসে আছেন। গ্রহতারারবি যাত্রার গান গাইতে গাইতে চলেছে। মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলার আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে।

১৯ আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে

আমি জগৎকে ভালোবেসেছি ব'লে এতে আমার আনন্দ আছে। আমি জীবন দিয়ে এই বিশ্বকে ঘিরে ঘিরে বেষ্টন করে রেখেছি। আমি বিশ্বের প্রভাতসন্ধ্যার আলো-অন্ধকারকে আমার চেতনা দিয়ে পূর্ণ করেছি—তারা আমার চৈতন্যের ধারার উপর দিয়ে ভেসে গেছে। আমি অনুভব করেছি যে, জীবন ভুবনের সঙ্গে মিলে গেছে, এরা তফাত নয়। আমি জীবনকে আলাদা ভালোবাসি না ব'লে আমার কাছে জগতের আলো'কে ভালোবাসা মানেই আমার প্রাণকে ভালোবাসা। আমি জীবনকে কখনো জগৎ-ছাড়া দেখি না, তাই আমার ভয় হয় না পাছে জগতের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়। আমি যদি জগৎ থেকে দূরে কারারুদ্ধ হয়ে থাকতুম তবে এই অনুভূতি হয়তো থাকত না। কিন্তু আমি জগতে বাস করছি ব'লে আমার কাছে জীবন ও ভুবনের ভালোবাসা এক হয়ে আছে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জগৎ ও আমার চৈতন্য এক হয়ে গেছে ব'লে চৈতন্য-থেকে-বিরহিত জগৎটা আমার কাছে একটা abstraction। জীবন ও ভুবন যখন মিলিত হচ্ছে তখনই উভয়ে সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভ করছে।

দ্বিতীয় স্তবক॥ এও যেমন একটা সত্য, তেমনি এই বস্তুবিশ্বে একদিন আমাকে মরতে হবে এই ব্যাপারটাও সত্য। এমন একদিন আসবে যখন আমার যে বাণী ফুলের মতো ফোটে, তা বাতাসের স্পর্শে ফুটে উঠবে না। আমার চোখ প্রতিদিন আলো আহরণ করছে, কিন্তু সেই দিন আমার চোখের সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখন আমার হৃদয় অরুণোদয়ের আহ্বানে ছুটছে, সে দিন তা ছুটবে না। একদিন রজনী কানে কানে তার রহস্যবার্তা বলবে না—সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কাজ ফুরিয়ে যাবে। তাই পার্থিব জীবনের

যে এমনি করে অবসান হবে এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

তৃতীয় স্তবক॥ জগৎ জীবনকে এখন একান্ত করে চাচ্ছে। আলো-অন্ধকারের মধ্যে, প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে, সে কত করে জগৎকে চাচ্ছে এবং উভয়ের মিলনের দ্বারা এই চাওয়ার সার্থকতা হচ্ছে। এ সত্য; তেমনি একদিন এই জগতের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, আমাকে মরতে হবে, সেও সত্য। তবে কী করে এই contradiction হতে পারে, এই দুই সত্যের মধ্যে কি মিল নেই। যদি মিল না থাকে তবে জগৎকে যে চাইলুম, সে যে আমাকে ভোলালে, তা যে একটা মস্ত প্রবঞ্চনায় গিয়ে ঠেকল। বিশ্বের সঙ্গে জীবনের যে আনন্দসম্বন্ধ স্থাপিত হল তা যদি একদিন মিথ্যা হয়ে যায়, যদি এমন করে সব ছাড়তে হয়, তবে তো কোনো মানে থাকে না।

অথচ কোনো ক্রূরতা তো বিশ্বে বলীরেখা আঁকে নি। যদি বিশ্ব এতদিন এত বড়ো প্রবঞ্চনাকে বহন করে এসে থাকে, যদি মৃত্যুর নিরর্থকতায় সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তার কোনো চিহ্ন এই পৃথিবীতে কেন দেখছি না? তা হলে তো বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য থাকত না। পুষ্পকে কীট কাটলে তা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যদি একটি মৃত্যুও সত্য হ'ত তবে সব মৃত্যু বিশ্বে তার দংশনের চিহ্ন ফুটো রেখে দিয়ে যেত। তবে মৃত্যুকীট অনায়াসে পৃথিবীকে শুকিয়ে কালো করে দিত। অথচ কেন এই পৃথিবী সদ্য-ফোটা ফুলের মতো আমার সামনে রয়েছে? এই সৌন্দর্যের emphasis-এর মানেই হচ্ছে যে, মৃত্যুই সর্বগ্রাসী abyss নয়, মৃত্যুই চরম সত্য নয়। কারণ, যদি তাই হত তবে তার প্রত্যেক দংশন ভুবনকে ছিদ্রে আচ্ছন্ন করে কালো করে শুকিয়ে ফেলত।

আলোচনা॥ ১॥ 'এমন একান্ত করে চাওয়া'—এমন করে যে জগৎকে চাচ্ছি আর এমন করে যে জগৎকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি এই দুটোই যদি সমান সত্য হয়েও দুটো contradictory হয় তবে জগতে এই ভয়ানক অসামঞ্জস্যের ভার এই প্রবঞ্চনা থেকে যেত, তবে তার সৌন্দর্যের ক্রূরতার চিহ্ন দেখতাম। কিন্তু তা তো কোথাও দেখি না। তবে এই দুই সত্যের মিল কোথায়?

এর উত্তর এই কবিতায় নেই, কিন্তু সেটাকে এমনি ভাবে বলা যেতে পারে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন (renewal) হয় না। ('ফাল্গুনী'তে আমি এই কথাই বলেছি। 'ফাল্গুনী' বলাকা'র সমসাময়িক।) সীমাকে পদে পদে মরতে হয়, পুনঃপুনঃ প্রাণসঞ্চার না হলে সে যে জীবন্মৃত হয়ে রইল। রূপ (form) যদি স্থবির হয়, fluid জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয়, তবেই সেই অচলরূপেই তার সমাধি হল। মৃত্যু রূপকে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়। যদি তার জীবন এক জায়গায় থেমে রইল তবে তা তার প্রসারণশীলতা (elastricity) রইল না। ইতিহাসে তাই দেখতে পাই মানুষ যখন প্রথার গণ্ডীতে বদ্ধ হয়ে থাকার দরুন তার মনের প্রসারণশীলতা চলে গেল তখন আবার একটা নবযুগ তার বাণীকে বহন করে এনে সেই বন্ধন ছিন্ন করে দিল। অসীমের প্রকাশ (manifestation) সীমাতে হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যেই সীমার চরম অবসান নয়—মৃত্যু তার বিশিষ্ট রূপকে ভেঙে দিয়ে তাকে নব নব আকারে পুনরুজ্জীবিত করে। আনন্দ হচ্ছে জীবনের positive দিক, তার negative দিকটার কাজ হচ্ছে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তার প্রবাহকে পুনঃপ্রবর্তিত করা।

এই নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতির বোঝাকে যে বইতে হবে তা নয়। মানুষের জীবনের শৈশবকাল থেকে একটা ঐক্যধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে—বিস্মৃতির সিংহদ্বার দিয়ে সেই ধারাকে আসতে হয়েছে। আমাদের সচেতন জীবনের মধ্যেও কত বিস্মৃতির

ফাঁক আছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ রয়েছে। যে সত্য আমার দেহে আবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তা আজ আমার চেতনার আলোয় বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই আলোরও মেয়াদ (term) আছে, এই বেড়ারও অবসান আছে।

এক-এক সময়ে ঠেলা আসে, তখন তার ধাক্কায় সব বিদীর্ণ হয়ে যায়। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের অবস্থানও ঠিক এই রকমের। সে যতক্ষণ পরিণতি লাভ করছে ততক্ষণ তার বৃদ্ধি সেই সীমাবদ্ধ জায়গাতেই আছে, কিন্তু এই পরিণতির শেষ হলেই তাকে বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে যেতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনেরও এমনি করে adjustment হয়, তার পরিণতির দ্বারকে [অবরোধক] ভাঙতে হয়—বিশালতর মুক্তিক্ষেত্রের জন্য।

এটা কোনো দার্শনিক speculation-এর কথা নয়, এ হচ্ছে poetry-র কথা। সত্যের positive দিক হচ্ছে আনন্দ। কিন্তু তার negative দিকও আছে। যদি সেটাকেই বড়ো করে দেখতুম তবে পদে পদে মৃত্যুর পদচিহ্ন চোখে পড়ত। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জরারই ছায়ার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে, সে চলেছে। যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে সত্যের positive দিকটা। তবে এ দুটো দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? যখন সীমার রূপের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া অসীমের অন্য গতি নেই তখন তাকে কারাগারকে ভেঙে ফেলেই বার বার শাশ্বত স্বরূপকে দেখাতে হবে।

২॥ স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে আমার বিলাতে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তাঁরও এই মত। আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা চক্র (cycle) আছে, সেটাকে যখন সম্পূর্ণ করব তখন স্মৃতির ধারা পূর্ণতা লাভ করবে। এখন আমার মনে নেই আমার পূর্বকার জীবনে কী হয়েছিল, এখন আমার সামনের দিকেই গতি। একটা অধ্যায় যখন পূর্ণ হবে তখন পিছন ও সামনের সঙ্গে আমার যোগ হবে।

'জীবনদেবতা' group-এর কবিতাগুলিতে এই ব্যাপারটি ঘটেছে। আমার প্রথম কবিতাগুলিতে আমি নিজেই জানি না কী বলতে চেয়েছি। 'কে সে জানি নাই তারে'— এই ভাবের মধ্যে দিয়ে grope করতে করতে অজ্ঞাতভাবে আমার কবিতার ভিতর দিয়ে একটা অভিজ্ঞতাকে পেলুম। আমার চক্র সম্পূর্ণ হল, আমার অনুভূতির রেখাটি আবর্তন করে এসে আর-এক বিন্দুতে মিলল, ঐক্যটি পরিস্ফুট হল—আমি বুঝতে পারলুম।

তেমনি করে জীবনের এক-একটা চক্ররেখা (Cycle) আছে, যখন তা সম্পূর্ণ হবে তখন অনুভূতির ভিতর দিয়ে মর্মগত (Significant) সত্যটিকে বুঝতে পারা যাবে। নভেল যখন সবটা শেষ করি তখনই সব অধ্যায়ের সমষ্টিগত উপাখ্যান ধারাটি পূর্ণ হয়। পিছনে যা ফেলে চললুম, তা দেখবার সময় নেই—আমাকে সামনে চলতে হচ্ছে। চলা যখন শেষ হয়ে চক্র পূর্ণ হল তখন সম্মুখ-পশ্চাৎ মিলিত হল, আমার স্মৃতিগুলি ঐক্যধারায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

তর্কের দ্বারা এই সত্যের প্রমাণ হয় না, এ ব্যাপার আমাদের instinct-এর। যে পাখির ছানা (Chick) ডিমের খোলসের মধ্যে আছে, তার কাছে প্রমাণ নেই যে বাইরে একটা জগৎ আছে। তার আবেষ্টনটি বাইরের জগতের সম্পূর্ণ উল্টো, কিন্তু এই বাইরের জগতের প্রমাণ আছে তার instinct-এ—তারই প্রেরণার সে ক্রমাগত খোলসে ঘা দিচ্ছে। তার ভিতরে তাগিদ (impulse) আছে, তার বিশ্বাস তাকে বলে দিচ্ছে, 'এখানে স্থিতি, এখানে গতি নয়, কৃত্রিম আশ্রয়কে ভেঙে ফেল্।' অথচ খোলসের গণ্ডীর মধ্যে এই মুক্ত জগতের কোনো প্রমাণ নেই।

মানুষের অভিজ্ঞতায়ও তেমনি আমরা দেখতে পাই যে, সব ধর্মের System-এ একটা

অকৃতজ্ঞতার ভাব আছে। তা কেবল বলছে যে, এই-যে যা দেখছ তা শেষ কথা (absolute) নয়। সব ধর্মতন্ত্র বলছে যে, বিরুদ্ধে যেতে হবে। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস বর্তমান আছে যে, যা দেখছি তার চেয়ে যা অগোচর অপ্রত্যক্ষ তা ঢের বেশি মূল্যবান। সেই প্রেরণা, বিদ্রোহ, আমাদের instinct-এ আছে। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এ তো ঠিক কথাই—বিষয়ী লোকেরা এই কথা বলেছে। কিন্তু মানুষ কিছুতেই মনে করতে পারছে না যে এতেই সব শেষ। সে তর্ক করুক আর যাই করুক তার instinct তার এই দেওয়ালে ধাক্কা মারতে ত্রুটি করছে না; যা প্রত্যক্ষগোচর তাকে সে আঘাত করছে, ঠোকর মারছে।

সব মনুষ্যত্বের বিশ্বমানবের ইতিহাসে এই প্রেরণা (urging) চলে আসছে। যা প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক, যাকে তর্কের দ্বারা বোঝানো যায়—তাকে মানুষ অবিশ্বাস করে এসেছে। বর্বরদের তো এ বিদ্রোহের ভাব নেই, কারণ তাদের জ্ঞানানুশীলন (Culture) নেই। যখন আমার বুদ্ধি আমকে স্থির রাখতে পারল না, এগিয়ে নিয়ে গেল, তখনই সত্যকে পেলুম। যে সত্য আমার গণ্ডীকে অতিক্রম করে বর্তমান আছে তাকে তখন আমি লাভ করলুম। মানুষ যেন জ্ঞানজগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বেরিয়ে পড়ে। তেমনি, আমার অধ্যাত্মজগতের যে আবষ্টেন আছে তার মধ্যেকার সত্যকে নেবার জন্য আমার Personality-তে 'ভূমৈব সুখম্' এই বিশ্বাসের প্রেরণা রয়েছে। আমরা জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে মেনে নিচ্ছে না, তাই ক্রমাগত আবেষ্টনে ঠোকর দিচ্ছি। এই বিশ্বাসের দ্বারা যারা অনুপ্রাণিত 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তারাই অমৃতকে লাভ করে।

৩।। প্রত্যেক form-এর মধ্যে দুটো জিনিস রয়েছে—খানিকটা তার প্রকাশিত আর বাকিটা তার আচ্ছন্ন। যা আচ্ছন্ন রয়েছে, একটা বিরুদ্ধ শক্তি তাকে ঘা না দিলে তার পূর্ণ বিকাশ হয় না। মৃত্যু প্রকাশের প্রবাহকে ক্রমাগত মুক্তিদান করে চলেছে। মৃত্যুতে form-এর কোনো বিকাশ হয় না, তার renewal বা নূতন নূতন প্রকাশ হয়।

২২ যখন আমায় হাতে ধ'রে

প্রথম স্তবক ।। তুমি যখন আমায় সমাদর করে পাশে ডেকেছিলে তখন ভয় হয়েছিল পাছে তোমার সেই আদর থেকে আমি একটুও বঞ্চিত বই, পাছে অসতর্ক হয়ে আমার কিছু নষ্ট হয়—কোথাও সম্মানের কোনো হানি হয়। তখন আপন ইচ্ছামত যে নিজের রাস্তায় চলব তার উপায় ছিল না— যে পথে চললে আপনাকে সহজে প্রকাশ করতে পারি সে পথে চলতে দ্বিধা হয়েছে। আমি চলতে গিয়ে ভাবতে ভাবতে গেছি, পাছে এ দিক-ও দিক এক পা নড়তে গিয়ে তোমাকে অসন্তুষ্ট করি। তুমি যখন আমার সম্মান দিলে তখন এই বিপদ হল, আমি যে আমার মতে সহজ পথে চলব তা হল না, আপনাকে সহজে বহন করে নেবার ব্যাঘাত ঘটল। পাছে আমি কোনো সময়ে তোমার সম্মান হারাই, পাছে কোথাও গেলে ক্ষতি হয়—এই আশঙ্কা আমি দূর করতে পারি নি।
দ্বিতীয় স্তবক ।। আজ আমি মুক্তি পেয়েছি। তোমার সম্মানের বাঁধনে বাঁধা ছিলাম, আজ মুক্তি বেজে উঠেছে—অনাদরের কঠিন আঘাতে তার সংগীত ধ্বনিত হয়েছে। অপমানের ঢাক ঢোল বেজে উঠল; আমি সম্মানের বন্ধন থেকে মুক্ত হলাম। আজ আমার ছুটি; যে খোঁটা আমার মনকে বেঁধেছিল তা আজ ভেঙে গেল, হাত-পায়ের বেড়ি খসে গেল। যা দেব আর নেব দক্ষিণে বামে তার পথ খোলসা হল। যখন সম্মানের বেষ্টনে বদ্ধ হয়ে পা ফেলছিলুম তখন আমার ভাবনা ছিল—কী দেব আর নেব। কিন্তু এবার নেবার পথ খোলসা।

আমার এক সময় ছিল যখন আমাকে কেউ জানত না; আমি বিশ্বে অনায়াসে বিহার করেছি; স্বচ্ছন্দে আকাশ-পৃথিবীতে উপরে উঠেছি, নীচে নেমেছি; কে কী বলবে কাড়বে তা ভাবি নি। সে সময় আমার সম্মানে অধিকার ছিল না। আজ আবার আকাশ-পাতাল আমার খুব করে ডাক দিল, আজ আমি অনাদৃতের দলে। যে লাঞ্ছিত তার ভাবনা নেই। সমস্ত জগতে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে কে তাকে থামায়। এই-যে আমি ঘরের মধ্যে সম্মানের বেষ্টনে ছিলাম, আজ তা ঘুচে গেল। আমি আমার আশ্রয়কে হারালাম। আজ আমায় ঘরছাড়া বাতাস মাতাল করে দিল, আর আমার ভয় নেই। যখন রাত্রে কোনো তারা খসে পড়ে, তখন সেই তারার এক-সময়ে তারকাসমাজে যে সম্মানের আসন ছিল তাকে সে হারিয়ে বসে— 'কুছ পরোয়া নেই' বলে আকাশে ঝাঁপ দেয়। তেমনি আমি আজ মরণ-টানে ছুটে চলেছি, বলছি, 'ভয় নেই, সব বাঁধন ছিড়ল।'

তৃতীয় স্তবক॥ আমি কালবৈশাখীর বাঁধন ছিন্ন মেঘ। এবার ঝড় আমাকে তাড়া দিল, অপমানের ঝড় অচলা স্থিতি থেকে আমাকে পথে বার করে দিয়েছে। সন্ধ্যারবির সোনার কিরণ আমাকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল; যখন কাল বৈশাখী তাড়া দিল তখন আমি স্বর্ণকিরীট অস্তপারে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মেঘ হয়ে বজ্রমানিকে ভূষিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি সেই বাঁধন-হারা বৈশাখের মেঘ—একা একা আপন তেজে ঘুরে বেড়াব। বাইরের সম্মান আমাকে আলোকিত করেছিল; কিন্তু এখন আমার ভিতর বজ্রমানিকের তেজ আছে, সেই তেজ আমাকে গৌরবান্বিত করেছে—বাইরের অস্তরবির কিরণ নয়। যে সম্মান আমাকে বাইরে টেনেছিল আমি তাকে ফেলে দিয়ে আপন অন্তরের মহিমায় একলা পথে বার হয়েছি।

আমি অসম্মানের মধ্যে মুক্তি পেলাম। সকলের চেয়ে চরম সমাদর যা তা বাইরে নেই, তা অন্তরে। যখন বাইরের খ্যাতির ঘটা ঘুচে যায় তখনই একমাত্র তোমারই আদর অন্তরে পেয়ে থাকি। সেটাই সমাদরের শেষ, তাতেই মুক্তি হয়। যা অপরের অপেক্ষা বাখে তা আমার পক্ষে বন্ধন—লোকের কথার উপর, স্তুতিবাদের তারতম্যের উপর, তার নিয়ত পরিবর্তন হয়। কিন্তু তোমার আলো যখন অন্তরে আসে তখন আপন যথার্থ স্বরূপকে জানি, তোমার চরম সমাদরে আমার বন্ধন মোচন হয়।

চতুর্থ স্তবক॥ গর্ভে যখন সন্তান থাকে তখন সে মাকে দেখে না। মা যখন তাকে মাটির উপর দূর করে দিলে, তখন যেন সে সমাদরের বেষ্টন থেকে অসম্মানের ধরণীতে বিচ্যুত হল। কিন্তু তখনই শিশু মাকে দেখতে পেল। যখন সে আরামে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল তখন সে মাকে জানে নি, দেখে নি। তুমি যখন আদরের মধ্যে সম্মানের দ্বারা আমাকে বেষ্টিত করো, তার হাজার নাড়ীর বাঁধনে যখন আমাকে জড়িত করো, তখন তোমাকে আমি জানতে পারি না—সেই আশ্রয়কেই জানি। কিন্তু যখন তুমি সম্মানের আচ্ছাদন থেকে আমাকে দূরে ফেলো তখন সেই বিচ্ছেদের আঘাতে আমার চৈতন্য হয়, আমি তোমার সেই আবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে তোমার মুখ দেখতে পাই। যখন সম্মান থেকে মুক্ত হয়ে, তোমার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে, তোমার সামনে এসে দাঁড়াই তখনই তোমাকে দেখতে পাই।

২৩ কোন্ ক্ষণে সৃজনের সমুদ্রমন্থনে

প্রথম স্তবক॥ সৃজনের প্রথম ক্ষণে দুই ভাবের নারী অতল অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছিল। একজন সুন্দরী, তিনি উর্বশী, বিশ্বের কামনারাজ্যে আধিপত্য করেন। আর-একজন লক্ষ্মী,

তিনি কল্যাণী। একজন স্বর্গের অপ্সরী, আর অন্যটি স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন হরণ করেন, আর-একজন পূরণ করেন।

দ্বিতীয় স্তব॥ একজন তপস্যাকে ভঙ্গ করে দেন। সেই ভাঙনে যে আলোড়ন জেগে উঠছে সে যেন তাঁর উচ্চহাস্য। তিনি সুরাপাত্র নিয়ে দুই হাতে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মাদকতাকে আকাশে বাতাসে বিকীর্ণ করে দিয়ে যান।

তৃতীয় স্তবক॥ তাঁর আগমনে বিশ্ব যেন বসন্তের কিংশুকে গোলাপে ফেটে পড়তে চায়। সমস্তই যেন বাইরের দিকে বিদীর্ণ বিকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যখন হেমন্তকাল আসে তখন অন্য মূর্তি দেখি। তখন দেখি তা ফল ফলিয়েছে, আপনাকে পূর্ণতার ভিতরে সম্বৃত করেছে; তখন বসন্তের আত্মবিস্মৃত অসংযম অন্তরে পরিপাক পেয়ে সফলতার পরিণত হয়েছে। এক নারী সেই বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাইরের তাপে আন্দোলিত করে দিলেন, অন্য জন তাকে শিশিরস্নাত ক'রে অন্তরের মাধুর্যে ফলবান করে তুললেন।

হেমন্তকালে যখন ফসল ফলল তখন তার মধ্যে চঞ্চলতা রইল না, সমস্ত স্তব্ধ হল, তার মধ্যে দক্ষিণ বাতাসের মাতামাতি থেকে গেল। হেমন্ত সেই আপনার শান্ত সফলতাটিকে বিশ্বের আশীর্বাদের দিকে উর্ধ্বে তুলে ধরে।

পুষ্পের মধ্যে প্রাণের প্রকাশের অধৈর্য আছে। কিন্তু তার এই জীবনের আবেগ তাকে একটি পরিমাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে মৃত্যুর সীমায় গিয়ে পৌঁছতে হয়, তবেই সে চরম সার্থকতা লাভ করে। ফলে পরিপক্ক হয়। জীবন যদি আপনারই সীমারেখার মধ্যে পর্যাপ্ত হত তবে মৃত্যু হঠাৎ এসে তাকে ভয়ানক বিচ্ছেদে নিয়ে যেতে এবং মৃত্যু তার একান্ত বিরুদ্ধ হত। কিন্তু মৃত্যুকে যখন কল্যাণের দিক দিয়ে দেখব তখন বুঝব যে, জীবন তার সীমাকে উত্তীর্ণ ক'রে অমৃতের মধ্যেই প্রবেশ করছে।

সীমার মধ্যে এই অনন্তের আভাস, সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টির মধ্যে অনির্বচনীয়ের প্রকাশের মতো। শিল্পীর রচনার মধ্যে যে সংযমের ব্যঞ্জনা আছে তার দ্বারা মনে হয় যে, সবটা যেন বলা হল না। কিন্তু সেই বলতে গিয়ে থেমে যাওয়ার মধ্যে প্রকাশের অসম্পূর্ণতা বা অপরিস্ফুটতা নেই; কারণ সেই কবিতা বা চিত্র বলাকে অতিক্রম ক'রে যা অনির্বচনীয় তাকেই ব্যক্ত করে এবং এই সংযমের সঙ্গে তার বাণীর পূর্ণতার বিরোধ নেই। জীবনের নিত্য আন্দোলনের মধ্যে তখনই অসমাপ্তিকে দেখি যখন মনে হয় যে মৃত্যু তাকে ভয়ানক নিরর্থকতায় নিয়ে যাচ্ছে। যখন মৃত্যুর মধ্যে জীবনের একান্ত বিচ্ছেদ দেখি তখনই কাড়াকাড়ি, তখনই বিরোধ ঘোচে না। কিন্তু যখন কল্যাণকে লাভ করি তখন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনের পরমার্থতা ও অসীমতা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

আমাদের জীবনের এই ব্যঞ্জনারই প্রতীক আমরা প্রকৃতির মধ্যে পাই। গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে সেখানে সে আপন চরম অর্থকে লাভ করছে। এক জায়গায় এসে নিরর্থকতার মরুভূমিতে তো সে ঠেকে যায় নি—তা হলে হয়তো মৃত্যু তার কাছে ভয়াবহ হত। কিন্তু সে যখন সমুদ্রে বিশ্রাম পেল তখনই তার পূর্ণতার উপলব্ধি হল, তাই তার শেষটা ভয়ানক পরিণাম বলে বোধ হয় না। সেই গঙ্গাসাগরের সংগমস্থলই অনন্তের পূজামন্দির। কল্যাণী যিনি, তিনি উদ্ধত বাসনাকে সেই পবিত্র সংগমতীর্থে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। একজন সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, অন্যজন তাদের সেখানে ফিরিয়ে আনেন। যেখানে শান্তির পূর্ণতা সেখানে লক্ষ্মীর স্থিতি।

উর্বশী আর লক্ষ্মী, এরা মানুষের দুটি প্রবর্তনার, প্রেরণার, প্রতিরূপ। সর্বভূতের মূলে এই দুই প্রর্বতনা আছে। একটি শক্তি, সে ভিতরে যা-কিছু প্রচ্ছন্ন আছে তাকে উদ্‌ঘাটিত

করে; এবং আর-একটি শান্তি, সে অন্তর্নিহিত পরিপক্কতার মধ্যে সফলতার পর্যাপ্তিতে নিয়ে যায়—তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে।

ভাঙাচোরা যখন চলতে থাকে, জীবনে যখন অভিজ্ঞতার ভূমিকম্প হতে থাকে, তখন তার মধ্যে যথেষ্ট বেদনা আছে। সেই উদ্দাম শক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু কেবল যদি এই চঞ্চলতাতেই তার সমাপ্তি হত তবে দুর্গতির আর অন্ত থাকত না। তাই দেখতে পাই এর মধ্যে লক্ষ্মীর হাত আছে; তিনি বাঁধন-ছাড়া তানকে শমের দিকে ফিরিয়ে এনে ছন্দ রক্ষা করেন। যে প্রলয়ংকরী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি সেই শক্তিই একান্ত হয় তবেই সর্বনাশ ঘটে। কিন্তু সে তো একা নয়। গতি প্রবর্তিত করবার জন্যে সে আছে। গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আর-এক শক্তি আছে, তাকেই বলি কল্যাণী। এই নিয়ন্ত্রিত গতি নিয়েই তো বিশ্বের সৃষ্টিসংগীত।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' আর 'শকুন্তলা'র মধ্যে এই দুটি শক্তির কথা আছে। শিবের তপস্যা যখন ভাঙল তখন অনর্থপাত হল, আগুন জ্বলে উঠল। সেই অগ্নি আবার নিবল কিসে? গৌরীর তপস্যা-দ্বারা।

'শকুন্তলা'র প্রথমাংশে ঠিক এই ভাবে ট্র্যাজেডিকে দেখানো হয়েছে। প্রবৃত্তি শকুন্তলাকে উদ্দাম করেছিল। কিন্তু পরে আবার যখন তপস্যার দ্বারা শকুন্তলা কল্যাণী হয়ে জননী হয়ে শান্তচিত্ত হলেন, তখন তাঁর ইষ্টলাভ হল।

আলোচনা॥ কালিদাসের এই দুই কাব্যে মানুষের দুই রকমের প্রবর্তনার কথা উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। গৌরী আর শকুন্তলা নারী ছিলেন এটাই কাব্যের আসল কথা নয়—কিন্তু এঁদের উপলক্ষ করে শক্তির দ্বিবিধ মূর্তি ফুটে উঠেছে সেটাই কালিদাসের আসল দেখাবার জিনিস। গৌরী অনেক দিন শান্ত-ভাবে শিবের সেবা করে আসছিলেন। কিন্তু যে ধাক্কায় তিনি শিবের জন্যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন সেই ধাক্কা এল যার থেকে তাকে আমরা কল্যাণী বলি নে। তবু সে না হলে শিবকে জাগাবারও উপায় থাকে না। শিব যখন আপনার মধ্যে আপনি নিবিষ্ট তখন তার থাকা না-থাকা সমান। যে শক্তি চঞ্চল করে তাকে বর্জন ক'রে যে শান্তি, সে শান্তি মৃত্যু; তাকে সংযত করে যে শান্তি, তাতেই সৃষ্টি—অতএব তাকে বাদ দেওয়া চলে না।

শকুন্তলা সংসারে অনভিজ্ঞ, তার সরলতার মধ্যে যে শান্তি সে যেন অফলা গাছের ফুলের মতো। ভরতকে যে চাই। সেই চাওয়ার মূল ধাক্কাটা শকুন্তলাকে যে দিলে সে তাকে দুঃখই দিলে। কিন্তু এই দুঃখের ভিতর দিয়ে যখন সে জীবনের পরিণতির মধ্যে এসে পৌঁছল তখনই সে সত্যের চক্রপথপ্রদক্ষিণ সাঙ্গ করলে। এই প্রদক্ষিণ যাত্রার প্রথম বিক্ষেপে বেদনা, শেষ পরিসমাপ্তিতে শান্তি।

গেটে যে চার লাইনে শকুন্তলার সমালোচনা করেছেন, আমার মনে হয়, সেটা তিনি খুব ভেবেচিন্তেই লিখেছিলেন। এ কথা আমি আগেও বলেছি। তিনি যে বলেছেন যে কালিদাস ফুলকে ও ফলকে, স্বর্গকে ও মর্তকে একত্রিত করেছেন, এর মধ্যে গভীর অর্থ আছে। এটা নিতান্ত কবিত্বের উক্তি নয়। কুঁড়ি থেকে ফোটা ফাইস্ট্ প্রথমে নির্জনে বাস করেছিলেন—জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বইয়ের পাতার মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। সেই কুঁড়ির মধ্যে পাপের আঘাত ছিল না। তিনি বললেন যে, এখানেই যদি সব শেষ হল তবে এই দুর্গতির যথার্থ পরিসমাপ্তি হল না—এবার হাওয়ায় আছাড় খেয়ে সেই ফিরে পাবার পথকে পেতে হবে। সে যদি বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝড়ে পড়ত তবে পড়ত তবে তো তাতে ফল ধরত না, জগতের ভালোমন্দের বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সে তপোবনে সখীদের সঙ্গে সবল

মনে আলবালে জলসেচনে ও হরিণশিশু-প্রতিপালনে নিরত ছিল। সেই অবস্থায় সে বাইরে থেকে কঠোর আঘাত না পেলে, তার জীবনের বিকাশ হত না। যেখানে জীবনের পতন, দুঃখ সেখানে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কালিদাস তাকে তো শেষ করতে দেন নি। তিনি problem of evil নিয়ে পড়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, জগতে কিছুই স্থির হয়ে নেই; তাই কুঁড়ির থেকে ফুল, তার থেকে ফল হচ্ছে—কোনো জায়গায় ছেদ নেই।

কোনো আধুনিক শিল্পী কালিদাসের মতো 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয় অংশটা লিখতেন না। ট্র্যাজেডি দিয়েই শেষ করতেন। কিন্তু আসলে অস্তিত্বের পরম সত্য ট্র্যাজেডি নয়। তার গতিবেগ তাকে কক্ষচ্যুত বিক্ষিপ্ত করে না—আত্মবিকাশের পথে তাকে নিয়ত উৎসাহিত করে। সেই আত্মবিকাশের লক্ষ্যস্থানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং আছেন ব'লেই আঘাত-সংঘাতের বেগ একান্ত হয়ে বিশ্বকে নষ্ট করে না। গাছ থেকে ফল ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেটা একান্তভাবেই ক্ষতি হ'ত যদি কোথাও ফলের প্রত্যাশার কোনো সার্থকতাই না থাকত।

দেবাসুরে যখন সমুদ্রমন্থন হল তখন সেখানে গরল করবার দেবতা ছিলেন, তাই সে গরল অমৃতকে অভিভূত করতে পারে নি।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকেরা কালিদাসের এই বইকে নীতি-উপদেশমূলক (didactic) বলবে। কিন্তু যা ধর্মনীতির দিক দিয়ে ভালো সেও কল্যাণনীতির দিক দিয়ে ভালো হবে না এমন তো কোনো কথা নেই। শিবের সতী সৌন্দর্যেরও সতী। উমা যখন বসন্তপুষ্পাভরণে সেজে এসেছিলেন তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যমদে বিশ্ব মত্ত হয়ে উঠেছিল। উমা যখন তাপসিনী সেজে আভরণ পরিত্যাগ করলেন তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যসুধায় দেবতা পরিতৃপ্ত হলেন। দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য সত্যের কল্যাণমূর্তিকে যত্নপূর্বক পরিহার করতে চায়, পাছে পাঠকরা বলে বসে এ মূর্তি সত্য নয়। পাঠকদের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠে কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর বলবার সাহস তার নেই। সত্যকে বিরূপ করে দেখিয়ে তবে সে প্রমাণ করতে চায় যে, সত্যের সে খোসামুদি করে না। সত্যের সুন্দর রূপ প্রকাশ করাকে তারা ইস্কুলমাস্টারি ব'লে ঘৃণা করে। এ কথা ভুলে যায় নীতিবিদ্যালয়ের ইস্কুলমাস্টার কল্যাণকে, সত্য এবং সুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থে পরিণত করে তুলেছে—কবি যদি সেই বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে সত্যের পূর্ণতা দেখাতে পারে তা হলেই কবির উপযুক্ত কাজ হয়।

২৪ স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই

প্রথম স্তবক॥ মানুষ যে স্বর্গকে খোঁজে তাকে সে পৃথিবীর বাইরে মনে করে; তাই সে স্বর্গে পৌঁছবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করে, সংসার ভাসিয়ে দেয়। যে স্বর্গকে মানুষ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জানে তা অস্পষ্ট, অব্যক্ত, সৃষ্টিছাড়া।

দ্বিতীয় স্তবক॥ আমি অনেক দিন পর্যন্ত সেই সৃষ্টিছাড়া স্বর্গে অব্যক্তের ভিতরে শূন্যে শূন্যে ঘুরেছিলুম। সেই স্বর্গ যা অস্ফুট ছিল, যার অবস্থা প্রকাশের পূর্বকার অবস্থা, তার থেকে যেই আমি মাটিতে জন্মালুম, পরম সৌভাগ্যে সেই ধুলোমাটির মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এলুম, অমনি সুস্পষ্ট রূপলোকে স্থান পেলুম।

আমার এই জন্মলাভ যেন অনেক দিনকার সাধনার ফলে। এই স্বর্গের ধারণা যেন কেবল একটা ইচ্ছারূপে ছিল, তা প্রথমে রূপ ধরে নি।

অনেক দিন পর্যন্ত যেন সৃষ্টিনাট্যের নেপথ্যগত একটি ইচ্ছাস্বর্গের মধ্যে ঘুরছিলুম। ভাবুকের মনের মধ্যে যখন কোনো-একটা ভাব থাকে তখন সে একটি বৃহৎ অপ্রকাশের আকাশে

বিকীর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু যেই সে ভাব একটু রূপ গ্রহণ করল অমনি অনেকখানি ভাবের নীহারিকা ব্যক্ত আকার ধারণ করল, অতখানি ব্যাপক অস্ফুটতা যেন সার্থক হয়ে গেল। যে স্বর্গ অব্যক্ত তা অনন্ত অসীম হতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র পরিমাপে রূপ দান করেও অনন্ত ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভ করে। তাই আমার পক্ষে মানুষ হয়ে জন্মানো কত বড়ো কথা! এই-যে আমি আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করছি, তার মধ্যে যেন অব্যক্ত অসীমের সৌভাগ্য বহন করছি। এই-যে আমি ধুলোমাটির মানুষ হয়েছি, এই হওয়ার মধ্যেই কত যুগের পুণ্য! আমার দেহে স্বর্গ তাই কৃতার্থ।

সেই স্বর্গ আমাকে আশ্রয় করে খেলা করতে পারল। আমাকে নিয়ে যে জন্মমৃত্যুর ঢেউ উঠল তার সংঘাতের দোলে সে আপনাকে দোলাতে পারল। স্বর্গ আমার মধ্যে নিত্যনবীন আনন্দচ্ছটায় লীলায়িত হচ্ছে, আমার ভালোবাসা বিচ্ছেদ-মিলন লাভ-ক্ষতি এই-সমস্তকে আপন খেয়ালে ভেঙেচুরে নানা রঙে বিচ্ছুরিত করছে।

তৃতীয় স্তবক॥ স্বর্গ নীরব ছিল, তার মুখে বাণী ছিল না; আমি যেই গান গাইলুম অমনি সেই স্বর্গ বেজে উঠল। সে আমার প্রাণের গানে আপনাকে খুঁজে পেল। আমার মধ্যে অব্যক্ত আপনার যে লক্ষ্যকে খুঁজছে তাকে আমার প্রাণের গতির মধ্যে, অভিব্যক্তির মধ্যে লাভ করেছে; তাই অসীম আকাশ আজ আমার মধ্যে নিবিষ্ট, তাই আমার সুখদুঃখের ঢেউয়ের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ সংহত।

আজকে দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে শঙ্খধ্বনি উঠেছে, সে তো আমার প্রাণেরই ক্ষেত্রে, আমারই মধ্যে। সাগর তার বিজয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে—সে তো বাজছে আমারই চিত্তকূলে। আমি প্রাণ পেয়েছি, চেতনা পেয়েছি, এইজন্যই তো অঙ্গনে অঙ্গনে স্বর্গলোকের শঙ্খ বেজে উঠল—নইলে বাজবে কোথায়? তাই তো ফুল ফুটেছে। পুরাঙ্গনারা যেমন অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে উলুধ্বনি করতে করতে ছুটে আসে, তেমনি আমি আসাতে ফুলের, ঝরনার, ধারার মধ্যে হুলুস্থুল বেধে গেছে।

অনন্তস্বর্গ মাটির মায়ের কোলে আমার মধ্যে জন্মেছে, বাতাসে এই বার্তা চারি দিকে প্রচারিত হল।—

এ পর্যন্ত এই শ্লোকগুলির মানে যা বললাম তাতে একে এক-রকম ব্যাখ্যামাত্র করা হল। কিন্তু কবিতা তো তত্ত্ব নয়, তা রস। কবি যে আনন্দের কথাটা এই কবিতায় বলতে চাচ্ছে সে হচ্ছে প্রকাশের আনন্দ।

সন্তান যখন বাপ-মা'র কোলে জন্মালো তখন বিপুল আনন্দে ঘর ভরে উঠল, এ যেমন আমাদের মানবগৃহে, তেমনি অসীমের ক্ষেত্রেও রূপ যখনই বাস্তব হয়ে উঠল তখনও এই ব্যাপারটি ঘটছে। বাস্তব হচ্ছে কোন্‌খানে? আমারই চৈতন্যের আলোকিত ক্ষেত্রে। এইজন্যে আমার চোখে যে মুহূর্তে দৃষ্টি জাগল অমনি যেন সোনার কাঠির স্পর্শে একটা সম্পূর্ণ বিশ্ব উঠল জেগে। যেই আমার কানের দ্বারে চৈতন্য এসে দাঁড়ালো অমনি শব্দের জগতে একি কোলাহল! এই-যে আমার চিত্তের প্রাঙ্গণে প্রকাশের মহামহোৎসব উঠেছে, কবি তারই বিচিত্র বিপুল আনন্দের কথা এই কবিতায় বলেছে। এর তত্ত্ব কত লোকে কত রকম করে বুঝবে বোঝাবে, কিন্তু এর রসটুকুই কাব্যে প্রকাশ করা চলে।

যা সৃষ্ট নয়, ব্যক্ত নয়, সেই ঠিকানাহীন দেশকে আমি 'স্বর্গ' নাম দিচ্ছি।

পুণ্য সঞ্চয় করলেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে এই কথাই চলতি কথা; কিন্তু আমি বলছি যে, আমি স্বর্গ থেকেই পুণ্যের জোরে মর্তে নেমে এসেছি। আমি যখন গণ্ডীবদ্ধ প্রকাশের মধ্যে পরিস্ফুট হলাম তখনই আমার সকল অপূর্ণতা সত্ত্বেও মর্তের মধ্যে স্বর্গ ধন্য হল।

আলোচনা॥ এই স্বর্গমর্তের ভাবটা বহু পূর্বে আমার বাল্যকাল থেকেই আমাকে অনুসরণ করেছিল।

অল্প বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এ এই আইডিয়ার ব্যাকুলতাকে আমি একরকম ক'রে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। সন্ন্যাসী বললে, 'যে ভববন্ধন সীমার শৃঙ্খলে আমাকে বেঁধে রাখে অমি তাকে ছিন্ন ক'রে অসীম প্রাণকে পাবার জন্য তপস্যা করব।' সে লোকালয়কে 'তুচ্ছ মায়া' 'অন্ধকার গহ্বর' ব'লে সমস্ত ত্যাগ করে দুরে চলে গেল। [রূপ] রস গন্ধ বর্ণচ্ছটা সব তার চৈতন্যের থেকে অপসারিত হল, সে আপনাকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার ক'রে অসীমকে পাবার জন্য পণ করল। তার পর কোথা থেকে একটি ছোটো মেয়ে দেখা দিল; সে নিরাশ্রয় ছিল, সন্ন্যাসী তাকে গুহায় নিয়ে এল। মেয়েটি তাকে ধীরে ধীরে স্নেহের বন্ধনে বাঁধল। তখন সন্ন্যাসীর মনে ধিক্কার হল; সে ভাবতে লাগল যে, এই তো প্রকৃতিমায়াবিনী দূতী করে এমনি করে মেয়েটিকে পাঠিয়েছে, সে সন্ন্যাসীকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন করে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়। এই সংগ্রাম যখন চলছে তখন একদিন সে ক্রোধের বশে মেয়েটিকে ত্যাগ করল। মেয়েটি যাকে নিতান্তভাবে আশ্রয়স্থল বলে জেনেছে তার সেই অবলম্বন চলে যাওয়াতে, সে ছিন্ন লতার মতো লুটিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী যত দূরে সরে যেতে লাগল, ততই মেয়েটির ক্রন্দন তার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হতে লাগল। শেষে মেয়েটি যে বাস্তব, মায়া নয়, তা সে হৃদয়ের বেদনার আঘাতে বুঝতে পারল। মনের এই অবস্থায় সে দূরে দাঁড়িয়ে লোকালয়ের দৃশ্য দেখতে লাগল; তার মাধুর্যে, মানুষের স্নেহপ্রীতিসম্বন্ধের সরসতায়, তার মন ভরে উঠল। সে বললে, 'ফেলে দিলুম আমার দণ্ড কমণ্ডলু, দূর হয়ে যাক এ-সব আয়োজন। সীমাকে বর্জন করে তো আমি কোনো সত্যই পাই নি। একটি ছোটো মেয়েকে স্নেহ করতে পেরেছিলুম বলেই তো সেই রসের মধ্যে অসীমকে পেয়েছি—তার বাইরে তো অনন্তস্বরূপের প্রকাশ নেই।' —এই ভাবটাই আমার নাটিকাটির মূল সুর।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এর প্রতিপাদ্য বিষয়টা বাল্যকালে আমার নানা কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। সীমার সঙ্গে যোগেই অসীমের অসীমত্ব, এ কথা ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে। 'অবিদ্যা' বা সীমার বোধকেই একান্ত ব'লে জানার মধ্যে অন্ধ তামসিকতা আছে, আবার অসীমের বোধকেই একান্ত করে দেখার মধ্যেও ততোধিক তামসিকতা আছে—কিন্তু যখন বিদ্যা-অবিদ্যাকে মিলিয়ে দেখব তখনই সত্যকে জানব।

সীমাকে নিন্দা করা গায়ের জোরের কথা। ঐকান্তিক (absolute) সীমা বলে কিছু নেই, সব সীমার মধ্যেই অনন্তের আবির্ভাবকে মানতে হবে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এর সন্ন্যাসী সীমাকে 'না' করে দেওয়া যে মুক্তি তার মধ্যে দিয়েই সার্থকতাকে চেয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে যায় অন্ধকারে।

তেমনি আবার সীমা-জগৎকে অসীম থেকে বিযুক্ত করে দিয়ে তার মধ্যে বদ্ধ হলে সেও ব্যর্থতা। কাব্যে শব্দকে বাদ দিয়ে যে রসিক রসকে পেতে চায় সে কিছুই পায় না, আবার রসকে বাদ দিয়ে যে পণ্ডিত শব্দকে পেয়ে বসে তার পণ্ডতারও সীমা নেই।

২৮ পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান

প্রথম স্তবক॥ তুমি মানুষ ছাড়া আর সব জীবকে যেটুকু দিয়েছ সে সেইটুকুই প্রকাশ করে। পাখিকে সুর দিয়েছ, সে সেই বাঁধা সুরের দানটি বার বার ফিরিয়ে দেয় তার বেশি সে

দেয় না। আমাকে তুমি যে সুর দিয়েছ সে সুর তোমার, কিন্তু আমি তার বেশি তোমায় ফিরিয়ে দিই—আমি যে গান গাই সে গান আমার।

দ্বিতীয় স্তবক॥ তুমি বাতাসকে ধরে রাখ নি। তার কোনো বাঁধন নেই, সে অনায়াসে তোমার সেবা করে, বিশ্বকে বেষ্টন ক'রে কাজ করে। আমাকে তুমি যত বোঝা দিয়েছ তাকে আমার সেই বন্ধন থেকে মুক্তিকে আপনিই উদ্‌ভাবন করতে হবে। আমি একে একে নানা বন্ধনদশার পাশমোচনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর থেকে মৃত্যুতে আপনাকে রিক্তহস্ত করে বয়ে নিয়ে যাব। আমি তোমার সেবার জন্য স্বাধীনতা অর্জন করব। এই হাত-দুটিকে মুক্ত ক'রে তোমার কাজের জন্য নিযুক্ত করব, বলব—তোমার আদেশ তোমারই কাজে এখন থেকে প্রবৃত্ত হলুম। তুমি আমাকে বন্ধন দিলে, কিন্তু আমাকে ভিতর থেকে মুক্তিতে বিলীন হতে হবে—আমার কাছে তোমার দাবি বেশি।

তৃতীয় স্তবক॥ তুমি পূর্ণিমায় হাসি ঢেলে দিচ্ছ—ধরণীকে হাস্যময় সৌন্দর্য দান করেছ। ধরণীর অন্তস্তলে যে রস নিহিত আছে, সে ফিরে সেই রসকে ঢেলে দিচ্ছে। কিন্তু আমায় তুমি দুঃখ দিয়েছ, তার ভার আমায় বইতে হচ্ছে। সমস্ত জীবনের এই দুঃখকে অশ্রুজলে ধুয়ে ধুয়ে তাকে আনন্দ করে তুলে আমাকে তোমার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে, তোমার কাছে নিবেদন করতে হবে। আমি দিনশেষে মিলনক্ষণে সকল দুঃখকে আনন্দময় করে তোমার কাছে নিয়ে যাব, আমার উপর এই ভার রয়েছে।

চতুর্থ স্তবক॥ তুমি তোমার এই ধরণী মাটি দিয়ে তৈরি করেছ, এই ধরণী আলো-অন্ধকারে সুখ-দুঃখে মিলিত হয়ে রয়েছে। আমায় তুমি এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছ কিন্তু কিছু সম্বল সঙ্গে দিলে না—একেবারে হাত শূন্য করে দিয়েছ, আর আড়ালে থেকে তুমি আমায় দেখে হাসছ। তুমি আমাকে এমনি অবস্থায় মাটিতে রেখে দিয়ে বললে, 'তোমার উপর ভার হচ্ছে এখানে স্বর্গ রচনা করবার। তুমি অন্ধকার থেকে আলো উদ্‌ভিন্ন ক'রে, মৃত্যু থেকে অমৃতকে বহন ক'রে এনে, তোমার আপনার জীবন দিয়ে এই মর্তলোকে স্বর্গ গড়ে তুলবে, তোমার উপব এই ভার রইল।'

পঞ্চম স্তবক॥ প্রকৃতিতে সব জীবকে তুমি তোমার দানের দ্বারা ভূষিত করলে এবং যাদের যা দিয়েছ তারা সেই সম্পদ্‌কেই প্রকাশ করছে। কেবল আমার কাছে তোমার দাবি রয়েছে, আমার কাছে তোমার আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। তাই আমি নিজের প্রেম দিয়ে যে অর্ঘ্য রচনা করে দিচ্ছি সেই যত্নের দান তুমি তোমার সিংহাসন থেকে নেমে এসে বক্ষে তুলে নাও। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার পরিমাণ অল্প, কিন্তু আমি যে দান তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তা অনেক বেশি।

তুমি আমাকে অল্প দিয়ে তোমার জীবনলোকে ছোটো নগণ্য প্রাণী করে দাও নি, কারণ, আমার প্রতি তোমার যে দাবির জোর আছে তাতে আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন তা আমার জীবন থেকে উৎসারিত হয়। আমি কেবল স্বর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু তোমার দাবি আছে ব'লে তা সংগীত হয়ে প্রকাশিত হয়। তুমি আমাকে বন্ধন দিয়েছ কিন্তু বলেছ যে, এই বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলতে হবে। তুমি চাও যে আমি মুক্তিলাভ করি। তোমার দাবি আছে ব'লেই মানুষকে দুঃখের উপর জয়যুক্ত হয়ে সেই দুঃখকে আনন্দধারায় ধৌত করে পূর্ণ করে তুলতে হয়, মানুষের জীবনের গতি তাই মুক্তির দিকে ধাবিত হয়। কিসে তার দুঃখমোচন হয় সেই সন্ধানে সে প্রবৃত্ত হয়। তুমি পৃথিবীকে আপনি রচনা করলে, কিন্তু স্বর্গ রচনা করবার ভার দিলে মানুষের উপর। পৃথিবীতে মানুষের যে সূচনা হল তাকে তো জ্যোতির্ময় বলা যায় না, কিন্তু মানুষকে সেই শূন্যতা থেকে এই মর্তধামেই অপূর্ব-আলোকে-উদ্‌ভাসিত

স্বর্গ রচনা করে তুলতে হবে। তাই মানুষ স্থির হয়ে বসে নেই—তার বিরাম নেই, শান্তি নেই। তার সঙ্গে তোমার এই-যে কঠিন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে তারই তাগিদে সে আপনার অন্তর্নিহিত সম্পদ্‌কে ক্রমাগত ব্যক্ত করে। তাই তোমার জন্য তার যে প্রেমের অর্ঘ্য রচিত হয় তাকে তুমি বহুমূল্য রত্নের মতো আদরের সঙ্গে বক্ষে তুলে নাও।

মানুষ তার ইতিহাসে যে মূলধন নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে তার মধ্যেই তো সে থেমে থাকে না। সাহিত্য রাজনীতি ধর্মকর্মতে সে ক্রমাগত উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে। মৌমাছিরা যখন চাক বাঁধতে শুরু করে তখন যার যে পরিমিত সামর্থ্যটুকু আছে সে সেই অনুসারে একই বাঁধাপথে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে কাজে লেগে যায়, কিন্তু মানুষ তো সংকীর্ণ পথে চলে না, তার যে কোথাও দাঁড়াবার জো নেই। তার হাতে যে উপকরণ আছে তাকে বিশালতর করে তুলতে হয়। সে আপনাকে আরো বিকশিত করবে, সে আরো এগিয়ে চলবে। ইতিহাসে তার এই আহ্বান রয়েছে।

মানুষের বর্তমান ইতিহাসেও এই বাণী রয়েছে। সে অতীত মানবদের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না—যা পেয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পদ দিয়ে তার সাজি ভরতে হবে। মানুষের এই গৌরব আছে। সে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলল; বলল—'এই মাটির ধরা আমাকে যা দিয়েছে আমি তার চেয়ে আরো বেশি একে দিয়েছি।'

'দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে থুয়ে'—যেখানে অপূর্ণতা সেখানেই শক্তির খর্বতা, সেখানেই দুঃখ। যখন মানুষের বাইরের অবস্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্য ঘটে, সে জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্যকে পায় না, তখন তার জীবনবীণা ঠিক সুরে বাজে না। এই-যে দুঃখের বাধা মানুষের পথরোধ করে, এরই ভিতর থেকে তাকে পথ কেটে বার হতে হবে। সে শক্তি খাটিয়ে মহত্ত্বকে বাধামুক্ত করে প্রকাশ করবে, সকল আন্তরিক দৈন্য অপসারিত করে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবে—এই তার সাধনা। তার এই গোড়াকার দৈন্যই যদি চরম হত তবে সে এক রকম করে বোঝাপড়া করে নিতে পারত, কিন্তু তার অন্তরে ধর্মবুদ্ধি বা আর-কোনো অনুভূতির চেতনা আছে যা তাকে ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে সম্মুখ-পানে চালিত করছে।

২৯ যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা

এই কবিতা আগে কবিতার আনুষঙ্গিক। এমন যেন কেউ মনে না করেন যে, এতে আমি সৃষ্টির আরম্ভের কোনো বিশেষ সময়কার কথা বলেছি। এতে কোনো সৃষ্টিতত্ত্ব নেই। এখানে 'আমি' মানে ব্যক্তিবিশেষ নয়, 'আমি' মানে হচ্ছে—যে আমি ব্যক্তজগতের প্রতিনিধি-স্বরূপ। বিশেষ সময়ে আমি সৃষ্ট হই নি। এমন কোনো এক সময় ছিল যখন আবীঃ যিনি তাঁর প্রকাশ ছিল না—তা বিশ্বাস করা যায় না।

প্রথম স্তবক॥ তুমি যে কোনো সময়ে অব্যক্ত ছিলে তা নয়, কিন্তু যদি কল্পনা করা যায় যে আমি কোথাও নেই, তবে সেই অবস্থায় কিরকম হবে এখানে তাই আমি বলেছি। আমি যখন নেই তখন তুমি আপনাকে দেখতে পাও নি, সে অবস্থায় কারো জন্যে তোমার জন্যে তোমার পথ-চাওয়া ছিল না। এই-যে সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে আজ ধীরে ধীরে আমার বিকাশ হচ্ছে, এই-যে আমার এই চলার জন্য তোমার অপেক্ষা আছে, এই-যে তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকো তখন এ-সব কিছুই ছিল না। যখন আমার অস্তিত্ব ছিল না ব'লে আমি কল্পনা করছি তখন এই-যে দু পায়ের আকাঙ্ক্ষার আবেগের হাওয়া আজ বইছে সেদিন তা ছিল না। আজ আমাক থেকে তোমার কাছে আর তোমার থেকে আমার কাছে কিছু-কিছু aspiration, আকাঙ্ক্ষা, আসছে যাচ্ছে—আমাদের উভয়ের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার আসা-

যাওয়ার হাওয়া বইছে। কিন্তু সেদিন তা ছিল না, এ পারের সঙ্গে ও পারের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

দ্বিতীয় স্তবক॥ আমার মধ্যেই তোমার সুপ্তির থেকে জাগরণ হল। আমার মধ্যেই বিশ্বের প্রকাশ হল, বিশ্ব যেন ঘুম থেকে উঠল। আলোর যে ফুল ফুটল তা আমার জন্যই বিকশিত হল, নইলে তার দরকার ছিল না। আমাকে তুমি এখানে নিয়ে এসে কত রূপে যে ফোটাচ্ছ তার ঠিক নেই। তুমি কত রূপের দোলায় আমাকে দোলালে—'আমাকে', অর্থাৎ আমায় নিয়ে যে বিশ্ব, যে দৃশ্য, সেই সকলকে।

তুমি যেন আমাকে বিক্ষিপ্ত করে দিলে, আমাকে এমনি করে ছড়িয়ে দিলে বলেই তোমার কোল ভরে উঠল। তুমি আমাকে ফিরে ফিরে নব নব রূপান্তরে নূতন করে করে পাচ্ছ।

তৃতীয় স্তবক॥ আমাকে এই নানা ভাবে পাওয়াতেই তোমার আনন্দ। আমি এলাম অমনি সব শব্দিত হয়ে উঠল; নইলে, তার আগে সব স্তব্ধ ছিল। আমার মধ্যেই তোমার দুঃখ, আমি এসেছি বলেই তোমাকে দুঃখ দিলাম। আমি এলাম ব'লে যে আনন্দের উদ্‌বোধন হল তার মধ্যে তেজ থাকত না যদি দুঃখ তাকে না জ্বালাত; আমার দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই আনন্দশিখা জ্বলে উঠছে। জীবন-মরণের এই-যে আন্দোলন এ আমায় নিয়েই হয়েছে। আমি এলাম বলেই তুমি এলে। আমার স্পর্শে তুমি আপনাকে স্পর্শ করলে। আমায় পেয়ে তোমার বক্ষ ভরে উঠল।

চতুর্থ স্তবক॥ আমার কত অভাব ত্রুটি অসম্পূর্ণতা আছে; তাই আমার চোখে লজ্জা, মুখে আবরণ—আমি সেই আবরণের ভিতর দিয়ে তোমায় দেখতে পাই না। তাই আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে; পদে পদে বাধা আছে ব'লে জীবনে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হল না। কিন্তু আমি জানি যে, আমি এমনি ভাবে আচ্ছন্ন আছি বলে তুমি অপেক্ষা করে আছ—কবে এই আবরণ উদ্‌ঘাটিত হবে। এই আবরণ একদিন খসে পড়ে যাবে না তা নয়—কারণ, তোমরা আমাকে দেখবার জন্য কৌতুকের অন্ত নেই, তুমি ক্রমশ আমার মধ্যে তোমার দৃষ্টি পেতে চাও। আমাকে দেখবে বলেই তুমি এত আলো জ্বালিয়েছ, তুমি আমার আত্মার সঙ্গে পরিচিত হবে বলেই তোমার এই সূর্যতারার আলো জ্বলছে।

আলোচনা॥ ১॥ 'আমি এলেম, এল তোমার দুঃখ'—বিশ্বের দুঃখ তো আমার সীমার মধ্যেই আছে। তোমার প্রকাশে যদি দুঃখ এসে থাকে তবে সে তো আমিই বয়ে এনেছি। তোমার আপনার মধ্যে দুঃখ নেই, আমিই তাকে এনেছি। কিন্তু তাতেই তো সব শেষ হয়ে যায় নি, আমার এই দুঃখের ভিতর দিয়েই তোমার আনন্দের উপলব্ধি হচ্ছে। অদ্বৈতের মধ্যে যেটা দ্বৈত সেটাই বড়ো কথা। শুধু monism তো nagative। সীমা সম্পর্কিত দুঃখের বিচিত্র লীলার ভিতরে যে আনন্দ সেটাই সত্যিকারের জিনিস।

এই কবিতায় 'আমি' মানে হচ্ছে সৃষ্ট জগৎ।

২॥ আমার দেহ হচ্ছে অসীমের প্রতিরূপ। সূর্যের আলো, প্রাণ, বাতাস, জল, আমার দেহ—এরা সব আকস্মিক জিনিস নয়, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই অসীমের background আছে। আমার যদি একটা isolated fact হয় তবে আমি কিছুই জানতে পারব না। কিন্তু আসলে আমার মনের একটা বাস্তবতার background আছে বলেই আমি বুদ্ধির ও চৈতন্যের জগৎকে পাচ্ছি।

বিজ্ঞান এ পর্যন্ত বলে এসেছে যে প্রাণ ও অপ্রাণের মধ্যে ছেদ আছে। প্রাণবান জিনিস প্রাণেই নিঃসৃত হচ্ছে, কম্পিত হচ্ছে। বিজ্ঞান একে radioactivity'র গতিশীলতা বলেছে। কিন্তু জগতের প্রাণের এই গতিবেগ অসীমেরই গতিশীলতার একটা প্রকাশ। বিজ্ঞানবাদ

অনুসারে অণু-পরমাণু কিছুই স্তব্ধ হয়ে নেই, তারা নিজের বেগে চলেছে—nucleus এর চারি দিকে electron গুলি সৌরজগতে আবর্তনের মতো ঘুরছে, কিন্তু এদেরও অসীমের beckground আছে। আমরা কি বলতে চাই যে, এই-যে আমরা আপনাকে জানছি, আমাদের মনের সঙ্গে বিশ্বনিয়মের চিরন্তন যোগ রয়েছে, এটা কেবল আকস্মিক যোগ? আর, দেহমনের উপর যে personality আছে তার কি infinite background নেই? এ হতেই পারে না। 'অন্নং ব্রহ্ম'—আধিভৌতিক জগতেও অসীম আছেন, তার আনন্দের মধ্যেই তাঁর personality'র বিকাশ। অন্ন এক অর্থে impersonal। আপনাতে আপনার উপলব্ধি ও ঐক্যবোধের মধ্যে বলা যায়। আমার personality তখনই দুঃখ পায় যখন বাইরে কিম্বা আন্তরে এই ঐক্যের বিচ্যুতি ঘটে।

শৈশব থেকে এপর্যন্ত যে-একটা ঐক্যধারার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি, যার মধ্যে আমার আনন্দ আছে, সেই ঐক্যের ভাবটিকেই আমি personality বলেছি। অসীমের personality ও আমার ঐক্যবোধের মধ্যে harmony আছে। যখন অসীমস্বরূপ দ্বৈতের মধ্যে ঐক্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন তখনই তার মধ্যে আনন্দ ও প্রেম জাগে। বন্ধুদের আত্মার প্রেমের মধ্যে এক জায়গায় বিচ্ছেদ আছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা ঐক্যসূত্র আছে। বিশ্বের মূলেও এই ব্যাপারটি আছে। আমি আর-এক 'আমি'র প্রতিরূপ। আমার অন্তরের উপলব্ধিতে জীবলোকে নাট্যলীলা (drama of existence) আছে। আমার থাকার মধ্যে বিশ্বের মূলের এই থাকা আছে। আমি মানে একমাত্র 'আমি' নয়; আমার ভোগ করা, দেখা, জানার উপর যে আমিত্ব আছে, তাই। আমি এসেছি বলেই দুঃখ আছে, আনন্দ আছে। আমি এসেছি বলেই এ পার থেকে ও পারের চিরন্তন যোগাযোগ চলছে।

৩০ এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো

প্রথম স্তবক॥ যে দেহভেলা অবলম্বন করে এতদিন জীবনস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিলুম, সেই ভেলাকে এবার ভাসিয়ে দাও। তাকে ফেলে দাও সে চলে যাক, তার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগ নেই—এবার তার কাজ ফুরালো। অমুক ঘাটে পৌঁছব কি না, আমার কী হবে, আলো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কোন্ পথ বেয়ে যাব—এ-সব প্রশ্ন নাই করলুম। এর উত্তব নাই বা জানলুম।

দ্বিতীয় স্তবক॥ না-জানার দিকে যাত্রা করাই তো আমার আনন্দ। অজানাই আমাকে এখানে এনেছিলেন, তিনিই আমাকে আমার এই জন্মগ্রহণের দ্বারা জানাশোনার বন্ধনে বেঁধে দিলেন, আবার তিনিই তো সব গ্রন্থি খুলে সব চুকিয়ে দেবেন। আবার ঠিক সব খাপ খেয়ে যাবে, কোনোখানে অসামঞ্জস্য থাকবে না। জানা এসে বসে বসে সব বাঁধে, তাই আমরা এখানে এসে সব ঘরকন্না গুছিয়ে নিই, নানা পরিচয়ের মধ্যে খুব কষে সব জেনে নিই—'এ আমার অমুক, সে আমার অমুক।' এই-সব জানাজানির ভিতরে বন্দী হই, এমন সময়ে হঠাৎ অজানা খামকা এসে ধাঁদা লাগিয়ে দিয়ে জানার বাঁধন সব ছিঁড়ে দেয়।

তৃতীয় স্তবক॥ এই ভেলার যে হালের মাঝি সে তো অজানা। সেই অপরিচিতই আমার কর্ণধার। সে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অজানাই আমার জানার বন্ধন কেবলই ছিন্ন করে করে আমাকে মুক্তি দেয়। সে থেকে থেকে বার বার মুক্তি দিতে দিতে আমাকে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। তাই তো আমার সামনের দিকে যে অজানা আছে তাকে আমি ভয় করতে চাই নে। আমি জানি সেই আমার হালের মাঝি, সে আমার এই জীবনেও আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মৃত্যু হঠাৎ এসে আমাকে চমক লাগিয়ে দেয়।

আকস্মিক ঘটনা আমাকে ত্রস্ত করে। এমনি করে নির্দয় যিনি তিনি আমাকে ভালোবাসেন ব'লে অপূর্বের অপরিচিতের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার ভয় ভাঙিয়ে দেন।

চতুর্থ স্তবক॥ তুমি ভাবছ যে, যে দিন চলে গেছে তাকেই ভালো জানি, অতএব তারই পুনরাবৃত্তি হোক—তাকেই বারে বারে ফিরে পাই। কিন্তু তুমি যে কূল ছেড়েছ সে কূলে আর কিছুতেই ফিরে যাবে না। তোমার কি পিছনের 'পরেই একমাত্র নির্ভর? ঐ পিছনই কেবল বিশ্বাসযোগ্য? যা অতীত তাই কেবল তোমার প্রধান সম্পদ এমনি কি তুমি ভাগ্যহারা? কেন তুমি বলতে পারলে না সামনের 'পরে তোমার বিশ্বাস আছে, সেখানে তোমার ভয় নেই? পিছন তোমাকে কিছুতে বেঁধে রাখবে না এতেই তোমার আনন্দ হোক।

পঞ্চম স্তবক॥ ঘণ্টা বেজেছে, সভা যে ভেঙে গেল, নৌকা ছাড়তে হবে—জোয়ার উঠছে। তিনিই অজানা যাঁর সঙ্গে দেখা হবে ব'লে মনে করি কিন্তু যাঁর মুখ দেখা আমার হয় না। তাঁকে জানি না ব'লে একটু ভয় হয় বৈকি, একটু বুক দুলে ওঠে, মনে হয় কী জানি কেমন করে অজানা আমার কাছে দেখা দেবে। এই শ্যামল পৃথিবী তার সূর্যালোক নিয়ে এবারকার মতো দেখা দিল, আবার অজানা কেমন করে দেখা দেবে কে বলতে পারে? এই পৃথিবীতে জন্মমুহূর্ত থেকে সূর্যলোকে লোকালয়ের নানা দৃশ্য নানা ঘটনা নানা অবস্থার মধ্যে অজানাকে ক্রমশই জানার ভিতর দিয়ে স্পর্শ করতে করতে চলেছি। অজানাকে কেবলই জানা, না-পাওয়াকে কেবলই পেতে থাকাকেই তো জীবন বলে। এই জীবনকে তো ভালোবেসেছি, অর্থাৎ সেই অজানাকে লেগেছে ভালো। সমুদ্রের এ পারে তাকে ভালো লেগেছিল, সমুদ্রের ও পারেও তাকে ভালো লাগবে।

৩১ নিত্য তোমার পায়ের কাছে

তোমার নিজের বিশ্বে তোমার পুরো অধিকার আছে, কারণ সে যে তোমারই জিনিস। তাতে তো তোমার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তুমি এমনি পূর্ণ হয়ে আছ ব'লে তোমার তাতে কোনো আনন্দের উপলব্ধি হয় না। এই বিশ্ব তোমার এত আপনার বস্তু, সব জিনিসেই তুমি এমন সম্পূর্ণ অধিকারী যে, তার থেকে চাইবার আর পাবার তোমার কিছুই বাকি নেই। তাই এই পূর্ণতাই তোমার আনন্দের ব্যাঘাত করছে। যেটা না চেয়ে লাভ করা, যেটা পেয়েছি, রয়েছে, তাতে কোনো আনন্দ নেই।

সেজন্য তুমি বিশ্বপতি হয়ে কী করলে? তুমি তোমার সব ধন আমার ভিতর দিয়ে নেবার দরকার বোধ করছ, নয়তো নিজের ধন ভোগ করে আনন্দ পাচ্ছ না। তোমার বিশ্বকে তুমি আমার ভিতর দিয়ে নিয়ে আবার ফিরে পাচ্ছ, যেন হারানো ধনকে নূতন করে পেয়ে গেলে। তুমি আমাকে যে অধিকার দান করেছ তাকে আবার আমার মধ্যে দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আনন্দিত হচ্ছ।

যে ঐশ্বর্য চিরকাল ভাণ্ডার পূর্ণ করে রয়েছে তা তোমার পক্ষে অতীত, কিন্তু তুমি তাকে নিয়ত বর্তমান করছ আর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছ। সেই সম্পদ্‌কে যখন তুমি আমার করে দিচ্ছ তখনই তাকে নিয়ত নানা ভাবে পাচ্ছ।

তোমার যে সূর্য সকালে উঠছে আর প্রতিদিন বিশ্বের যে শান্তি ও সৌন্দর্যের ছবি ফুটে উঠছে, তাদের তুমি আমার দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নূতন করে কিনে নিচ্ছ। তুমি আমার সেই নূতন করে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে তোমার চিরকালের সূর্যকে নব নব রূপ পাচ্ছ।

তোমার প্রেমের যে স্পর্শমণি তা দিয়ে যাকে তুমি ছোঁবে সে স্বর্ণময় হয়ে উঠবে।

তার স্পর্শে তুমি আমার প্রাণকে নূতন নূতন আনন্দের দ্বারা পূর্ণ করে হিরণ্ময় করে তুলছ, আর আনন্দিত হচ্ছ; কারণ, আমায় দিয়ে তুমি নিজের স্পর্শমণির পরিচয় পাচ্ছ, আমি না থাকলে তুমি সেই পরিচয় পেতে না। তুমি আমার দ্বারা বিশ্বকে নূতন্ নূতন ক'রে গ্রহণ করছ। তোমার স্পর্শমণি সকলকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে স্বর্ণময় করে দিচ্ছে। তাতে করে তুমি বুঝছ যে তোমার মধ্যে প্রেমের স্পর্শমণি আছে, তোমার মধ্যে শান্ত সুন্দর মঙ্গলরূপ আছে।

অলোচনা ॥ ১ ॥ তুমি যখন পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে আছ তখন তোমাকে কিছু পেতে চাইতে হয় না, কারণ তখন তুমি আপনাতেই সার্থকতা লাভ করে বসে আছে। তাই তুমি তোমার সম্পদ্‌কে ক্ষণে ক্ষণে না-পাওয়ার ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করো, তাকে অভাব ও বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই পূর্ণভাবে জানতে পারো।

আমি যখন গান রচনা করি তখন তার মধ্যে সার্থকতার বোধ কোথায়? আমার অন্তরে যে অনুভূতি আছে তাকে খণ্ডিত করে বিশিষ্ট রূপের মধ্যে প্রকাশ করে তাকে যখন আমি চিত্তক্ষেত্র থেকে হারিয়ে ফেলি, তখন আবার তা গানরূপে আমার কানে এসে পৌঁছয়— এই ফিরে পাওয়ার দ্বারা আমি আমার অনুভূতিকে পূর্ণভাবে লাভ করি। মনের ভাবরাশিকে যখন অস্পষ্টতার থেকে আকার দান করবার প্রয়াস করি তখন তার মধ্যে অনেক দুঃখতাপ আছে। কিন্তু এই-যে travail, এই-যে বেদনার প্রক্রিয়া, এর ভিতর দিয়েই আবার ভাবগুলিকে সাহিত্যসৃষ্টিরূপে ফিরে পাই।

আমি যখন কবিতা লিখি তখন আর-একজন পড়ে বলে 'বাঃ বেশ হয়েছে', তখন আমার নিজের জিনিসকে হারিয়ে যেন অন্যের ভিতর দিয়ে তাকে ফিরে পেলাম। আমার জিনিস তো আমারই থাকতে পারত, তবে কেন আমি এ অভাব বোধ করি? কেন আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে একে অন্যের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে ধরব যাতে অন্যে খুশি হয়? তার কারণ হচ্ছে, অন্যের অনুভূতির ভিতর দিয়ে আমি আমাকে উপলব্ধি করবার আনন্দে আবার সেই কবিতাকে ফিরে পাচ্ছি। আমার অন্তরে যে সম্পদ আছে তাকে এমনি করে বিচিত্র ভোগের মধ্য দিয়ে, সকলের সমাদরের মধ্য দিয়ে ফিরে পাই। বিশ্ববিধাতা তাঁর সম্পদ্‌কে সকল মানুষের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নূতন নূতন করে উপলব্ধি করেন। তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্যকে মানুষের আনন্দসম্ভোগের দ্বারা যখন জানতে পারেন তখনই তাঁর যথার্থ আনন্দ হয়।

২॥ নির্জন কারাবাসে থেকেও মানুষ কাব্য রচনা কেন করে? সকল শিল্পীরই এ কথা মনে জাগ্রত থাকে যে, যখন তাদের সৃষ্টি প্রকাশের জগতে যাবে তখন অন্যে তা উপভোগ করবে, অনেক শ্রোতার কানে তার বাণী পৌঁছবে এবং দৃষ্টিতে সেই রচনা প্রতিফলিত হবে। কবি প্রথমে নিজে তার কবিতার শ্রোতা, কিন্তু তার আশা আছে যে পরে সে একমাত্র শ্রোতা থাকবে না—সেই কথা ভেবেই সে কাব্য রচনা করে। তাই যখন লোকে কবিতা লিখে ছিঁড়ে ফেলে তখন বুঝতে হবে যে, তার রচনায় আনন্দ ছিল না, তৃপ্তিলাভ হয় নি—বুঝতে হবে যে, তাতে পূর্ণ সন্তোষ পাওয়া যায় নি, বাসনা অতৃপ্ত থেকে গেছে। ভগবান তাঁর অন্তরের পূর্ণতাকে সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করে ফিরে পাচ্ছেন। তিনি অসংখ্য চিত্তের বহু বিচিত্র আনন্দানুভূতির ভিতর দিয়ে পূর্ণতার আনন্দকে বিশেষ করে লাভ করেন। মানুষ জানে যে, বিশ্বব্যাপারগুলি কেবল ঘটনার সমষ্টি নয়, তার মধ্যে আনন্দস্বরূপের প্রকাশ আছে। রসো বৈ সঃ : সকল জীব সেই আনন্দের পূর্ণতা উপভোগ করে ধন্য হচ্ছে। এবং তারা বুঝছে যে, ক্ষুদ্র স্বার্থের ভোগের মধ্যে সেই পূর্ণতার বিকাশ নেই।

৩২ আজ এই দিনের শেষে

আজ এই দিনের শেষে এই-যে সন্ধ্যা আপন কালো কেশে সূর্যাস্তের মানিক পরেছিল তাকে আমি গেঁথে নিয়েছি। তাকে বিনা সুতায় এই কবিতায় গেঁথে নিয়ে গলার হার করে নিলুম। এইমাত্র এই ক্ষণে ঐ ঘুমিয়ে-পড়া চক্রবাকের নিদ্রার দ্বারা নীরব নির্জনপদ্মার তীরে সন্ধ্যা যেন তার নির্মাল্য নিয়ে—পূজায় নিবেদিত সোনার ফুলের মালা নিয়ে—সমস্ত আকাশ পার হয়ে আমার মাথায় ছুঁইয়ে দেবে ব'লে এসেছিল। প্রকৃতি সন্ধ্যাকুসুমের এই মালা পূজার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করেছিল। সেই মালা সে আমার মাথায় ঠেকিয়ে গেল, আমি তা অন্তরে অনুভব করলুম। ঐ-যে সন্ধ্যা আস্তে আস্তে অন্ধকার আকাশে নীহারিকাকে স্রোতে ভাসিয়ে দিল, ঐ-যে আকাশে ছায়াপথে তারার দল ক্রমে ক্রমে সরে যাচ্ছে, তা চোখের সামনে পদ্মার তরঙ্গহীন স্রোতের প্রতিবিম্বের মধ্যে দেখছি—যেন সন্ধ্যা সেই তারার দলকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঐ-যে সন্ধ্যা সোনার চেলি রাত্রির আঙিনায় অন্ধকারে বিছিয়ে দিয়েছে, সে যেন নিদ্রায় অলস দেহ নিয়ে সেই চেলি মেলে দিয়েছে। আর ঐ-যে রাত্রির কালো ঘোড়ার রথে চড়ে সন্ধ্যা সপ্তর্ষির ছায়াপথে আগুনের ধুলো উড়িয়ে দিয়ে বিদায় নিল—এই তো সব চোখ মেলে দেখলুম। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই সন্ধ্যা এসেছিল, এত বড়ো কাণ্ড, এত ঘটা কেবল একজন কবির জন্যই হল। তার কাছে এসে সন্ধ্যা তার করুণ স্পর্শ রেখে গেল। অনন্তকালের মধ্যে এমন অনুপম সন্ধ্যা একজন কবির কাছে দেখা দিল, এত আয়োজন এই আশ্চর্য ব্যাপার তাকে স্পর্শ করে চলে গেল। এমনি করে তুমি এক নিমেষের পত্রপুটে অনন্তকালের ধনকে ভরে দাও, এমন যে অমৃত তা ক্ষণকালের ভিতরে সার্থক করে তোলে—এই তো তোমার লীলা।

৩৩ জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও

এই-যে আমি চলেছি, জীবনের পথে নানা অভিজ্ঞতার ভিতরে আমার যে বিকাশ হচ্ছে, বিশ্বে এটা একটা সার্থক ব্যাপার। আমি আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চৈতন্য বিশ্বকে বহন করে নিচ্ছি। আমি চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত করে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হব, এর জন্য বিশ্বে অপেক্ষা আছে। বিশ্ব আমার ক্রমিক বিকাশের দিকে চেয়ে আছে। আমার চিত্ত যতটুকু পরিণামে গিয়ে ঠেকছে তারই জন্য বিশ্ব প্রতীক্ষা করে আছে।

আমার মধ্যে যে শক্তি আকাঙক্ষা আমাকে চালাচ্ছে তা বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বিশ্বের মধ্যেও এই অগ্রসর হবার পরিব্যপ্তি হবার আকাঙক্ষা আছে—তা কেবল আমারই একলার সামগ্রী নয়। তাই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে বিশ্বে আনন্দ আছে। যদি আমার চলা বিচ্ছিন্ন সত্য হত তবে বিশ্বে এমন গতিবেগ থাকত না, বিশ্ব মুষড়ে যেত। কিন্তু আসলে একটি বৃহৎ ক্ষেত্রে আমার আকাঙ্ক্ষার স্থান আছে। এই অনুভব করে এই কবিতা লেখা।

প্রথম স্তবক॥ আমার মধ্যে কি একান্ত নিঃসঙ্গতা আছে? চিত্ত ছাড়া বাইরে কি আমার কোনো সার্থকতা নেই? হাঁ, আছে। আমার দোসর আছেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমার আকাঙ্ক্ষার সুর মিলছে। অসীমের পথে আমার চলার শব্দ তাঁর কানে গিয়ে ঠেকছে। এই বিশ্বের যে রূপরসগন্ধ আমার চিত্তে আঘাত করছে তাদের অন্তর্নিহিত আনন্দ আমাকে নিয়েই পূর্ণতা লাভ করছে। আমার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই আনন্দের বিকাশ হচ্ছে। যখন আমার

চিত্ত সংকুচিত হয় না, আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করে, তখনই এই সূর্য চন্দ্র তারা পূর্ণ আলো দেয়—সেই শুভক্ষণে বিশ্বের সৌন্দর্য সুন্দরতম হয়ে প্রকাশিত হয়। আমি পায়ে পায়ে এগোচ্ছি আর বিশ্বজগৎ প্রতি পদক্ষেপে পুলকিত হয়ে উঠছে। আমি যে চলেছি এর শব্দ কেউ শুনছে বা শুনছে না তা আমি জানি না, কিন্তু আমার চলার ধ্বনি এক জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে। আমি জানি যে, আমার এই-যে আলো অন্ধকার সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে যাত্রা, এর পদশব্দ একজন শুনতে পাচ্ছেন।

দ্বিতীয় স্তবক॥ এই-যে জন্ম থেকে জন্মে নব নব জীবনের মধ্য দিয়ে আমার পদ্মটির এক-একটি দল উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, এ তো তোমারই চিত্তসরোবরের মধ্যে। তোমার মানসসরোবরে আমি পদ্মটির মতো বিকশিত হয়ে উঠছি, নব নব জীবনে তার দলগুলি খুলে যাচ্ছে। এই ব্যাপাব দেখবার জন্য সকল গ্রহতারা চারি দিকে ভিড় করে রয়েছে, এদের কৌতূহলের অন্ত নেই। তারা সব আমারই জন্য আলো দান ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

তোমার যে জগৎকে সৃষ্টি করেছ তা যেন অন্ধকারের বৃন্তের উপর তোমার আলোর মঞ্জরী, যেন তা'তে একসঙ্গে অনেক ফুল ধরে রয়েছে। সেই মঞ্জরী তোমার দক্ষিণ হস্ত পূর্ণ করে রয়েছে। কিন্তু তোমার স্বর্গ তো অমন করে চোখের সামনে প্রকাশিত হয় না; সে লাজুক, সে আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে। তারার বিচিত্র প্রকাশের মতো একটি গুচ্ছে সে ফুটে উঠে নি; সে যেন পাতার অন্তরালে লুকিয়ে রাখা ফুলের মতো। কিন্তু তোমার এই গোপন স্বর্গটি যেখানে, সেখানেই তোমার সঙ্গে আমার পূর্ণ মিলন। তোমার লাজুক স্বর্গ প্রেমের নব নব বিকাশের ভিতরে একটি একটি দল মেলে দিচ্ছে—মঞ্জরীর মতো তার একেবারে পূর্ণ বিকাশ হয় না। আমার অন্তরের ভিতরে তোমার সেই স্বর্গ আমার প্রেমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার পাপড়িগুলি খুলে দিচ্ছে। সেই গোপন উদ্‌ঘাটনের দিকে তোমার দৃষ্টি, তাতেই তোমার আনন্দ।

৩৪ আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে

প্রথম স্তবক॥ আমি আজ আমার মনের জানালার দিকে আপনাকে স্থাপন করলুম। তোমার চিত্ত যেখানে কাজ করছে সেখানে দৃষ্টি প্রসারিত করবার জন্য যেন তাকে খুললুম। আমি নিজে কী ভাবছি, আমার নিজের কী সুখদুঃখ আছে, আজ আমি তার দিকে তাকালুম না এবং তখন অনুভব করতে পারলুম যে বিশ্বে তুমি আপন-মনে কাজ করছ।

বিশ্বের মাঝখানে তোমার মন যেখানে কাজ করছে সেখানে আমি আমার মনের জানালা খুলে দিচ্ছি। বিশ্বের মাঝে তোমার নিজের কর্মচেষ্টাকে আমি যেন আজ অনুভব করছি। তুমি যেন বিশ্বে অব্যবহিত ভাবে কাজ করছ, তোমার মন তাতে ব্যাপৃত আছে।

আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে কী দেখলুম? আমি আজ আমার হৃদয়ের ডাককে বাইরে দেখলুম। আমি যখন অন্তরে নিবিষ্ট হয়ে থাকি তখন অনুভব করতে পারি যে, তুমি আমায় ডাকছ। তখন আমার মধ্যে তোমার যে ডাক রয়েছে তা এসে পৌঁছায়, তোমার আমার মধ্যে যোগাযোগকে জানতে পারি। কিন্তু আজ আমি দেখলুম ফুলের মধ্যে, পাতার মধ্যে, তোমার ডাক রয়েছে। মনের জানালা খুলে দেখি যে, তোমার ঐ অন্তরের বাণী চৈত্র মাসের সমস্ত পত্রপুষ্পের মধ্যে বাইরে ছড়িয়ে আছে : তাই আমার আজ কর্ম নেই, আজ আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। অন্তরের ধ্যানের দ্বারা বাইরের দরজা বন্ধ করে যে ডাক মনের মধ্যে শুনতে চেষ্টা করি সেই আহ্বানবাণী যেন পাতায়-পাতায় ফুলে-ফুলে চারি দিকে দেখলুম; আজ তাই কেবল চেয়ে আছি—আমার সব কর্ম ঘুচে গেছে।

দ্বিতীয় স্তবক॥ আমি আমার নিজের সুরে যে গান গাই তা আবরণের মতো। কারণ,

আমি গাইবার সময়ে তোমার বিশ্বরাগিণীকে আচ্ছন্ন করে ফেলি। আজ আমার নিজের সুরের সেই পর্দা তোমার গানের দিকে উঠে গেল, তোমার সংগীত আমার কাছে প্রকাশিত হল। আমার নিজের গান বন্ধ হয়েছে—আমি অনুভব করছি যে, আজ সকালের আলোই আমার নিজের গানের মতো। আজ আমার গানের দরকার নেই। কারণ, প্রভাত-আকাশ আমারই গান প্রকাশ করছে, কিন্তু সে গানের সুরটা তোমার। তাই আমার নিজের সুরের প্রয়োজন রইল না। আমারই সংগীত সকালের আলো আর আকাশকে পূর্ণ করে প্রকাশ পাচ্ছে।

আজ আমার মনে হল আমারই প্রাণ তোমার বিশ্বে তান তুলেছে। তোমার বিশ্বে ফুলের সৌন্দর্য আর আকাশের গান—এদের কোনো মানে থাকে না, যদি না আমার মন তাতে সাড়া দেয়। আমার মনের আনন্দের সঙ্গে তাদের যোগ আছে। বিশ্বের যা-কিছু মধুর ও সুন্দর তা আমারই চিত্তে ধ্বনিত হচ্ছে বলেই তা মধুর ও সুন্দর। যে জগৎ আমার চেতনার মধ্যে সাড়া না পায় তা বোবা জগৎ। তাই আমার গানের সুরগুলিকে আজ তোমার জগৎ থেকে ফিরে শিখে নিতে হবে। আমার মন বিশ্বের শ্যামলতায় ও নীলিমায় যে আনন্দ পাচ্ছে তাই তো তোমার গান—সেই গান তো আমায় শিখে নিতে হচ্ছে। আমি আমার নিজের সুর ভুলে গিয়ে নিজের গানকে তোমার সুরে ধ্বনিত দেখছি, আর সে সুর তোমার কাছে শিখে নিচ্ছি।

বিশ্বে যা রমণীয়, যা মধুর দেখছি—যার থেকে রস উপভোগ করছি—তারা চিত্তের বাইরে কোনো বিচ্ছিন্ন সুন্দর বস্তু নয়। আমার মনের মধ্যে যে আনন্দময় স্বাভাবিক শক্তি আছে তাই এ-সবকে সুন্দর করছে। বিশ্বের গাছপালা দেখে যে ভালো লাগছে সেই ভালো লাগাটাই হচ্ছে তার সৌন্দর্য।

ফুলের মধ্যে আমারই গান আছে, কিন্তু সে গান কার সুরে বাজছে? তা তো আমার নিজের সুরের 'সা রে গা মা' নয়—তা যে স্বতন্ত্র একটি সুরে পূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের সৌন্দর্যে আমার যে আনন্দসম্ভোগ আমি তার মধ্যে আমার মনের গান পাচ্ছি, সে গান আমার নিজের বাঁধা 'সা রে গা মা' সুর নয়—তা তোমার নিজেরই সুর। তাকে আমি শিখে নিচ্ছি। আমি আনন্দিত না হলে আমার নিজের গান হতে পারত না।

আমি যখন নিষ্ক্রিয় থাকি তখনই বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার সুর শুনি, ফুলে পাতায় আমার নামে তোমার ডাককে দেখতে পাই। আর তাই গাইতে চেষ্টা করছি না, আমার খুশি মনকে বিশ্বে মেলে দিয়েছে। আজ ফুলগুলি যে সংগীতের মতো জেগে উঠেছে এতে আমার হাত আছে, আমার চিত্তই তাদের মাধুর্য দান করছে, অথচ সেই সুর আমার নিজের নয়—সে গান ফুলেরই সুরে রচিত। আমার হৃদয়কে মেলে দিয়ে আমার গানকে তোমার সুরে শুনতে পাবার সৌভাগ্য লাভ করছি।

৩৫ আজ প্রভাতের আকাশটি এই শিশির-ছলছল

এই কবিতা শ্রীনগরে থাকতে একটি বিশেষ অনুভূতি নিয়ে লেখা।[২]—

এই-যে সকালে আকাশটি শিশিরে ঝক্‌মক্ করছে, ঝাউগাছগুলি রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করছে—এবা বাইরের জিনিস হলে আজ কি অন্তরের এত কাছে আসতে পারত? এই ঝাউ আর

---

২ গীতরূপে প্রচলিত পূর্বতন পাঠে পার্থক্য কেবল প্রথম ছত্রে : তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ/রচনা ৭ কার্তিক ১৩২২ বা ২৪ অক্টোবর ১৯১৫। অনির্বচনীয় ভাবের আভাসে কবিচিত্তে ইহার প্রথম উদ্‌বোধের বিষয় জানি কিছুদিন পূর্বে (২৫ আশ্বিন ১৩২২) দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে লেখা যে চিঠিকে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে তাহার কিয়দংশ এস্থলে সংকলনযোগ্য :

আকাশ এমন নিবিড়ভাবে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করেছে যে আমি অনুভব করছি যে, এরা যেন মনের ব্যাপারেরই অংশ, যেন এরা বস্তুজগতের ব্যাপার নয়। কারণ, এরা যদি কেবল বস্তুপিণ্ড দিয়েই গড়া হত তবে এমন করে আমার মনের মধ্যে স্থান পেতে পারত না, বাইরেই থাকত—তাদের সঙ্গে আমার অসীম ব্যবধান থেকে যেত।

আজ ঝাউগাছের ঝালর আর শিশির-ছলছল আকাশ এমন নিবিড় ভাবে আমার মনকে পূর্ণ করেছে যে আমার মনে হচ্ছে যে, এরা আমার হৃদয়ে পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। বাইরের বিশ্ব যেন আমার মনেরই সামগ্রী, যেন অকূল মানসসরোবরে পদ্মের মতো ফুটে রয়েছে। আজ আমি এই ধুলোবালির মধ্যে বস্তুবিশ্বতেই কেবল স্থান পাই নি; আমি আজ জানতে পারলুম যে এই বিশ্বটি একটি বাণী আর তার মধ্যে আমি একটি বাণী—বিশ্বটি একটি গান, তার মধ্যে আমি একটি গান—এই বিশ্বের মহাপ্রাণের আমি একটি প্রকাশ, অন্ধকারের বুক-ফাটা তারার মতো। আজ যেন আমার অস্থিচর্ম নেই, আজ যেন আমি অন্ধকারের হৃদয় বিদীর্ণ করে উত্থিত অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল আলোক। আজ বিশ্ব আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

৩৬ সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা

এই কবিতা শ্রীনগরে থাকতে লিখি। তখন আমি সেখানে ঝিলম নদীতে বোটে থাকতুম। একদিন সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে ঝিলমের জলে অন্ধকার নেমে আসছে। আমি ছাদে বসে আছে। ও পারে অন্ধকার জমাট হয়ে আসছে, নদীর স্রোত কালো হয়ে গেছে, চারি দিকে কোনো শব্দ নেই। এমন সময় বুনো হাঁসের দল হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ...পদ্মাবক্ষে-বাস-কালে আকাশে হাঁসের পাখার ঝাপট অনেকবার অট্টহাস্যের মতো হাহা করে চমক লাগিয়ে দিয়েছে।

প্রথম স্তবক॥ আমি ঝিলমে যে জায়গাতে ছিলুম সেখানে স্রোত বেঁকে গেছে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত নদীটাকে একটা বাঁকা তলোয়ারের মতো দেখাচ্ছে। ঝিলমের জল ঝিল্‌মিল্ করছিল, তার উপর অন্ধকার নেমে এল। যখন অন্ধকার নদীকে আবৃত করল তখন মনে হল, কে যেন খাপের মধ্যে তলোয়ার পুরে দিল। যেমন ভাঁটার শেষে জোয়ার আসে তেমনি দিনের আলো নিবে গেলে রাত্রির জোয়ার কালির বন্যা নিয়ে এল। নদীর ধারের রাস্তার পরপারে, পাহাড়ের পায়ের কাছে, দেবদারু গাছগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে; সেই পাহাড়ের নীচেটা যেন আরো ঘন অন্ধকারে আবৃত বলে মনে হচ্ছে। মানুষ যেমন স্বপ্নের মধ্যে ভয়ে বা রাগে চেঁচিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বার করতে পারে না, তেমনি পাহাড়ের তলায় দেবদারুশ্রেণী যেন ঘনায়মান অস্পষ্ট আলোতে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াতে, মনে হচ্ছে, পাহাড় আপনাকে ব্যক্ত করবার প্রাণপণ

...the paradise is in sight. I feel I am coming nearer to myself.... It is becoming easier for me to feel that it is I who bloom in flowers, spread in the grass, flow in the water, scintillate in [the] stars, live in the lives of all men of all ages. When I sit in the morning, outside on the deck of my boat, before the majestic purple of the mountains crowned with the morning light, I know that I am Eternal, that I am *ananda-rupam*, my true form is not that of flesh and blood, but of joy.

—Rabindranath : Srinagar, 12. 10. 1915

ঈষৎ ভিন্ন পাঠ *Latters to a Friend* (1929) গ্রন্থে।

প্রয়াস করছে কিন্তু পারছে না। সেই আচ্ছন্ন অন্ধকার যেন পাহাড়ের গুম্‌রানো শব্দ, পুঞ্জীভূত ধ্বনি।

দ্বিতীয় স্তবক॥ নদীর জল অন্ধকারে ঢেকে গেছে, স্রোত দেখা যাচ্ছে না, এমন নীরব নিস্তব্ধ সময়ে শুনতে পেলুম ঠিক মাথার উপরে হংসশ্রেণী শব্দের বিদ্যুৎছটা বিকীর্ণ ক'রে হুহুহু—স্ শব্দের ঝলক দিয়ে কোন্ দূরদেশে চলে গেল। আমি কতবার এমনি পদ্মার বোট থেকে হুহুস্ শব্দ শুনে মনে করতুম যেন ভুতুড়ে কায়াহীন অট্টহাস্য শুনছি। হে হংসবলাকা, ঝঞ্ঝার মদ খেয়ে মাতাল তোমাদের পাখা যেন শব্দের ঝড় বইয়ে দিয়ে গেল। সুপ্ত আকাশ চমকে উঠল; ভাবল—হঠাৎ এ কী হল। একটা অট্টহাস্য দূর থেকে দুরান্তরে তরঙ্গ বিস্তার করে চলে গেল। ইন্দ্রলোক থেকে এসে যেমন অপ্সরা সন্ন্যাসীর তপোভঙ্গ করে দেয় তেমনি তোমরা ধ্যাননিরত স্তব্ধতার তপস্যাকে সহসা উড়িয়ে দিয়ে মনকে উতলা করে দিয়ে গেল। সেই তপোভঙ্গে তিমিরমগ্ন গিরিশ্রেণী শিউরে কেঁপে উঠল। দেবদারুবন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবতে লাগল—এ কী, এ হল কী!

তৃতীয় স্তবক॥ যে পর্বত-অরণ্য-ধরণী সন্ধ্যায় নীরব নিশ্চল হয়ে ছিল, মনে হল যেন তোমাদের এই পাখার বাণী এক পলকের মধ্যে তাদের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ সঞ্চারিত করে দিল। তারা তো চলে না, কিন্তু পাখার অট্টহাস্যের তরঙ্গঘাতে তাদের অন্তরে চলার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। ছুটে-চলা পাখার বাণী পর্বতের মনকে যেন উদ্‌বিগ্ন করে দিয়েছে, সে যেন মেঘের মতো উধাও হয়ে যেতে চাচ্ছে। মাটিতে শিকড়ের সঙ্গে তরুশ্রেণীর পা বাঁধা আছে, তাঁরা পাখির মতো মাটির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে পাখা মেলে দিয়ে ঐ শব্দ লক্ষ্য করে উড়ে যেতে চায়। তারা বলছে, 'আমরাও শব্দরেখার পিছন-পিছন নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যাই।'

এই বাণী যাযাবর (migratory) পাখিদের অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করবার বাণী। পরিচিত বাসায় তাদের চিরস্থিতি নয়। সমুদ্রপারে কোন্ অজ্ঞাত দেশে আর-এক বাসা আছে, বাসা-ছাড়া পাখির দল তার অনুসরণ করে চলেছে।

চতুর্থ স্তবক॥ হে বলাকা, তুমি মন থেকে স্তব্ধতার আবরণ উঠিয়ে দিয়ে গেলে। এই আবরণ মায়ার জালের মতো ছিল, তাই স্তব্ধতার ভিতরে যে গতি ছিল তা আগে দেখি নি। কিন্তু পাখার শব্দ বেগের আবেগ জাগালো তখন আমার কাছে কিছুই নিশ্চল রইল না, সব সচল হয়ে গেল। আমি শুনতে পাচ্ছি সর্বত্রই কার প্রসারিত পক্ষ আকাশবিস্তৃত হয়ে উড়ছে। তাই আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তৃণদল ডানা ঝাপটাচ্ছে, তারা মাটির আকাশে উড়ছে। মাটির নীচে বীজের বলাকা যেন প্রাণের চঞ্চলতায় অঙ্কুরের পাখা মেলেছে তারা উড়ছে। তৃণের দলও যেন বলাকা, তারা মাটির আকাশে ডানা মেলে মেলে চলেছে। আমার কাছে কিছুই অব্যক্ত রইল না। এই হিমালয় পৃথিবীর নীড় থেকে আপন অগ্নিপক্ষ বিস্তার করে আকাশে উড়ছে। এই পাহাড়ও চলবার পথে, একদিন ক্ষয় হতে হতে এই পাহাড় কোথায় যাবে তার ঠিকানা থাকবে না। এই বন মুক্ত পাখা মেলে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে, এক অজানা লোক থেকে অন্য অজানা লোকে ক্রমাগত চলেছে। প্রকৃতির সব বস্তু উড়ছে; তাদের পাখার স্পন্দনে অন্ধকার চমকে কেঁদে উঠেছে। শিশুর কান্নার মতো নক্ষত্রবিন্দুতে যেন আকাশের কান্না ছড়িয়ে গেছে।

পঞ্চম স্তবক॥ প্রকৃতিতে তো দেখলুম যে, পর্বত অরণ্য স্তব্ধ হয়ে নেই, তারা চলেছে। তেমনি মানুষের যত আকাঙ্ক্ষা কামনা ভাবনা তারাও লোকালয়ের তীরে তীরে এক শতাব্দী

থেকে অন্য শতাব্দীতে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে, দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কয়েকটি পূর্বপর্তী কবিতায়ও এই কথাটা ছিল। কোন্ অস্পষ্ট অতীতমানুষের চিত্তধারায় সেই ভাবনা কামনার জন্ম হয়েছে, কিন্তু তারা সেই আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভাবীকালের বাসা কোথায় জানি না কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে, মানুষের চেষ্টা-বাণী-ইচ্ছা-চিন্তা-কর্ম-স্রোত দলে দলে আকাশ পূর্ণ করে চলেছে। মানুষের এই-য়ে অপূর্ব অশ্রুত বাণী অতীত হতে যাত্রা করে চলেছে, আমি শুনলুম তারা যেন বলাকার পাখার শব্দে জাগ্রত হযে উঠেছে।

আমার অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করেও দেখলুম যে, আমার মনের বাসা-ছাড়া পাখি আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অবিশ্রাম চলেছে—যা-কিছু গতিশীল, যা-কিছু উড়ে চলেছে, তাদের সহযাত্রী হয়ে অসংখ্য পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে। এরা কোন্ দিকে চলেছে জানি না, কিন্তু আমি বসে বসে নিখিলের এই পাখার ঝাপট শুনছি। সমস্ত আকাশ পাখার এই বাণীতে ভরে গেছে—'এখানে নয়, এখানে নয়, এ বাসায় থেমে থাকবার নয়, আর-এক জায়গায় যেতে হবে।'

আমার বলাকা চারি দিকে নিখিলের এই বার্তা শুনতে পাচ্ছে।....

'বলাকা' বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন-যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না। কিন্তু বলাকার পাখা-যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল, সেইটাই এই আসল বলবার কথা এবং 'বলাকা' বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। 'বলাকা' নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল যখন নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তার ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে—এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধুতীরে আর-এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল—এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চলেছে : তাদের কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ তা জানি না। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে! কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি না, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী—'এখানে নয়, এখানে নয়।'[৩]

৩৮ সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী

আমার অন্তরে আমার প্রেমের নূতনত্বের অন্ত নেই। কিন্তু তাকে বাইরে দেখাই কেমন করে?

৩। পাণ্ডুলিপিতে বা অন্য কোথাও রচনার সুনির্দিষ্ট তারিখ লেখা নাই। কবির খসড়া খাতায় ইহার অব্যবহিত পূর্বের রচনা—'আজ/ আলোকের এই ঝরনা ধারায়' গানটি, রচনার স্থান-কাল : মার্তণ্ড/ কাশ্মীর। ৯ কার্তিক ১৩২২। আর, পরের রচনা অবশ্য 'ঝড়ের খেয়া' (দুর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন ইত্যাদি) —স্থান-কাল : কলিকাতা। ২৩ কার্তিক ১৩২২।/ রবীন্দ্রনাথ ২১ আশ্বিনে বা দু-একদিন আগে শ্রীনগরে অপনীত হন আর ১৯ কার্তিকের পূর্বে কলিকাতায় ফিরেন, এটুকু আনা যায় তাঁহার একাধিক চিঠিপত্রে। অতএব, ৯ কার্তিক (১৩২১) হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে যে-কোনো সময়ে বলাকার এই নাম-কবিতার রচনা, ইহা অনুমান করা চলে।

দেহ উৎসুক হয়ে বলছে যে, অন্তরের এই সংগীতকে, বেদনাকে, নবীনের উচ্ছ্বাসকে কোনো রকমে যদি প্রকাশ করতে পারি তবে আমার ব্যাকুলতার তৃপ্তি হয়। দেহ যেন তার নূতন বসনের মধ্য দিয়ে সেই বেদনাকে প্রত্যক্ষ করে দেখাতে চাচ্ছে। আমার অন্তরে যে গানের ব্যাকুলতা আছে তা বাঁধা-সুরকে ছাড়িয়ে নূতন নূতন তানের উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হয়। আমার দেহ আজকার এই নূতন কাপড়ে লীলায়িত গানের সেই তান লাগিয়ে দিল। আপনার প্রতিদিনের বাঁধা-গণ্ডিকে সে ছাড়িয়ে গেল।

আমার আপনাকে দেওয়া শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তবু আমার ইচ্ছা হয় প্রতিদিন আপনাকে নূতন করে নিবেদন করি। আমার মনের সেই বেদনাকে, সেই নূতনতার উৎকণ্ঠাকে ক্ষণে ক্ষণে কেমন করে বোঝানো যায়? তোমার কাছে ক্ষণে ক্ষণে আমার নূতন হতে ইচ্ছা হয়, তাই এই নূতন কাপড় প'রে আজ আপনাকে যেন এই প্রথম তোমার হাতে সমর্পণ করলুম।

চাঁদের যে আলো, তা যেন তার চোখের গান। চাঁদের রাতে যখন দুজনে কেবল মিলিত হব সে সময়ে আমাদের মধ্যে কোনো কথা হবে না—সে তো কথা কইবার সময় নয়। সেই স্তব্ধতাকে কোনো শব্দ তো বিক্ষিপ্ত করে না, অথচ সেই মধুর মুহূর্তের অন্তরের মধ্যে একটা গান আছে। সেই অব্যক্ত সংগীতের সুরটিই আমার কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে রঙের হিল্লোলে ব্যক্ত হবে।

প্রেমের নতূন নূতন রঙ ক্রমাগতই বিচ্ছুরিত হয়, তার যেন আশ মিটতে চায় না। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারই প্রেরণায় আমার কাপড়ে নূতন নূতন রঙ দেখা দেয়। আমার আজকার এই বসনের রঙ দেখা দেয়। আমার আজকার এই বসনের রঙ নীল, এ যেন অকূলের দিশাহারা নীল। আজ আমি অন্তরের অসীমতাকে প্রকাশ করছি—আমার দেহ অকূলের সুদূরের নীলকে ধারণ করছে। আজ এই কাপড় নবমেঘের বাণী বহন করে আনছে। নদীর এই নিকটের পারের রঙ সবুজ কিন্তু ও পারের যে অরণ্য দূরে তার রঙ নীল—সেই রঙ আজ আমার কাপড়ে। যে নবমেঘ দিশাহারা হয়ে আকাশে বেরিয়ে পড়েছে সেই সজল মেঘের বাণী আমার কাপড়ের রঙের মধ্যে। চিত্তেও সেই নবীনতার প্রতিরূপ আছে।

৪৪ যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে

প্রথম স্তবক॥ কে বলেছে, যৌবন, তুমি সুখের খাঁচাতে ছোলা জল খেয়ে বাস করবে? কে বলেছে তুমি বাঁধা নিয়মে আহার করবে আর ঝিমবে আর তোমার খাঁচার চারি দিকে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে? আরে বাপু, তুমি কাঁটাগাছের উপরে চ'ড়ে ফিঙের মতো পুচ্ছ নাচাও না কেন? খাঁচার মধ্যে বসে তোমার বাঁধা খোরাকি খেয়ে কাজ কী?

তুমি পথহীন সাগরপারের পথিক; তোমার ডানা চঞ্চল, অক্লান্ত। তোমাকে আজ অজানা বাসা সন্ধান করে নিতে হবে, জানার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ঝড়ে যে বজ্র আছে তার মধ্যে দুঃখ বেদনা থাকুক-না কেন, তাকেই তুমি ঝড় থেকে ছিন্ন করে নিয়ে আসতে পারো—আরামের জিনিসকে তুমি চাও না—এই তোমার দাবি।

দ্বিতীয় স্তবক॥ যৌবন, তুমি কি আয়ুকে চাও? তুমি কি নিরাপদের চণ্ডীমণ্ডপে গম্ভীর হয়ে বসে থাকবে? এই কি তোমার আকাঙ্ক্ষা? তুমি কি আয়ুর কাঙাল হয়ে থাকতে চাও? না, তুমি যাকে সন্ধান করছ সে যে মরণ। তুমি তো আয়ুর স্পৃহা রাখ না, তুমি যে অমৃতরস পান করতে চাও—মৃত্যুর ভিতর দিয়েই সেই সুধাকে আহরণ করবে। মৃত্যুই সেই অমৃতের পাত্রকে বহন করছে। তুমি জীবনের যে সার্থকতাকে চাও তোমার সেই প্রিয়া

মরণ-ঘোমটার ভিতরে অবগুণ্ঠিতা—সে মানিনী। তাকে পাবার সফলতাতেই তোমার পরিতৃপ্তি। তার আবরণকে উদ্‌ঘাটিত করে তুমি তাকে দেখো।

তৃতীয় স্তবক॥ কোন্‌ তান তুমি সাধতে চাও? শাস্ত্রকারের পোকাকাটা শুকনো তুলট কাগজের পুঁথির মধ্যে কি তোমার বাণী আছে? তোমার বাণী যে দক্ষিণ-হাওয়ার বীণায় আছে। তার সুরে যে অরণ্য জেগে ওঠে। সেই বাণীকে কি তুমি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বার করবে? যে বাণী শুনে অরণ্যে নবকিশলয়ের উদ্‌গম হয় সেই বাণীই তোমার। তুমি তো পুঁথির পাতার মধ্যে খড়্‌-খড়্‌ সর্‌-সর্‌ করছ না, তুমি ঝড়ের ঝংকার শুনে বেরিয়ে পড়। তোমার বাণী ঢেউয়ে তার বিজয়ডঙ্কা বাজায়।

চতুর্থ স্তবক॥ এই-যে একটুখানি প্রাণের গণ্ডির মধ্যে কোনো রকমে বেঁচে আছি, তোমার এই মায়া কাটিয়ে উঠতে হবে। তুমি যে চিরকালে—যতদিন মানুষ বাঁচবে ততদিন তোমার বিজয়ডঙ্কা বাজবে। সূর্যের আলোক যেমন কুয়াশাকে ছিন্ন করে ফেলে, তেমন তোমার যে দীপ্তিশিখা তা বয়সের এই কুহেলিকাকে ছিন্ন করে কেটে ফেলবে। যেমনতরো কুঁড়ির বাইরে যে পত্রপুট তা সেই খড়্‌ খড়ে পাতা কেটে ফেলে ভিতরের ফুলটিকে উদ্‌ভিন্ন করে, তেমনি বয়স-রূপ কুঁড়ির বাইরের যে আবরণ সেটা হয় জীর্ণ—তার বক্ষ দুফাঁক করে তোমার অমর স্বরূপটি—যা ঝরবে না, মরবে না, তোমার সেই চিরনবীন প্রকাশটি—জরা বিদীর্ণ করে ফুটে উঠুক।

পঞ্চম স্তবক॥ তুমি কি ভোগের গ্লানিতে জড়িত হয়ে ধুলিতে আসক্ত হয়ে থাকবে? তুমি কি ভোগের আবর্জনার বোঝার গ্লানিভারে লুণ্ঠিত হয়ে থাকবে? তোমার যে পবিত্র আলোর উজ্জ্বলতা আছে, মাথায় সোনার মুকুট আছে। যে কবি তোমার কবিতা রচনা করে সে হচ্ছে অগ্নি—তার ঊর্ধ্বশিখা উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকে। আগুন তোমার কবি, সে তোমার জয়গান করে। সূর্য তোমার মধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দেখে। তুমি কি আত্মসুখে ভুলে ধুলায় পড়ে থাকবে? সূর্য যে তোমার মাথার উপর উঠবে, তাকে কি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করবে না?

বলাকা ৪ ও ৭-সংখ্যক কবিতার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন—

[৪] বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বানশঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়—অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে। সময় এলেই, উদাসীন ভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।

[৭] শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তা হলে দেখতে পাই, সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না—ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না ব'লেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তাঁর চলে যেতে হয়—পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলই সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয়; তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেইরকম। সে সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো খসে পড়েছে, তাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয় নি।

তাজমহলের শেষ দুটি লাইনের সর্বনাম 'আমি' ও 'সে'—যে চলে যায় সেই হচ্ছে 'সে', তার স্মৃতিবন্ধন নেই; আর, যে অহং কাঁদছে সেই তো ভার-বওয়া পদার্থ। এখানে 'আমি' বলতে কবি নয়, 'আমি-আমার' ক'রে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। 'আমার বিরহ—আমার স্মৃতি—আমার তাজমহল' যে মানুষটা বলে তারই প্রতীক ঐ

গোরস্থানে; আর মুক্ত হয়েছে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী—তাকে কোনো-একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারতসাম্রাজ্যে, না শাজাহান-নামরূপ-ধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে।[৪]

—প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৮, পৃ ১২৩

কবি শেষোক্ত কবিতার প্রসঙ্গেই শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে লেখেন—

যে প্রেম সম্মুখ-পানে...
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।...

কবিতা লিখেছি বলেই যে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই। মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মানের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্তর্যামীর কাজ সারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে। এখন বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে বের করতে হবে—সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি তেমনি তুমিও আছে এবং আরো দশজন আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিয়ে সর্বদাই হট্টগোল বেধে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে আমার ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি—যদি সন্তোষজনক না মনে করো, তোমার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।

বেগমমণ্ডলীপরিবৃত বাদশার যে প্রেম, কালিদাস হংসপদিকার মুখ থেকে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে প্রেম চল্‌তি পথের। ধুলোর উপরে তার খেলাঘর। মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিল ব'লেই বিরহের একটি সজীব বীজ সেই খেলাঘরের ধুলির উপরে পড়ে ধুলি হয়ে যায় নি, ক্লান্তিপ্রবণ বিলাসের ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তার ভিতরকাব অমরতা ক্ষণকালের পরমা স্মৃতিকে বহন করে রয়ে গেল। যে বেদনাকে সেই স্মৃতি ঘোষণা করছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তার আর-একটি ঘোষণা আছে; তার বাণী হচ্ছে এই যে, সেই শাজাহানও নেই সেই মমতাজও নেই, কেবল তাদের যাত্রাপথের এক অংশের ধূলির উপরে জীবনের ক্রন্দনধ্বনি বহন করে রয়ে গেছে তাজমহল। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমের মধ্যে একটা মহিমা আছে, দুই তপোবনের মাঝখান দিয়ে সে গেছে অমরাবতীর দিকে—তার সংকীর্ণ খেলাঘরের বেড়া ভেঙে গিয়েছিল, তাই প্রথম বিলাসবিভ্রমের বিস্মৃতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সে তপঃপূত চিরস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে; সে প্রেম দুঃখবন্ধুর পথে অন্তহীন সম্মুখের দিকে চরে গিয়েছে, সম্ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি নয়।

আমি জানি শাজাহানের এই অংশটি দুর্বোধ। তাই এক সময়ে এটাকে বর্জন করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম, কে বোঝে কে না-বোঝে সে কথার বিচার আমি করতে যাব কেন—তোমাদের মতো অধ্যাপকদের আক্কেল দাঁতের চর্ব্যপদার্থ না রেখে গেলে ছাত্রমণ্ডলীদের ধাঁধা লাগাবে কী উপায়ে? ২১ শ্রাবণ ১৩৪৪

—রবীন্দ্রানাথের চিঠি

১৯৪০ সনে (এপ্রিল-মে/বৈশাখ ১৩৪৭) মংপুতে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ বলাকার ৮-সংখ্যক কবিতার প্রসঙ্গে বলেন—

experience এর কথা কী করে বোঝাব। যেমন মনে পড়ে বলাকার কথা—সেই এলাহাবাদে ছাদের উপর বসে আছি, বসেই আছি—দীর্ঘ সময়, রাত্রি বয়ে চলেছে, তারাগুলো

৪। এই কবিতার (সংখ্যা ৭) পূর্বপাঠ লেখা হয় ১৪ কার্তিক তারিখের রাত্রে। উহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের বিন্যাস বদল করিয়া, শেষ স্তবকের শেষে (বর্তমান তৃতীয়ের শেষে) ১৭টি নূতন ছত্র এবং নূতন এক স্তবক (বর্তমান চতুর্থ) যোগ করিয়া, তাহা ছাড়া বহু পাঠও বদল করিয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেওয়া হয় পরদিন, অর্থাৎ ১৫ কার্তিক ১৩২১ তারিখে।

আকাশের এপার থেকে ওপারে চলে গেল। আমি বসে বসে যেন অনুভব করলুম কালের স্রোত, যে কাল বয়ে চলেছে তার প্রবল বেগ, সে আমি বোঝাতে পারি নি, সেই অনুভূতি বোঝানো যায় না। কত রকম চেষ্টা তো করলুম নদীর সঙ্গে স্রোতের সঙ্গে তুলনা ক'রে—বয়ে চলেছে কাল প্রবাহের মতো, তার মধ্যে বস্তুগুলো যেন জলের ফেনার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উঠেছে, কিন্তু বলতে কি পেরেছি? সেদিন রাত্রে যেমন করে অনুভব করেছিলুম তা বলা হয় নি। ও কবিতা যারা বিশ্লেষণ করে পড়বে তারা পাবে ওর মধ্যে ছন্দ উপমা মিল তত্ত্ব কত-কী কিন্তু তাই দিয়ে ওকে বোঝা যায় না। আরও একটা কিছু যোগ করতে হবে। সে, যে পড়বে তার নিজের অন্তর থেকেই। তার মনের মধ্যে যদি সেই রকম স্থান থাকে যেখানে এর অনুভূতিটা বাজে—তা না হলে ও হবে না...ওর true perspective পাবে না।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (মৈত্রেয়ী দেবী-প্রণীত) ১৯৪৩, পৃ ২৫১

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলাকার ২২-সংখ্যক কবিতা[৫] সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ লিখিয়াছিলেন—

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শান্তং শিবং অদ্বৈতং। য়িহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ ব'লে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।—

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারই নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারই আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি—
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্য-মিথ্যা ভালো-মন্দ জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই-সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়?—অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে : সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে, জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে, অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে

৫। বাইশ সংখ্যার এই 'মুক্তি' কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দোমুক্তি'র যে নূতন পদক্ষেপ সূচিত সে সম্পর্কে দ্রষ্টব্য আলোচনা : রবীন্দ্রবীক্ষা-৪, পৌষ ১৩৮৪, পৃ ১০২-১০৪।

আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং—মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন; তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদ্‌কেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না—সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গা-যমুনাসংগম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া তা নয়, সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই-যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা, জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে? সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে : অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। গময় এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

—সবুজ পত্র। আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

রসাত্মক বাক্যে ও ছন্দোবদ্ধ পদবিন্যাসে যাহা বলা হইয়াছে বলাকার ২৮-সংখ্যক কবিতায় চতুর্থ স্তবকে, প্রায় এক বৎসর পূর্বে তাহাই বলা হয় উপাসনামন্দিরের এক ভাষণে; উহার প্রাসঙ্গিক অংশ শান্তিনিকেতন গ্রন্থ হইতে এ স্থলে সংকলনযোগ্য—

কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, 'তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ করতে হবে।' সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এতদিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে? যে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচার-বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে? তার ঘর-ভরা শিশু, তার মা বাপ ভাই বন্ধু আত্মীয় প্রতিবেশী—এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে? না, তিনি বলেছেন, 'তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব—আর-সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গসৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এত বড়ো একটা চরম সৃষ্টি হতে পারে নি।'...

আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হয়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুশি হয়ে চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, 'আমি ঐ সৃষ্টিতে আরো কিছু সৃষ্টি করব।'...আমি গান সৃষ্টি করব বলে সেই গান তিনি শোনাবার জন্যে আপনি এসেছেন। তিনি খুশি হয়েছেন—মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েছেন, প্রেম দিয়েছেন, তা যে মিলল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে।... এই-যে তাঁর মুখের খুশি—না দেখতে পেলে যে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়।

যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে, মানুষ করে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় বসে আছে, সে কিছুই নয়। কিন্তু শিল্পী কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য নিল; কবি সুর নিল, রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে পারা যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে।...প্রাতঃকাল, ১১ মাঘ ১৩২০

—সৃষ্টির অধিকার। শান্তিনিকেতন

এই প্রসঙ্গই আর-একভাবে উত্থাপিত বলাকার ২৪-সংখ্যক কবিতায়। সে সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য ইতঃপূর্বে সংকলিত।

জগৎ-জোড়া দুঃখের যে নিদারুণ বেদনা-বোধ হইতে বলাকার ৩৭-সংখ্যক কবিতাটি লেখা, তাহা কবিচিত্তে, কবির চিন্তায় ও উক্তিতে, কিছুকাল হইতে যেভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহার সাক্ষ্য দেয় শান্তিনিকেতন গ্রন্থের একাধিক ভাষণ (শ্রাবণ-পৌষ ১৩২১)। যেমন—

সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে—কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে।...এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে—সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে : মা মা হিংসীঃ।...তুমি আমাদের পিতা, তুমি সকলের পিতা, এই কথা বলতেই হবে।...

আজ অপ্রেমঝঞ্ঝার মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে, এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দন-ধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!...বিশ্বপাপাকে দূর করো।. বিনাশ থেকে রক্ষা করো। ২০ শ্রাবণ ১৩২১

—মা মা হিংসীঃ। শান্তিনিকেতন

একবার ভেবে দেখো দেখি, এই মুহূর্তে যখন এখানে আমরা আনন্দোৎসব করছি তখন সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে।... কী প্রলয়ের বিভীষিকা! সেখানে এই বিভীষিকার উপরে দাঁড়িয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রকার করছে... ডাক শুনে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। কে ভুল করেছে, কে ভুল করে নি—এ যুদ্ধে কোন্ পক্ষ কী পরিমাণ দায়ী, সে কথা দূরের কথা। কিন্তু, ইতিহাসের ডাক পড়েছে—সে ডাক জর্মান শুনেছে, ইংরাজ শুনেছে, ফরাসি শুনেছে, বেলজিয়ান শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা করবেন... কোনো জানি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে, তা হবে না—ইতিহাসবিধাতার এই আদেশ। '...জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর...ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না।' যেমনি এই হুকুম পৌঁচেছে অমনি কামানের গোলা দুই পক্ষ থেকে সেই প্রাচীরের উপর এসে পড়েছে। বীরের দল ইতিহাসবিধাতার পূজায় তাদের রক্তপদ্মের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে।... মহেশ্বর যখন তাঁর পিনাকে রুদ্র নিশ্বাস ভরেছেন তখন মাকে কেঁদে বলতে হয়েছে, 'যাও!' স্ত্রীকে কেঁদে নিজের হাতে স্বামীকে বর্ম পরিয়ে দিতে হয়েছে। সমুদ্রপারে আজ মরণযজ্ঞে সেই প্রাণের মহোৎসব।... ৭ পৌষ ১৩২১ প্রাতে।

—আরো। শান্তিনিকেতন

আজ এই-যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে

উঠেছে : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়।... বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

...এক-এক সময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে—যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু, এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক।... মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মানুষ যে পরস্পর গাঁথা হয়ে আছে।

মানুষের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে গৌরব আছে তাকে ভুললে চলবে না। এইজন্যই আমাদের সকলকে দুঃখভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না—সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না।...

তাই বলছি যে, সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখকে এক করে যে একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম আছেন, তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন তবে বেদনার এই গতি কখনোই এমন বেগবান হতে পারত না। ধনী-দরিদ্র জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে। এই কথাটি আজ বিশেষভাবে অনুভব করো।... ৯ ভাদ্র ১৩২১

—পাপের মার্জনা। শান্তিনিকেতন

বলাকার ব্যাখ্যায় লেখা না হইলেও—'বলাকা' তখনও সুদূর ভাবীকালে প্রচ্ছন্ন—রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পুরাতন নিবন্ধের বিশেষ বিশেষ অংশ 'বালক' (১২৯২) মাসিক পত্রের বিভিন্ন সংখ্যা হইতে এ স্থলে সংকলন করা যাইতে পারে। বলাকার ভাবধারা-যে রবীন্দ্রচিত্তের চিরপ্রবাহিণী ধারা মাত্র—প্রকাশের বিস্ময়কর অপূর্বতা সত্ত্বেও, কবির ধ্যানধারণা বা মননে একেবারে নূতন নয়, এই স্বল্পসংকলন হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। বলাকা কাব্যের সর্বত্র-অনুস্যূত ভাবনার সহিত, বিশেষতঃ 'ছবি' (৬) ও 'শাজাহান' (৭) কবিতার বক্তব্যের সহিত, 'রুদ্ধগৃহ'[৬] ও 'পথপ্রান্তে'[৬] প্রবন্ধের অথবা 'উত্তর প্রত্যুত্তর'[৭] পত্র-প্রবন্ধের সম্পূর্ণই মিল দেখা যায়—

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধিভবনে কৃপণের মতো মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণপ্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে।...

৬। উত্তরকালে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলিত। কবি 'রুদ্ধগৃহ' সম্পর্কে '২১। ৯। ৩৪' তারিখের এক পত্রে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন—দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০, পৃ ১৭৭—'দেখা যাচ্চে পরবর্ত্তীকালের বলাকার ভাবের সঙ্গে এই লেখার মিল আছে।' অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ চিঠিও বিশেষ মননের বিষয়।

৭। পূর্বপ্রকাশিত 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধের আলোচনাসূত্রে এই প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছেন 'শ্রীঅঃ'। ইনি কবিবন্ধু 'অক্ষয়কুমার বড়াল' এরূপ অনুমান করা হয়।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে; পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই-বোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে, আমাদের কোনো ভয় থাকে না; কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু, রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়।...

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য-ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন! হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন! তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও; জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

...স্নেহ প্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই।...

দ্বার খুলিয়া দাও। সূর্যের আলো দেখিয়া, মানুষের সাড়া পাইয়া, চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু, পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাতায়নের মধ্য দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

—রুদ্ধগৃহ। বালক। আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত, তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত। নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর-সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়। বৃহৎ প্রেমের প্রভাবে ক্ষুদ্র প্রেমের সূত্রসকল টুটিয়া যায়। জগৎ তাই চলিতেছে, নইলে আপনার ভারে আপনি অচল হইয়া পড়িত।

ঐ দেখো, কচি ছেলেটিকে বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে...ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গৃহের মতো মধুর করিয়াছে কে? কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন? মা কেন মনে করে এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনন্তের অবসান? অনন্তের পথে যেখানে পৃথিবীর সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে মায়ের হাত ধরিয়া মাকে সেই ছেলের রাজ্যে লইয়া যায়—সেখানে শতকোটি সন্তান।...

একটি ছেলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া দেয়। যার ছেলে নাই তার কাছে অনন্ত স্বর্গের একটা দ্বার রুদ্ধ; ছেলেটি আসিয়া স্বর্গের সেই দ্বারটি খুলিয়া দেয়; তার পর তুমি চলিয়া যাও, সেও চলিয়া যাক। তার কাজ ফুরাইল, তার অন্য কাজ আছে।

প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর-একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইজন্যই তাহাকে পথের আলো বলি। ...একটিকে ভালোবাসিলেই আর-একটিকে ভালোবাসিতে শিখিবে। অর্থাৎ এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

...পথ চলিতে আর-কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্যে করে।

—পথপ্রান্তে। বালক। অগ্রহায়ণ ১২৯২

জগতের মধ্যে আমাদের এমন 'এক' নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে 'এক' হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে—এক কাড়িয়া আর-এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের 'এক' যৌবনের 'এক' নহে, যৌবনের 'এক' বার্ধক্যের 'এক' নহে, ইহজন্মের 'এক' পরজন্মের 'এক' নহে। এইরূপ শতসহস্র একের মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই এক মহৎ **'এক'** এর দিকে লইয়া যাইতেছে। সেই দিকেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, পথের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে আসি নাই... আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। অনুরাগ বদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে, অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে। প্রকৃতির বৈবাগ্য দেখো। সে সকলকেই ভালোবাসে বলিয়া কাহারও জন্য শোক করে না। তাহার দুই-চারিটা চন্দ্র সূর্য গুঁড়া হইয়া গেলেও তাহার মুখ অন্ধকার হয় না... অথচ একটি সামান্য তৃণের অগ্রভাগেও তাহার অসীম হৃদয়ের সমস্ত যত্ন সমস্ত আদর স্থিতি করিতেছে, তাহার অনন্ত শক্তি কাজ করিতেছে। ...প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমাণ স্রোতের উপরে সীলমোহরের ছাপ মারিয়া 'আমার' বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে। ...বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম এ'ের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে অন্য পথ দেখি না। সোলাপুর। ২৬ আশ্বিন [১২৯২]

—উত্তর প্রত্যুত্তর। বালক। পৌষ ১২৯২

বিশ্বসৃষ্টি তথা জাগতিক জীবনের যে নিরন্তর গতিময়তা উদ্‌ভাসিত বলাকার ৩৬-সংখ্যক কবিতায় (কার্তিক ১৩২২) আর নিঃসীম তাৎপর্যেরও পরমাশ্চর্য ব্যঞ্জনা তৎপূর্বে 'চঞ্চলা'য় (সংখ্যা ৮ / পৌষ ১৩২১) তাহা লইয়া পূর্বে বহু আলোচনা হইয়া থাকিবে, পরেও হইবে; আর সে আলোচনায় রবীন্দ্র-সমকালীন বিখ্যাত দার্শনিক বের্গ্‌সঁর (১৮৫৯-১৯৪১ খৃষ্টাব্দ) উল্লেখও প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলা চলে। এ প্রসঙ্গে লণ্ডন হইতে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা (বিলাতী ডাকঘরের ছাপ ৩০ অগস্ট্ ১৯২২ বা ১৪ ভাদ্র ১৩১৯) কবির এক পত্রের শেষাংশ তুলিয়া দেওয়া যায়—

Bergson সম্বন্ধে একটি চটি বই... সেটা ভারি চমৎকার, সহজে ওঁর মতটা ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। উনি যে দিকটা দেখিয়েছেন সেটা খুব চমৎকার কিন্তু অন্য দিকটাকে একেবারে অস্বীকার করাবার কোনো মানেই নেই। গতিতত্ত্বও যেমন সত্য, স্থিতিতত্ত্বও তেমনি সত্য এবং সেইজন্যই গতিকেও আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই পারিনে—সেটা কেবলমাত্র আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির মায়া নয়—সেটা সত্য বলেই তার হাত আমরা এড়াতে পারিনে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশেষ ব্যাখ্যা না করিলেও এ চিঠি লেখার সময় প্রাচীন উপনিষদের বাণী, বিশেষতঃ ঈশোপনিষদের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক, কবির মনে অবশ্যই জাগরূক ছিল এরূপ আমাদের মনে হয়। অপরপক্ষে তরুণ বয়সেই গতিবাদের প্রবক্তা কতটা ছিলেন তিনি তার অল্প-স্বল্প প্রমাণ বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে ইতঃপূর্বে সংকলিত (পৃ. ১৭-৭৬)। সে-সময় (১২৯২ আশ্বিন-পৌষ/খৃষ্টীয় ১৮৮৫-শেষ ভাগ) বের্গ্‌স'র অভিনব গতিবাদের উদ্‌ভব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এ দেশে কিংবা ও দেশেও কতটা হইয়াছিল, সুধীজন তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

বলাকার চতুর্থ কবিতা ('শঙ্খ') প্রথমে যেরূপ লেখা হয়, হয়তো অল্প পরেই তাহাতে ছন্দোগত

বিশেষ পরিবর্তন ঘটে, তাহার সাক্ষ্য আছে স্বর্গত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা কবির পত্রে। কৌতূহলী পাঠক দেশ পত্রের ১৩৭৩ শারদীয়া সংখ্যা (পৃ ২৪-২৫) দুটি রূপ পাশাপাশি দেখিয়া তুলনা করিতে পারিবেন। এ স্থলে কেবল প্রথম স্তবকের পূর্বরূপটি সংকলন করা যাইতেছে—

তোমার শঙ্খ ধূলায় আছে পড়ে'
কেমন করে সইব?
বাতাস গেছে আলোক গেছে মরে'
এ কি রে দুর্দৈব!
বইবে যারা চলুক ধ্বজা বেয়ে,
গাইবে যারা উঠুক তারা গেয়ে,
ছুটবে যারা যায় না কেন ধেয়ে,
আয় না রে নিঃশঙ্ক!
ধুলার পরে ঐ যে আছে চেয়ে
অমোঘ তব শঙ্খ।

আদ্যন্ত কবিতায় দীর্ঘ ছত্রগুলিতে দুইটি করিয়া মাত্রা কম তকরিয়া দেওয়ায় কবিতা প্রাণপূর্ণ দ্রুতিলাভ করিয়াছে; তাহা আশ্চর্যজনক সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির প্রমাণে, বর্তমান গ্রন্থে কয়েকটি কবিতার পাঠ এবং রচনার স্থানকাল-সম্পর্কিত তথ্য সংশোধিত। দ্বাদশখণ্ড 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে বলাকা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যাইবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, ২৮-সংখ্যক কবিতাটির প্রথম স্তবকের পরে এই একটি নূতন স্তবক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়—

ফুলের পাতার পুটে রেখে দিলে তব নাম
করে' সে প্রণাম—
তোমার নামের ভরে মাথা হয় নিচু,
তার বেশি আর নয় কিছু।
দিলে জনমের প্রাতে
মোর হাতে
শুধু শূন্য সাজিখানি, রক্তে দিলে শান্তিহীন খোঁজা;
শূন্য ভ'রে এনে দিই পূজা।

মিশ্রকলাবৃত্ত যে মুক্তক ছন্দে বলাকা কাব্যের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যাহার অন্ত্যানুপ্রাসশূন্য পূর্বাভাস মাত্র মানসী কাব্যে ১২৯৪ অগ্রহায়ণের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়, তাহারই সার্থক প্রথম প্রয়োদ দেখা যায় 'ছবি' কবিতায়—গ্রন্থে ইহার সংখ্যা ৬। শন্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের এক পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির যে রূপ দেখা যায়, তাহার আনুপূর্বিক লিপিচিত্র বলাকার ১৩৭৭ পৌষের মুদ্রণে প্রথম প্রকাশিত। বলা বাহুল্য, পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠে নানা 'সংশোধন' ও পরিবর্তন করার পরেই, তাহা ১৩২১ অগ্রহায়ণের সবুজ পত্রে ও গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। পূর্বলিখিত আর সাময়িক পত্রে তথা গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠের তুলনা করিলে রবীন্দ্ররচনারীতির প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা করার সুবিধা হইতে পারে।

উল্লেখ করা প্রায়োজন কেবল মিশ্রকলাবৃত্তে নয়, দলবৃত্তে বা খাস বাংলার ছড়ার ছন্দেও মুক্তক রচনা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই; তন্মধ্যে প্রথমের মর্যাদা বলাকার ২২-সংখ্যক কবিতার—প্রবাসী পত্রে শিরোনাম 'মুক্তি'। এটি বা এই গুচ্ছের কবিতা সম্পর্কে

কৌতূহলজনক বিবরণ পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালীন ডায়ারিতে; তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ পিতৃস্মৃতি গ্রন্থ হইতে সংকলনযোগ্য : 'বাবা পরশুদিন [১২. ২. ১৯১৫/২৯ মাঘ ১৩২১] শিলাইদহ থেকে ফিরে এসেছেন। সেখানে...অনেকগুলি কবিতা ও একটা গল্প [বলাকা কাব্যের '২২'-'৩৩' সংখ্যা[৮] ও চতুরঙ্গের 'শ্রীবিলাস'] এই ক'টা দিনের মধ্যে [? ১৮-২৮ মাঘ ১৩২১] লিখে ফেলেছেন। ...বললেন কিছুদিন আগে রমণীমোহন ঘোষ তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলেন যে 'আপনাকে তো আজকাল আবার সেই সাধুভাষায় [মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে] ফিরে যেতে হল'—সেটার কিছু প্রতিবাদ করেন নি—কিন্তু মনে মনে ছিল যে এখন যে নতুন ছন্দ [মুক্তক] ব্যবহার করছেন তাতে সহজ বাংলা ভাষায় [বাংলা ছড়ার রীতিতে বা দলবৃত্তে] লিখতে চেষ্টা করবেন। এবারে শিলাইদায় গিয়ে 'মুক্তি' কবিতা সেই প্রথম চেষ্টা।[৯] প্রথমটায় একটু শক্ত ঠেকেছিল... তার পর সহজেই আসতে লাগল। বরঞ্চ দেখলেন এই রকম ভাঙা ছন্দে [মুক্তকে] সহজ ভাষাই [ছড়ার বা দলবৃত্তের পদ্ধতি] ঠিক খাটে।[১০]

—পিতৃস্মৃতি (১৩৭৩), পৃ ২৮১-৮২

বলাকার যৎসামান্য ছন্দোবিচারে যে নূতন পরিভাষা ব্যবহৃত হইল তাহার উদ্‌ভাবক প্রবোধচন্দ্র সেন। তাঁহার আধুনিক রচনাবলীতে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত। বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা না হইলেও, বিশেষ বিশেষ কবিতার দৃষ্টান্তে বুঝিতে কোনো অসুবিধা হইবে না আশা করা যায়।

বলাকার সকল কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত, এবং সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ কবিতারই শিরোনাম ছিল। বলাকার তৃতীয় মুদ্রণেও প্রথম আটটি কবিতা শিরোনামহীন ছিল না। বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতাগুলির মুদ্রণের তালিকা পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখসহ অতঃপর সংকলিত হইল—

১	সবুজের অভিযান	সবুজ পত্র	বৈশাখ ১৩২১।	১৭
২	সর্বনেশে	সবুজ পত্র	শ্রাবণ ১৩২১।	২০৯
৩	[আহ্বান]	সবুজ পত্র	জ্যৈষ্ঠ ১৩২১।	৯৬
৪	শঙ্খ	সবুজ পত্র	আষাঢ় ১৩২১।	১৪১
৫	পাড়ি	সবুজ পত্র	ভাদ্র ১৩২১।	৩২৮
৬	ছবি	সবুজ পত্র	অগ্রহায়ণ ১৩২১।	৫১৭
৭	তাজমহল [শা-জাহান]	সবুজ পত্র	অগ্রহায়ণ ১৩২১।	৫৫১
৮	চঞ্চলা	সবুজ পত্র	পৌষ ১৩২১।	৫৭৭
৯	তাজমহল	সবুজ পত্র	পৌষ ১৩২১।	৫৮৭
১০	উপহার	সবুজ পত্র	মাঘ ১৩২১।	৬৬২
১১	বিচার	সবুজ পত্র	মাঘ ১৩২১।	৬৯৪

৮। সবগুলি দলবৃত্ত মুক্তক নয়। রচনা-সন্নিবেশ রচনার কালক্রমে; তন্মধ্যে সংখ্যা ২২, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩ দলবৃত্ত মুক্তক বটে। এই রীতিপদ্ধতির চমৎকারজনক উৎকর্ষ পরবর্তী পলাতকা কাব্যে।

৯। পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে প্রথমাবধি ভুল করিয়া মনে করা হয় এটি পলাতকার 'মুক্তি' : ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো ইত্যাদি। রথীন্দ্রনাথের ডায়ারির ভিতরে সেরূপ কোথাও বলা হয় নাই। সব দিক বিবেচনা করিলে এটিকে অবশ্যই বলাকার 'মুক্তি' কবিতা (সংখ্যা ২২) বলিতে হয়।

১০। রথীন্দ্রনাথের ডায়ারিতে ইহাও বলা হয় যে, 'উনি ইচ্ছা করে কোথাও কোথাও দু-একটা অক্ষর কম দিয়েছেন—যাতে একটা লাইনের ঝোঁকটা' আর-এক লাইনে 'থেমে না যায়।' মনে হয় এই 'অক্ষর'-কমতির কথাটি বুঝা যাইবে প্রবাসী পত্রের পাঠ দেখিলে; বলাকার পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত, বিশেষতঃ সূচনাংশে।

১২	দেওয়া নেওয়া	প্রবাসী	আশ্বিন ১৩২২। ৬৮৩
১৩	যৌবনের পত্র	সবুজ পত্র	আষাঢ় ১৩২২। ১৬২
১৪	মাধবী	প্রবাসী	চৈত্র ১৩২২। ৬১৪
১৫	আমার গান	সবুজ পত্র	বৈশাখ ১৩২২। ২২
১৬	রূপ	সবুজ পত্র	ফাল্গুন ১৩২২। ৬৮৭
১৭	প্রেমের পরশ	মানসী	আষাঢ় ১৩২২। ৪৮৫
১৮	যাত্রা	সবুজ পত্র	শ্রাবণ ১৩২২। ২৬৯
১৯	জীবন মরণ	ভারতী	আশ্বিন ১৩২২। ৫২১
২০	যাত্রাগান	প্রবাসী	বৈশাখ ১৩২২। ৭৯
২১	অগ্রণী	প্রবাসী	বৈশাখ ১৩২২। ৯৮
২২	মুক্তি	প্রবাসী	ফাল্গুন ১৩২১। ৬৮৫*
২৩	স্বর্গ	সবুজ পত্র	ফাগ্গুন ৩২১। ৭৫৮
২৪	স্বর্গ	প্রবাসী	ফাল্গুন ১৩২১। ৬৯৪*
২৫	এবার	সবুজ পত্র	ফাগ্গুন ১৩২১। ৮০৪
২৬	আবার	সবুজ পত্র	ফাল্গুন ১৩২১। ৮০৫
২৭	রাজা	ভারতী	আষাঢ় ১৩২৩। ৩৭০
২৮	দেনাপাওনা	ভারতী	চৈত্র ১৩২২। ১১১৩
২৯	তুমি-আমি	সবুজ পত্র	বৈশাখ ১৩২২। ২৩
৩০	অজনা	সবুজ পত্র	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২। ৩৫৭
৩১	পূর্ণের অভাব	ভারতী	চৈত্র ১৩২২। ১১৮৪
৩২	সন্ধ্যায়	ভারতী	শ্রাবণ ১৩২২। ৩২৯
৩৩	প্রেমের বিকাশ	প্রবাসী	চৈত্র ১৩২১। ৬০১
৩৪	খোলা জানালায়	প্রবাসী	চৈত্র ১৩২২। ৫৩৩
৩৫	'মানসী'	মানসী	মাঘ ১৩২২। ৬১৩
৩৬	বলাকা	সবুজ পত্র	কার্তিক ১৩২২। ৪১৮
৩৭	ঝড়ের খেয়া	প্রবাসী	পৌষ ১৩২২। ২৩৩
৩৮	নূতন বসন	সবুজ পত্র	অগ্রহায়ণ ১৩২২। ৪৬৩
৩৯	শেকস্‌পিয়র	সবুজ পত্র	পৌষ ১৩২২। ৬০৭
৪০	চেয়ে দেখা	সবুজ পত্র	ফাল্গুন ১৩২২। ৭২৬
৪১		সবুজ পত্র	চৈত্র ১৩২২। ৭৯৬
৪২	অপমানিত	মানসী	বৈশাখ ১৩২৩। ২৪৯
৪৩	পথের প্রেম	ভারতী	বৈশাখ ১৩২৩। ২৯
৪৪	যৌবন	প্রবাসী	বৈশাখ ১৩২৩। ১
৪৫	নববর্ষের আশীর্বাদ	সবুজ পত্র	বৈশাখ ১৩২৩। ১

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় বলাকার সমুদয় কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এবং ৩ এবং ৪১ -সংখ্যাঙ্কিত কবিতা ব্যতীত সবগুলিই বিচিত্র শিরোনাম-যুক্ত ছিল; বন্ধনীমধ্যে তৃতীয়-মুদ্রণ বলাকায় ব্যবহৃত বিশেষ শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে,

* প্রবাসী পত্রে ভ্রমক্রমে ৫৮৫ স্থলে ৬৮৫ ও ৫৯৪ স্থলে ৬৯৪ ছাপা হইয়াছে।

৩৯-সংখ্যক কবিতাটি মহাকবি শেক্সপিয়রের মৃত্যুর ত্রিশততম স্মৃতিবার্ষিক উৎসব-উদ্‌যাপন উপলক্ষে চরিত হইয়া কবিকৃত ইংরেজী অনুবাদ-সহ *A Book of Homage to Shakespeare, 1916* গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত অনুবাদ রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত আছে।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমে অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলাকার অনেকগুলি কবিতার যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কর্তক অনুলিখিত হইয়া ১৩২৯-৩০ সালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় অনুলেখক মহাশয়ের বিশেষ সৌজন্যে, বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ের সূচনাতেই যেমন সেই ব্যাখ্যা ও আলোচনার আনুপূর্বিক সংকলন সম্ভবপর হইয়াছে, তেমনি মূল পাণ্ডুলিপির বহুলাংশ মিলাইয়া দেখিবারও সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়—কবি এই অনুলেখন সম্ভবতঃ আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং বহু স্থলেই বহু যোগ-বিয়োগ করিয়া বিশেষ সম্পাদনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডের প্রথম প্রকাশ (আশ্বিন ১৩৪৯) থেকেই কোনো কোনো কবিতার পাঠভেদ দেখা যায়। যেমন, অষ্টম কবিতার সপ্তম ও অষ্টম ছত্রের মধ্যে এক ছত্র : ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে।/এবং অষ্টাদশ কবিতার অষ্টম ও নবম ছত্রের মধ্যে : চারিদিকে নেমে নেমে আসে আবরণ;/ছত্র-দুটি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য পাঠভেদ—অষ্টম কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের ষষ্ঠ ছত্রে সর্বনাশা প্রেম' স্থলে 'সর্বনাশা প্রেমে'; উনশেষ স্তবকের পূর্বগামী ছত্রের সূচনায় 'নিঃশেষ' স্থলে 'নিঃশেষে'; এবং ত্রিচত্বারিংশ কবিতার সপ্তম স্তবকের সপ্তম ছত্রে 'ভরে' স্থলে 'ভরি'।

সাময়িক পত্রে এবং/বা প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থে যে-পাঠ পাওয়া যায় স্বতন্ত্র বলাকা কাব্যে মুখ্যত তাহাই গৃহীত।

দ্বাত্রিংশ কবিতার উনবিংশ ছত্রের রূপ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি অনুসারে—

তোমার ওই অনন্ত-মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে, /

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রথমাবধি এই পাঠ গৃহীত। সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে 'ওই' পদটি না থাকা মুদ্রণপ্রমাদ বলিয়া মনে হয়। 'তোমার' পদটি অতিপর্বিক।

সপ্তম কবিতার ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রথমনাথ বিশীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠির অনেকাংশ গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত। 'শুভাকাঙ্ক্ষা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯৭৯) গ্রন্থে মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিচিত্র অনুযায়ী পূর্বের দুইটি মুদ্রণপ্রমাদ বর্তমান গ্রন্থে সংশোধিত : 'লাগবে' স্থলে 'লাগাবে' এবং 'চলিত' স্থলে 'চল্‌তি'।

রবীন্দ্ররচনায়, বিশেষত কবিতায়, পাঠের বিবর্তন কীরূপ বিচিত্র এবং কতটা তাৎপর্যপূর্ণ হইতে পারে তাহার যৎসামান্য ধারণা হইবে বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত সম্পূর্ণ ও আংশিক বিশেষ দুইটি কবিতার পাণ্ডুলিপি-চিত্র হইতে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, রবীন্দ্ররচনার বহু ও বিচিত্র পাঠ-পঞ্জীকৃত সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে বিশ্বভারতী উদ্যোগী হইয়াছেন। সন্ধ্যাসংগীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, প্রকৃতির প্রতিশোধ, চিত্রাঙ্গদা, রাজা ও রানী, গ্রন্থের এইরূপ পাঠভেদপুঞ্জিত, সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপরিচয়-সংকলন ও সম্পাদনা : কানাই সামন্ত